বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দা : একটি পর্যালোচনা

(নির্বাচিত রচনা অবলম্বনে)

পিএইচ. ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক : বসুন্ধরা মণ্ডল

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা : AOOBE1200916 / 2016-17

তত্ত্বাবধায়ক : ড. শম্পা চৌধুরী

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৩

Certificate that the Thesis entitled

বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দা : একটি পর্যালোচনা (নির্বাচিত রচনা অবলম্বনে)

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur university is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Sampa Chaudhuri, Professor, Department of Bengali, Jadavpur University. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor | Candidate

Dated : | Dated :

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

‘বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দা ; একটি পর্যালোচনা (নির্বাচিত রচনা অবলম্বনে)’ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে পিএইচ. ডি স্তরের গবেষণা অভিসন্দর্ভ হিসেবে রচিত হয়েছে। কিশোর পাঠক হিসেবে বিভিন্ন গোয়েন্দা কাহিনির প্রতি যে আকর্ষণ বোধ করতাম, সেই পাঠ গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ আসে প্রথম এম. ফিল স্তরের গবেষণার বিষয় নির্বাচনের সময়। এম. ফিল করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত পড়াশুনো করতে গিয়ে বুঝতে পারি বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকলেও মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। তাই এই বিষয়টি নিয়ে পিএইচ. ডি স্তরে গবেষণা করার কথা ভাবি। তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শম্পা চৌধুরীর সম্মতি সহ কাজ শুরু করি। পিএইচ. ডি ডিগ্রি লাভের জন্য রচিত বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে একদম শুরু থেকে তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শম্পা চৌধুরীর যে সহযোগিতা পেয়েছি, তার জন্য আমি তাঁর কাছে চিরঋণী। তাঁর উপস্থিতি ছাড়া এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ করতে পারা একেবারেই সম্ভব ছিল না। তাঁর প্রতি আমার চির কৃতজ্ঞতা ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

আমাকে এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সব অধ্যাপকদের, বিভিন্ন সমস্যায় যাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ ও পি এইচ ডি সেলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি করার আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক ঊর্মি রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করি। তাঁর সহযোগিতা ও উৎসাহ দান যে আত্মবিশ্বাস ও গবেষণা কর্মের প্রতি আগ্রহ তৈরি করে দিয়েছিল তার জন্য তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

গবেষণার বিষয় সংক্রান্ত দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সন্ধানে জাতীয় গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হতে হয়। অন্যদিকে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সম্ভার থেকে বিশেষ সাহায্য লাভ করি। গবেষণা সংক্রান্ত পড়াশুনোর জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার ও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাহায্য পেয়েছি, এই দুই গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও যে যে গ্রন্থাগারের সহযোগিতা পেয়েছি সেগুলি হল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারকর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

আন্তর্জালিক মাধ্যমে যাঁদের আলোচনা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছি তার মধ্যে অধ্যাপক নির্মাল্য কুমার ঘোষের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারানি কাশীশ্বরী কলেজের সহযোগিতায় 'সাহিত্যতক্কো' পত্রিকা 'বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য ; সেকাল ও একাল' শীর্ষক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। এই আলোচনা চক্র থেকে উপকৃত হই, আলোচনা চক্রের আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানাই। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 'গোয়েন্দা কাহিনি পাঠের ভূমিকা' শীর্ষক যে কোর্সের আয়োজন করেছিল, তা থেকে বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছি। ড. অনামিকা দাস, ড. পরিচয় পাত্র, ড. সুদেষ্ঞা দত্ত চৌধুরী, ড. কিংশুক দাস ও অমিত চক্রবর্তীর গোয়েন্দা সাহিত্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনার পদ্ধতি আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। এঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। আর এই কোর্সের আয়োজনের জন্য নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

আমার অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের এই লিপিবদ্ধ সন্দর্ভ বিশেষজ্ঞ পরীক্ষকদের কাছে বিনীত ভাবে উপস্থাপন করছি। ত্রুটিমুক্ত ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলেও গবেষণাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং মুদ্রণ ও বানান প্রমাদ যদি থেকে থাকে তার জন্য গবেষক ক্ষমাপ্রার্থী।

।। সূচিপত্র ।।

অধ্যায়		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		১ - ৮
প্রথম অধ্যায় :	বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৯ – ২২
দ্বিতীয় অধ্যায় :	মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণের নানা দিক	২৩ – ৪৩
তৃতীয় অধ্যায় :	মেয়ে গোয়েন্দা সিরিজের সূত্রপাত প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কৃষ্ণা ও কুমারিকা সিরিজ	৪৪ - ১২১
চতুর্থ অধ্যায় :	কিশোরী গোয়েন্দা দলের আবির্ভাব নলিনী দাশের গণ্ডালু সিরিজ	১২২ - ১৬১
পঞ্চম অধ্যায় :	সখের গোয়েন্দাগিরিতে বিবাহিত নারীর পদার্পণ মনোজ সেনের দময়ন্তী	১৬২ – ১৯৮
ষষ্ঠ অধ্যায় :	গোয়েন্দা কাহিনির প্রেক্ষাপটে নারী জীবনের বিবর্তন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গার্গী সিরিজ	১৯৯ - ২৭৫
সপ্তম অধ্যায় :	পেশাদার গোয়েন্দার ভূমিকায় নারী সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন	২৭৬ – ৩১৬
অষ্টম অধ্যায় :	অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাদের কথা	৩১৭ – ৩৪৬
উপসংহার		৩৪৭ – ৩৫৩
গ্রন্থপঞ্জি		৩৫৪ – ৩৫৮

ভূমিকা

উনিশ শতকের নবম দশকে বাংলায় গোয়েন্দা সাহিত্য প্রকরণটির অনুপ্রবেশ ঘটে। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের কাছে এই পাশ্চাত্য অনুগামী সাহিত্যধারা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যে জনপ্রিয়তা এখনও অক্ষুণ্ণ। এই কারণে একের পর এক গোয়েন্দা সাহিত্য রচিত হতে থাকে। জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনি রচনায় কখনও ভাঁটা পড়তে দেখা যায়নি। তবে গোয়েন্দা কাহিনির কথা বললে পাঠক সমাজের মনে মূলত এক শক্ত সমর্থ পুরুষ চরিত্রের ছবিই ভেসে ওঠে। 'মেয়ে গোয়েন্দা' বিষয়টি এখনও পর্যন্ত ঠিক গোয়েন্দার পদমর্যাদায় উন্নীত হতে পারেনি।

গোয়েন্দা কাহিনি মূলত পুরুষতান্ত্রিক একটি সাহিত্য ধারা। অপরাধ জগতে নারীর আনাগোনার বিষয়টি তৎকালীন সমাজিক কাঠামো অনুযায়ী বিশেষ বিশ্বাসযোগ্যও ছিল না। কারণ, উনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত নারীরা শিক্ষিত হওয়ার অধিকার পেলেও তাদের জীবন মূলত সংসার কেন্দ্রিক ছিল। তাই গোয়েন্দা সাহিত্যের আওতায় তাদের আনাগোনার পরিমাণ খুব সীমিত ছিল। অপরাধ সাহিত্যে মূলত খল চরিত্র হিসেবে নারীর উপস্থিতি চোখে পড়ত। আস্তে আস্তে পুরুষ গোয়েন্দাদের পরামর্শদাতা হিসেবেও মেয়েদের দেখা যায়। তবে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত মেয়ে গোয়েন্দার দেখা মেলে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ভিত তৈরির প্রায় সাত দশক পরে। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা হিসেবে নারী চরিত্রের আগমন ঘটে। আগাথা ক্রিস্টির মিস মারপেল চরিত্র থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সৌরীন্দ্র মোহন রায়, প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত 'বিন্দিপিসির গোয়েন্দাগিরি', 'ঠাকুমার গোয়েন্দাগিরি' জাতীয় গল্প লিখলেও বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রতিষ্ঠিত মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র হিসেবে কৃষ্ণার নাম উল্লেখ করতেই হয়। বাংলায় পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্য দিয়ে গোয়েন্দা সাহিত্যের ভিত প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণা নির্দিষ্ট কোনও পাশ্চাত্য গোয়েন্দা কাহিনির আদলে নির্মিত নয়।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য রচনায় লেখিকাদের আগমন ঘটতে বিশেষ দেরি হয়নি। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের (১৮৯৯/১৯০০ খ্রিস্টাব্দের) 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর বিজয়ীর তালিকায় সরলাবালা সরকারের নামও লক্ষ করা যায়। এরপর সুষমা সেন, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রমুখ লেখিকা গোয়েন্দা গল্প লেখেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এঁদের প্রত্যেকের গল্পের গোয়েন্দা চরিত্র পুরুষ। মনে হতে পারে সামাজিক পরিস্থিতির কথা মনে রেখে তাঁরা বাস্তবানুগ

কাহিনি রচনা করতে গিয়ে এমনটা করেছেন। কিন্তু তার পাশাপাশি এই প্রশ্ন ওঠে, গোয়েন্দা সাহিত্য ধারাটি কতটা বাস্তবানুগ। আমরা আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া অপরাধের দিকে তাকালে দেখতে পাই তার তদন্ত আসলে সরকারি পুলিশই করে। বাস্তব জীবনে ব্যোমকেশ, ফেলুদা, কাকাবাবু, অর্জুন এদের মতো বিখ্যাত গোয়েন্দাদের অস্তিত্ব নেই। বেসরকারি তদন্তকারী সংস্থা অবশ্যই আছে, কিন্তু কারোর পিছু করে তার সম্বন্ধে তথ্য যোগাড় করা ছাড়া তাদের বিশেষ কিছু করার থাকেনা। সুতরাং, গোয়েন্দা কাহিনি আসলে বাস্তবানুগ সাহিত্য ধারার অন্তর্গত নয়। গোয়েন্দা সাহিত্যকে আধুনিক রূপকথা বলা যেতে পারে। তাই এর মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবতার অনুসন্ধান করা আসলে এক ধরণের ছেলেমানুষি। মানুষ পুলিশি ব্যাবস্থার প্রতি যখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে তখন মানুষের সামনে এমন ত্রাতার ছবি তুলে ধরলে মানুষ আকৃষ্ট হয়। আর সেই কারণেই বাস্তবানুগ না হলেও গোয়েন্দা সাহিত্য একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সাহিত্যধারা হয়ে উঠেছে।

মেয়ে গোয়েন্দা বিষয়টি শুধুমাত্র যে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই খুব অবহেলিত তা নয়, বিশ্ব সাহিত্যের দিকে তাকালেও দেখা যায় সেখানে মেয়ে গোয়েন্দাদের উপস্থিতি ও জনপ্রয়তা পুরুষ গোয়েন্দাদের তুলনায় নগণ্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু লেখক লেখিকা মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেছেন। শুধুমাত্র লিঙ্গগত পরিচয়েই তারা আলাদা নয়, তাদের জীবন যাত্রা, তদন্তের ধরণ, অপরাধীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার কৌশল সবকিছুই পুরুষ গোয়েন্দাদের থেকে বেশ অনেকটা আলাদা হয়ে উঠেছে। এই গবেষণা পত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় নির্বাচিত কিছু মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মূলত প্রভাবতী দেবীর গোয়েন্দা কৃষ্ণা চৌধুরী, অগ্নিশিখা রায়, নলিনী দাশের গোয়েন্দা গণ্ডালু, মনোজ সেনের রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা গার্গী, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা মিতিন মাসিকে নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্রগুলিকে লেখক লেখিকারা কেমন ভাবে নির্মাণ করেছেন, তাদের ব্যাক্তিগত জীবন ও পেশাগত জীবনের ধরণ কেমন, লেখক ও লেখিকার লিঙ্গগত পরিচয়ের প্রভাব মেয়ে গোয়েন্দা সৃষ্টিতে আলাদা করে পড়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে আলোচনার মধ্যে রাখা হয়েছে। গোয়েন্দারা কোন কাহিনিতে ঠিক কী ধরণের অপরাধ ও অপরাধীর মুখোমুখি হচ্ছে, তা চার্টের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু 'গণ্ডালু' সিরিজে অপরাধ ও অপরাধীর ধরণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য নেই, তাই গণ্ডালু কেন্দ্রিক অধ্যায় বাদ দিয়ে বাকি সব অধ্যায়ে এই চার্ট রাখা হয়েছে। যে সিরিজগুলিতে হত্যা প্রসঙ্গের আধিক্য রয়েছে, সেখানে হত্যার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক লেখিকারা

গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে গিয়ে পুলিশের প্রসঙ্গে কেমন মানসিকতা পোষণ করেছেন, তাও অধ্যায়গুলির মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় 'গোয়েন্দা কাহিনির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়'-এ কিভাবে একটু একটু করে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ভিত গড়ে উঠল, আর উনিশ শতকের শেষাংশ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটু একটু করে তা কেমন ভাবে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান সময়ের গোয়েন্দা কাহিনির ধরণ তৈরি করল তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণের নানা দিক' অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে একেবারে পুরুষালি সাহিত্য ধারাতেও মেয়েরা কিভাবে নিজেদের অবদান রেখে গেছেন। শুধুমাত্র মেয়ে গোয়েন্দা নয়, লেখিকাদের নিয়েও এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে মেয়েদের অবস্থানকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে --- ১। লেখকের হাতে গড়ে ওঠা নারী গোয়েন্দা ২। লেখিকার কলমে নারী গোয়েন্দা ৩। গোয়েন্দার সহকারী নারী চরিত্র। এর পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্রগুলির ওপর পুরুষতান্ত্রিক ও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে সেই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দা সিরিজের সূত্রপাত : প্রভাবতী দেবীর কৃষ্ণা ও কুমারিকা সিরিজ' অধ্যায়ে প্রথমে লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রতিষ্ঠিত মেয়ে গোয়েন্দা কৃষ্ণা চৌধুরী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পিতা-মাতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে একটি কিশোরী কিভাবে আস্তে আস্তে গোয়েন্দা হয়ে ওঠে তার ধারাবাহিক ক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কৃষ্ণা ছাড়া এই সিরিজে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র --- কৃষ্ণার মামা প্রনবেশ ও পুলিশ ইনস্পেক্টর ব্যোমকেশক চরিত্র দুটি কেমন এবং কিভাবে তারা কাহিনিকে প্রভাবিত করেছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি কাহিনিতে লেখিকা অপরাধী চরিত্রকে কিভাবে অঙ্কন করেছেন, আর তারা কোন কোন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত তা একটি চার্টের মাধ্যমে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এরপর বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণার অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের দ্বিতীয়াংশে গোয়েন্দা অগ্নিশিখা রায়কে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিখার জীবন ও চরিত্র নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। শিখা ও কৃষ্ণার সামাজিক অবস্থান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। পিতৃহারা কৃষ্ণা যেমন তার মামা প্রনবেশের কাছে

বড় হয়ে উঠতে থাকে, শিখাও তার কাকা মেজর অতুল কৃষ্ণ রায়ের অভিভাবকত্বে বেড়ে উঠেছে। কৃষ্ণার কাহিনিতে থাকা ইনস্পেক্টর ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সমান্তরালে শিখার কাহিনিতে হাজির হয়েছেন যতীন্দ্রনাথ বসু ও বিমলেন্দু চৌধুরী। এই চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নির্মাণ কৌশলের মধ্যে কাহিনি বিন্যাস এবং অপরাধ ও অপরাধী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও অস্ত্র প্রসঙ্গ, লড়াইয়ের দৃশ্য, তদন্তের ধরণ, পুলিশের ভূমিকা, পিতৃতান্ত্রিক সামাজ চিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রভাবতী দেবীর কৃষ্ণা ও শিখা খুবই উল্লেখযোগ্য চরিত্র। কিন্তু একুশ শতকের পাঠককে তা সমকালীন পাঠকের মত মুগ্ধ করতে সক্ষম নয়। বর্তমান পাঠকের চোখে কাহিনিগুলির মধ্যে থাকা বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতা সহজেই ধরা পড়ে। সেই সীমাবদ্ধতা নিয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সব শেষে প্রভাবতী দেবীর নির্মিত গোয়েন্দা কৃষ্ণার সঙ্গে গোয়েন্দা অগ্নিশিখা রায়ের একটি তুলনামূলক আলোচনা রাখা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় 'কিশোরী গোয়েন্দা দলের আবির্ভাব : নলিনী দাশের গণ্ডালু সিরিজ'। গণ্ডালুদেরকে আসলে গোয়েন্দা বলা যায় কিনা তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। গণ্ডালু আসলে স্কুল পড়ুয়া চার মেয়ের দল। এরা নিজেদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে বোর্ডিংয়ে একসঙ্গে থাকে আর নিজেদের কৌতূহল প্রবণতা থাকে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ে। কাহিনিগুলি মূলত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। কিন্তু যেহেতু লেখিকা স্বয়ং এই সিরিজটির নাম 'গোয়েন্দা গণ্ডালু' রেখেছেন, তাই মেয়ে গোয়েন্দাদের আলোচনায় এদেরকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। গণ্ডালুদের রহস্য উন্মোচনের ধরণে খুব বেশি বৈচিত্র নেই। মূলত বিভিন্ন সুড়ঙ্গ বা টানেলে অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে তারা অপরাধ কর্ম বা অপরাধীদের হদিশ পায়, সেখান থেকে তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাবস্থা করে। এছাড়া গুপ্তধন উদ্ধারেরও অনেকগুলি কাহিনি পাওয়া যায়। যেহেতু এখানে অপরাধ কর্মের খুব বেশি বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না তাই এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য অধ্যায়ের মতো অপরাধ ও অপরাধীদের পরিচয় দেওয়ার জন্য কোনও চার্ট তৈরি করা হয়নি। কিন্তু আলোচনার মধ্যে অপরাধ কর্ম ও তা উন্মোচনের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত অর্থে গোয়েন্দা না হলেও গণ্ডালুদের কাহিনির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কোডিং ও ডিকোডিংয়ের ব্যাবহার দেখা গেছে, যা পরবর্তী কালের কিশোর গোয়েন্দা কাহিনির ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অধ্যায়ের শুরুতে লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কাহিনি সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গোয়েন্দা কাহিনিতে সচারাচর একজন গোয়েন্দা ও তার সহকারী চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু একটি দলের কাহিনি

রয়েছে, তাই লেখিকা কিভাবে এক একটি চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এনিড ব্লাইটনের 'ফেমাস ফাইভ'-এর প্রভাব এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সিরিজের রচনা কৌশলের মধ্যে কাহিনির আবহ নির্মাণ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কাহিনি বিন্যাসের মধ্যে বিষয়বস্তু অনুযায়ী কাহিনিগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে --- কাঞ্চনপুর ও ঝাউতলা কেন্দ্রিক অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্য সমাধানের কাহিনি, মাটির তলায় রহস্য, গুহা ও টানেল প্রসঙ্গ, ঘরের মধ্যে ঘর, গুপ্তধন প্রসঙ্গ, ভূতের প্রসঙ্গ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রসঙ্গ, আধুনিক নাগরিক অপরাধ, ডি-কোডিং। অধ্যায়ের শেষে কাহিনিগুলির সামগ্রিক মূল্যায়ণ করা হয়েছে। মূলত 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্য পত্রিকার সম্পাদক নলিনী দাশ এই সিরিজ সৃষ্টি করেন। এরপর এই পত্রিকার জন্য সত্যজিৎ রায় 'ফেলুদা সিরজ' রচনা করেন। শুধুমাত্র সেই দিক থেকেই যে গণ্ডালু ফেলুদার পূর্বসূরী, তা নয়। গোয়েন্দা কাহিনির মধ্যে ভ্রমণ রসের মিশ্রণকেও সত্যজিৎ রায় তাঁর লেখায় গ্রহণ করেন, যা পরবর্তী সময়ে প্রায় সব কিশোর গোয়েন্দা কাহিনিতেই অনুসৃত হয়েছে। তাই এই সিরিজ একুশ শতকের পাঠকের কাছে খুব বেশি জনপ্রিয় না হলেও বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসে বেশ উল্লেখযোগ্য নাম হিসেবেই এই সিরিজকে স্মরণ করতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায় 'সখের গোয়েন্দাগিরিতে বিবাহিত নারীর পদার্পণ : মনোজ সেনের দময়ন্তী'। প্রতুল চন্দ্র সেন 'ঠাকুমার গোয়েন্দাগিরি' গল্পটি লিখলেও ঠাকুমা একটি গোয়েন্দা চরিত্র হিসেবে পাঠকের কাছে পরিচিত হয়ে উঠতে পারেনি। দময়ন্তীর পূর্ববর্তী পরিচিত গোয়েন্দা চরিত্র কৃষ্ণা, শিখা, গণ্ডালুরা সবাইই অবিবাহিত নারী। মনোজ সেন রহস্য সন্ধানী দময়ন্তীকে বিবাহিত নারী হিসেবে নির্মাণ করলেন। পেশাগত ভাবে দময়ন্তী ইতিহাসের অধ্যাপক, আর রহস্য অনুসন্ধান তার নেশা। এই অধ্যায়ে লেখক মনোজ সেনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর দময়ন্তী চরিত্রটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক কাহিনিগুলিতে সমাজের অভ্যন্তরে জমে থাকা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরোক্ষ সমালোচনা করেছেন। অপরাধী থেকে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত অফিসার গোয়েন্দা দময়ন্তীর লিঙ্গগত পরিচয় নিয়ে তাকে বিদ্রূপ করে গেছে। কিন্তু দময়ন্তী মুখে কোনও উত্তর দেয়নি। রহস্য সমাধানের মধ্য দিয়েই সে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে কাহিনিগুলিকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতা ও কলকাতার উপকণ্ঠের কাহিনিগুলির মধ্যে নাগরিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ছবি ফুটে উঠেছে। কাহিনির অপরাধগুলির মূলেও রয়েছে এই নাগরিক জটিলতা। কলকাতা থেকে দূরবর্তী

অঞ্চলে ছুটি কাটাতে যাওয়ার কাহিনিগুলিতে লেখক বিভিন্ন সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিচয় তুলে ধরেছেন। যেহেতু বেশিরভাগ কাহিনিতে হত্যার প্রসঙ্গ রয়েছে, আর হত্যার বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতিও প্রযুক্ত হয়েছে --- তাই অপরাধ ও অপরাধীর বর্ণনার পাশাপাশি এখানে হত্যার প্রণালী নিয়ে একটি আলাদা সারি যুক্ত করা হয়েছে। মনোজ সেনের গোয়েন্দা কাহিনি রচনার একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কাহিনিগুলিতে ইঞ্জিনিয়র চরিত্রের ছড়াছড়ি দেখা যায়। কিছু কিছু কাহিনির ক্ষেত্রে অপরাধ কর্মের সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আরেকটি খুব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কাহিনির অনেক চরিত্রের ক্ষেত্রেই মানসিক বিকলনের ছবি ফুটে উঠেছে। কাহিনিগুলির মধ্যে যৌন প্রসঙ্গের অনায়াস যাতায়াত লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যদিও এটি আলাদা করে উল্লেখযোগ্য কোনও বৈশিষ্ট্য নয়, তবে নির্দিষ্ট করে মেয়ে গোয়েন্দাদের কাহিনির দিকে তাকালে দেখা যায় মনোজ সেনের কাহিনিগুলির মতো যৌন বিকৃতির ছবি অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাদের কাহিনিতে অতটা নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায় ‘গোয়েন্দা কাহিনির প্রেক্ষাপটে নারী জীবনের বিবর্তন : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গার্গী সিরিজ’-এ লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর গোয়েন্দা গার্গীর ব্যাক্তিগত জীবনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজ আয়তনের দিক থেকে বাংলা মেয়ে গোয়েন্দা সিরিজের মধ্যে সবচেয়ে বড়। শুধুমাত্র গোয়েন্দাগিরির কাহিনি নয়, গোয়েন্দার ব্যাক্তিগত জীবন সময়ের সাথে সাথে কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে, গার্গীর কাহিনিগুলিতে তার বিবরণ রয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে গার্গীর জীবনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে --- গার্গীর ছাত্রজীবন, পেশাগত ও বৈবাহিক জীবনে প্রবেশের পরের জীবন, সহকারী সহ গোয়েন্দাগিরি পর্যায় ও মা হওয়ার পরবর্তী জীবন। এই চারটি পর্যায়ে গার্গীর ব্যাক্তিগত জীবনে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি তার তদন্তের ধরণও পরিবর্তিত হয়েছে। শুধু তাই নয় বিগত বাইশ বছর ধরে লেখকের মানসিকতায় যে পরিবর্তন এসেছে, তাও গার্গী চরিত্রের মধ্যে অনেকাংশে ধরা পড়েছে। গার্গী কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি শুধুমাত্র গোয়েন্দা কাহিনি হয়ে থাকেনি, উপন্যাসগুলো সম্পূর্ণ ভাবেই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হয়ে উঠেছে। তাই গার্গীর উপন্যাসগুলি নিয়ে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই অধ্যায়ে গার্গী কেন্দ্রিক কিশোর কাহিনিগুলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। গার্গীর বেশিরভাগ কাহিনিই ‘হু ডান ইট’ ঘরানার অন্তর্গত। কিশোর সাহিত্যের কিছু কাহিনি বাদ দিলে প্রায় সব কাহিনিতেই হত্যা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। আর হত্যাকারীরা বিভিন্ন ধরণের পন্থা অবলম্বন করেছে। তাই অপরাধ ও অপরাধীর পাশাপাশি হত্যা প্রণালী নিয়েও এই

অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেশির ভাগ গোয়েন্দা কাহিনির ক্ষেত্রে সচারাচর বুদ্ধিমান গোয়েন্দা ও বোকা পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু গার্গীর কাহিনিতে জোর করে পুলিশকে ছোট করার চেষ্টা নেই। এই অধ্যায়ে গার্গী সিরিজে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গার্গী মনে করে পুলিশি পরিকাঠামো তদন্তের জন্য অনেক বেশি উপযোগী। তাই সে কোনও রকম সংকোচ ছাড়া পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করে। অন্যদিকে অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাকে পুলিশ যে ভাবে খাটো করার চেষ্টা করে, গার্গীর পদমর্যাদার কথা মনে রেখে পুলিশ তেমনটা করতে পারেনা। লেখক জানান, পুলিশ পদমর্যাদাকে খুব সম্মান করে। গার্গীর সিরিজ অনেক কিছুতে অন্যান্য সিরিজের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে থাকলেও এই সিরিজের বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, একাধিক কাহিনিতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এই সীমাবদ্ধতার জায়গাও অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় 'পেশাদারি গোয়েন্দার ভূমিকায় বিবাহিত নারী : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন'। গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি পাঠকের কাছে 'মিতিন মাসি' নামেই বেশি পরিচিত। আসলে প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠকের প্রতিনিধি চরিত্র টুপুরের 'মিতিন মাসি'। সেই সূত্রেই সে বাংলা সাহিত্যেও মিতিন মাসি পরিচয়েই খ্যাত হয়ে উঠেছে। লেখিকার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর এই সিরিজের সব কাহিনিগুলির কালানুক্রমিক তালিকা যুক্ত করা হয়েছে। মিতিন অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাদের থেকে পরিচয়গত কারণে আলাদা। বাকি মেয়েরা সখের গোয়েন্দা, কিন্তু মিতিন 'থার্ড আই' ডিটেকটিভ এজেন্সির মালিক। অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রিম চুক্তিতে টাকা হাতে নিয়ে তাকে তদন্তে নামতে দেখা যায়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেড়াতে গিয়ে নানা রকম সন্দেহ জনক বিষয় দেখেও সে রহস্যানুসন্ধানে নেমে পড়ে। অন্যান্য গোয়েন্দা চরিত্রের সঙ্গে মিতিনের আরেকটি বড় পার্থক্য রয়েছে। সচারাচর গোয়েন্দাদের পারিবারিক জীবন নিয়ে লেখক লেখিকারা মাথা ঘামান না, কিন্তু মিতিনের ক্ষেত্রে তার গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি তার পারিবারিক জীবনও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। তাই 'মিতিনের জীবনে অন্যান্য চরিত্রের ভূমিকা' নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। মিতিনের গোয়েন্দাগিরি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় কিশোর কাহিনিগুলি ও পরিণত পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখা কাহিনিগুলি একেবারে বিপরীত মেরুর। তাই কাহিনিগুলিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়ে মিতিনের গোয়েন্দাগিরির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অপরাধ, অপরাধী ও হত্যার প্রণালী নিয়ে যে ছক তৈরি করা হয়েছে, তাতে প্রতিটি কাহিনির অপরাধ অতি সংক্ষেপে স্বচ্ছ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মিতিনের সঙ্গে

পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারি অনিশ্চয় মজুমদারের (কিছু কাহিনিতে অনিশ্চয় তালুকদার) সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকার ফলে মিতিন অনেক তদন্তেই খুব সহজে পুলিশি সহায়তা পেতে সক্ষম হয়েছে, 'পুলিশের ভূমিকা' অংশে এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে যে মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তারা বাংলা সাহিত্যের খুব উল্লেখযোগ্য মেয়ে গোয়েন্দা। কিন্তু এদের ছাড়াও আরও বেশ কিছু গোয়েন্দা চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নির্মিত হয়েছে। তাদের পরিচয় ও তদন্তের ধরণ নিয়ে অষ্টম অধ্যায় 'অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দার কথা'য় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের শেষভাগে গোয়েন্দা কাহিনির ধারা প্রবেশ করে। সেই সময় থেকে শুরু করে একবিংশ শতকের দুইয়ের দশকেও এই ধারার প্রতি লেখক ও পাঠকের আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সমালোচকদের দৃষ্টিতে গোয়েন্দা সাহিত্য যেমন স্থানেই থাকুক জনপ্রিয়তার বিচারে গোয়েন্দা সাহিত্য আজও অদ্বিতীয়, বর্তমানের পূজাবার্ষিকী সংখ্যাগুলোর দিকে তাকালে তা সহজেই বোঝা যায়। শুধুমাত্র প্রাচীনতার দিক থেকেই নয়, সংখ্যাগত দিক থেকেও বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ। অধ্যাপক পিনাকী রায়ের মতে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য প্রাচীনতার দিক থেকে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে, ফরাসী ও ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের পর বাংলাতেই গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'-এর উদ্যোগে পাদ্রী উইলিয়াম কেরি সংকলিত 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের গল্পগুলির নির্দিষ্ট কোনও নাম ছিল না। 'ইতিহাসমালা'র ১১ সংখ্যক এবং ১৮ সংখ্যক গল্পে অপরাধ ও অপরাধী অন্বেষণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সুকুমার সেন পরবর্তীকালে গল্পটির নামকরণ করেন যথাক্রমে 'চোর ধরার বাহাদুরি' ও 'আমি তো কলা খাইনি'। এই গল্প দুটিতে অপরাধ এবং চাতুর্যের মাধ্যমে অপরাধীকে অন্বেষণের বৃত্তান্ত রয়েছে। বলা বাহুল্য গল্প দুটি ঠিক আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনির ছাঁচে ঢালা নয়। অধিকাংশ সমালোচকই মনে করেন, "প্রকৃতপক্ষে বাংলা গোয়েন্দা-গল্পের প্রথম স্বীকৃত সূচনা ঘটল উনিশ শতকের শেষ দশকে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৫ --- ?) হাতে।"[১]

১৩০০ বঙ্গাব্দ (১৮৯২) থেকে তাঁর 'দারোগার দপ্তর' মাসিক কিস্তিতে প্রকাশ পেতে থাকে। "এই সিরিজের প্রথম রচনা 'বনমালী দাসের হত্যা' ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১২৯৯-এর বৈশাখে) প্রকাশিত হয়। আনুমানিক ২০৬টি রচনা এই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[২]

এছাড়া এই সিরিজের অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে 'অদ্ভুত হত্যা', 'কুলসুম', 'আবির জান', 'ইংরেজ ডাকাত', 'মুণ্ডচুরি' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেশির ভাগ কাহিনির ক্ষেত্রে আত্মকথন রীতির ব্যবহার দেখা যায়। অধিকাংশ সমালোচক প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়কে বাংলায় গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা বলে মেনে নিলেও সুকুমার সেন সম্পাদিত

'বাঁকাউল্লার দপ্তর'-এর ভূমিকায় সুকুমার সেন জানান এটি বরকতউল্লা নামে এক দারোগার কাহিনি যা ১৮৯৬-এর পূর্বেই রচিত। তাঁর অনুমান এটি প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এর লেখা হতে পারে। তবে 'দারোগার দপ্তর'-এর পূর্বেই 'বাঁকাউল্লার দপ্তর' প্রকাশিত হয়েছিল। এখানেও আত্মকথন রীতিতে বরকতউল্লা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা পাঠককের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই দুটি সিরিজের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও সবচেয়ে বড় বৈসাদৃশ্য হলো 'দারোগার দপ্তর' সম্পূর্ণভাবে বাংলা রচনা এবং 'বাঁকাউল্লার দপ্তর'-এর কাহিনিগুলি ইংরেজি রচনা রূপান্তর। প্রিয়নাথের সমকালে গিরীশ চন্দ্র বসুও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'সেকালের দারোগার দপ্তর' (১৮৯৫) লেখেন। প্রায় সমকালে ১৮৯৪-এ 'সখা ও সখী'তে হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'আশ্চর্য্য হত্যাকাণ্ড' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই কাহিনিকে "প্রথম কিশোর থ্রিলার বলে অভিহিত করেছেন অনেকে।"[৩]

শরচ্চন্দ্র সরকারের উদ্যোগে ১৩০১ বঙ্গাব্দে (১৮৯৪) 'গোয়েন্দা কাহিনি' নামে একটি সিরিজ প্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এটি প্রকাশ পেত। প্রায় চার বছর ধরে এই সিরিজ প্রকাশিত হয়। এই সময়ে নীরদবরণ দাস 'ডিটেকটিভের গল্প' নামে একটি সিরিজ প্রকাশ করেন। সিরিজটিতে কোনও লেখকের নাম থাকত না। প্রায় একই সময়ে বটতলা থেকে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হরিদাসের গুপ্তকথা' প্রকাশিত হত। ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ইউজিন সু' ও 'মারি করেলিং' (ইংরেজিতে 'ওয়ানকারিং' ও 'সরোজ অফ স্যাটার্ন') এই দুটি বই 'অভিশপ্ত ইহুদী' ও 'সন্তপ্ত শয়তান' নামে অনুবাদ করেন। এছাড়া এই সময়ে হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেপাল ডাক্তারের ডায়েরি', নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'চুরি না বাহাদুরি', ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'জাল গোয়েন্দা', 'তিন খুন' প্রভৃতি গোয়েন্দা কাহিনি প্রকাশিত হয়।

পাঁচকড়ি দের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে প্রথম বেসরকারি গোয়েন্দা বা প্রাইভেট ডিটেকটিভের আগমন ঘটে। বর্তমান পাঠক এই লেখকের রচনার সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত না হলেও সমকালে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। মূলত বিদেশি রচনাকে তিনি দেশী পোশাক পরিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতেন। 'কোরক'-এর সম্পাদক বলেন, "পঞ্চাশ ষাট বছর আগে যাদের বাল্যকাল ছিল তারা পুরনো পঞ্জিকা খুললে পাঁচকড়ি দের বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখতে পেতেন।"[৪]

তাঁর গোয়েন্দা কাহিনির নায়ক দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র তার গুরু অরিন্দম বসুর সাহায্য নিয়ে রহস্য সমাধান করে। 'মায়াবিনী' উপন্যাসটি পাঁচকড়ি দের প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি। এছাড়া 'হত্যাকারী কে?', 'মনোরমা', 'নীলবসনা সুন্দরী', 'ছদ্মবেশী', 'সেলিনা সুন্দরী' প্রভৃতি সমকালে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

গোয়েন্দা কাহিনির ধারাকে বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সুগন্ধি নির্মাতা, যন্ত্র বিশারদ হেমেন্দ্র মোহন বসু ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রবর্তন করেন। প্রতি বছর পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলি নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হতো।

> ১৩০৬ সালে তিনি কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে তিনটি গোয়েন্দা বা রহস্যভেদী কাহিনি ছিল। শ্রীহট্টের বেহুড়া স্কুলের হেডমাস্টার রজনী দত্ত 'অদ্ভুত হত্যা' গল্পের জন্য প্রথম পুরস্কার, 'গহনার বাক্স' গল্পটির জন্য জগদানন্দ রায় অষ্টম পুরস্কার ও অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসের সরলাবালা দাসী তাঁর 'ঘড়িচুরি' কাহিনির জন্য নবম পুরস্কার পেয়েছিলেন।[৫]

❖ বিশ শতক

'বিভাব' পত্রিকার গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপক হিসেবে তিন লেখকের নামের উল্লেখ থাকলেও 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকার গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যায় পিনাকী ভাদুড়ী 'বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি: একটি যথাসাধ্য খতিয়ান' প্রবন্ধে জানান যে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে গোয়েন্দা কাহিনির জন্য চারজন লেখক পুরস্কার পান 'কুন্তলীন পুরস্কার' পান। "শ্রীহট্ট স্কুলের হেডমাস্টার রজনীকান্ত দত্ত, দীনেন্দ্রকুমার রায়, শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞান শিক্ষক জগদানন্দ রায়, অমৃতবাজার পত্রিকার সরলাবালা সরকার গোয়েন্দা গল্প লিখে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।"[৬]

এঁদের মধ্যে বাকি তিনজন পরবর্তীকালে গোয়েন্দা সাহিত্য রচনায় সেভাবে আগ্রহ না দেখালেও দীনেন্দ্রকুমার রায় বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির আঙিনায় পা রাখলেন। তিনি 'নন্দন-কানন' মাসিক পত্রিকায় 'অজয় সিংহের কুঠি' নামে এক দীর্ঘ অনুবাদ মূলক ক্রাইম কাহিনি লেখা শুরু করেন। একসময় 'নন্দন-কানন' পত্রিকা মাসিক ক্রাইম সিরিজে পরিণত হয়। সেই সময় 'কালরাত্রি', 'রূপসী', 'কলঙ্কিনী', 'ছায়া গোয়েন্দা', 'যখের ধন' ইত্যাদি বহু ক্রাইম কাহিনি প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়ে পত্রিকাটি প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামসর্বস্ব হয়ে পড়ে, অন্য লেখক বা অনুবাদকের নাম থাকত না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দীনেন্দ্রকুমার 'নন্দন-কানন' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে যে হালকা চালের গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করতে থাকেন সেগুলি তাঁর মৌলিক রচনা নয়, বিভিন্ন পাশ্চাত্য গোয়েন্দা কাহিনির অনুবাদ। কাহিনির পটভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লণ্ডনের পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং তাঁর গোয়েন্দা মিস্টার ব্লেক ও তার সহকারীর স্মিথ শার্লক হোমস এর মত বেকার স্ট্রিটের

বাসিন্দা। সুকুমার সেনের মত এইসব রচনা সংখ্যা দুশোর বেশি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল --- 'মরা মানুষ', 'জাল', 'হট্টমন্দিরের দস্যুলীলা', 'রঙ্গিনীর রণরঙ্গ', 'সাদা ঠগী', 'পেয়ালায় মরুরহস্য', 'জার্মানির ষড়যন্ত্র' প্রভৃতি ।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সমকালে অম্বিকাচরণ গুপ্ত কয়েকটি গোয়েন্দা উপন্যাস রচনা করেন। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৮) তিনি 'গোয়েন্দা গল্প' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করলেন। এই সময়ে বিদগ্ধ পন্ডিত ব্যক্তিগণও গোয়েন্দা সাহিত্য রচনায় হাত দেন। তার মধ্যে রয়েছেন ঐতিহাসিক গল্পের লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, এমনকি দার্শনিক পন্ডিত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও রয়েছেন। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 'কঙ্কণ চোর', 'লাল বিবি', 'মৃত্যু প্রহেলিকা' ইত্যাদি গল্প রচনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'হত্যা বিভীষিকা', 'দুই দারোগা', 'ধড়িবাজ চোর' প্রভৃতি গল্প লেখেন।

বিশ শতকের দুইয়ের দশকে প্রকাশিত গোয়েন্দা কাহিনির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খানিকটা কম, তবে এই দশকেই গোয়েন্দা সাহিত্য জগতে হেমেন্দ্রকুমার রায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের আগমন ঘটে। হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮–১৯৬৩) তাঁর জয়ন্ত-মানিক এবং বিমল-কুমারকে নিয়ে রচিত কাহিনিতে বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ করেন। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রথম বিজ্ঞান নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন ঘটালেন। অন্যদিকে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যকে প্রাপ্তবয়স্কদের আসর থেকে সরিয়ে শুধুমাত্র কিশোর সাহিত্যের উপযোগী করে গোয়েন্দা গল্প পরিবেশনের দায়ও প্রথম বোধ হয় তিনিই নিয়েছিলেন।[৭]

তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'যখের ধন' ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কাহিনির গোয়েন্দা বিমল, তার সহকারীর কুমার। পরবর্তী সময়ে বিমল, কুমার ভৃত্য রামহরি ও কুকুর বাঘাকে নিয়ে প্রকাশিত হয় --- 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর', 'সূর্য নগরীর গুপ্তধন', 'কুমারের বাঘা গোয়েন্দা' ইত্যাদি। বিমল-কুমার ছাড়াও তাঁর আরেক গোয়েন্দা-সহকারী জুটি হল জয়ন্ত ও মানিক। বেসরকারি গোয়েন্দা জয়ন্ত, তার সহকারী মানিক এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবুকে নিয়ে রচিত গোয়েন্দা উপন্যাসগুলির মধ্যে 'জয়ন্তর কীর্তি', 'শনিমঙ্গলের রহস্য','শাহজাহানের ময়ূর', 'পদ্মরাগ বুদ্ধ' 'জগৎশেঠের রত্নকুঠি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া গোয়েন্দা হেমন্ত, ইন্সপেক্টর সতীশবাবুকে নিয়ে তিনি চারটি গ্রন্থ রচনা করেন --- 'অন্ধকারের বন্ধু', 'রাত্রির যাত্রী', 'মুখ ও মুখোশ' এবং 'বিভীষণের জাগরন'।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯০৩-১৯৩৮) গোয়েন্দা হুকাকাশি চরিত্রটি নির্মাণ করেন। এই গোয়েন্দা জন্মসূত্রে জার্মান এবং আচার-আচরণে বাঙালি। ১৯২৮ সালে 'রামধনু' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস 'পদ্মরাগ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। তিনি 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি' ও 'সোনার হরিণ' নামে দুটি উপন্যাস ও 'চণ্ডেশ্বরপুরের রহস্য' ইত্যাদি নামে কয়েকটি গোয়েন্দাগল্প রচনা করেন। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তাঁর কাহিনির সংখ্যা স্বল্প হলেও তার মাধ্যমেই তিনি পাঠককুলকে আকৃষ্ট করেছিলেন। পরবর্তীকালে 'হুকাকাশি'কে ব্যঙ্গ করে শিবরাম চক্রবর্তী 'কল্কেকাশি' চরিত্রটি নির্মাণ করেন। যদিও তা কোনো যথার্থ গোয়েন্দা কাহিনি বয়নের জন্য নয়, কিন্তু এ থেকে অনুমান করা যায় সেসময়ে হুকাকাশির জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য ছিল।

তিনের দশকে গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারায় আবার জোয়ার এল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাত মত প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা গোয়েন্দা কাহিনি রচনায় হাত দিলেন। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য যৌবনে পদার্পণ করল। পাশ্চাত্য গোয়েন্দা কাহিনির অনুবাদ বা সেই কাহিনিকে বাংলার পটভূমিতে স্থাপন করার প্রবণতা থেকে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি ধীরে ধীরে মুক্তি পেতে শুরু করল।

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির ধারায় এখনো পর্যন্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মিত ব্যোমকেশ বক্সী সাহিত্য সমালোচকদের কাছে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসে আছেন। তাঁর প্রথম গোয়েন্দা গল্প 'পথের কাঁটা' আষাঢ়, ১৩৯৯ (১৯৩২)-এর 'বসুমতি'তে প্রকাশিত হয়। 'সীমান্তহারা' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯) লেখার পর লেখক ব্যোমকেশকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি 'সত্যান্বেষী' (মাঘ, ১৩৯৯) লেখেন। তবে খ্যাতির শীর্ষে উঠে তিনি গোয়েন্দা কাহিনি লেখা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখেন। কিন্তু পাঠকসমাজের প্রবল চাহিদায় আবার 'চিড়িয়াখানা' রচনা মধ্যে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর 'অচিন পাখি', 'দুর্গ রহস্য', 'চিত্রচোর' প্রভৃতি কাহিনি পাঠক মনে আজও উজ্জল হয়ে রয়েছে। ৩৮ বছর ধরে ব্যোমকেশকে নিয়ে তিনি প্রায় ৩৩টি গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেন, যার মধ্যে গল্প-উপন্যাস দুইই রয়েছে। ব্যোমকেশকে নিয়ে তাঁর শেষ রচনা 'বিশুপাল বধ' (১৯৭০), রচনাটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। শরদিন্দুর তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিগুলি কিশোর পাঠকদের কথা ভেবে লেখেননি। প্রাপ্ত বয়স্কদের উদ্দেশ্যেই তিনি কাহিনিগুলি রচনা করেছেন। ব্যর্থ প্রেমজাত প্রতিহিংসা থেকে শুরু করে যৌনতা কেন্দ্রিক অপরাধের বিভিন্ন ধরণের ছবি কাহিনিগুলিতে উপস্থিত। তবে প্রিয়নাথ বা পাঁচকড়ির মত তীব্র যৌনতার মাদক প্রদাহ এই রচনাগুলিতে নেই।

গোয়েন্দা সাহিত্যের জগতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) আবির্ভাবও ১৯৩২ সালে। 'গোয়েন্দা কবি পরাশর' তাঁর প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি। এরপর দু'দশক ধরে পরাশর বর্মাকে নিয়ে তিনি 'নিলাম ডাকলেন পরাশর বর্মা', 'গোয়েন্দা হলেন পরাশর বর্মা', 'পরাশর এবার জহুরি', 'হার মানলেন পরাশর বর্মা', 'পূর্বে বালি পশ্চিমে বালি', 'ঘুড়ি ওড়ালেন পরাশর বর্মা', 'ঘোড়া কিনলেন পরাশর বর্মা' প্রভৃতি মোট ২৯টি কাহিনি রচনা করেন।

ড. নীহাররঞ্জন গুপ্তও (১৯১১-১৯৮৬) এই দশকে গোয়েন্দা সাহিত্যে পদার্পণ করেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন গোয়েন্দা কাহিনির ভক্ত নীহাররঞ্জন আগাথা ক্রিস্টির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দেশে ফেরার পর তাঁর প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস 'কালো ভ্রমর' লেখেন। তাঁর গোয়েন্দা কিরিটি রায়কে নিয়ে 'রহস্যভেদী চক্রী', 'বউরানীর বিল', 'হলুদ শয়তান', 'ডাইনির বাঁশি', 'সেতারের সুর', 'ছায়া', 'নিরালা প্রহর', 'পদ্মদহে পিশাচ', 'কুহেলি' প্রভৃতি কাহিনি রচনা করেন। 'মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স' প্রকাশিত 'কিরীটি অমনিবাস'-এর তালিকা অনুসারে কিরিটি রায়কে নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা ৬৪টি। কেউ কেউ এই কাহিনিগুলিকে কিশোরসাহিত্য বললেও যৌন অপরাধের চিত্র এমনভাবে গ্রথিত যে অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা বলে মনে হয়।

তিনের দশকের আরো একজন উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা কাহিনির স্রষ্টা মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ও (১৮৮৭ - ১৯৪৩) ১৯৩২ সালে গোয়েন্দা কাহিনির জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ীর জনপ্রিয়তার দরুন পরবর্তীকালে এই চরিত্রটিকে নিয়ে অন্যান্য অনেক লেখক গোয়েন্দা কাহিনি নির্মাণ করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের 'রোমাঞ্চ' পত্রিকা গোষ্ঠীর কিছু লেখক, যেমন --- প্রণব রায়, পরেশ চন্দ্র বসু, মণি বর্মা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, অসিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

চারের দশকে গীতিকার প্রণব রায় 'রোমাঞ্চ পত্রিকা'য় গোয়েন্দা কাহিনি লেখেন। ১৯৪৮-এ 'শুকতারা' প্রকাশনী 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'প্রহেলিকা সিরিজ' বের করে। এই সিরিজের লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়, নিপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনির্মল বসু প্রমূখ নামকরা লেখকরা ছিলেন। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিরিজে বুদ্ধদেব বসুর 'ছায়া কালো কালো', 'ভূতের মত অদ্ভুত' গোয়েন্দা কাহিনি প্রকাশিত হয়। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছাড়া 'শরৎ সাহিত্য ভবন'-এর 'অলকানন্দা সিরিজ' প্রকাশিত হয়। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'দেব সাহিত্য কুটীর'-এর উদ্যোগে 'উদাসী বাবার আখড়া' নামে বেশ কিছু কিশোর সাহিত্য রচনা করেন। এই

সিরিজগুলোর সাফল্য দেখে বড়দের জন্য প্রকাশিত হয় ‘পিরামিড সিরিজ’। এই সিরিজে স্বপনকুমার তাঁর গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জিকে হাজির করেন।

পাঁচের দশকে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫-১৯৭২) ‘গুপ্ত হত্যা’ কাহিনিতে কৃষ্ণা চৌধুরী চরিত্রটিকে নির্মাণ করেন। বাবা-মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে আস্তে আস্তে অপরাধীদের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে থাকে। ক্রমে এই চরিত্রটিই গোয়েন্দা কৃষ্ণায় পরিণত হয়। এই সিরিজের সাফল্যের পরে লেখিকা ‘কুমারিকা সিরিজ’ লিখতে শুরু করেন, সেখানেও গোয়েন্দার ভূমিকায় মেয়ে গোয়েন্দা অগ্নিশিখা রায়কে নিয়ে আসেন। তবে এই সিরিজটি আগেরটির মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। কারণ দুই গোয়েন্দার মধ্যে সহজে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই দশকের আরেকজন উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন প্রখ্যাত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪ – ২০১৮)। তাঁর নির্মিত গোয়েন্দা চরিত্র চারু ভাদুড়ী বয়সে আরাকুল পোয়ারোর মতো প্রবীণ, কিন্তু পেশায় পার্কার পাইনের এর সঙ্গে তুলনীয়। পাইনের মতো তাঁর নিজস্ব অফিস আছে নাম ‘সি.বি.আই’, অর্থাৎ ‘চারু ভাদুড়ী ইনভেস্টিগেশন্স’। সব কাহিনিরই সূত্রপাত ঘটে আড্ডার আসর থেকে। আড্ডার আসরের উত্থাপিত কোনো প্রসঙ্গ থেকেই কাহিনি শুরু হয়। ভাদুড়ী মশাইয়ের প্রধান সহকারী কৌশিক। উপন্যাসগুলিতে কথক হিসেবে উপস্থিত সাংবাদিক কিরণ চ্যাটার্জী। কোনো কোনো কাহিনিতে লেখক কমিক রিলিফের জন্য লেখক সদানন্দ বাবুকে হাজির করেছেন। ‘বিষাণগড়ের সোনা’, ‘আংটির রহস্য’, ‘পাহাড়ি বিছে’, ‘লকারের চাবি’ প্রভৃতি উপন্যাসের রিটায়ার্ড চারু ভাদুড়ি মহাশয় তাঁর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ছয়ের দশক বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাসের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ এই দশকের বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় গোয়েন্দা ফেলুদার আগমন ঘটে। জনপ্রিয়তার নিরিখে বিচার করলে যদিও এই সময়ের অন্যান্য রচয়িতারা ম্লান হয়ে যান, তবে এই দশকে সত্যজিৎ রায় ছাড়াও আরো দুজন রচয়িতার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন নলিনী দাশ ও নারায়ণ সান্যাল ।

নলিনী দাশ (১৯০৬ – ১৯৯৩) হলেন উপেন্দ্রকিশোরের নাতনি, পুণ্যলতা রায়ের মেয়ে। তিনি ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি লেখা শুরু করলেন। ‘গোয়েন্দা গণ্ডালু’ নামে চার মেয়ের একটি গোয়েন্দা দল সৃষ্টি করলেন। এই চার মেয়ে

বাংলা-বিহারের সীমান্তবর্তী কাঞ্চনপুর নামক এক জায়গায় স্কুল বোর্ডিংয়ের বাসিন্দা। এক গন্ডা মেয়ে --- কালু, মালু, বুলু ও টুলুকে নিয়ে তৈরি হয়েছে 'গন্ডালু'। নলিনী দাস 'হিড়িম্বা দেবীর রহস্য', 'মাউন্ট আবুর রহস্য', 'অলৌকিক বুদ্ধমূর্তি' প্রভৃতি কাহিনি রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে এরকম মেয়ে গোয়েন্দা দলের পরিচয় আর কারও কলমে পাওয়া যায়নি। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৯৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে নলিনী দাস গণ্ডালুদের নিয়ে ২৯টি কাহিনি রচনা করেন ।

সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২) 'সন্দেশ'-এর পাতায় তাঁর গোয়েন্দা ফেলুদা ওরফে প্রদোষ চন্দ্র মিত্রকে হাজির করলেন। তাঁর প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' 'সন্দেশ' পত্রিকায় ডিসেম্বর, ১৯৬৫ থেকে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ অবধি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম গোয়েন্দা গ্রন্থ 'বাদশাহী আংটি' ১৯৬৯-এ প্রকাশিত হয়। ফেলুদার অভূতপূর্ব সাফল্য লেখককে গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে এবং তা নিয়ে চলচ্চিত্র বানাতে উৎসাহী করে তোলে। সত্যজিৎ রায়ের পূর্ববর্তী কালের সবচেয়ে উচ্চ মানের ও জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনি নির্মাতা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি অনেক ক্ষেত্রেই প্রাপ্তবয়স্কদের উদ্দেশ্যে রচিত। সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধমূলক কাহিনির পিছনে যৌন লালসা ক্রিয়াশীল থেকেছে। বলা বাহুল্য সত্যজিৎ রায় কাহিনিগুলিকে পুরোপুরিই কিশোরসাহিত্য। কাহিনিগুলি পড়ে মনে হয় তিনি সচেতন প্রয়াসে ফেলুদার কাহিনিগুলিকে নারী বিবর্জিত করে নির্মাণ করেছেন। খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র এবং লালমোহন গাঙ্গুলী তার প্রধান সঙ্গী। লালমোহন বা জটায়ুকে লেখক কমিক রিলিফের জন্য কাহিনিতে উপস্থিত করেছেন। এছাড়া কিছু কাহিনিতে আরেকটি চরিত্রকে দেখা যায় তিনি হলেন সিধু জ্যাঠা, ফেলুদার এনসাইক্লোপিডিয়া। সত্যজিৎ রায় 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' 'সোনার কেল্লা', 'বাক্স রহস্য', 'গোঁসাইপুর সরগরম', 'টিনটোরেটোর যীশু' প্রভৃতি ২৯টি গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেন এবং চারটি উপন্যাস অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। তাঁর লেখার একটি প্রধান উপাদান হলো ভ্রমণরসে রাঙিয়ে তোলার প্রবণতা। তাঁর পূর্ববর্তী নলিনী দাশের মধ্যে এই প্রবণতা খানিকটা ছিল। তাঁর পরবর্তীকালে অনেক সাহিত্যিকই এই প্রবণতাকে তাঁদের গোয়েন্দা কাহিনি লেখার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন।

এই দশকের আর একজন উল্লেখযোগ্য রচয়িতা হলেন নারায়ণ সান্যাল। তিনি তাঁর গোয়েন্দা সংকলন গ্রন্থের ভূমিকাতেই জানান তাঁর গোয়েন্দা ব্যারিস্টার পি.কে.বসু বার অ্যাট ল'কে তিনি স্ট্যানলি গার্ডনারের প্যেরি মেন্স চরিত্রের আদলে নির্মাণ করেছেন। অন্যান্য গোয়েন্দা চরিত্রের থেকে এই চরিত্রের পার্থক্য হলো তিনি নির্দোষ আসামিকে নিরাপরাধ প্রমাণ করেন তাদের বাঁচান। তাঁর প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি 'নাগচম্পা' ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত

হয়। এরপর অনেক বছর ধরে তিনি গোয়েন্দা উপন্যাস রচনা করেন। 'সোনার কাঁটা', 'উলের কাঁটা', 'পথের কাঁটা' প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা।

সাতের দশকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গোয়েন্দা উপন্যাস রচনায় হাত দেন। কাকাবাবু ও সন্তু চরিত্র দুটিকে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে কিশোর সাহিত্য রচনা করেন। রাজা রায়চৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সন্তু স্কুলপড়ুয়া তরুণ । প্রথম কাহিনি 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সন্তুর আত্মকথনের রচিত যদিও পরবর্তীকালে লেখক কথনরীতির পরিবর্তন করেন। 'সবুজ দ্বীপের রাজা', 'খালি জাহাজের রহস্য', 'নীলমূর্তি রহস্য', 'ভূপাল রহস্য', 'কাকাবাবু হেরে গেলেন?' প্রভৃতি কাকাবাবু সিরিজের বিখ্যাত গোয়েন্দা উপন্যাস। কাহিনিগুলিকে তিনি শুধুমাত্র বুদ্ধিদীপ্ত মারপ্যাঁচের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি, কাহিনিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোমাঞ্চকর কাহিনি অর্থাৎ অ্যাডভেঞ্চার। পেশার খাতিরে নয় শুধুমাত্র অ্যাডভেঞ্চারের টানে স্ট্রেচারে ভর করে নানান রহস্যজনক ঘটনার মূল খুঁজতে কাকাবাবু বেরিয়ে পড়েছেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। উপন্যাসগুলিতে কাকাবাবু রাজা রায়চৌধুরীর ভাইপো সন্তু কাকাবাবুর সঙ্গী ও সহকারি । তরুণ এই কিশোরের সহপাঠী জোজো কোনো কোনো উপন্যাসে কমিক রিলিফের জন্য হাজির হয়েছে, তবে অধিকাংশ উপন্যাসের এই চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না।

বিমল কর (১৯২১-২০০৪) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের থেকে বয়সে বড় হলেও গোয়েন্দা সাহিত্যজগতে সুনীলের পরে তাঁর আগমন। ১৯৭৪ সালে 'আনন্দমেলা'য় 'কাপালিকরা এখনো আছে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তাঁর গোয়েন্দা কিঙ্কর কিশোর রায় ওরফে কিকিরা আসলে ম্যাজিশিয়ান, জাদুকর হুডনির ভক্ত। তারাপদ ও চন্দন তার সহকারি। অলৌকিক ঘটনার টানে সে রোমাঞ্চকর রহস্য উদঘাটনের পথে পা বাড়ায় এবং অলৌকিকতার অন্তরালে থাকা প্রকৃত সত্যকে অনুসন্ধান করে বের করে আনে। এই সিরিজের 'রাজবাড়ীর ছোরা', 'ঘোড়া সাহেবের কুঠি', 'যাদুকরের রহস্যময় মৃত্যু', 'সোনালী সাপের ছোবল' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২) সাতের দশকের গোড়া থেকে গোয়েন্দা কাহিনি রচনায় হাত দেন। তাঁর গোয়েন্দা কর্নেল নিলাদ্রি সরকার ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি। 'পরগাছা', 'ত্রিশূল রক্তের দাগ', 'লাভারস বিচ ইভনিং ভিলা', 'হানিমুন লজ', 'তুষারে রক্তের দাগ', 'কালো নেকড়ে', 'স্বর্গের বাহন' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা কাহিনি। কোনো কোনো কাহিনিতে তিনি কেকে হালদার

চরিত্রটিকে কমিক রিলিফের জন্য নিয়ে এসেছেন। সবগুলি কাহিনির ক্ষেত্রে লেখকটি প্রেক্ষণবিন্দু প্রয়োগ করেননি। কোনো কাহিনির কথক সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী, কোনো কাহিনি কর্নেলের আত্মকথন, আবার অনেক ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ কথনরীতির প্রয়োগও লক্ষ করা যায়।

আটের দশকে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪১-) 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'দেরকে গোয়েন্দা কাহিনির আসরে হাজির করেন। এনিড ব্লাইটনের 'দ্য ফেমাস ফাইভ' ও 'মিস্ট্রি সিরিজ'-এর অনুসরণে তিনি 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' সিরিজ তৈরি করেন। বাবলু, বিলু ভোম্বল তিন কিশোর ও বিচ্চু ও বাচ্চু দুই কিশোরী এবং একটি দেশি কুকুর পঞ্চুকে নিয়ে এই দলটি গড়ে উঠেছে। ১৯৮১ সালে প্রথম কাহিনি প্রকাশিত হয়। প্রথম গল্পটির আয়তন খুবই ছোট, ধীরে ধীরে এই সিরিজের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনির আয়তনও বাড়তে থাকে। শেষের দিকের কাহিনিগুলি অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাসের আয়তনে পৌঁছয়।

সমরেশ মজুমদার (১৯৪২-) ১৯৮৪ সালে 'খুনখারাপি' গল্পে গোয়েন্দা অর্জুনকে নির্মাণ করলেন। অর্জুন শখের গোয়েন্দা নয় , বেকার জীবনের যন্ত্রনা ঘোচাতে এবং পেটের দায়ে পড়ে সে গোয়েন্দা হয়েছে। প্রথম দিকের কাহিনিতে সে সরকারি গোয়েন্দা অমল সেনের অধীনে শিক্ষানবিস হিসেবে কাজ করেছে, ক্রমে ধীরে ধীরে সে নিজেই পরিপূর্ণ গোয়েন্দা হয়ে উঠেছে। 'লাইটার', 'জুতোয় রক্তের দাগ', 'দিন-দুপুরেই রাত দুপুর', 'রত্নগর্ভা', ইয়েতির আত্মীয়', প্রভৃতি কাহিনিগুলি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, বাংলাদেশ, নেপালের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও তাঁর অধিকাংশ প্রেক্ষাপট উত্তরবঙ্গ ।

সাত ও আটের দশকের রচয়িতারা নয়ের দশকের গোয়েন্দা সাহিত্যের আসর জমিয়ে রাখলেন। 'কাকাবাবু সিরিজ', 'পাণ্ডব গোয়েন্দা সিরিজ', 'অর্জুন সিরিজ' যখন বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য জগতে আধিপত্য করছে তখন তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের আসরে গোয়েন্দা গার্গীকে নিয়ে এলেন। নয়ের দশকে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭ -) 'আনন্দবাজার'-এর 'রবিবাসরীয়'তে ধারাবাহিকভাবে 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' উপন্যাসটি লিখতে শুরু করলেন। আনন্দবাজারের পৃষ্ঠায় এই উপন্যাসের মোট ৩৩ টি কিস্তি প্রকাশিত হয়। গোয়েন্দা গার্গী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়েন্দা কাহিনি লেখার থেকে যখন বিরাম নিতে চান আবার রমাপদ চৌধুরীর অনুরোধে তিনি 'ধূসর মৃত্যুর মুখ', 'নীল রক্ত নীল বিষ', '৭৭ সবুজ সরণি' প্রভৃতি কাহিনিগুলি রচনা করেন। শুধুমাত্র গোয়েন্দা কাহিনির রহস্যভেদ নয়, এই কাহিনিগুলিতে অঙ্কের ছাত্রী গার্গীর ব্যক্তিগত জীবনের উত্থান পতনের কাহিনিও জায়গা করে নেয়।

❖ একুশ শতক

একুশ শতকের শুরুর দিকেই সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫) গোয়েন্দা কাহিনি রচনায় হাত দেন। বাংলা সাহিত্যের দরবারে তিনি গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জিকে হাজির করেন। ২০০০ সালে 'পালাবার পথ নেই' প্রকাশ পেল। ২০০৩ সালে প্রকাশিত 'সারেন্ডার শয়তান' কাহিনিতে সহকারী বোনঝি টুপুরের আগমন ঘটল। এরপর থেকে প্রত্যেক বছর 'আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী'তে মিতিনমাসি গোয়েন্দা কাহিনি প্রকাশিত হতে থাকলো। ২০১৫ সালে প্রকাশিত 'স্যান্ডার সাহেবের পুঁথি' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্যন্ত সেই ধারা অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

একুশ শতকের আর এক উল্লেখযোগ্য কাহিনিকার হলেন সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। 'আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী'তে তাঁর গোয়েন্দা কাহিনি প্রকাশিত হয়। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা দীপঙ্কর বাগচি প্রথাগত গোয়েন্দা চরিত্রের থেকে একেবারে আলাদা। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা সাঁটা সাদামাটা ভুলো মনের মাঝ বয়সী ভদ্রলোক দীপঙ্কর বাগচি। আঁখি সেন ওরফে ঝিনুক তাঁর সহকারী। ক্যারাটেতে পারদর্শী এই কিশোরী বিভিন্ন কাহিনিতে দীপকাকুকে শুধু সাহায্যই নয়, রক্ষাও করে। প্রায় প্রত্যেকটি কাহিনিতে 'রিটায়ার্ড মিলেটারি ম্যান' বাবার একমাত্র সন্তান আঁখির শারীরিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'অদৃশ্য নজরদার', 'হেঁয়ালির অন্ধকারে', 'চেনা চেহারায় অচেনা মানুষ', 'ময়ূরবাড়ি রহস্য', 'চিত্রনাট্যে কিসের ইঙ্গিত', 'ফন্দিবাজ বন্দি', 'প্রাপকের খোঁজে', 'ডাক রহস্য' প্রভৃতি কাহিনিগুলিতে লেখক মুন্সিয়ানার ছাপ রেখেছেন।

'আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪১৯'-এ (২০১৩) পারমিতা ঘোষ মজুমদারের 'রাবংলা সম্ভব' উপন্যাসে গোয়েন্দা রঞ্জাবতীকে খুঁজে পাওয়া যায়। সে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনো করার পর কিছুদিন সংবাদ পত্রে চাকরি করে। তারপর 'ট্রুথ সিকার্স' নামের এজেন্সি বানিয়ে গোয়েন্দাগিরি শুরু করে। তার সঙ্গী লাজবন্তী এখানে ব্যোমকেশ কাহিনির অজিতের মতোই তার গোয়েন্দাগিরির কাহিনি লেখে। তাদের অ্যাডভেঞ্চারের আরেক সদস্য হল লাজবন্তীর ছেলে পোগো ওরফে বীতশোক গঙ্গোপাধ্যায়। 'আনন্দমালা পূজাবার্ষিকী ১৪২৩'-এ (২০১৭) দেখা যায় পারমিতা ঘোষ মজুমদার স্কুল পড়ুয়া পোগো চক্কতির ও তার বন্ধুদের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি লেখেন। বাংলা সাহিত্যে আরেকটি মেয়ে গোয়েন্দা সিরিজ তৈরি হতে হতেও থমকে যায়।

একুশ শতকের অত্যন্ত পরিচিত লেখিকা সায়ন্তনী পুততুণ্ডও গোয়েন্দা কাহিনি লেখায় হাত দেন। যদিও তিনি বেসরকারি গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেননি। তিনি সি.বি.আই.

অফিসার অধিরাজকে নিয়ে তিনি বেশ কিছু গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছেন। মূলত জটিল খুনের কাহিনি নিয়েই এই সিরজটি রচিত। ২০১৮ সালে অধিরাজের কয়েকটি কাহিনি নিয়ে 'বহুরূপী' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তারপর 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে', 'সর্বনাশিনী', 'বহুরূপী ২', 'চুপি চুপি আসছে', 'ডেয়ার অর ডাই' গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়।

ডাক্তার ইন্দ্রনীল সান্যাল নির্দিষ্ট কোনও গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ না করলেও তিনি বিভিন্ন পেশার মেয়েকে তার ব্যাক্তিজীবনের সঙ্গে যুক্ত ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাদের গোয়েন্দা হয়ে ওঠার কাহিনি লিখেছেন। কাহিনিগুলিকে তিনি 'মেডিক্যাল' থ্রিলার বলে অভিহিত করেছেন। 'কর্কটক্রান্তি', 'স্নেহজাল', 'পণ্যভূমি' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

লেখিকা নন্দিনী নাগ গোয়েন্দা তিস্তা দত্ত চরিত্রটিকে নির্মাণ করেন। তিস্তা একটি সংবাদ পত্রের অফিসে চাকরি করে। সেই সূত্র ধরে তাকে বিভিন্ন হত্যা কাণ্ডের সমাধানে নামতে দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত গোয়েন্দা তিস্তাকে নিয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে --- 'হত্যার পরিমিতি' ও 'ডুয়ার্সে ডামাডোল'।

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির একশ তিরিশ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যায় ক্রমাগত বিবর্তিত হতে হতে আজ তা অনেক পরিণত রূপ লাভ করেছে। উনিশ শতকে বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনির সূচনালগ্নে লেখকরা প্রাইভেট ডিটেকটিভদের বেছে নেননি। বরং পুলিশ কর্মচারীদের স্মৃতিকথার আদলে বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনির সূত্রপাত। এরপর বিদেশী গোয়েন্দা কাহিনির অনুবাদ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদেশী কাহিনির দেশীয় রূপ নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু সেই পর্যায় পেরিয়ে এসে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে সাবালকত্ব অর্জন করে। বাংলায় মৌলিক গোয়েন্দা কাহিনি রচিত হতে থাকে। নানা ধরণের গোয়েন্দা চরিত্র নির্মিত হতে থাকে। বাংলার পাঠক মহলে 'হার্ড বয়েল' ক্রাইম কাহিনির আদলে নির্মিত আদি রসাত্মক গোয়েন্দা কাহিনির জনপ্রিয়তা থাকলেও লেখকরা শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক নির্দিষ্ট পাঠক গোষ্ঠীর মধ্যে গোয়েন্দা কাহিনিকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। লেখকরা কিশোর পাঠকের মনে জায়গা করে নেওয়ার দিকে নজর দেন। হেমেন্দ্র কুমার রায় গোয়েন্দা কাহিনিকে প্রাপ্ত বয়স্কদের আসর থেকে মুক্ত করেন। নলিনী দাশ, সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকরা কিশোর পাঠকদের জন্য গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে শুরু করেন। বলা বাহুল্য 'সন্দেশ', 'আনন্দমেলা', 'শুকতারা' ইত্যাদি কিশোর পত্রিকার ভূমিকা এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। শুধুমাত্র কিশোর পাঠ্য গোয়েন্দা কাহিনিই নয়, বাংলায় কিশোর গোয়েন্দা দলের দেখাও মিলেছে। কিশোর কিশোরীরা রহস্যের সমাধান করেছে আবার

গোয়েন্দার সহকারীর ভূমিকাও পালন করেছে। বয়সের বেড়াজাল টপকানোর পাশাপাশি বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য লিঙ্গগত ভেদাভেদকেও তুচ্ছ করে তুলেছে। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দার আগমন ঘটেছে। ঠাকুমা, পিসিমা, কলেজ পড়ুয়া মেয়ে, স্কুল পড়ুয়া মেয়ের দল, সংসার সামলানো মহিলা, বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সাংবাদিক, ডাক্তার --- সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেয়েদেরকে লেখকরা গোয়েন্দার ভূমিকায় নির্মাণ করেছে। পুরুষ গোয়েন্দা থেকে নারী গোয়েন্দা, সরকারী গোয়েন্দা থেকে থেকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ, রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার থেকে স্কুল পড়ুয়া গোয়েন্দা --- বাংলা গোয়েন্দার ধরণ ও ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে। শুধুমাত্র প্রাচীনতার দিক থেকেই নয়, বিস্তৃতির দিক থেকেও শতাব্দী প্রাচীন বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

নির্দেশিকা

১। বিবেক সিংহ, 'বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য : উনিশ ও বিশ শতক', সম্পাদক : ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী, ২০০৯ কলকাতা, পৃ. ১০৪২

২। তদেব

৩। তাপস ভৌমিক, 'সম্পাদকের নিবেদন', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪২০, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৩

৪। সিদ্ধার্থ ঘোষ, সম্পাদকীয়, বিভাব, শার্লক হোমসের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৭, কলকাতা, পৃ. ১০

৫। পিনাকী ভাদুড়ী, 'বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী : একটি যথাসাধ্য খতিয়ান', কোরক সাহিত্য পত্রিকা ; প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪২০, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ১৪

৬। বিবেক সিংহ, 'বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য : উনিশ ও বিশ শতক', সম্পাদক : ড। সত্যবতী গিরি ও ড। সমরেশ মজুমদার, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী, ২০০৯ কলকাতা, পৃ. ১০৪২

৭। তদেব, পৃ. ১০৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণের নানা দিক

গোটা পৃথিবী জুড়ে গোয়েন্দা সাহিত্য একটি অতি জনপ্রিয় সাহিত্য ধারা হলেও সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা এখনও দ্বিতীয় শ্রেণির সাহিত্য হয়েই রয়ে গেছে। তাই তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কিন্তু অকপটে বলি, গোয়েন্দা উপন্যাস লিখলে তাঁরা হয়ে যান দ্বিতীয় শ্রেণির লেখক"[১] । হীরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ধরনটা এই রকম যে এই ধরণের গল্পকে আর যাই বলা যাক, সাহিত্য বলা যায় না।"[২]

সাহিত্য জগতে গোয়েন্দা কাহিনি যতটা তাচ্ছিল্যের বিষয়, গোয়েন্দা সাহিত্য জগতে মেয়ে গোয়েন্দা তার থেকেও বেশি তাচ্ছিল্যের পাত্রী। গোয়েন্দা নানা রকম হতে পারে, এমনকি কাকাবাবুর মতো স্ট্রেচারে ভর করা মানুষ, কিংবা দীপকাকুর মতো ভুলো মনের ছাপোষা মধ্যবিত্তও গোয়েন্দা হতে পারে। কিন্তু মেয়ে গোয়েন্দা শুনলেই শুধুমাত্র সমালোচক মহল নয়, পাঠক ও লেখক মহলের মনেও তাচ্ছিল্য জেগে ওঠে। এই প্রবণতা শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। অর্থাৎ, সাহিত্যের দরবারে গোয়েন্দা সাহিত্য যেমন দ্বিতীয় শ্রেণির সাহিত্য বলে বিবেচিত, গোয়েন্দা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মেয়েরাও তেমনি দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

এডগার এলানপকে আধুনিক গোয়েন্দা সাহিত্যের জনক বলে মনে করা হয়। তিনি চার্লস অগাস্টে দ্যুপ্যাঁ চরিত্রটি নির্মাণ করেন। ১৮৪১ সালে 'দ্য মার্ডার ইন দ্য রু মর্গ' গল্পে এই চরিত্রটির আবির্ভাব। দ্যুপ্যাঁ পেশাদার গোয়েন্দা নয়, কিন্তু বেশিরভাগ সমালোচক এই কাহিনিটিকে প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি হিসেবে মান্যতা দেন। আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনির ধারা তৈরি হওয়ার প্রায় ছত্রিশ বছর পর গোয়েন্দা কাহিনি ধারায় প্রথম লেখিকার পদার্পণ ঘটে। ১৮৭৮ সালে অ্যানা ক্যাথারিন গ্রীনের 'দ্য ল্যাভেনোর্থ কেস' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এখানে ধনী ব্যাবসায়ী হারেশিও লেভেনোর্থের মৃত্যুর তদন্তের জন্য তদন্তকারী এবেনেজার গ্রিস ও আইনজীবী রেমন্ডকে উপস্থিত হতে দেখা যায়। ১৯২৩ সালে ডরোথি এল সয়ার্সের 'হুজ বডি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি গোয়েন্দা পিটার হুইমজি চরিত্রটি নির্মাণ করেন। বলা বাহুল্য গোয়েন্দা সাহিত্যের জগতে লেখিকার আগমন ঘটলেও গোয়েন্দার ভূমিকায় তাঁরা পুরুষ চরিত্রই নির্মাণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রথম গোয়েন্দা কাহিনির লেখিকা সরলাবালা সরকার তাঁর 'ঘড়িচুরি'

গল্পে রহস্য সমাধানের ভার পুরুষ চরিত্রের ওপরেই দিয়েছেন। তবে লেখিকা ডরোথি এল সয়ার্স গোয়েন্দা কাহিনির লেখিকা হিসেবে সাফল্য অর্জন করেন, তাঁর গোয়েন্দা চরিত্রটি পাঠক মনে স্থায়ী জায়গা করে নেয়। ২০১৩-তে জিল প্যাটন ওয়ালস 'দ্য লেট স্কলার' কাহিনিতে পিটার হুইমজির সহকারী হিসেবে তাঁর স্ত্রী হ্যারিয়েট ভেনকে রেখেছেন। লক্ষণীয় পিটার হুমিমজির আবির্ভাবের নব্বই বছর পর এই কাহিনি লেখা হয়েছে। এর মধ্যে সামাজিক পরিস্থিতি ও সমাজ মনস্তত্ত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। যার ফল স্বরূপ লেখিকা বিখ্যাত পুরুষ গোয়েন্দার সহকারী হিসেবে কোনও পুরুষ চরিত্রকে না এনে তাঁর স্ত্রীকে সেই জায়গায় বসিয়েছেন।

বিশ্ব সাহিত্যে প্রথম মেয়ে গোয়েন্দার আবির্ভাব ঘটে এক লেখিকার হাত ধরে। ১৯২৭ সালে 'দ্য রয়াল ম্যাগাজিন'-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় আগাথা ক্রিস্টির 'দ্য টুইসডে নাইট ক্লাব' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই গল্পে বিশ্ব সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত মেয়ে গোয়েন্দা মিস জেনি মারপেলের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৩০ সালে আগাথা ক্রিস্টি তাঁকে নিয়ে 'মার্ডার অ্যাট দ্য ভাইকারেজ' উপন্যাসটি রচনা করেন। ক্রমেই এই চরিত্র জনপ্রিয় হয়ে ওঠে মিস মারপেলকে নিয়ে বিভিন্ন গল্প লেখার পাশাপাশি লেখিকা ১২টি উপন্যাস রচনা করেন। ১৯৭৬ সালে শেষ উপন্যাস 'স্লিপিং মার্ডার' প্রকাশিত হয়। তবে মিস মারপেলকে নির্মাণ করার আগে তিনি এক পুরুষ গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেছিলেন। ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় 'দ্য মিস্টিরিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইল', এখানে আরকুল পয়রো চরিত্রটির দেখা মেলে। এই চরিত্রটিও বিশ্বসাহিত্যে অতি পরিচিত। ক্রিস্টি পয়রোকে নিয়ে পঞ্চাশটারও বেশি গল্প ও তেত্রিশটা উপন্যাস লিখেছেন। অর্থাৎ, তিনি পাশাপাশি পুরুষ ও মেয়ে গোয়েন্দার কাহিনিকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন।

আগাথা ক্রিস্টির লেখার মধ্য দিয়েই গোয়েন্দা সাহিত্যে স্বর্ণযুগের সূচনা ঘটে। এই সময়ে বহু লেখকদের পাশিপাশি অনেক লেখিকা গোয়েন্দা কাহিনি লেখা শুরু করেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল : আগাথা ক্রিস্টি, ডরথী এল সয়ার্স, মার্জারী অ্যালিংহাম, এডিথ মার্শ। এই চার লেখিকাকে 'কুইনস অফ ক্রাইম' বলে অভিহিত করা হত। মার্জারী অ্যালিংহ্যাম তাঁর গোয়েন্দা অ্যালবার্ট ক্যাম্পিয়নকে ১৯২৯ সালে 'দ্য ক্রাইম অ্যাট ব্ল্যাক ডাডলে' গল্পের মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে নিয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে এই চরিত্রকে নিয়ে তিনি আঠারোটি উপন্যাস ও কুড়িটিরও বেশি গল্প লেখেন। এডিথ মার্শ ১৯৩৪ সালে 'আ ম্যান লে ডেড' উপন্যাসে তাঁর গোয়েন্দা পুলিশ রোডেরিক অ্যালেনকে প্রথমবারের জন্য

উপস্থিত করেন। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত ‘লাইট থিকনেস’ পর্যন্ত এই চরিত্রকে নিয়ে লেখিকা অনেক কাহিনি রচনা করেন।

গোয়েন্দা কাহিনির স্বর্ণযুগের ‘কুইনস অফ ক্রাইম’ --- আগাথা ক্রিস্টি, ডরথী এল সয়ার্স, মার্জারী অ্যালিংহাম, এডিথ মার্শ --- এই চার লেখিকা পুরুষ গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেন। এঁদের মধ্যে শুধুমাত্র আগাথা ক্রিস্টি পুরুষ গোয়েন্দার পাশাপাশি মেয়ে গোয়েন্দাও সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ, আধুনিক পাশ্চাত্য মননও গোয়েন্দা হিসেবে কোনও নারীকে খুব সহজে মেনে নিতে পারেনি। মিস মারপেলকে একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরতে হয়, মূল ধারার ক্ষেত্রে লেখিকারাও গোয়েন্দা হিসেবে পুরুষ চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন। তবে ক্রিস্টি নারী গোয়েন্দা নির্মাণ করলেও তাকে পুরুষ গোয়েন্দার প্রতিস্পর্ধী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেননি। মিস মারপেল মূলত উল বুনতে বুনতে রহস্যের সমাধান করেন, পুরুষ গোয়েন্দাদের মতো তাঁকে রহস্য ভেদ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় না। ১৯৭০ সালে পি ডি জেমস নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ‘অ্যান আন সুইটেবল জব ফর আ ওম্যান’ গ্রন্থে কর্ডেলিয়া গ্রে চরিত্রটিকে হাজির করেন। এই চরিত্রটিকে নিয়ে তিনি ‘দ্য স্কাল বিনিথ দ্য স্কিন’ নামে আরেকটি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁকে ডিটেকটিভ এজেন্সির নাম ‘প্রাইড’। এখানে একেবারে পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবে একজন নারীকে পাওয়া যায়। তবে এই চরিত্র নির্মাণের আগে ১৯৬২ সালে ‘কভার হার ফেস’ উপন্যাসে তিনি অ্যাডাম ডালগ্লিয়াস নামে একটি পুরুষ গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তাঁকে নিয়েই তিনি তাঁর বেশিরভাগ গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেছেন।

ড. পিনাকী দের মতে, বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভারতীয় ভাষায় গোয়েন্দা সাহিত্য একটি আলাদা ধারা হিসেবে গড়ে ওঠেনি। প্রাচীনতার দিক থেকে দেখতে গেলে গোটা পৃথিবীতে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ফরাসী ও ইংরেজি সাহিত্যের পরই বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য ধারা গড়ে উঠেছে। শুরুতে ইংরেজি সাহিত্যকে অনুকরণ করে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ভিত তৈরি হয়। তারপর বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য নিজস্ব গতিপথ বেছে নেয়।

আর লেখক ও লেখিকার নির্মাণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত যে পার্থক্য রয়েছে, সেদিকে তাকানোও দরকার।

অধিকাংশ সমালোচকের মতে ১৯৯২ সালে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনি ধারার সূত্রপাত হয়। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য নির্মাণের

জগতে নারীর আগমন ঘটতে খুব বেশি দেরি হয়নি। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৮৯৯/১৯০০) যে চারজন লেখক 'কুন্তলীন' পুরস্কার পান, তাঁদের মধ্যে সরলাবালা সরকারেরও নাম পাওয়া যায়। "অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসের সরলাবালা দাসী তাঁর 'ঘড়ি চুরি' কাহিনির জন্য নবম পুরস্কার পেয়েছিলেন"[৩]।

তবে রহস্য উন্মোচনকারীর হিসেবে তিনি সুধাংশুশেখর বসু নামের একটি চরিত্র নির্মাণ করেন। 'প্রহেলিকা সিরজ'-এ সুষমা সেন দুটি কাহিনি লেখেন --- 'এ যুগের দুঃশাসন' ও 'ব্যাথার দান', এখানে নায়ক শৈলেন চৌধুরী। প্রতিভা বসুর 'চুরির তদন্ত' গল্পে তিনি এগারো বছরের কিশোর অন্তুকে রহস্য উন্মোচনকারী হিসেবে উপস্থিত করেন, 'রহস্য ভেদ' গল্পে বিমানবিহারি রহস্যভেদ করেন। শৈলবালা ঘোষজায়ার উপন্যাস 'জয়পতাকা'তেও সেই একই ধারা অব্যাহত থাকে, এখানে নায়কের ভূমিকায় জীমূতবাহন কর চরিত্রটির দেখা মেলে। এই প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় তৎকালীন অবহেলিত নারী সমাজ যখন অপরাধ সাহিত্য রচনায় হাত দিচ্ছেন, তখন তাঁরা গোয়েন্দা হিসেবে শুধুমাত্র একজন পুরুষকেই কল্পনা করতে পারছেন। গোয়েন্দা কাহিনি ধারার শুরুর লেখিকারা মেয়ে গোয়েন্দার কথা ভাবতেই পারছেন না।

তবে সময়ের সঙ্গে এই মানসিকতায় বদল আসে। বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দার আগমন ঘটে। শুধুমাত্র লেখিকারাই নয়, লেখকরাও মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেন। রচয়িতার লিঙ্গভেদের প্রভাব মেয়ে গোয়েন্দা নির্মাণে প্রভাব ফেলেছে কিনা, সেদিকে একবার তাকানো প্রয়োজন।

❖ লেখকের হাতে গড়ে ওঠা মেয়ে গোয়েন্দা

গোয়েন্দা কাহিনির লেখকরা যে সব সময় মেয়ে গোয়েন্দা বিষয়টাকে তাচ্ছিল্য করে গেছেন, তা নয়। বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু লেখক সফল নারী গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেছেন। বিশ্ব সাহিত্যের অনুরাগী বাঙালি সাহিত্যিকরা আগাথা ক্রিস্টির মিস মারপেল চরিত্রটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বাংলায় এমন চরিত্রও নির্মাণ করেছেন।

নির্মাল্য কুমার ঘোষ তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেন, "বাংলায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ নামক প্রাণীটির জন্ম যেমন সম্ভব হয়েছে শার্লক হোমসের কৃপায়, একই ভাবে বলা চলে বাঙালি

মেয়ে-গোয়েন্দার আবির্ভাবের পিছনেও রয়েছে আগাথা ক্রিস্টি ও মিস মারপেলের তাগাদা”[৪]।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ‘বিন্দিপিসির গোয়েন্দাগিরি’ গল্পটি লেখেন। পাশাপাশি গোয়েন্দা কাহিনির একনিষ্ঠ পাঠক ও সমালোচক প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত ‘ঠাকুমার গোয়েন্দাগিরি’ গল্পটি রচনা করেন। তবে মিস মারপেলকে অনুসরণ করে এই কাহিনি দুটি নির্মিত হলেও, এগুলি ঠিক পাঁচকড়ি দের মতো অনুবাদধর্মী রচনা নয়। বিন্দিপিসি ও ঠাকুমা একেবারেই আদন্ত্য বাঙালি। বিন্দিপিসি নক্সিকাঁথা সেলাই করেন, আর বাড়ির পরিচারিকার কাছ থেকে সাড়া পাড়ার খবর সংগ্রহ করেন। এভাবেই তাঁর ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষমতা গড়ে উঠেছে। তাই শুধুমাত্র বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি রহস্যের সমাধান করে দিতে পারেন। অন্যদিকে কীর্তনের আসরে বসে থাকা ঠাকুমাও নিজের বুদ্ধি খরচ করে রহস্যের কিনারা করে ফেলেন। মিস মারপেল চরিত্রটি বিশ্বসাহিত্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় চরিত্রের মধ্যে একটি, তাঁর জনপ্রিয়তা এখনও বর্তমান। এর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘শুভ মহরত’ এবং টেলিছবি ‘তাহার নামটি রঞ্জনা’।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বৈশালী চট্টোপাধ্যায় ও হৈমন্তী ঘোষাল নামের দুই মেয়ে গোয়েন্দাকে নির্মাণ করেন। তবে তাদের নিয়ে তিনি খুব বেশি কাহিনি রচনা করেননি। বরং তিনি তাঁর পুরুষ গোয়েন্দা চরিত্রকেবেশি সময় দিতে চেয়েছেন। অজিতকৃষ্ণ বসু ‘ডিটেকটিভ নন্দিনী সোম ও দানুমামা’ গল্পে নন্দিনী সোম নামে একটি মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেন। নন্দিনী এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজি নিয়ে এম.এসসি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বুদ্ধির বিচারে সে যে কাউকে টেক্কা দিতে পারে। বিশ শতকের সাতের দশকে মনোজ সেন মাসিক ‘রোমাঞ্চ’ পত্রিকায় রহস্য সন্ধানী দময়ন্তীর কাহিনি লিখতে শুরু করেন। ইতিহাসের অধ্যাপক দময়ন্তীও শুধুমাত্র মস্তিষ্কের জোরে রহস্যের সমাধান করে ফেলে। প্রথম গল্প ‘সরল অঙ্কের ব্যাপার’ গল্পে সে খুনের জায়গায় না গিয়েও বাড়িতে বসে রহস্য সমাধান করে ফেলে। পরবর্তী অন্যান্য কাহিনিতে সে অপরাধের স্থলে থাকলেও তাকে অপরাধীর সঙ্গে মারামারি কিংবা গুলি চালাতে দেখা যায়না। সে শুধুমাত্র নিজের বুদ্ধি খরচ করে রহস্যের সমাধান করে। যেহেতু লেখকের হাতে নির্মিত চরিত্র এটি, তাই আলাদা করে এই কাহিনির মধ্যে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় না। তবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছে বারবার তাকে উপহাসের পাত্র হতে হয়েছে। আটের দশকে অদ্রিশ বর্ধন গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্রের পাশাপাশি ‘গয়েন্দানী নারায়ণী’কে হাজির করেন। তবে নারায়ণীকে তিনি অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাদের মতো শুধুমাত্র বুদ্ধি খরচ

করে গোয়েন্দাগিরি করার দলে রাখেননি। কাহিনিতে তাকে কামোদ্দীপক উপকরণ হিসেবেও ব্যাবহার করেছেন। 'শিয়রে শমন' কাহিনিতে দেখা যায়, "গোয়েন্দানী বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আয়নার সামনে। তার নীল রঙের দু'পকেট ওয়ালা ডেনিম শার্টের দুটো পকেটই ঠেলে উঠেছে। উদ্ধত বুকের নিচেই কটিদেশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে দেড় ইঞ্চি চওড়া বেল্টের বন্ধনে। নিম্নাঙ্গ আবৃত ব্লু জিন্সের প্যান্টে। নিতম্ব কামড়ানো জিন্স।"[৫]

এসব বর্ণনার পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন নারায়ণী মার্শাল আর্টে পারদর্শী। সে অতি আধুনিক নাগরিক নারী, পিতৃতান্ত্রিকতার কাছে সে মাথা নোয়ায় না, কাউকেই সে পরোয়া করেনা। নয়ের দশকের শেষ ভাগে রমাপদ চৌধুরীর অনুরোধে সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' গোয়েন্দা উপন্যাসটি রচনা শুরু করেন। তাঁর কাহিনির গোয়েন্দা হিসেবে তিনি একটি নারী চরিত্রকে বেছে নেন। কলেজ পড়ুয়া গার্গী মুখার্জি পরবর্তী সময়ে গার্গী চৌধুরী হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে লেখা কাহিনির মধ্যে সংখ্যার বিচারে গোয়েন্দা গার্গী সবচেয়ে এগিয়ে আছে। গার্গীর কাহিনিগুলি শুধুমাত্র তার রহস্য সমাধানের কাহিনিই নয়, এই কাহিনির মধ্য দিয়ে লেখক একটু একটু করে গার্গীর জীবনের বিবর্তনকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। তার কলেজ জীবন থেকে শুরু করে তার মেয়ে লুনার দ্বাদশ শ্রেণিতে পৌঁছনোর পর্যায়গুলি কাহিনিগুলির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক থেকে 'প্যারাডাইস প্রোডাক্টস'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হওয়া গার্গী ক্যারাটে জানলেও মূলত বুদ্ধির জোরেই সে রহস্য সমাধান করে। সাম্প্রতিক কালে রচিত ইন্দ্রনীল সান্যালের লেখা থ্রিলারগুলিতে কোনও একটি গোয়েন্দার বিবর্তনের কাহিনি নয়, বরং একাধিক মেয়ের রহস্য সমাধানের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তারা নিজস্ব পেশাগত জগতে প্রতিষ্ঠিত, তাই আলাদা করে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের তাগিদ তারা অনুভব করেনা, রহস্য সমাধানের ওপরেই তাদের যাবতীয় মনোযোগ সংবদ্ধ করে।

❖ লেখিকার কলমে মেয়ে গোয়েন্দা

ঠাকুমা, বিন্দিপিসিদের গোয়েন্দাগিরির বিচ্ছিন্ন কয়েকটি গল্প লেখা হলেও একটি নির্দিষ্ট গোয়েন্দা চরিত্রকে নির্মাণ করে তার গোয়েন্দাগিরির কাহিনি পাঠকের সামনে প্রথম তুলে ধরেন যিনি, তিনি হলেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। "মেয়েদের বুদ্ধিহীনতার অনড় মিথকে ভেঙে গুড়িয়ে এক গোয়েন্দানীর ধারাবাহিক কারবার নিয়ে যিনি বহুদিন আসর মাত করে রেখেছিলেন, তিনি প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।"[৬]

তিনি ১৯৫২ সালে ‘গুপ্ত ঘাতক’ কাহিনিতে কৃষ্ণা চরিত্রটিকে নির্মাণ করেন। এরপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আস্তে আস্তে সে গোয়েন্দা হয়ে ওঠে। গোয়েন্দা কৃষ্ণাকে লেখিকা তৎকালীন আধানিক নারীদের আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বিপদে পড়লে কিভাবে তার মোকাবিলা করা যায়, তার পরিচয় দেওয়ার জন্য তিনি কৃষ্ণা সিরিজটি রচনা করেন। কৃষ্ণা অত্যন্ত সুন্দরী, পড়াশুনোয় তুখোড়, অনেকগুলি ভাষা বলতে পারে, ঘোড়ায় চড়তে পারে, গাড়ি চালাতে পারে, রিভলভার চালাতে পারে। এক কথায় সে আধুনিক রূপকথার নায়িকা। সে বিন্দিপিসির মতো আর্মচেয়ার ডিটেকটিভ নয়, সে অপরাধীদের পিছনে ধাওয়া করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরাধীদের হাতে বন্দিও হয়, তারপর নিজের সামর্থে সেখান থেকে বেরিয়েও আসে। কৃষ্ণা সিরিজের কাহিনির মধ্যে খুব বেশি ডিটেকশনের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না, চেজিং আর অ্যাডভেঞ্চারই এই সিরিজের মূলধন।

কৃষ্ণা সিরিজ জনপ্রিয়তা অর্জন করার পর প্রভাবতী দেবী ‘কুমারিকা সিরিজ’ রচনা করেন। এখানে তিনি গোয়েন্দা হিসেবে অগ্নিশিখা রায় চরিত্রটিকে নির্মাণ করেন। অগ্নিশিখা আর কৃষ্ণা চারিত্রিক ভাবে প্রায় একই ধরণের। আলাদা করে লেখিকা কেন এই চরিত্রটিকে নির্মাণ করলেন জানা যায়না। কাহিনি বয়নের দিক থেকে দেখলে ‘কুমারিকা সিরিজ’-এর কিছু কাহিনির মান ‘কৃষ্ণা সিরিজ’-এর তুলনায় অনেক বেশি ভালো। এখানে চেজিং এর পাশাপাশি বুদ্ধির ব্যাবহারও চোখে পড়ে।

প্রভাবতী দেবী একেবারেই নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর গোয়েন্দাদের নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরে যিনি মেয়ে গোয়েন্দাদের কাহিনি লেখলেন তিনি একেবারেই এই ধারা থেকে অনেকটা সরে এলেন। তার পিছনে অবশ্য উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ’, ‘কৃষ্ণা সিরিজ’, ‘কুমারিকা সিরিজ’ এগুলির পরিণত বয়সের পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হত। ছয়ের দশকে নলিনী দাশ যখন ‘গোয়েন্দা গণ্ডালু’ সিরিজ লেখা শুরু করলেন, তখন শিশু ও কিশোররা তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠক মহল। সেই কারণে তিনি স্কুল পড়ুয়া চার কিশোরী --- কালু, মালু, টুলু ও বুলুকে নিয়ে ‘গণ্ডালু’ সিরিজ রচনা করলেন। তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, ‘ফেমাস ফাইভ’-এর আদলে রচিত এই সিরিজে কোনও কিশোরের দেখা পাওয়া গেল না। লেখিকা মেয়েদের বোর্ডিং ও মেয়েদের দলের কাহিনি নিয়ে আসলেন। এর পিছনে লেখিকার নারীবাদী মনোভাব কাজ করলেও কাহিনিগুলোতে তার ছায়াপাতের কোনও অবকাশ নেই। গণ্ডালুদের কাহিনিগুলি মূলত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি, অ্যাডভেঞ্চারে নেমে তারা বিভিন্ন জটিল রহস্যের জালে জড়িয়ে

পড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ডি-কোডিং বা ধাঁধার সমাধান করলেও বেশিরভাগ কাহিনিতে অপরাধীর পিছু করার ছবিই দেখতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি এই কাহিনিগুলির মধ্যে খানিকটা ভ্রমণরসের উপস্থিতিও রয়েছে। এক কথায় লেখিকা নলিনী দাশ বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যকে কিশোর জগতের উপাদান করে গড়ে তুললেন। অধ্যাপক নির্মাল্য কুমার ঘোষ বলেন, "নলিনীর গণ্ডালুরা সত্যজিতের ফেলুদার পূর্বসুরী"[৭]।

গোয়েন্দা কৃষ্ণা, অগ্নিশিখা মোটরগাড়ি, ঘোড়া, নৌকা ইত্যাদির সাহায্যে অপরাধীদের পশ্চাৎ ধাবন করেছে অন্যদিকে গণ্ডালুরা পায়ে হেঁটে অপরাধীদের পিছু করেছে। কিন্তু পরবর্তী কালের অনেক কাহিনিতেই এই পশ্চাৎ ধাবনের জায়গায় শুধুমাত্র বুদ্ধির ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। ১৪০৪ বঙ্গাব্দের শারদীয়া 'শুকতারা'য় আশাপূর্ণা দেবী 'মেয়ে গোয়েন্দার বাহাদুরি' নামে একটি গল্প লেখেন। এখানে রহস্য উন্মোচনকারী চরিত্র কাজল, সে পেশায় গোয়েন্দা নয়, পরিচারিকা। কিন্তু নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে সে অপরাধের গন্ধ পায় ও পুলিশকে তা জানায়।

২০০০ সালে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস 'পালাবার পথ নেই' প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জিকে নিয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে এই চরিত্রটিই মিতিন মাসি নামে খ্যাত হয়। বলা বাহুল্য বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য জগতে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় চরিত্র এই মিতিন মাসি। তাঁর এই সিরিজের মধ্যে নারীবাদী ও পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের এক অদ্ভুত মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। মিতিন পেশাদার গোয়েন্দা, 'থার্ড আই' নামে আর একটি গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে। তার বাড়ির মধ্যে তার আলাদা চেম্বারও রয়েছে। বিভিন্ন কাহিনিতে দেখা যায় সে পেশাদার গোয়েন্দা বলে অনেকের কাছেই সে উপহাসের পাত্রী হয়ে উঠছে। বলাই বাহুল্য মিতিন নিজের কাজের মধ্য দিয়ে তাদের বিদ্রূপের যোগ্য উত্তর দিয়েছে। মিতিন ক্যারাটে জানে, রিভলভার চালাতে জানে। প্রয়োজনে তা ব্যাবহারও করে। কিন্তু এর পাশাপাশি মিতিন বুমবুমের মা, এই পরিচয়কে লেখিকা বারবার পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চান। তার পাশাপশি সে অসাধারণ রান্নাও করে। অর্থাৎ, লেখিকা পেশাদার গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করলেও পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মিতিনকে আদর্শ নারী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সম্ভবত আমাদের চারপাশে দেখতে পাওয়া খুব সাদামাটা বিবাহিত নারীও যে সফল গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পারে, তিনি তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

একুশ শতকের লেখিকা পারমিতা ঘোষ দস্তিদার রঞ্জাবতী মজুমদার নামে এক মেয়ে গোয়েন্দাকে নির্মাণ করেন। বত্রিশ বছর বয়সী রঞ্জাবতী অর্থনীতির কৃতি ছাত্রী। প্রথমে কিছুদিন সংবাদপত্রে চাকরি করার পর সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে 'ট্রুথ সিকার্স' ডিটেকটিভ

এজেন্সি খুলেছে। রঞ্জাবতী, তার বন্ধু লেখিকা লাজবন্তী গঙ্গোপাধ্যায় ও তার স্কুল পড়ুয়া ছেলে বীতশোক গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে পোগোকে নিয়ে এই তদন্তকারী দল গড়ে উঠেছে। অন্যান্য গোয়েন্দাদের তুলনায় রঞ্জাবতী প্রযুক্তিতে অনেক বেশি পারদর্শী, 'রাবংলা সম্ভব' উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যায়। রঞ্জাবতী একেবারেই সাংসারী নারী নয়, খানিকটা উড়নচণ্ডী স্বাভাবের। পাশাপাশি তার বন্ধু লাজবন্তীকে অঙ্কন করে লেখিকা একজন সাংসারী মায়ের থেকে যে রঞ্জাবতী কতটা আলাদা তা পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক কালের লেখিকা নন্দিনী নাগ গোয়েন্দা তিস্তা দত্ত চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন। তিস্তা সংবাদপত্রের অফিসে কাজ করে। অন্যান্য গোয়েন্দাদের সঙ্গে তার মূলগত পার্থক্য হল, তার মধ্যে রহস্য সমাধানের কোনও জেদ নেই। সে নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করে, কিন্তু পাশাপাশি তাকে একথাও বলতে দেখা যায়, যদি সে বিফল হয় তাহলেও তার কোনও আফসোস নেই। কারণ গোয়েন্দাগিরিটা তার পেশা নয়। তিস্তার বর অর্ক ও বন্ধু রাজীবকে তার সহকারির ভূমিকায় দেখা যায়। এই সিরিজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এখানে তিস্তা মেয়ে হয়েও গোয়েন্দাগিরি করছে বলে তাকে কোনও রকম হেয় করার ছবি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিনকে যেমন মেয়ে গোয়েন্দা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রাণপণ চেষ্টা দেখা যায়, তিস্তার মধ্যে তা একেবারেই অনুপস্থিত। আসলে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সময়কাল ও নন্দিনী নাগের সময় কালের মধ্যে বেশ খাইনিকটা ব্যবধান রয়ে গেছে। তাই তিস্তার কাঁধে লেখিকা সংসার সামলানোর দায় তুলে দেননি। তার পারিবারিক জীবন নিয়ে লেখিকা খুব ফলাও করে কিছু বলার চেষ্টা করেননি। তার পেশাগত জীবন ও গোয়েন্দাগিরি ছবিগুলো নিয়েই 'হত্যার পরিমিতি', 'ডুয়ার্সে ডামাডোল' উপন্যাসগুলি নির্মিত হয়েছে।

❖ গোয়েন্দার সহকারী নারী চরিত্র

গোয়েন্দা কাহিনিতে গোয়েন্দার পার্শ্ববর্তী কোনও চরিত্র অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা গোয়েন্দার সঙ্গে পাঠকের সংযোগ ঘটানোর সেতু হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো সেই চরিত্র পেশাগত সহকারীও হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ পুরুষ গোয়েন্দাদের ক্ষেত্রে দেখা পুরুষ সহকারীর উপস্থিতিই লক্ষ করা যায়। যেমন --- হেমেন্দ্র কুমারের বিমল, জয়ন্ত ও হেমন্তের সহকারী হিসেবে কুমার, মাণিক

ও রবীনকে পাওয়া যায়। অজিত ব্যোমকেশের ছায়াসঙ্গী হলেও রহস্য সমাধানে সক্রিয় ভাবে সহায়তা করেনি। ফেলুদার কাহিনির ক্ষেত্রে দেখা যায় ফেলুদা তোপসেকে তার সহকারী হিসেবে পরিচয় দেয়। কাকাবাবুর ক্ষেত্রে সন্তু তাঁর সহকারী। বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা চরিত্রের সহকারী চরিত্র এমন অনেক আছে। কিন্তু তার মধ্যে সিংহভাগই পুরুষ চরিত্র। হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র মেয়ে সহকারিকে দেখতে পাওয়া যায়।

'পাণ্ডব গোয়েন্দা' পাঁচ কিশোর কিশোরীর দল হলেও সেখানে মূলত বাবলু দলের পাণ্ডা, সে-ই বেশিরভাগ রহস্যের সমাধান করেছে। বাচ্চু ও বিচ্ছু দুই কিশোরী সহকারীর ভূমিকা পালন করেছে। পারমিতা ঘোষ মজুমদারের রঞ্জাবতীর সহকারী হিসেবে তার বন্ধু লাজবন্তীর নাম করা যেতে পারে। লাজবন্তী পেশায় লেখিকা, সে রঞ্জাবতীর রহস্য উন্মোচনের কাহিনিও লেখে। বলা বাহুল্য এই প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ ও অজিতের কথা মনে আসে। তবে অজিতের ক্ষেত্রে সে পুরুষ বলে যে বাউন্ডুলে জীবন যাপন করতে পেরেছে চল্লিশ বছরের লাজবন্তীর ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। লাজবন্তীকে তার সংসার, ছেলে সামলে দময়ন্তীর সহযোগিতা করতে হয়। তবে নামে সহকারী হলেও তাকে গোয়েন্দার সহকারী হওয়ার কারণে কোনও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়না।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'মিতিন মাসি' সিরিজে মিতিনের বোনঝি ঐন্দ্রিলা ওরফে টুপুর তার সহকারী। মূলত পাঠক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি টুপুর 'ঝাও ঝিয়েন হত্যা কাণ্ড'তে মাসির ব্যাস্ততার কারণে নিজেই বেশ খানিকটা তদন্তের কাজ করে। এছাড়া অন্যান্য কাহিনিতে তাকে মাসির সঙ্গে থানায় যাওয়া, জরুরি ফোন ধরা, নোট নেওয়া ইত্যাদি ছোট-খাটো কাজ করতে দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা সহকারী মেয়ে চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের দীপঙ্কর বাগচির সহকারী আঁখি সেন ওরফে ঝিনুক। টুপুর ও ঝিনুক দুজনেই ক্যারাটে শেখে। ঝিনুক ক্যারাটের পাশাপাশি কুংফুও শেখে। লেখক শুধুমাত্র এই তথ্য দিয়েই থেমে যাননি, তিনি বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে ঝিনুককে লড়তে দেখিয়েছেন। এমনকি গোয়েন্দা দীপকাকুকে অপরাধীরা অপহরণ করলে ঝিনুক নিজের ক্যারাটের প্যাঁচে তাদেরকে ঘায়েল করে দীপকাকুকে ছাড়িয়েও আনে। এইসব কারণে ঝিনুককে তার মায়ের কাছে বকা শুনতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সে বাবার কাছ থেকে প্রশ্রয় পায়। এই দুই চরিত্রকে নির্মাণ করতে গিয়ে লেখক এক অদ্ভুত বৈপরীত্য নিয়ে এসেছেন। দীপকাকু খুব ভুলো মনের ছাপোষা মাঝবয়সী মধ্যবিত্ত। তিনি ফেলুদা বা অর্জুনের মতো নায়কোচিত ব্যাক্তি নন। অপরাধীদের সঙ্গে হাতাহাতি করার মতো শক্তিও তাঁর নেই। ঝিনুক

মেয়ে, কিন্তু সে শক্ত সবল কিশোরী। তাই অপরাধীদের সঙ্গে লড়াই করতে হলে তাকেই এগিয়ে যেতে হয়।

আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে গোয়েন্দা সাহিত্যে নারীর খুব বেশি ভূমিকা চোখে পড়েনা। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রথম পর্যায় থেকেই এই জগত ফেলুদার কাহিনির মতো একেবারে নারী বিবর্জিত নয়। একদিকে সরলাবালা সরকার, সুষমা সেন, শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, নলিনী দাশ, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সায়ন্তনী পূততুণ্ড প্রমুখ লেখিকার আগমন ঘটেছে অন্যদিকে কৃষ্ণা, শিখা, দময়ন্তী, গার্গী, মিতিন, তিস্তা ইত্যাদি মেয়ে গোয়েন্দাও নির্মিত হয়েছে। কখনো লেখিকারা পুরুষ গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেছেন আবার কখনো লেখকরা নারী গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেছেন। একদিকে যেমন দময়ন্তী শুধুমাত্র বুদ্ধির জোরে রহস্যের সমাধান করেছে, অন্যদিকে ঝিনুক অপরাধীদের ধরাশায়ী করে পাঠককে মুগ্ধ করেছে। এক কথায় বলতে গেলে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারায় নানা পরতে নারীরা নিজেদের উপস্থিতিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

❖ বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের ওপর নারীবাদের প্রভাব

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঘেঁটে নানা সময়ের গবেষকরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের খোঁজ পেলেও বর্তমান মানব সমাজকে মোটামুটি পিতৃতান্ত্রিকই বলা চলে। যেহেতু সহিত্য সমাজেরই আয়না, তাই সেখানেই যে ছবি ভেসে ওঠে বলা বাহুল্য তা পিতৃতান্ত্রিক ছবি। সিমন দ্য বভেয়ার তাঁর ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’ (‘Le Deuxieme Sexe’) গ্রন্থে বলেন, দুটি বিষয় নারীদের অবস্থার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারে : উৎপাদনে অংশগ্রহণ এবং প্রজননের দাসত্ব থেকে মুক্তি। মাতৃত্ব নারীকে শরীরের মধ্যে আটকে দেয় ফলে পুরুষ নারী ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের সূত্রপাতের সময় তাঁর এই বক্তব্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ব্যাক্তিগত জীবনে তিনি এই শৃঙ্খলের হাতে বাঁধা পড়েননি। আজীবন অবিবাহিত থেকেছেন এবং মাতৃত্বের পথে পা বাড়াননি। সোজার্নার ট্রুথ, এলিজাবেথ কেডি স্ট্যানটন, বেটি ফ্রির্ডান, নাওমি উলফ প্রমুখ নারীবাদীরা যেমন বর সন্তান নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন, অন্যদিকে সুজান বি অ্যান্টনি, বেল হুক্স অবিবাহিত থেকেছেন। গ্লোরিয়া মেরি স্টেইনেম বিবাহ জীবনে আবদ্ধ হলেও সন্তান জন্ম দেওয়া থেকে বিরিত থেকেছেন।

ভারতের সমাজ জীবনে নারীবাদের তরঙ্গ অনেকটা অন্য রকম। বর্তমানে এমা ওয়াটসনের হ্যাসট্যাগ ‘হি ফর শি’ (#heforshe)-এর মতো করেই ভারত তথা বাংলার সমাজে নারী অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনের সূত্রপাত । নারীর আত্মসচেতনতার জন্য যে চেতনা প্রয়োজন, সেই চেতনার নেপথ্যে থাকা শিক্ষার অধিকারের জন্য ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লড়াই করতে দেখা যায়। কিন্তু নারীর অধিকারের জন্য লড়াইয়ের কারণে তাঁকে সমাজের বেশিরভাগ নারীর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এমনকি সতীদাহ রদ করার জন্য রামমোহন রায়কে সমকালীন সমাজের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতে হয়। কাজেই একথা সহজেই বোঝা যায় যে পাশ্চাত্য ‘ফেমিনিজম’-এর থেকে ভারতীয় নারীবাদ অনেকাংশেই অলাদা। বাংলায় উনিশ শতকের নবজাগরণের ফল স্বরূপ মেয়েদের অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষালাভ, প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার প্রবণতা এবং তার পরবর্তীতে বিবাহিত নারীর মর্যাদা, ব্যাক্তিগত ও পেশাগত জীবনের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠেছে। তবে ভারতীয় নারীবাদীরা সিমন দ্য বভেয়ারের থিয়োরিকে সর্বাংশে গ্রহণ করেনি, মাতৃত্বকে তারা বাদ দেওয়ার কথা ভাবতে পারেনি। তবে পাশ্চাত্য নারীবাদের ঢেউ যে বাংলা মানসিকতায় একেবারেই প্রভাব ফেলেনি,

একথা বলা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় নারী স্বাধীনতার চেতনা বাংলার গোয়েন্দা সাহিত্যে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সেদিকে একবার তাকানো জরুরি।

গোয়েন্দা সাহিত্যের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভাবেই পুরুষ শাসিত। গোয়েন্দা থেকে শুরু করে পুলিশ, অপরাধী সব ক্ষেত্রেই পুরুষের আধিপত্য বর্তমান। এই নিয়ে কোনও সংশয় থাকতে পারেনা যে অন্তঃপুরে বন্দী মেয়েরা যেখানে বাইরের পৃথিবীর আলো হাওয়া থেকে অনেকটা দূরবর্তী অবস্থানে রয়েছে, সেখানে অপরাধ জগতে তাদের ভূমিকা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেরকম চিত্র তৈরি করতে চাইলে বেশির ভাগ সময়ই তা বাস্তবানুগ হবে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, গোয়েন্দা সাহিত্য কতটা বাস্তবানুসারী ! আমরা যদি বাস্তবের দিকে তাকাই তাহলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ বিষয়টাই যে এক ধরনের আধুনিক রূপকথা তা বুঝে নিতে খুব বেশি সমস্যা হয়না। আসলে এক জটিল আর্থ-সামাজিক সময়ে মানুষ যখন পুলিশি ব্যাবস্থার উপর আস্থা হারাচ্ছিল, তখন কাল্পনিক প্রাইভেট ডিটেকটিভদের কাহিনির মধ্যে তারা আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করছিল। সেই সময় থেকে সাহিত্যের এই ধারাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আমরা আরকুল পয়রো, শার্লক হোমস, মিস মারপেল, ব্যোমকেশ, ফেলুদা , মিতিন মাসি, দময়ন্তী --- এদের নাম জানি। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা এমন কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভের নাম জানিনা। সুতরাং, বলাই যায় গোয়েন্দা সাহিত্য আসলে আধুনিক সমাজের রূপকথা। আর রূপকথার মধ্যে বাস্তবতা খুঁজতে যাওয়া আসলে ছেলেমানুষী।

১৮৯৯ সালের 'কুন্তলীন' পুরস্কারের তালিকা দেখে জানা যায় সরলাবালা সরকার 'ঘড়ি চুরি' নামে একটি গোয়েন্দা গল্প রচনা করেছিলেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল তাঁর ডিটেকটিভ ছিল এক পুরুষ চরিত্র। যে সময়ে সমাজের বেশির ভাগ মেয়ে শিক্ষার আলোয় এসে দাঁড়াতে পারেনি, সেখানে লেখালেখির জগতে শিক্ষিত মেয়ের পদার্পণ সম্ভব হলেও গোয়েন্দা হিসেবে এক নারী চরিত্রের নির্মাণ সম্ভব নয়। গোয়েন্দার ভূমিকায় নারীকে উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা গেল প্রভাবতী দেবীর রচনায়। ১৯৫২ সালে তিনি কৃষ্ণা চরিত্রটি নির্মাণ করলেন, পরবর্তী সময়ে যা হয়ে উঠল বাংলার প্রথম মেয়ে গোয়েন্দা। প্রভাবতী দেবী তৎকালীন শিক্ষিত আধুনিক নারীর আদর্শ ছবি সবার সামনে তুলে ধরার জন্য এই চরিত্রটি নির্মাণ করলেন। এই চরিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় এই চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ফেমিনিজমের দ্বিতীয় তরঙ্গের খানিকটা প্রভাব রয়েছে। 'কৃষ্ণার পরিচয়' কাহিনিতে দেখা যায় কৃষ্ণার পরিচয় দিতে গিয়ে তার মাসতুতু দিদি শুভ্রা জানাচ্ছে ---- "এই কৃষ্ণা... জানেন, কৃষ্ণা কি বলে ? ও বলে বিয়ে করবে না ... শয়তানির বুহ্য ভেদ করে শয়তানদের

ও বার করবে ! ও করবে দুঃশাসনদের মুখোস খুলে তাদের স্বরূপ জানিয়ে তাদের খর্ব্ব করে, সমাজের কল্যাণ ! সে কাজ হবে কৃষ্ণার অভিযান”[৮]

আমরা খুব সহজেই সিমনের মাতৃত্বের শৃঙ্খল ধারনার সঙ্গে এই বিষয়টা মেলাতে পারি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এখানে মাতৃত্বের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। কিন্তু ভারতীয় ভাবধারায় বিয়ে আসলে সন্তান উৎপাদনেরই পূর্ববর্তী প্রস্তুতি। বিবাহিত জীবন কাটানোর পরও সন্তান উৎপাদন করা বা না করা একটি দম্পতির নিজস্ব নির্বাচন ---- এই চেতনা বর্তমান সময়ের মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। কোনও বিবাহিত দম্পতি সন্তান উৎপাদন না করতে চাওয়ার সিদ্ধান্ত জানালে সমাজ সেটাকে সহজ ভাবে নিতে পারেনা। সর্বোপরি, অধিকাংশ বিবাহিত নারীকে বলতে শোনা যায় – “বাচ্চা যখন নিতেই হবে ...” অর্থাৎ, সমাজের চাপিয়ে দেওয়া পোশাক, রীতি রেওয়াজ অনেক কিছুকেই সহজে বর্জন করে ফেলতে পারলেও ; বিবাহিত নারীর নিঃসন্তান থাকার সিদ্ধান্তকে সমাজ এখনও মেনে নিতে পারেনি। বলা বাহুল্য সাত দশক আগে সেই ভাবনার অবকাশই ছিল না। তাই গোয়েন্দা হয়ে উঠতে চাওয়া স্বাধীনচেতা কৃষ্ণা বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

বিশ শতকের শেষাংশের দিকে আমরা দেখতে পাই নাগরিক মধ্যবিত্ত পরিবারে নারী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে বেশ খানিকটা সাম্য এসেছে। শুধুমাত্র বিয়ের কারণে এক নারী নিজের জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে গৃহবধূর ভূমিকায় জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে না, অন্তঃপুরের গণ্ডি পেরিয়ে নারীরা বিভিন্ন পেশায় সফল ভাবে নিজেকে উচ্চকিত করতে সক্ষম হচ্ছে। এর প্রভাব বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যেও দেখা গেল। এতদিন মেয়ে গোয়েন্দা নির্মাণের ক্ষেত্রে রচয়িতারা কলেজ পড়ুয়া বা স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের চরিত্র তৈরি করছিলেন, এবার সেখানে এলো বিবাহিত মেয়ে গোয়েন্দা। সাতের দশকে লেখক মনোজ সেন নির্মাণ করলেন রহস্যসন্ধানী দময়ন্তীকে। দময়ন্তী বিবাহিত নারী হলেও ‘বুক ফার্ম’ থেকে প্রকাশিত রহসন্ধানী দময়ন্তীর দুটি খণ্ডের মধ্যে দময়ন্তীকে মা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় না। গার্গীর উপন্যাসগুলিতে তার কলেজ জীবন থেকে শুরু করে তার ‘প্যারাডাইস প্রডাক্ট’-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে ওঠা এবং পরবর্তী সময়ে লুনার মা হয়ে ওঠার ছবি পাওয়া যায়। প্রজ্ঞাপারমিতার ক্ষেত্রে কয়েকটি কাহিনিতে তাকে মা হিসেবে দেখা না গেলেও তার কিশোর কাহিনির প্রতিটাতেই মিতিন মাসি বুমবুমের মা হিসেবে উপস্থাপিত।

আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘সুবর্ণলতা’ এবং ‘বকুল কথা’ ত্রয়ী উপন্যাসের শেষাংশেও দেখা যায় লেখিকা বকুল নিজের জীবনকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেনি। কিন্তু

বিবাহিত নারীর জয়যাত্রার চিত্র দেখানোর জন্য মনোজ সেন, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য বেছে নিলেন বিবাহিত গোয়েন্দাকে।

মল্লিকা সেনগুপ্তের 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ' গ্রন্থে দেখা যায় তিনি নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

> পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সন্তান পালনের ক্ষেত্রে মেয়েলি ও পুরুষালি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু অযথা প্রথাবদ্ধ ধারনা তৈরি হয় লিঙ্গবৈষম্যের ভিত্তিতে। মার্কিন ও ভারতীয় সমাজের সমীক্ষা অনুসারে দেখা গেছে মেয়েলিপনা ও পুরুষালীপনার ধারনাগুলি অনেকাংশে এক :

পুরুষালী বৈশিষ্ট্য	মেয়েলি বৈশিষ্ট্য
১। নেতৃত্বের গুণ সম্পন্ন	১। স্নেহশীলা
২। আগ্রাসী	২। ছেলেমানুষ
৩। উচ্চাকাঙ্ক্ষী	৩। সান্ত্বনাদাত্রী
৪। খেলাধুলায় পটু	৪। মেয়েলি
৫। প্রতিযোগিতামূলক	৫। স্তুতিপ্রিয়
৬। প্রভাববিস্তারকারী	৬। অন্যের প্রয়োজনের প্রতি সতর্ক
৭। শক্তিমান	৭। লজ্জাশীলা
৮। স্বনির্ভর	৮। মৃদুভাষিণী
৯। পৌরুষদীপ্ত	৯। কোমল
১০। কোঠর ব্যাক্তিত্বময়	১০। উষ্ণ
১১। ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা সম্পন্ন	১১। সহজে প্রভাবিত

> ডঃ বুলা ভদ্র এই মনগড়া ও সমাজ নির্মিত লিঙ্গভেদ আরও স্পষ্টভাবে প্রয়োগ করেছেন ভারতীয় নারীত্বের উপর নানা প্রাদেশিক সমীক্ষার ফলাফলের আলোচনায় :

ভারতীয় পৌরুষ/ ভারতীয় নারীত্ব

১। আক্রমনাত্বক ও আগ্রাসী/একেবারেই আক্রমণাত্মক নয়

২। স্বাধীনচেতা / আদৌ স্বাধীনচেতা নয়

৩। বস্তুনিষ্ঠ/ বস্তুনিষ্ঠ নয়

৪। একবারেই আবেগ প্রবণ নয়/ খুব আবেগপ্রবণ

৫। সহজে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় না / সহজে প্রভাবিত হয়

৬। কর্তৃত্বপূর্ণ/ বাধ্য ও বশ্য

৭। আত্মবিশ্বাসী/ একেবারেই আত্মবিশ্বাসী নয়

৮। কখনও কাঁদে না/ খুব অল্পেই কাঁদে

৯। নরম অনুভূতি প্রকাশে অক্ষম/ সহজেই নরম অনুভূতি প্রকাশ করে

১০। কড়া কথা বলে / কড়া কথা বলেনা

১১। কম কথা বলে / বেশি কথা বলে

১২। যুক্তিনিষ্ঠ / অযৌক্তিক

১৩। প্রতিযোগিতা পছন্দ করে / প্রতিযোগিতা পছন্দ করে না

১৪। উচ্চাকাঙ্ক্ষী / উচ্চাশা নেই

১৫। সব কিছুতেই সক্রিয় / কোনও কিছুতেই সক্রিয় নয়

১৬। এলোমেলো ও আগোছালো / পরিস্কার ও গোছালো

১৭। নিজের চেহারা সম্বন্ধে সচেতন নয় / খুব সচেতন

১৮। অঙ্ক ও বিজ্ঞান পছন্দ কিন্তু কলা ও সাহিত্য পছন্দ নয় / কলা ও সাহিত্য পছন্দ কিন্তু অঙ্ক ও বিজ্ঞান পছন্দ নয়

১৯। ভোগী, কলঙ্ক স্পর্শ করেনা / সতীত্ব, পবিত্রতা ও ত্যাগ অপরিহার্য মতাদর্শ।[৯]

এই যে বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্য দিয়ে নারী এবং পুরুষের চরিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে, তার মধ্যে থেকে কিছু বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকালে দেখা যায় পুরুষের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নারীর

বৈশিষ্ট্যের সরাসরি কোনও বিরোধ নেই। যেমন নেতৃত্ব গুণ সম্পন্ন হলেই যে স্নেহশীল হওয়া যাবেনা কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলে যে কাউকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবেনা এমন নয়। প্রথম তালিকার দিক থেকে নজর সরিয়ে দ্বিতীয় তালিকার দিকে তাকালে দেখা যায় এখানে তুলনা নয়, একেবারে সরাসরি পার্থক্যের কথা বলা রয়েছে। এই যে পার্থক্যের তালিকা রয়েছে, মেয়ে গোয়েন্দাদের কাহিনিতে এই পার্থক্যের তালিকা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে ।

কৃষ্ণা চরিত্রটির মধ্যে আক্রমনাত্বক ও আগ্রাসী, স্বাধীনচেতা,সহজে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, কর্তৃত্বপূর্ণ, আত্মবিশ্বাসী, যুক্তিনিষ্ঠ, প্রতিযোগিতা পছন্দ করে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সব কিছুতেই সক্রিয় ---- তথাকথিত পুরুষের এই বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থিত। উল্টোদিকে মেয়েদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকা সহজে প্রভাবিত হয়, বাধ্য ও বশ্য, খুব অল্পেই কাঁদে, সহজেই নরম অনুভূতি প্রকাশ করে ---- এমন বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে একেবারেই নেই। বাবা খুন হওয়ার পর কৃষ্ণা সিদ্ধান্ত নেয় যে সে তার বাবা-মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নেবে, এখানে তার আক্রমণাত্মক , আত্মবিশ্বাসী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মামা প্রনবেশ তাকে বিভিন্ন ঝুঁকি নেওয়ার আগে বারবার বারণ করলেও তার অপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এমনকি পুলিশ অফিসার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীও তার রহস্যের কিনারা করার ধরণের ওপর চেষ্টা করেও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অন্যদিকে ‘গ্রহের ফের’ কাহিনিতে দেখা যায় কিশোর দেবু কৃষ্ণার প্রতি শুধু মুগ্ধই নয়, তার দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছে :

> দেবু পিতামাতার নিকট গল্প শুনেছে কৃষ্ণা খুব ভালো মোটর চালাতে জানে, পাকা ঘোড় সওয়ারও তার কাছে পরাজিত হয়, রিভলভার ছুঁড়তে সে সিদ্ধহস্ত। মেয়ে হলেও সে পুরুষের মতো আসীম শক্তি ও সাহসের অধিকারিণী, ---- ইত্যাদি ইত্যাদি শুনে বালক দেবু এই মেয়েটিকে সত্যিই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, কৃষ্ণার যে কোনো কাজ সে সম্ভ্রমের চোখে দেখে।[১০]

তবে কৃষ্ণার কাহিনিতে লেখিকা বারবার দেখানোর চেষ্টা করেছেন কৃষ্ণা ছেলেদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। লেখিকা বারবার পাঠককে এই কথা মনে করিয়ে দিতে চান --- “মেয়ে হয়ে সে যতখানি শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে, বাংলার কয়জন ছেলে তা পারে ?”[১১]

এই প্রসঙ্গে মনে হয়, তাহলে কি নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইলে পুরুষের মতো হয়ে ওঠা খুব জরুরি ? কিন্তু পাশাপাশি তথাকথিত কোনও পুরুষালী গুণের প্রয়োগ না করেও কৃষ্ণাকে নিজের কার্যসিদ্ধি করতে দেখা যায়। কৃষ্ণা অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধীদের জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে --- তার প্রতি দুর্বল, এমন মানুষদের সঙ্গে ছলনা করে নিজেকে এবং অন্যদেরকেও মুক্ত করার চেষ্টা করেছে। যেমন, 'কারাগারে কৃষ্ণা'য় মিংলোকে দেখে কৃষ্ণা বুঝতে পারে তার প্রতি সে দুর্বল। কৃষ্ণা এই দুর্বলতাকে কাজে লাগায়। সে নিজেই মিংলোকে প্রেম নিবেদন করে, তাকে জানায় সে তার সঙ্গে তার দেশে গিয়ে সংসার পাততে চায়। বলা বাহুল্য মিংলো তার ফাঁদে পা দেয়। মিংলো তাকে বন্দী ঘেরাটোপ থেকে বের করে। 'মায়াবী ও কৃষ্ণা'তেও কৃষ্ণা নারায়ণ দাসকে জানায় যে সে প্রথম থেকেই বুঝেছিল নারায়ণ তার প্রতি আসক্ত, এবং সেও নারায়ণ দাসকে পছন্দ করে। এভাবে অপরাধী দলের বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে ছলনা করে কৃষ্ণা প্রতিকূল পরিস্থিতির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। 'কারাগারে কৃষ্ণা'য় অপরাধী আ-চিনের সঙ্গেও সে প্রেমের অভিনয় করতে পিছপা হয়নি। এগুলি একেবারেই পৌরুষপূর্ণ আচরণ নয়, ওই পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নেওয়া যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত।

মেয়ে গোয়েন্দাদের প্রথম পর্যায় থেকে সরাসরি বিশ শতকের সাতের দশক, নয়ের দশক এবং একুশ শতকে নির্মিত বিবাহিত গোয়েন্দাদের দিকে তাকালে মনে হয় লেখকরা মেয়ে গোয়েন্দাদের ওপর তথাকথিত পৌরুষ আরোপ করতে চাননি। দময়ন্তীর নারী হয়ে গোয়েন্দাগিরি করা নিয়ে অনেকে অনেক সময় মন্তব্য করেছে, তার কলেজের সহপাঠী জয়ন্ত তাকে জিজ্ঞেস করেছে কলেজের অধ্যাপনা বাদ দিয়ে সে কেন বৃথা গোয়ন্দাগিরি করছে, গোয়েন্দাগিরি মেয়েদের কাজ নয়। কিন্তু এই ধরনের কথায় দময়ন্তীকে খুব একটা রাগতে দেখা যায় না। দময়ন্তীর কাহিনিতে অপরাধীর পিছনে ধাওয়া করা কিংবা মারামারি বা গুলি চালানোর প্রসঙ্গও পাওয়া যায় না । নিজের গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে দময়ন্তীর মন্তব্য : "কোনও ঘটনার পিছনের পারম্পর্য এবং তার কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করে তার বিশ্লেষণই যেমন ঐতিহাসিকের কর্তব্য, আমারও তাই।"[১২]

গার্গীর ক্ষেত্রে দেখা যায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায় গার্গীকে সবকিছুতে পারদর্শী হিসেবে নির্মাণ না করে সাধারণ পরিবারের সাধারণ মেয়ে হিসেবে তুলে ধরতে চান। গার্গী কৃষ্ণার মতো রূপসী কিংবা গাড়ি চালানো, রিভলবার চালানোতে পারদর্শী নয়। সে পড়াশুনোয় ভালো, ভালো বক্তৃতা দিতে পারে, কাগজে লেখালেখি করে, এক কথায় শিক্ষিত বুদ্ধিমতি মেয়ে। তথাকথিত নারী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে : নিজের চেহারা সম্বন্ধে সচেতন, কলা ও সাহিত্য

পছন্দ কিন্তু অঙ্ক ও বিজ্ঞান পছন্দ নয়, স্বাধীনচেতা নয়, সহজে প্রভাবিত হয়, আত্মবিশ্বাসী নয়, যুক্তিনিষ্ঠ নয় --- এসব বৈশিষ্ট্যকে গার্গী অনায়াসে গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছে। সে অঙ্ক নিয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনো করেছে। এমনকি অপরাধীকে বাগে আনার জন্য নিজের বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানকে সরাসরি কাজে লাগিয়েছে। 'সোনালী সুতোর ফাঁস' উপন্যাসে গার্গী আশ্রমের স্বামীজির কাছে দীক্ষা নিতে যাওয়ার অভিনয় করে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাবস্থা করে।

> উনি ঘরের মধ্যে আমাকে একা পেয়ে বিভ্রান্ত করতে চাইলেন তাঁর ম্যাজিক দেখিয়ে। সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ব্রোমাইড ক্লোরাইড মিশিয়ে বোরিয়াম সালফেটের প্রেসিপিপেট দেখিয়ে দুধ তৈরি করেছেন বললেন। ...... আমিও ফেরিক ক্লোরাইড সলিউশনের সঙ্গে পটাশিয়াম থায়োসাইনিন মিশিয়ে লাল টকটকে ডালিমের তৈরি করে ওঁকে ফ্ল্যাট করে দি। এ ম্যাজিকটা বোধয় উনি জানতেন না। তার ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই ওঁকে কাগজের ফুলে ক্লোরোফর্ম মাখিয়ে শুঁকতে দি। বলি উনি শুঁকলেই কাগজের ফুল হয়ে উঠবে সত্যিকারের ফুল,[১৩]

মিতিন মাসির কাহিনির ক্ষেত্রে লেখিকা খানিকটা মধ্যপন্থা নির্বাচন করেছেন। তিনি একদিকে পুরুষত্রান্ত্রিক মানসিকতার সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে নিপুণ গৃহিণীর জয়যাত্রার কাহিনি বয়ন করেছেন। 'থার্ড আই' গোয়েন্দা সংস্থার মালকিন একদিকে ভালো রান্না করে সবাইকে খাওয়ায়, ছেলেকে শাসন করে, তদন্তে বেরিয়ে বাড়ির পরিচারিকা আরতিকে ফোন করে ছেলে বুমবুমের খবর নেয়, অন্যদিকে পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবে কাজও করে। পেশাদার গোয়েন্দা হওয়ার জন্য তাকে অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে যোগ্য জবাব দিতে পিছপা হয় না। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরোধিতার পাশাপাশি মিতিন নিয়ম করে শরীর চর্চা করে, রিভলভার চালানোর পাশাপাশি সে মার্শাল আর্ট জানে। অপরাধীকে শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়, তাকে মেরে ক্যাৎ করার ক্ষমতাও মিতিনের রয়েছে ।

> কাঁধের ওড়না ফেলে দিয়ে ভল্ট খেয়ে দাঁড়াল মিতিন মাসি। বিদ্যুতবেগে সরে গেল খানিকটা। তারপর বিকট চিৎকার হেনে এক লাফ এবং লোকটার বুকে সপাটে জোড়া পায়ে লাথি। কী সাংঘাতিক জোর ওই পদাঘাতের, বাপস! কাটা কলাগাছের মতো লোকটা ধরাশায়ী ! ত্বরিত গতিতে লোকটার বুকে হাঁটু চেপে মিতিনের রিভলভার এবার লোকটার রগে, "কী, ট্রিগার টিপব ?"[১৪]

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, মনোজ সেন, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকরা প্রচলিত ধ্যান ধারনাকে ভাঙ্গার জন্যই কৃষ্ণা চৌধুরী, দময়ন্তী দত্তগুপ্ত, গার্গী চৌধুরী, প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি চরিত্রগুলিকে নির্মাণ করেছেন। অনেক সময়ই লিঙ্গ রাজনীতির প্রচলিত ধারনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য তাঁদের লেখায় এক উল্টো রাজনীতির চিত্র ধরা পড়েছে। যে কারণে, প্রভাবতী দেবী ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে প্রথমে যোগ্য পুলিশ অফিসার হিসেবে দেখালেও, পরবর্তী কাহিনিগুলিতে তাঁকে বোকা পুলিশ বানিয়ে তুলেছেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্যও অনিশ্চয় মজুমদারের বুদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন করার অবকাশ তৈরি করে দিয়েছেন। তবে গোয়েন্দা কাহিনিতে বোকা পুলিশের উপস্থিতি প্রায় সব গোয়েন্দাদের কাহিনিতেই দেখা যায়। এঁদের ক্ষেত্রে পার্থক্য হল এদের উপস্থিতির পরিমাণ অনেকটা বেশি। পড়ার সময় পাঠকের মনে হতে পারে তাদের বুদ্ধির ঘট ফাঁকা দেখানোর জন্যই যেন তাদের উপস্থিতির সময় বাড়ানো হয়েছে। তবে একথা সত্যি যে গোয়েন্দা সাহিত্যের নারীরা কতটা বাস্তবানুগ এই প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলে দেখা যায় এই চরিত্ররা পাঠকের মনে জমাট বেঁধে থাকা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার ওপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। এমনটা সত্যি হয় কিনা, এই প্রশ্নকে ছাপিয়ে গেছে এমনটাও হতে পারে, এই ভাবনা।

নির্দেশিকা

১। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার গোয়েন্দা কাহিনি লেখার পশ্চাদপট', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪২৯, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ২৬০

২। হীরেন চট্টোপাধ্যায়, 'গোয়েন্দা গল্পের অল্পবিস্তর', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪২৯, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ২৪

৩। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সম্পাদকীয়, বিভাব, শার্লক হোমসের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা; সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১০

৪। নির্মাল্য কুমার ঘোষ, 'গয়েন্দানীর সাতকাহন', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪২৯, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৬৯

৫। তদেব, পৃ. ৬৯

৬। তদেব, পৃ. ৬৯

৭। তদেব, পৃ. ৭০

৮। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'কৃষ্ণার পরিচয়', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ৪০৬

৯। মল্লিকা সেনগুপ্ত, স্ত্রী লিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৪ , পৃ. ৫৩-৫৪

১০। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'গ্রহের ফের', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১০২

১১। তদেব, পৃ. ১০৭

১২। মনোজ সেন, 'নকল হিরে', রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র ১, বুক ফার্ম, কলকাতা, ২০১৯ পৃ. ৬৬

১৩। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সোনালি সুতোর ফাঁস', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র, দে'জ, কলকাতা, ২০১২ পৃ. ৩৫৩-৩৫৪

১৪। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সর্প রহস্য সুন্দরবনে, কলকাতা, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ১০৪-১০৫

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দা সিরিজের সূত্রপাত

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কৃষ্ণা ও কুমারিকা সিরিজ

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৫মার্চ চব্বিশ পরগণার গোবরডাঙ্গার খাঁটুরা গ্রামে প্রভাবতী দেবীর জন্ম। বাবা গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় ছিলেন আইন ব্যাবসায়ী। তৎকালীন সমাজের দাবী মেটাতে গিয়ে ৯বছর বয়সে গৈগুর গ্রামের বিভূতি ভূষণ চৌধুরীর সঙ্গে প্রভাবতীর বিয়ে দেন। কিন্তু এক সপ্তাহ পর বিবাহিত জীবনে ইতি টেনে প্রভাবতী চলে আসেন মা সুশীলাবালা দেবীর কাছে, এবং এরপর শ্বশুরবাড়িতে আর ফিরে যাননি।

প্রভাবতীর বাবা পেশার খাতিরে সপরিবারে দিনাজপুরে চলে যান। সেখানে পড়াশুনোর জন্য স্কুলে ভর্তি হয়ে শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছেও পরীক্ষা দিতে পারেননি প্রভাবতী। পাঁচ বোন এক ভাইয়ের সংসারে বলাবাহুল্য ভাই সত্যসাধনের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। তাকে কলেজে ভর্তি করার জন্য সুশীলাবালা দেবী ছয় সন্তানকে নিয়ে বহরমপুরে চলে আসেন। পড়াশুনোর প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল প্রভাবতীর, পাশাপাশি শিশুকাল থেকেই লেখালেখিতেও খুব আগ্রহ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে লেখা তাঁর প্রথম কবিতা 'গুরুবন্দনা', ১১বছর বয়সে 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । এরপর 'অর্চনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'টমি' গল্প। বহরমপুর থেকে চলে যান আসামের লামডিং শহরে, রচনা করেন প্রথম উপন্যাস 'প্রতীক্ষায়'। এই সময়ে বহরমপুরে বাবা গপালচন্দ্রের মৃত্যুর ফলে প্রভাবতীর জীবনে অনিশ্চয়তা নেমে আসে। কিন্তু লেখালেখিতে তিনি ছেদ পড়তে দেননি। ১৯২৪ সালে (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস 'বিজিতা'।

নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ১৯২৯ সালে ব্রাহ্ম গার্লস ট্রেনিং কলেজ থেকে টিচার্স ট্রেনিং নিয়ে ওই স্কুলেই শিক্ষকতায় যোগ দেন। এখানেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী রমা দেবীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। রমা দেবীর উৎসাহতেই বাগবাজারে সাবিত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলেও শিক্ষকতা করেন তিনি। পাশাপাশি নিজের গ্রাম খাঁটুরার বঙ্গ বালিকা বিদ্যালয়কে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির শাখা কেন্দ্রে সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের সময়ে বোন হরিদাশীর

সঙ্গে কৃষক সভার ত্রাণের কাজও করেছেন। অন্যদিকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথ ভাবে জামশেদপুর নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালকও ছিলেন তিনি। সাহিত্য রচনা এবং সাহিত্যিক জগতে সাবলীল গমনের জন্য পাঠক সমাজের পাশাপাশি সমকালীন সাহিত্যিক সমাজেও তিনি আদরনীয় ছিলেন। শোনা যায় ('মাটির দেবতা' উপন্যাসটি) রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও তিনি সাহিত্য রচনার উৎসাহ পান। নবদ্বীপের বিদ্বজ্জন সভা তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধি দেয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে তিনি 'লীলা পুরস্কার' পান।

আবাহন দত্তের আনন্দবাজারের লেখা থেকে জানা যায় সমকালীন সময়ে প্রভাবতী দেবীর লেখার জনপ্রিয়তা এতোটাই বেশি ছিল যে একটি উপন্যাস শেষ হলে তাঁর আরেকটি উপন্যাসের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতেন প্রকাশক। এছাড়া বিয়েতে উপহার দেওয়ার সামগ্রী হিসেবে তাঁর বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত বলে জানা যায়। সমকালে তিনি খ্যাতনামা লেখকের আসনে আসীন ছিলেন। সেই সময়ে প্রভাবতী দেবী নামে আরও অন্য কোনও একজন, বা একাধিক সাহিত্যিকের আগমন ঘটে। এই প্রসঙ্গে প্রভাবতী দেবী বলেন --

> "ইদানিংকালে বাজারে আমার নাম নকল করিয়া বহু উপন্যাস ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমাকে জানাইতেছেন। পাঠক-পাঠিকা, প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষকগণের অবগতির জন্য তাঁহাদের আমি জানাইতেছি, আমার লিখিত উপনন্যাস ও অন্যান্য রচনাদিতে আমার নাম সহি করা থাকবে। যাহাতে তাঁহারা সতর্ক হইতে পারিবেন"[১]

এই নামের বিভ্রাট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধে তিনি নামের সঙ্গে 'সরস্বতী' উপাধিটি যোগ করে নেন। এবং জীবনের শেষ লেখা পর্যন্ত তিনি প্রভাবতী দেবী সরস্বতী নামেই লেখালেখি করে যান। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে গলব্লাডারের অসুখের কারণে তিনি মারা যান।

'বিজিতা' উপন্যাস জনপ্রিয় হওয়ার পর একের পর এক তাঁর উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে --- 'ব্রতচারিণী', 'দানের মর্যাদা', 'ঘরের লক্ষ্মী', 'সোনার প্রতিমা', 'সহধর্মিণী', 'প্রিয়ার রূপ', 'পথের শেষে' প্রভৃতি। প্রভূত জনপ্রিয়তার কারণে তাঁর রচনার চলচ্চিত্রায়ণও হয়। 'বিজিতা' উপন্যাসটি বাংলায় 'ভাঙাগড়া', হিন্দিতে 'ভাবী', মালায়লমে 'কুল দেবম' নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়। বিশ্বরূপ থিয়েটার 'পথের শেষে'র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে সাফল্য

পায়। তবে তাঁর এই সাফল্যকে অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগীরা খুব একটা ভালোভাবে নেননি। সুকুমার সেনের মতো সমালোচকরা তাঁর বিপুল সাহিত্য সম্ভার সৃষ্টিকে বাঁকা নজরেই দেখেছেন। বেশিরভাগ সমালোচকের মতে তাঁর সব লেখাই গতানুগতিক। নারীজীবনের চিত্রকে তিনি তুলে ধরেছেন ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মানসিকতার জয়গানই স্থাপন করেছেন। ব্যাক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে তিনি যেমন প্রচলিত ছক ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তেমনটা তিনি করতে পারেননি। সমকালীন সময়ে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ এবং পরবর্তী সময়ে একেবারেই বিস্মৃত হওয়ার নেপথ্যে প্রধান কারণ সম্ভবত সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সমকালকে তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছেন। তাঁর এই তথাকথিত 'গতানুগতক সাহিত্য' কর্মের জগতে একেবারেই দমকা হাওয়ার মতো রয়েছে তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিগুলি। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মেয়ে গোয়েন্দা সিরিজের আবির্ভাব ঘটে প্রভাবতী দেবীর হাত ধরেই। প্রথমে 'কৃষ্ণা সিরিজ'-এর গোয়েন্দা কৃষ্ণা এবং তারপর 'কুমারিকা সিরিজ'-এর শিখা একেবারের সমকালীন ছক ভাঙা নারী চরিত্র। বিশ শতকের পাঠকের কাছে তিনি আবার ফিরে আসেন গোয়েন্দা কৃষ্ণার হাত ধরে। ২০২০ সালে 'দেব সাহিত্য কুটীর' থেকে প্রকাশিত হয় 'গোয়েন্দা কৃষ্ণা'।

❖ কৃষ্ণার গোয়েন্দা হয়ে ওঠা :

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ'-এ প্রকাশিত হয় প্রভাবতী দেবীর লেখা 'গুপ্ত ঘাতক'। এখানে দেখা যায় মিঃ সত্যেন্দ্র চৌধুরী মেয়ে কৃষ্ণাকে নিয়ে বর্মা থেকে কলকাতায় চলে আসছেন। সত্যেন্দ্র চৌধুরীর বাবা কলকাতার ভাবানীপুরে একটি বাড়ি বানিয়েছিলেন। ভাবানীপুরেই জন্ম সত্যেন্দ্র চৌধুরীর। বাবা বেশ খ্যাতনামা পুলিশ অফিসার ছিলেন, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সত্যেন্দ্রও পুলিশে যোগ দেন এবং বর্মায় চলে যান। তাঁর বর্মা যাওয়াতে সাহায্য করেছিলেন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ আর্থার মুর। বর্মা যাওয়ার আগেই তাঁর বিয়ে হয়। 'গুপ্ত ঘাতক'-এর কাহিনি যে সময় থেকে শুরু হচ্ছে তার কুড়ি বছর আগে সত্যেন্দ্র চৌধুরী কৃষ্ণার মাকে নিয়ে বর্মায় চলে যান। কৃষ্ণার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সবই বর্মাতে। ১৯৩৪ বা ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণার জন্ম বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, কারণ, কাহিনির শুরুর সময় কৃষ্ণার বয়স ষোল-সতের বছর। এই সময়ে মিঃ চৌধুরী স্বেচ্ছাবসর নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কুখ্যাত বর্মিজ-দস্যু ইউ-উইনের দলের সঙ্গে

সত্যেন্দ্র চৌধুরীর সংঘাত অনেক দিনের। কিন্তু শত্রুতা চরম পর্যায়ে পৌঁছয় যখন তিনি ভামোর জঙ্গলে তার দলকে বিপর্যস্ত করে উদ্ধার করা বুদ্ধ-মূর্তি ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দেন। ইউ-উইন চিঠি দিয়ে তাঁকে হুমকি দেন যে পবিত্র বুদ্ধ-মূর্তি অপবিত্র করার অপরাধে সে মিঃ চৌধুরীকে উচিত শাস্তি দেবে, তাকে দগ্ধে দগ্ধে মারবে --- এক মাসের মধ্যে তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করবে এবং ছ'মাসের মধ্যে তাঁর একমাত্র সন্তান কৃষ্ণাকে হত্যা করবে। পুলিশ পাহারা দিয়ে বাড়ি ঘিরে রেখেও স্ত্রীকে বাঁচাতে পারেন নি মিঃ চৌধুরী। বর্মা ছাড়ার বন্দোবস্ত করতে করতে হুমকি চিঠি পাওয়ার পর প্রায় তিন মাস কেটে যায়। মূলত কৃষ্ণার প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিঃ চৌধুরী বেনামে জাহাজে করে বর্মা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। আসার সময় কলকাতা মিউজিয়ামে দেওয়ার জন্য তিনি বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে প্রাপ্ত বুদ্ধদেবের একজোড়া খড়ম নিয়ে আসছিলেন। জাহাজেই তা চুরি হয়ে যায়।

কলকাতায় পৌছনোর পর মিঃ চৌধুরী বুঝতে পারেন বেনামে জাহাজে করে এলেও ইউ-উইনকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেননি। সেও তাঁর পিছু পিছু কলকাতায় চলে এসেছে। একদিন ইউ-উইনের কাছ থেকে হুমকি চিঠি আসে, সেখানে ইউ-উইন জানায় শুধুমাত্র বুদ্ধদেবের খড়ম নয়, তার সঙ্গে মিঃ চৌধুরী একটি নক্সা ও তার প্রতিলিপি এনেছেন। তাকে সেই নক্সা, প্রতিলিপি এবং কুড়ি হাজার টাকা দিলে সে কৃষ্ণাকে হত্যা করবেনা। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের ব্যোমকেশ বাবু তাঁদেরকে এই আতঙ্ক থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্র চৌধুরীকে তিনি বাঁচাতে পারেন না। মৃত্যুর আগে মিঃ চৌধুরী কৃষ্ণাকে জানিয়ে গেছিলেন এই নক্সা ও প্রতিলিপি হল বর্মার রাজ পরিবারের গুপ্ত ধনসম্পত্তি পর্যন্ত পৌঁছনোর নক্সা। এই নক্সা নিয়ে ইয়াং চাং এবং তাঁর সম্পর্কীয় ভাইপো ইউ-উইনের অনেক দিনের বিবাদ। এই নক্সা ছিল ইয়াং চাংয়ের এক বিশ্বস্ত অনুচরের কাছে। ইউ-উইন তার স্ত্রী-পুত্র সবাইকে হত্যা করে, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েও এর কোনও হদিস পায়নি। এই নক্সা সেই বৃদ্ধ অনুচরের পোড়ো বাড়ির এক জায়গায় প্রায় পাঁচ হাত মাটির তলায় একটা মাটির কলসির মধ্যে হাতির দাঁতের বাক্সের মধ্যে রাখা ছিল। বৃদ্ধকে উদ্ধার করার সময় মিঃ চৌধুরী এই নক্সার হদিস পান। সেই বৃদ্ধ তাঁকে দিয়ে শপথ করিয়ে নেন – যেন তিনি এই নক্সা ইয়াং চাংয়ের হাতে তুলে দেন।

মিঃ চৌধুরীর বাবা যখন ভাবানীপুরের বাড়ি বানিয়েছিলেন, তখন রমাকান্ত মিস্ত্রীকে দিয়ে তিনি একটি ঘরের দেওয়ালে একটি চোরা কুঠুরি বানিয়েছিলেন। সেই মিস্ত্রী বেঁচে নেই। ফলত সেই গোপন কুঠরির খোঁজ তিনি ছাড়া আর কেউই জানেনা। কৃষ্ণাকে তিনি

এর হদিস জানিয়ে যান। আরও বলেন এই নক্সা পেলে ইয়াং চাং পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়েছে।

হুমকি চিঠি অনুযায়ী যে রাতে নক্সা ও টাকা বাড়ির শিউলি গাছের কাছে রেখে আসার কথা ছিল, সেই রাতেই ইউ-উইন মিঃ চৌধুরীর বাড়িতে হামলা করে মিঃ চৌধুরীকে হত্যা করে। ছ'মাস সময়ের মধ্যে কৃষ্ণা তার মা এবং বাবা দুজনকেই হারায়। মায়ের গলায় যেমন সূচাকৃতি ফলা বিদ্ধ হয়েছিল, বাবার ক্ষেত্রেই সেই একই রকম বিষ প্রয়োগের চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু তদন্তে থাকা ব্যোমকেশ বাবু তাদের বাড়ির জবাব দেওয়া দারোয়ান হুজুরিমলকে গ্রেফতার করেন। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কৃষ্ণা নিজে তদন্তে নামে। প্রণবেশকে ইয়াং চাংয়ের খোঁজ নিতে পাঠায়, আর নিজে ইউরপিয়ান মেয়ে সেজে কলকাতার বিভিন্ন এলিট হোটেলে ইউ-উইনের খোঁজ করতে যায়। আন্যদিকে প্রণবেশ অপহৃত হয়। কৃষ্ণার কাছে প্রণবেশের নামে চিঠি আসে, বিশেষ দরকারে ইয়াং চাংয়ের সঙ্গে তিনি বর্মায় যাচ্ছেন। সন্ধ্যায় একজন একটি চিঠি নিয়ে কৃষ্ণার কাছে হাজির হবে কৃষ্ণা যেন তাকে নক্সা ও তার প্রতিলিপি দিয়ে দেয়। কৃষ্ণা সব কথা ব্যমকেশকে জানায়। ব্যোমকেশ বাবু একটি নকল নক্সা বানান। সন্ধ্যেবেলা দেখা যায়, তাদের বাড়ির সামনে বসে থাকা খোঁড়া ভিখিরি ইউ-উইনের চিঠি নিয়ে হাজির। কৃষ্ণা তাকে নকল নক্সা দেয়। ব্যোমকেশ তার পিছু নিলেও তাকে ধরতে পারেন না, বরং মাথায় আঘাত পেয়ে আহত হন। কৃষ্ণা তাঁকে দেখতে গিয়ে জানতে পারে যে, ইউ-উইন তাঁর বাড়িতে এসে দেখা করে বলে গেছে কৃষ্ণা তার সন্ধান নিতে গিয়ে তার সঙ্গেই কথাবার্তা বলে এসেছে, কিন্তু তাকে চিনতে পারেনি। সে চাইলে তখনই কৃষ্ণাকে বন্দী বানাতে পারত, কিন্তু এত ছেলেমানুষ দেখে তার দয়া হয়েছে। এরপর কৃষ্ণার বাবার পরিচিত সিনিয়র অফিসার মিঃ আর্থার মুরের ছদ্মবেশে ইউ-উইন কৃষ্ণার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে এবং কথায় কথায় গুপ্ত কুঠরির সন্ধান জেনে নেয়। রাতে ওই বাড়িতে হানা দিয়ে নক্সা ও তার প্রতিলিপি চুরি করে, সঙ্গে কৃষ্ণাকে অজ্ঞান করে নিয়ে যায়।

ব্যোমকেশের ভাই সমরও পুলিশে চাকরি করে ব্যোমকেশ তাকে পাঠিয়েছিল প্রণবেশ কে বর্মা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য। সমর প্রণবেশকে নিয়ে ফেরে। পুলিশ দলবল নিয়ে বর্মাগামী জাহাজে তল্লাসি চালায়। এমন সময়ে ইউ-উইন জাহাজ থেকে নিজের বোট নামিয়ে দলবল সমেত পালিয়ে যায়। পুলিশ গুলি ছুঁড়ে বিশেষ কিছু করতে পারেনা। প্রনবেশের উদ্যোগে জাহাজের বাথরুমে কৃষ্ণাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ।

এত সবকিছুর পর কৃষ্ণাকে জীবিত ফিরে পাওয়াটাই প্রনবেশের পরম প্রাপ্তি বলে মনে হয়। কিন্তু কৃষ্ণা সেই সময় জীবনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারেনা। তার মনে হতে থাকে ---"ভগবান যে তাকে এ-যাত্রায় বাঁচিয়েছেন সে কেবল প্রতিশোধ নেবার জন্য। এখন চাই শুধু প্রতিশোধ – হত্যার প্রতিশোধ!"[২]

এরপর থেকে শুরু হয় কৃষ্ণার অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। 'গুপ্ত ঘাতক' কাহিনিটিকে কৃষ্ণা সিরিজের ভূমিকা বলা যেতে পারে। কৃষ্ণার আর্থ সামাজিক অবস্থান, তার পারিবারিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এসব কিছুর পাশাপাশি অবশ্যই ইউ-উইনের মতো দস্যুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু এখানে কৃষ্ণার বুদ্ধি বিচক্ষণতার বদলে বরং তার সরলতা বা বলা ভালো বোকামিই ফুটে উঠেছে। আর্থার মুরের ছদ্মবেশে থাকা ইউ-উইনকে সে তার বাড়ির গুপ্ত স্থানের সন্ধান বলে দিয়ে পরোক্ষ ভাবে নক্সা তার হাতেই তুলে দিয়েছে।

'গুপ্ত ঘাতক' একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কাহিনি নয়। এই কাহিনি শেষ হয়েছে কৃষ্ণার পরাজয় এবং নিজেকে দৃঢ় করে তোলার প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে। আর এই কাহিনির বাকি অংশ শেষ হয়েছে 'হত্যার প্রতিশোধ' কাহিনিতে। 'হত্যার প্রতিশোধ' কাহিনিটি একেবারে সেখান থেকেই শুরু হয়, যেখানে 'গুপ্ত ঘাতক' কাহিনির শেষ। এখানে লেখিকা পূর্ব কাহিনির অনুষঙ্গ টেনে এনে লেখেন: "তারপর পিতার মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া সে শপথ করিয়াছে, তাঁহার হত্যার প্রতিশোধ সে লইবে, সে প্রতিজ্ঞা সে ভুলে নাই, গত তিন মাসের প্রতিদিন --- প্রতি মুহূর্তে সে মনে করিয়াছে তাহাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে হইবেই।"[৩]

'গুপ্ত ঘাতক' কৃষ্ণাকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে শেষ হয়, আর 'হত্যার প্রতিশোধ শুরু হয় কৃষ্ণাকে নিয়ে প্রনবেশের বাড়ি ফিরে আসার চিত্র দিয়ে। ইউ-উইন কৃষ্ণাকে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল বলে প্রণবেশ ও ব্যোমকেশ শঙ্কিত হয়েছিল। কৃষ্ণা তাঁদেরকে আশ্বস্ত করে বলে, যে নক্সা নিয়ে এতো ঝাঞ্ঝাট ইউ-উইন সেই নক্সা যখন পেয়ে গেছে তখন আর ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। তাকে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তার কারণ সে ইউ-উইনকে চেনে, এছাড়া তার আর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।

আগের কাহিনির ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও শুধুমাত্র 'হত্যার প্রতিশোধ' কাহিনিটিকে আলাদা ভাবে পড়লে পাঠক যাতে হতাশ না হন, তার জন্য লেখিকা এই কাহিনিতে আগের ঘটনার ধারাবাহিকতার পাশাপাশি নতুন একটি সমস্যা সংযোজন করেছেন। ইয়াং চাং এবং তাঁর মেয়ে মা-পানের সঙ্গে কৃষ্ণা, প্রণবেশ, ব্যোমকেশ বাবু সবার সাক্ষাৎ হয়। এখানে জানা যায় ইউ-উইন শুধুমাত্র গুপ্তধনের নক্সা নয়, ইউ-উইনের কাছ

থেকে তাদের রাজ বংশের সৌভাগ্যের প্রতিক একটি আংটি হাতাতে চায়। এই আংটি ভারতবর্ষের কোনও এক রাজা বুদ্ধদেবের চরণে দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। বুদ্ধদেব তা স্পর্শ করেননি। তিনি ইয়ং চাংয়ের এক পূর্বপুরুষকে সেটি দান করেছিলেন। সেই আংটি পাওয়ার পর থেকে বংশের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। তারপর ইয়ং চাংয়ের কোনও এক পূর্বপুরুষ সেই আংটি হারিয়ে ফেলেন এবং চরম দুর্দশার শিকার হন। তারপর ইয়ং চাংয়ের পিতামহ অভাবনীয় ভাবে সেটি পান। এই আংটিটি পাওয়ার জন্য ইউ-উইন ইয়ং চাংয়ের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেছে। ইয়ং চাং তাঁদের পরিবারের বিভিন্ন মূল্যবান বস্তুসহ এই আংটি দেখার জন্য তিনজনকেই আমন্ত্রন জানান। কৃষ্ণারা অন্যান্য বহুমূল্য জিনিসগুলো দেখতে পেলেও, আংটির কৌটো খোলার পর দেখায় যায় সেখানে আংটিটি নেই।

কিছুদিন আগে ইয়াং চাংয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি মহীদল সবকিছু তোলপাড় করে খুঁজেও সেই আংটি পায়নি। চাকর হিয়েন ইয়াং চাংকে জানিয়েছিল --- মহিদল তাঁর ঘর অনুসন্ধান করার সময় হিয়েন তাকে দেখে ফেলে, কিন্তু চিৎকার করে কাউকে ডাকতে পারেনি, কারণ মহিদল তার মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যায়। কৃষ্ণাদের দেখানোর জন্য ইয়ং চাং আংটিটি গুপ্ত জায়গা থেকে বার করে আগের রাতেই তাঁর ঘরের আয়রন চেস্টে রেখেছিলেন। কিন্তু সেটা দেখানোর জন্য বাক্স খুলতেই দেখা যায়, সেটি আর নেই, চুরি হয়ে গেছে। কৃষ্ণা প্রথমেই বাড়ির চাকর হিয়েনকে সন্দেহ করে। মা-পানের কাছ থেকে তার ছবি দেখে অবাক হয়ে যায় --- এই চাকর আসলে তাদের রেঙ্গুনের চাকর ফুচু।

মিঃ সত্যেন্দ্র চৌধুরীর বন্ধু অবিনাশ রায় আগেই চিঠি দিয়ে কৃষ্ণাদের রেঙ্গুনের বাড়ি ‘হ্যাপি-ম্যানসন’ বিক্রির জন্য তাদেরকে রেঙ্গুনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কৃষ্ণা ও প্রণবেশ রেঙ্গুনে যায়। বাড়ি কেনার জন্য ফরেস্ট বিভাগের ইনচার্জ মিঃ আর রবিন সেজে ইউ-উইন আসে। এমন সময় তাদের বাড়ির সামনে থাকা ল্যাং নামের এক খোঁড়া প্রাক্তন গুণ্ডা পুলিশের বেশে থাকা একজনকে নিয়ে আসে। সে এসে খবর দেয়, কৃষ্ণাকে একবার থানায় যেতে হবে, প্রণবেশ গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। কৃষ্ণা মিঃ রবিনকে বিদায় জানিয়ে খবর দিতে আসা পুলিশের গাড়িতে ওঠে। কিন্তু রবিনবেশী ইউ-উইন সহানুভূতি দেখিয়ে সঙ্গে যেতে চায়, কৃষ্ণা আপত্তি করেনা। ফলত সহজেই ইউ-উইনের হাতে সে বন্দী হয়। ব্যোমকেশবাবু অনুমান করেন, কৃষ্ণার খোঁজে পুলিশকে ব্যাস্ত রেখে সেই সময়ে সহজে গুপ্তধন উদ্ধার করার চেষ্টা করবে ইউ-উইন। তাঁরা অনুসন্ধানে নেমে পড়েন।

ইউ-উইন কৃষ্ণাকে একটি গোপন ডেরার ভূগর্ভস্থ ঘরে আটকে রাখে। এই বাড়ির একটি ঘরে দলবলের সঙ্গে বৈঠকে ইউ-উইন জানায় যে গুপ্তধনের নক্সা সে জোগাড় করে নিয়েছে, মিঃ চৌধুরীর কাছ থেকে বুদ্ধের পাদুকা উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি ইয়ং চাংয়ের কাছ থেকে উদ্ধার করা সোনার ভিক্ষাপাত্র, বুদ্ধের গলার মালা প্রভৃতি সে ফায়াতে স্থাপন করতে চায়। ফুঙ্গিদের সঙ্গে তার কথা হয়ে গেছে, শুভদিন দেখে তারা এইসব জিনিসগুলোর পবিত্রতা ফিরিয়ে এনে ফায়াতে স্থাপন করবে। এর পাশাপাশি দলের সবাইকে সে জানায়, মহিদল ইয়াং চাংয়ের সেক্রেটারির কাজকরার সময় সেখান থেকে বেশ কিছু জিনিস সংগ্রহ করেছে, হিয়েন চাকরের কাজ নিয়ে রাজবংশের সৌভাগ্যের প্রতীক আংটিটি চুরি করেছে। এখানেই জানা যায় কৃষ্ণার সন্দেহ সঠিক। মিঃ চৌধুরী রেঙ্গুনে থাকাকালীন ফুচু নাম নিয়ে তাঁদের বাড়িতে অনেকদিন চাকরের কাজ করেছে। ল্যাংও তাদের দলের হয়ে অনেক কাজ করেছে, এদের সবাইকে ইউ-উইন অভিবাদন জানায়। এরপর ল্যাংকে কৃষ্ণার পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেয়। এমন সময় চাকর ফুজি এসে জানায় যে পুলিশ এসেছে। দেওয়ালের গায়ে একটি বোতামে চাপ দিতে একটি কাঠের দেওয়াল ফাঁক হয়ে যায়, এবং ইউ-উইন বাদে সভার বাকি সবাই সেখানে লুকিয়ে পড়ে। মিঃ লি পুলিশ বাহিনি নিয়ে এসে দেখতে পায় সেখানে জাপানের সেনাবিভাগের প্রাক্তন জেনারেল বৃদ্ধ কুয়ে গাঁ বসে রয়েছেন। দীর্ঘ কথাবার্তার পর পুলিশ চলে সেই চোরা ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে আসে, আবার তাদের আলোচনা শুরু হয়।

চার-পাঁচদিন বন্দী থাকার পর। কৃষ্ণা ল্যাংকে গলা টিপে ধরে অজ্ঞান করে পালিয়ে যায়। ফিরে যাওয়ার দুদিন পর তাকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছিল, প্রণবেশ, ব্যোমকেশ সহ পুলিশ বাহিনি নিয়ে কৃষ্ণা সেখানে হাজির হয়। যে বৃদ্ধা তাকে খাবার দিত তার কাছ থেকে জানতে পারে ইউ-উইন ফায়াতে স্থাপন করার জন্য ফুঙ্গিদেরকে সবকিছু দিয়ে দিয়েছে। ফুঙ্গিদেরকে চাপ দিতেই তারা উই-উইনের অপহৃত সবকিছু বের করে দেয়। সঙ্গে এও জানায় ওই রাতে ইরাবতী নদী দিয়ে তারা কোনও একটা জায়গায় যাবে। কৃষ্ণারা পিছু নেয় এবং যেখানে তারা গুপ্তধনের জন্য মাটি খোঁড়া হচ্ছিল সেখানে উপস্থিত হয়। কিন্তু এতকিছু করেও ইউ-ইউনকে গ্রেফতার করা যায় না। নিজের রিভলভারের সাহায্যে সে আত্মহত্যা করে।

কাহিনির শেষে ইয়াং চাং তাঁর কথামতো আংটি উদ্ধারের জন্য ব্যোমকেশ বাবুকে পাঁচ হাজার টাকা দেন। আর মা-পান একটি বহুমুল্য রত্নহার উপহার দেয় কৃষ্ণাকে। ‘বোনের স্নেহের দান’ হিসেবে দিলেও পাঠক বুঝতে পারেন এই হারটি আসলে কৃষ্ণার

সাহসিকতার পুরস্কার। লক্ষণীয় : “গভর্নমেন্ট হইতে ব্যোমকেশ যখন পুরস্কৃত হইলেন --- সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাও পুরস্কার লাভ করিয়াছিল।”[৪]

এখানে লেখিকা কৃষ্ণাকে এক বিখ্যাত পুলিশ অফিসারের সমপর্যায়ে বসানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু পরের কাহিনিগুলিতে তিনি কৃষ্ণার সামর্থ্যকে উচ্চকিত করার জন্য ব্যোমকেশকে যথেচ্ছ খাঁটো করার চেষ্টা করেছেন।

পূর্বোক্ত দুটি কাহিনিতে আমরা কৃষ্ণাকে এক সাহসী বুদ্ধিমতি কিশোরী হিসেবে পেয়েছি, যে নিজের বাবা মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অপরাধ জগতের মুখোমুখি হয়। কিন্তু এরপর যে সে স্বেচ্ছায় অপরাধ জগতের মোকাবিলায় নামতে চায়, এমন ইঙ্গিত দেন লেখিকা ---

> সেই দিন প্রণবেশকে সে জানাইয়া দিল ... পড়াশুনা সে যাহা করিয়াছে তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না পাইলেও তাহার দিন চলিবে। সে এমনই কোনো কাজ লইতে চায়, যাহাতে সাধারণের উপকার হইবে এবং নিজেও আনন্দ লাভ করিবে।[৫]

যদিও পরবর্তী কাহিনিগুলিতে তাকে কলেজে পড়া মেয়ে হিসেবেই পাওয়া যায়। তবে পড়াশুনো না ছাড়লেও সে গয়েন্দাগিরির কাজে নেমে পড়ে। ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ’-এ প্রকাশিত এই দুই কাহিনি এতো জনপ্রিয় হয় যে, এরপর প্রভাবতী দেবী পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য ‘কৃষ্ণা সিরিজ’-এর কাহিনি রচনা করতে থাকেন।

প্রভাবতী দেবীর অন্যান্য রচনা সম্পর্কে অনেক সমালোচক মনে করেন, প্রথাগত মানসিকতার বাইরে গিয়ে তিনি বিশেষ কিছু লিখতেন না। বলাবাহুল্য তাঁর গোয়েন্দা কাহিনির ক্ষেত্রে একথা বলা চলেনা। লেখিকার সমকালে বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দা নির্মাণ অবশ্যই ব্যাতিক্রমী প্রয়াস। কারো কারো মতে, নিজে শিক্ষিকা হাওয়ার দরুণ একজন শিক্ষিত আধুনিক মেয়ের কেমন হওয়া উচিত এমন দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি মেয়ে গোয়েন্দা নির্মাণে হাত দেন। বলা বাহুল্য তাঁর নির্মিত দুই গোয়েন্দা চরিত্রই পেশাগত ভাবে গোয়েন্দা নয়, তারা আসলে কলেজের ছাত্রী। কৃষ্ণার পড়াশুনো চলতে থাকে পাশাপাশি গয়েন্দাগিরিও।

❖ গোয়েন্দা কৃষ্ণা চৌধুরী

মিঃ সত্যেন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র সন্তান কৃষ্ণা 'গুপ্ত ঘাতক' কাহিনিতে ষোল-সতের বছরের কিশোরী। বর্মা ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে কলকাতার বাসিন্দা হয়ে যাওয়ার পর তার জীবন এগতে থাকে।'গ্রহের ফের'-এ দেখা যায় --- কৃষ্ণা স্কটিশ চার্চ কলেজে আই-এ পড়ছে। 'মুক্তি-পথে কৃষ্ণা' কাহিনিতে লছমীর বয়ানে জানা যায় কৃষ্ণা ফার্স্ট-ডিভিশনে আই-এ পাশ করেছে, সেই সময়ের মেয়েরা যা সহজে পারেনা। কৃষ্ণার পড়াশুনো চলতে থাকে। যখন সে পানিহাটিতে ঘনশ্যাম আগরওয়ালের বাগান বাড়িতে লছমীর হাতে বন্দিনী, তখন তার কলেজের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। কৃষ্ণা আফসোস করে --- "আজই বি.এ এগজামিন আরম্ভ! দু-বছর প্রাণপণ পড়ার ফল তার এমনি ভাবে নষ্ট হয়ে গেল!"[৬]

'কৃষ্ণার অভিজান'-এ দেখা যায় --- "সামনে এগজামিন। থার্ড ইয়ার থেকে এবার সে উঠবে ফোর্থ ইয়ারে – সে জন্য বেশ একটু পরিশ্রম করছে কৃষ্ণা"[৭] ।

তবে কৃষ্ণার কাহিনিতে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গার্গীর মতো কলেজ জীবন থেকে শুরু করে সাংসারিক জীবনে পদার্পণ, সন্তানকে বড় করে তোলা --- এতোটা বিস্তৃত চিত্র নেই । কৃষ্ণার অভিযানের সব কাহিনিই কৃষ্ণার স্কুলের গণ্ডি পার করার পর কলেজের ছাত্রী জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'কৃষ্ণার পরিচয়'-এ কৃষ্ণার মাসতুতো বোন শুভ্রা কৃষ্ণার পরিচয় দিতে গিয়ে জানায় ---"এই কৃষ্ণা... জানেন, কৃষ্ণা কি বলে? ও বলে বিয়ে করবে না ... শয়তানির বুহ্য ভেদ করে শয়তানদের ও বার করবে ! ও করবে দুঃশাসনদের মুখোস খুলে তাদের স্বরূপ জানিয়ে তাদের খর্ব্ব করে, সমাজের কল্যাণ ! সে কাজ হবে কৃষ্ণার অভিযান"[৮] ।

'গ্রহের ফের' কাহিনিতে দেখা যায় কৃষ্ণা ইতিমধ্যেই গোয়েন্দা হিসেবে বেশ নাম করে ফেলেছে। আগেই জানা গিয়েছিল ---

> এই বয়সে কৃষ্ণা মাতৃভাষা ছাড়া আরও পাঁচ-সাতটি ভাষা শিখিয়াছে। কেবল শিখিয়াছে বলিলেই হইবে না, যে কোনো ভাষায় সে অনর্গল কথা বলিতে পারে, পড়িতে পারে। পিতা তাহাকে অশ্বারোহণে পারদর্শী করিয়াছে, মোটর সে নিজেই চালায়, পিতার সহিত বর্মার জঙ্গলে সে বহু শিকার করিয়াছে। উপযুক্ত ব্যায়ামের ফলে তাহার দেহ সুগঠিত, শক্তিশালিনী; দেহে যেমন তার অটুট শক্তি, অন্তরে তার তেমনই অকুতো সাহস।[৯]

মিঃ সত্যেন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র সন্তান হওয়ার দৌলতে সে আর পাঁচটা সাধারণ কিশরীর চেয়ে আলাদা হয়ে উঠেছে। পাঁচ বোন ও এক ভাইয়ের সংসারে বেড়ে ওঠা প্রভাবতী দেবী হয়ত উপলব্ধি করেছিলেন, সংসারে পুত্র সন্তান থাকলে কন্যা সন্তান বরাবরই অবহেলিত হয়। সম্ভবত সেই কারণেই কৃষ্ণাকে তিনি একক সন্তান হিসেবে নির্মাণ করেছেন। এই কাহিনিতে মিঃ চৌধুরীকে বলতে দেখা যায় ---"আমার ছেলে নেই, তুমি মেয়ে হলেও তোমায় গড়ে তুলেছি ছেলের মতো --- আমি আশাও করি আমার যা কিছু অসমাপ্ত কাজ তুমি শেষ করবে, আমার মুখ তুমি উজ্জ্বল রাখবে।"[১০]

তবে প্রভাবতী দেবী কাহিনি বয়নের ক্ষেত্রে কল্পনার রাজ্যে ভেসে গিয়ে সম্পূর্ণ আজগুবি কাহিনি নির্মাণ করেননি। কাহিনি বয়ন সমালোচনার উর্ধে না হলেও কৃষ্ণাকে তিনি পুরোপুরি কল্পলোকের নিয়িকা বানান নি। যে কারণে শারীরিক ভাবে শক্ত সবল, রিভলভার চালাতে পারদর্শী হলেও সে বারবার বিভিন্ন অপরাধীর হাতে বন্দী হয়। তার শারীরিক ক্ষমতা খুব বেশি কাজে লাগেনা, ক্লোরোফর্মের গন্ধে তাকে অজ্ঞান করে তুলে নিয়ে যায় অপরাধীরা। তার প্রত্যুতপন্নমতিতা এবং শারীরিক সক্ষমতা মূলত পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে, কিংবা তাদেরকে আহত করে পালানোর কাজে ব্যাবহৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশিবার অপরাধীদের হাতে বন্দী হওয়া গোয়েন্দা হল কৃষ্ণা। 'হত্যার প্রতিশোধ'-এ ইউ-উইনের হাতে, 'গ্রহের ফের'-এ খাঁজাহানের হাতে, 'কলঙ্কী চাঁদ'-এ প্রতিমা সহ পান্না সিংয়ের হাতে (সাথে রত্নাও ছিল), 'কারাগারে কৃষ্ণা'তে আ-চিনের কাছে, 'মায়াবী ও কৃষ্ণা'তে অমরনাথের হাতে, 'কৃষ্ণার অভিযান'-এ রাজা রাওয়ের হাতে, 'বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা'তে আলি মহম্মদের হাতে, 'মুক্তি পথে কৃষ্ণা'য় সুচেৎ সিং ও লছমী বাইয়ের দলের হাতে বন্দী হয়। বন্দী অবস্থা থেকে নিজেকে উদ্ধার করে পালিয়ে গিয়ে পুলিশ নিয়ে এসে অপরাধীদের ধরিয়ে দেওয়াই মূলত কাজ। এই ছকের বাইরে অন্য ধরনের কেস সমাধান করার সৌভাগ্য তার বিশেষ হয়নি। বিভিন্ন কেসের পিছনে মূল রহস্যগুলো আলাদা কিন্তু রহস্য সমাধানের মূলত এই একটি পথই লেখিকা বেছে নিয়েছেন।

কৃষ্ণার চরিত্রটিকে লেখিকা সমকালের একজন আদর্শ নারীর মূর্তি রূপে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু বলাই বাহুল্য সেই রূপ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে লেখিকা আধুনিক যুগের রূপকথার চরিত্র নির্মাণ করেছেন। সাহসিকতায় সে আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও সুন্দরী রূপসী মেয়ে হিসেবেই তাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন লেখিকা। অর্থাৎ, পরবর্তী কালের তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গার্গীর মতো শুধুমাত্র মেধায় এগিয়ে থাকা নয়, রূপের দিক থেকেও সে সমাজের আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের চেয়ে অনেক

এগিয়ে। প্রথম কাহিনিতেই লেখিকা দেখান --- "নিখুঁত একটি ইউরোপিয়ান-বালিকা, --- এই গাউনে আর টুপিতে তাহাকে বড় সুন্দর মানাইয়াছে। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল থাকায় কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না যে, সে ইউরোপিয়ান নয়। প্রণবেশ তাহার ইংরেজি উচ্চারণ শুনিয়াছে, ---ইউরোপিয়ান গভর্নেসের কাছে দুই বৎসর হইতে মানুষ হওয়ায় কথাবার্তা ও চালচলনে তাহাকে সর্বাংশে ইউরপিয়ান-বালিকা বলিয়াই মনে হয়"।[১১]

ইউরোপিয়ানদের মতো ফর্সা গায়ের রং এবং ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নারী, তৎকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের কাছে বেশ আদরনীয়। এরসঙ্গে তাল মিলিয়ে বেশিরভাগ কাহিনিতে তার এক এক জন প্রনয়াকাঙ্খির ছবিও চোখে পড়ে।

'কারাগারে কৃষ্ণা' কাহিনিতে দেখা যায় মূল অপরাধী কৃষ্ণার প্রনয়াকাঙ্ক্ষী। সে কৃষ্ণার প্রতি প্রেম নিবেদন করে --- "দস্যু? কিন্তু বুদ্ধিমতী ভেবে দেখ, তোমায় আমি কত ভালবাসি!"[১২]

এই কাহিনিতে দেখা যায় আ-চিন যখন বিদেশ থেকে দেশে ফেরে তখন মিঃ চৌধুরী তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। একদিন হঠাৎ কৃষ্ণার হাত চেপে ধরার ফল স্বরূপ মিঃ চৌধুরী উত্তম-মধ্যম ধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই আ-চিনের হাতে বন্দী থাকার সময় যখন সে আবার প্রেম নিবেদন করে, কৃষ্ণা ছলনার আশ্রয় নেয়, তাকে জানায় কলেজে থাকাকালীন সে একটি ছেলের প্রেমে পড়েছিল, পরে জানতে পারে সে রাজদ্রোহী। বিচারে তার দ্বীপান্তরের শাস্তি হয়। তাকে দেখতে আ-চিনের মতোই ছিল। কৃষ্ণা তার কাছে ধরা দেওয়ার নাটক করে বলে,'আজ থেকে তিন মাস, দশ দিন পরে আমার পিতার কালাশৌচ শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করবে না --- আমার সংস্পর্শে আসবে না।'[১৩] আ-চিন তার ছলনা ধরতে পারেনা, শর্তে রাজি হয়ে যায়।

'মায়াবী ও কৃষ্ণা'তেও দেখা যায় প্রধান অপরাধী অমরনাথ কৃষ্ণার প্রেমমুগ্ধ। তবে আ-চিনের মতো সরাসরি প্রেম নিবেদন করার কিংবা কৃষ্ণাকে লাভ করার কোনও উদ্দেশ্য তার নেই। দুজনের কথোপকথনের সময় মজার ছলে বলা দু-একটি কথা থেকে কৃষ্ণার প্রতি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ পায়। কৃষ্ণারও 'ধনীর বিভীষিকা, কিন্তু গরীবের বন্ধু' অমরনাথের প্রতি কোনও বিরূপ মনোভাব জন্মায় না। যদিও সে আইনের চোখে অপরাধী, কিন্তু তার পূর্ব কার্যকলাপ কৃষ্ণার কাছে খুব বেশি অনৈতিক বলে মনে হয়নি। অমরনাথ সম্পর্কে কৃষ্ণার মনে হয়েছে --- "হয়ত সত্যিই ভালো লাগে কৃষ্ণাকে দেখতে অমরনাথের ! কিন্তু অমরনাথ ইতর নয় তা কৃষ্ণা জেনেছে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একটা বেড়ালকে

জয় করতে পারলেও মানুষ আনন্দ পায়। শুধু সেই আনন্দটুকু পাওয়া ছাড়া কৃষ্ণার মনে আর কিছু ভাব এলো না।”[১৪]

এখানে কৃষ্ণার মনস্তত্ত্বকে খুব স্বচ্ছ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। কৃষ্ণা ব্যাক্তি অমরনাথের প্রতি কোনও আকর্ষণ অনুভব না করলেও অমরনাথের তার প্রতি দুর্বলতাকে বেশ উপভোগ করেছে। শেষ অংশে অমরনাথ যখন দেশ ছাড়ার আগে কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা করে তার মায়ের এক বহুমূল্য জড়োয়ার হার কৃষ্ণাকে উপহার দেয় , কৃষ্ণা তা ফিরিয়ে দেয়না, শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করে। এমনকি আইনের চোখে অপরাধী অমরনাথকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেনা, বরং পারস্পরিক বন্ধনহীন ভালোলাগার সম্পর্ককে খুব সহজেই স্বীকৃতি জানায়। ‘কৃষ্ণার অভিজান’-এও অপরাধী রাজা রাও কৃষ্ণাকে বলে --- ‘ভালোভাবে যদি থাকতে পারতুম, আপনার মতো একটি মেয়ে যদি আমার পাশে থাকত! কিন্তু তা সম্ভব নয়! যেদিন মহাকালের মন্দিরে আপনাকে দেখেছি, সেদিন থেকে কেবলই মনে হয়েছে, এ-কাজ ছেড়ে আপনাকের নিয়ে---”[১৫]

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণা প্রতিবাদ জানায়। রাজা রাও নিজেকে সামলে নিয়ে জানায়, যেদিন কৃষ্ণা পালিয়েছে, সেদিন থেকেই রাজা রাও বুঝেছে তাকে পাওয়া সম্ভব নয়, তাই সেই বিষয় নিয়ে সে আর আলোচনা বাড়ায় না। তবে কাহিনির শেষে রাজা রাজ কৃষ্ণাকে বলে ---

> “আপনাকে পুরস্কার দিয়ে লজ্জা দেবো না কৃষ্ণা দেবী। আমার নূতন তৈরি এই আংটি --- যদি দয়া করে নেন! আপনার আঙুলে এ আংটি আমার মঙ্গল-চক্রের কথা আপনাকে ভুলতে দেবে না !
>
> কৃষ্ণা আংটি নিয়ে বললে, ধন্যবাদ ! আমাদের কথা ভুলবেন না আপনি !
>
> রাজা রাও বললে, ‘কোনো দিন ভুলব না কৃষ্ণা দেবী। জীবনে পরম শ্রদ্ধায় আপনার কথা মনে করব’।[১৬]

কৃষ্ণা আংটি গ্রহণ মেনে নেওয়া গেলেও তারপর রাজা রাওয়ের প্রতি কৃষ্ণার ব্যাবহার কাহিনির সঙ্গে খুব একটা সাযুজ্যপূর্ণ বলে হয়না। আবার ‘বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা’তে দুই ফেরারি আসামির মধ্যে একজন – রজনী দত্ত, এক সময়ে তার প্রনয়াকাঙ্খী ছিল।

> এককালে সে ইউনিভার্সিটির ভালো ছেলে ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়ে সে অসৎ পথ অবলম্বন করেছে। কৃষ্ণার দিকে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল,

> এমনকি একবার সে গোপনে একখানা পত্রও দিয়েছিল --- যদি কৃষ্ণা তাকে বিবাহ করতে রাজি হয়, এসব জঘন্য কাজ ছেড়ে দেবে, তার প্রচুর সম্পত্তি সে কৃষ্ণাকে দেবে, কৃষ্ণা শুধু সম্মতি দিক, তাকে বিবাহ করতে রাজি হোক। দারুণ ঘৃণায় কৃষ্ণা পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলেছিল।[১৭]

কিন্তু কৃষ্ণাকে অপহরণ করার পর তার প্রতি পুনরায় কোনও দুর্বলতা দেখায় নি। বরং আর পাঁচজন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাকে আরবে পাচার করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল।

'মুক্তি-পথে কৃষ্ণা কাহিনিতে কেউ সরাসরি কৃষ্ণাকে প্রেম নিবেদন না করলেও, শান্তা জানায় অপরাধী দলের প্রায় সবাই কৃষ্ণাকে মেরে ফেলতে চায়। কিন্তু আউলিং তাতে বারবার বাধা দিয়ে বলে --- "হুজুর, ও-বাইটাকে আমায় বখশিস করুন। ও যেমন বাঘিনী আছে --- আমি ওকে বশ করে সাদী করব।"[১৮]

একথা শুনে কৃষ্ণার প্রচণ্ড রাগ হয়। সে মনে মনে ঠিক করে নেয়, বেরনোর পর তার প্রথম কাজ হবে আউলিংকে সাজা দেওয়া।

অপরাধীদের মধ্যে অনেকেই কৃষ্ণার প্রতি আকৃষ্ট হলেও সবার প্রতি কৃষ্ণার মনোভাব সমান নয়। আউলিং, আ-চিন বা রজনী দত্তের প্রতি কৃষ্ণা যেমন ঘৃণা পোষণ করে, রাজা রাও বা অমরনাথের প্রতি তার বিদ্বেষ দেখা যায় না। তার একটি বড় কারণ এরা দুজন আইনের চোখে অপরাধী হলেও সমাজের চোখে সাধু সেজে থাকা অপরাধীদের সঙ্গেই তাদের মূল লড়াই। তাই নৈতিকতার দিক থেকে তাদেরকে ঘৃণা করতে পারেনি কৃষ্ণা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাকে প্রেম নিবেদন না করলেও তার প্রতি দুর্বল --- এমন মানুষদের সঙ্গে ছলনা করে অপরাধীদের জাল ছিঁড়ে বেরনোর চেষ্টা করেছে কৃষ্ণা। যেমন, 'কারাগারে কৃষ্ণা'র মিংলোকে দেখে কৃষ্ণা বুঝতে পারে তার প্রতি সে দুর্বল। কৃষ্ণা এই দুর্বলতাকে কাজে লাগায়। সে নিজেই মিংলোকে প্রেম নিবেদন করে, তাকে জানায় সে তার সঙ্গে তার দেশে গিয়ে সংসার পাততে চায়। বলা বাহুল্য মিংলো তার ফাঁদে পা দেয়। এবং মিংলো তাকে বন্দী ঘেরাটোপ থেকে বের করে। 'মায়াবী ও কৃষ্ণা'তেও কৃষ্ণা নারায়ণ দাসকে জানায় যে সে প্রথম থেকেই বুঝেছিল নারায়ণ তার প্রতি আসক্ত, এবং সেও নারায়ণ দাসকে পছন্দ করে। এভাবে অপরাধী দলের বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে ছলনা করে কৃষ্ণা প্রতিকূল পরিস্থিতির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। তবে কৃষ্ণা যে শুধুমাত্র পুরুষদের সঙ্গেই ছলনা করেছে, এবং বন্দী দশা থেকে বের হওয়ার জন্যেই যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে তা নয়। 'মুক্তি পথে কৃষ্ণা' কাহিনিতে জানা যায়, ব্যোমকেশের কথায় কৃষ্ণা সুন্দর লালের মেয়ে লছমীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়। কলেজ পড়ুয়া লছমী তাকে প্রকৃত বন্ধু বলেই বিশ্বাস

করে। কিন্তু লছমীকে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাবহার করে কৃষ্ণা। লছমীর বাবার বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন কৃষ্ণাই প্রধান সাক্ষী ছিল। তবে মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে খেলা করার পরও পাঠক কৃষ্ণার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়না তার কারণ, কৃষ্ণা আসলে সত্যের জন্য লড়ছে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে লড়ছে।

তবে কৃষ্ণার প্রতি যে এই মানুষগুলো আকৃষ্ট হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার মূল কারণ রূপ। এবার আসা যাক কৃষ্ণার গুনের কথায়। ঘোড়ায় চড়া, মোটর চালানো, পাঁচ-সাতটা ভাষায় কথা বলতে পারা এমন গুনের অধিকারি কৃষ্ণা বহিরাবরণের ভিতরে আসলে কেমন মানুষ সেটার সন্ধান চালানোও জরুরি। কৃষ্ণার মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল সে সাহসী মেয়ে। লেখিকা তাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী এবং সাহসী নারী হিসেবে বারবার উল্লেখ করলেও অপরাধী দলের লোকজনকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে বন্দীদশা থেকে পালানো, কিংবা আসুস্থতার ভান করে গুণ্ডাদের কড়া নজরদারি থেকে রেহাই পেয়ে পালানো ছাড়া কোনও কাহিনিতেই তার বুদ্ধির পরিচয় খুব বেশি পাওয়া যায়না। তবে তার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় প্রায় সব কাহিনিতেই। 'হত্যার প্রতিশোধ'-এ ছদ্মবেশ ধরে ইউ উইনের খোঁজ করতে যাওয়া বেশ সাহসিকতার পরিচয় দেয়। 'কৃষ্ণার অভিযান'-এ যখন কেউই মহাকালের মন্দিরে ঢুকতে চাইছে না, এমনকি স্থানীয় পুলিশের কর্মচারীরা ভয় পাচ্ছে, তখন কৃষ্ণা এই মন্দিরে ঢোকার জেদ ধরে। সাহসের পাশাপাশি তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, জটিল পরিস্থিতিতে অবিচল থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। প্রথম দিকের কাহিনিতে যদিও তার বোকামির ছবি দেখা গেছে। কিন্তু ব্যাক্তিগত জীবনের পরিসর থেকে বেরিয়ে সে যখন বিভিন্ন কেসের সমাধানে নেমেছে তখন থেকে তার মধ্যে এই বিচক্ষণতা চোখে পড়ে। 'কলঙ্কী চাঁদ'-এ কৃষ্ণা ও প্রতিমা যখন বুঝতে পারে তারা দুষ্কৃতিদের হাতে পড়েছে, তাদেরকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছেনা, তারা আসলে অপহৃত হয়েছে; তখন প্রতিমা গাড়ি খুলে লাফ দিতে চাইলে কৃষ্ণা তাকে নিরস্ত করে। তাকে বোঝায় যে গাড়ি শহর থেকে গ্রামের পথে চলে এসেছে, সেখানে ওই মুহূর্তে পুলিশ পাওয়া সম্ভব নয়, আশেপাশে কোনও লোকজনও নেই। ফলত ওই জায়গায় চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে নেমে কোনও সুবিধে হবে না। বরং সাহসের সঙ্গে গোটা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পরামর্শ দেয়।

অপরাধ জগতের বিরুদ্ধে সাহসিকিতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য খানিক শারীরিক বল দরকার। লেখিকা কিছু কিছু জায়গায় কৃষ্ণার শারীরিক ক্ষমতার ছবি দেখিয়েছিয়েন। 'বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা' কাহিনিতে আলি মহম্মদের হাতে বন্দী থাকার পর যখন আবুর সাহায্যে সে পালানোর চেষ্টা করে, তখন ওই দলের লোক তাকে বাধা দেওয়ার জন্য আসলে কৃষ্ণা

তার নাকে ঘুষি মেরে তাকে আহত করে পালায়। আবার আপরাধীদের হাতে ধরা পড়ে এবং তারপর নল বেয়ে পালানোর চেষ্টা করে। নল বেয়ে নেমে এসে আবার সামনে থাকা মস্ত আমগাছে উঠে পড়ে। ‘মুক্তি পথে কৃষ্ণা’তেও দেখা যায়, শান্তা দড়ির মই ফেলে দিলে সেই মই বেয়ে কৃষ্ণা অবলীলায় ওপরে উঠে আসে। শান্তাকে নিয়ে পালানোর সময় উপো তাদেরকে ধরে ফেলে। কিন্তু উপোর আনাবধানতায় কৃষ্ণা তার হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়ে তার বুকের ওপর উঁচিয়ে ধরে। আউলিং কোমরের বেল্ট থেকে ছোরা বের করার চেষ্টা করলে, তার দিকে রিভলভার তাক করে তাকে শাসায়। কাহিনির শুরুতেই সত্যেন্দ্র চৌধুরীর বয়ানে পাওয়া যায় তাঁর ছেলে না থাকার দরুণ কৃষ্ণাকে তিনি ছেলের মতো করে মানুষ করেছিলেন। ফলত, কাহিনিতে কৃষ্ণার সাহসিকতার যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তা অবাস্তব বলে মনে হয়না।

এবার আসা যাক রহস্যের প্রতি কৃষ্ণার আগ্রহের দিকটাতে। ‘মুক্তি-পথে কৃষ্ণা’তে কৃষ্ণা জানায় ---“আমি পুলিশের লোক নই। আমার পেশা ডিটেকটিভগিরিও নয়, নেহাৎ দায়ে পড়ে সখের খেয়ালে এক-আধবার জড়িয়ে পড়ি”[১৯]।

‘কলঙ্কী চাঁদ’-এও তাকে বলতে দেখি ---

> “আমি মেয়ে --- তারপর বাংলাদেশের মেয়ে, আমার শক্তি কতটুকু --- সাহসই বা কতখানি? কোথায় পাঞ্জাবে একজন রাজার উইল চুরি গেছে, তার তদন্তের ভার নেব আমি ? এ একেবারে অসম্ভব কথা। হতে পারে, নিতান্ত আত্মীয়স্থলে বা সম্পূর্ণ নিজের জন্য আমি কিছু কাজ করেছি, তা বলে আমি যে ডিটেকটিভের পেশা নিইনি এ কথা তো জানেন”[২০]

বলা বাহুল্য ব্যাক্তিগত জীবনের প্রতিশোধ নেওয়ার তাগিদ থেকেই কৃষ্ণার এই পথে নামা। ‘গ্রহের ফের’-এ পারিবারিক বন্ধু মিঃ আতুল মিত্রের একমাত্র সন্তান দেবু অপহৃত হওয়ায় বাধ্য হয়ে কৃষ্ণাকে তদন্ত করতে হয়। ‘কারাগারে কৃষ্ণা’তে কৃষ্ণার এক দূরসম্পর্কের মাসি রুমা চিঠি লিখে তার কাছে সাহায্য চায়। প্রনবেশের অমত থাকলেও কৃষ্ণা তদন্তে নামে। প্রনবেশ সামনে তার পরীক্ষা আছে জানালে সে বলে নারী হিসেবে নারীর প্রতি তার কর্তব্য আছে। নারীর প্রতি কর্তব্যের পরিচয় অনেক কাহিনিতেই ফিরে ফিরে এসেছে। ‘কলঙ্কী চাঁদ’-এ মিস্টার সেন নির্দোষ নন জেনেও কৃষ্ণা তাঁর মেয়ে রত্নাকে শত্রু পক্ষের হাত থেকে বাঁচিয়ে আনার চেষ্টা করে। কারণ, তার মাকে সে সন্তান ফিরেয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আবার, ‘কলঙ্কী চাঁদ’-এ দেখা যায়, পাশের বাড়িতে চুরি হলেও কৃষ্ণা তা নিয়ে

বেশি মাথা ঘামায় না। প্রনবেশ এই বিষয় নিয়ে কথা বললে সে প্রনবেশকে বলে --- "... কিই-বা দরকার পরের জন্য খাটতে যাওয়ার? যাদের গেছে তারা তো আমায় কিছু বলছে না। পুলিশের কাজ নিয়ে, পুলিশের কৃতিত্ব বাড়িয়ে আমার কি লাভ হবে ?"[২১]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে রহস্যের প্রতি আকর্ষণের চেয়ে খ্যাতির প্রতি আকর্ষণ তার অনেক বেশি। তবে খ্যাতির প্রতি তার যেমন আকর্ষণ তেমন খ্যাতির স্বীকৃতি ফিরিয়ে দেওয়ার মতো অহংকারও তার রয়েছে। 'বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা' কাহিনিতে মৃন্ময় যখন জানায় সরকার থেকে তাকে যাতে পুরস্কৃত করা হয় সেই মর্মে গভর্ণর একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কৃষ্ণা তক্ষুনি জানিয়ে দেয় --- 'আমি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করব মামাবাবু, -- সম্মানের পুরস্কার নেবার মতো ঢের লোক আছে – আমার এ ঘাড় তেমন মজবুত নয় – অত ভার বইতে পারবে না! আপনি দয়া করে এই কথাটা জানিয়ে দিলে খুব ভালো হবে"[২২]।

পাশাপাশি পুলিশের প্রতিও তার খানিক বিদ্বেষ আছে বোঝা যায়। যদিও তার বাবা পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী হওয়ার সুবাদে সে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিশের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছে। 'কারাগারে কৃষ্ণা'তে প্রনবেশের বন্ধু ইন্সপেক্টর সুজন মিত্র তার গোয়েন্দাগিরি নিয়ে হাসাহাসি করলে কৃষ্ণা রেগে যায় এবং পরোক্ষ ভাবে তাকে অপমান করতেও পিছপা হয়না। সুজনকে সে বলে --- 'ভুল করছেন। আমি ডিটেকটিভ নই – আত্মীয়তা হিসেবে তিনি আমায় পত্র দিয়েছেন, আর আমিও মামাকে নিয়ে সেই জন্যেই এসেছি। আমার মনে হয় পুলিশেও খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমদের দেশের পুলিশ এত কর্মতৎপর যে, এই দীর্ঘকালের মধ্যেও কিছু কিনারা করতে পারেনি"[২৩]

বলা বাহুল্য যেহেতু কৃষ্ণা পেশাদার গোয়েন্দা নয় তাই পারিশ্রমিকের প্রতি তার আকর্ষণ কিছুই নেই। বাংলা সাহিত্যে সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের দীপঙ্কর বাগচি ছাড়া টাকা নিয়ে মাথা ঘামানো গোয়েন্দা খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এমনকি সুচিত্রা ভট্টাচার্যের প্রজ্ঞাপারমিতা সম্পূর্ণ ভাবে পেশাদার গোয়েন্দা হলেও তাকে বলতে দেখা যায় কেসের সারবত্তা না থাকলে সে শুধু টাকার জন্য কোনও কেস নেয়না। পূর্বসূরি হিসেবে কৃষ্ণাকেও বলতে দেখা যায় --- "পারিশ্রমিকের লোভে আমি এ-কেস হাতে নিচ্ছি এরকম মনে করবেন না মিস আদমজী। আমারও আপনার মত সন্দেহ হচ্ছে যে, স্যার আদমজীর মৃত্যুর পিছনে গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। আপনার কেস আমি সেই জন্যেই হাতে নিচ্ছি"[২৪] ।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের কলেজ পড়ুয়া মেয়ে, পারিশ্রমিকের তোয়াক্কা না করেই সে বিভিন্ন রহস্যের সমাধান করেছে। তবে তাকে একেবারে খালি হাতে ফিরতে হয়নি। 'হত্যার

প্রতিশোধ'-এ নিজের বাবা-মায়ের হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য হলেও ইয়ং-চাংয়ের পারিবারিক অংটি এবং চুরি হয়ে যাওয়া অন্যান্য সামগ্রী ফিরিয়ে দেওয়ার পিছনে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সেই কারণে ব্যোমকেশের সঙ্গে সেও নিজের কাজের স্বীকৃতি পায়। মা-পান তার গলায় একটি বহুমূল্য রত্নহার পরিয়ে দেয়। "গভর্নমেন্ট হইতে ব্যোমকেশ যখন পুরস্কৃত হইলেন --- সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাও পুরস্কার লাভ করিয়াছিল"।[২৫]

'গ্রহের ফের'-এ মিঃ মিত্র তাঁর সন্তান দেবুকে ফিরে পাওয়ার পর দেবুর মুক্তিপণ ববাদ অপহরণকারীরা যে ১০হাজার টাকা দাবি করেছিল, সেই টাকা কৃষ্ণার হাতে তুলে দিতে চান। কৃষ্ণা সেই টাকা নিতে অস্বীকার করে। মিসেস মিত্র জানান তিনি বরং ওই টাকায় কয়েকটা হীরে কিনে কৃষ্ণাকে হার গড়িয়ে পরিয়ে দেবেন। কলঙ্কী চাঁদ'-এ পারিশ্রমিকের পরিমাণ উল্লেখ করা না থাকলেও লেখা আছে মিঃ সেন কৃষ্ণাকে মোটা টাকা পুরস্কার দিয়ে গেছেন। 'কারাগারে কৃষ্ণা'তে কৃষ্ণা কোনও পারিশ্রমিক পায়না। বরং সদ্য পিতৃহারা রুমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে হয়। 'মায়াবী ও কৃষ্ণা'তে কাহিনির শেষে অমরনাথ কৃষ্ণাকে তাঁর মায়ের একটি জড়োয়ার হার উপহার দেন। যদিও এটি কাহিনি শেষের প্রাপ্তি তবে এটাকে পারিশ্রমিক বলা যায়না। কারণ, কৃষ্ণা রত্নাকে উদ্ধারের জন্য নেহওয়াল সিং কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিল। এবং অমরনাথের হয়ে কোনও কাজ সে করেনি। তাই এটি প্রীতি উপহার, পারিশ্রমিক নয়। তবে 'কৃষ্ণার অভিযান'-এ রাজেন্দ্র প্রসাদের কেস হাতে নিলেও শেষ পর্যন্ত জানা যায় তিনিই প্রকৃত অপরাধী। তিনি আত্মহত্যা করেন। কাহিনির শেষে রাজা রাও কৃষ্ণাকে একটি আংটি উপহার দেন। এটিও প্রীতি উপহার। কিন্তু এক অর্থে এটাকে পারিশ্রমিকও বলা চলে। কারণ, প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষ ভাবে কৃষ্ণা রাজা রাওয়ের উদ্দেশ্য --- মহাকালের মন্দিরে চক্র স্থাপনে সহায়তা করেছে। 'বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা'তে কৃষ্ণা নিজেই বিপদে পড়েছে, নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে সে আরও অনেক অপহৃত মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছে। সুতরাং, কোনও মক্কেল না থাকায় পারিশ্রমিকের প্রশ্ন নেই। পারিশ্রমিক না পেলেও ইন্সপেক্টর মৃন্ময় জানায় সরকারের তরফ থেকে তাকে পুরস্কৃত করার কথা চলছে, কৃষ্ণা নিজে সেই সরকারি স্বীকৃতি নিতে রাজি হয়না। তবে ভকতরাম লোহিয়া তার এই কাজের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থে তাকে এক ছড়া বহুমূল্য জড়োয়া নেকলেস উপহার দেন। 'মুক্তি-পথে কৃষ্ণা'তে কৃষ্ণার পারিশ্রমিক পাওয়ার কোনও অবকাশ নেই। কারণ এখানে সে নিজেই ভিকটিম। 'কৃষ্ণার জয়যাত্রা'তে যদিও রাবেয়া কৃষ্ণাকে নিয়োগ করে। এবং শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণা সব জট কাটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। কিন্তু কাহিনির শেষ হয় রাবেয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। পারিশ্রমিকের প্রসঙ্গ এখানে গৌণ হয়ে যায়।

কৃষ্ণা চরিত্রটির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বেশ কিছু বিপরীতমুখি স্বভাব বৈশিষ্ট্যের মেলবন্ধন লক্ষ করা যায় তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য হল একদিকে বিধির বিধানের দোহাই দিয়ে কোনও কিছুকে ভবিতব্য বলে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল আপত্তি, আবার অন্যদিকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রতি প্রবল বিশ্বাস। আ-চিনের সঙ্গে যখন সে ছলনা করে, তার বিশ্বাস অর্জনের জন্য খুব অবলীলায় বলতে পারে 'তোমার ঈশ্বরের দিব্যি', তখন মনে হয় কৃষ্ণা বোধয় নাস্তিক। কিন্তু বিভিন্ন কাহিনিতে নানা প্রসঙ্গে লেখিকা প্রণবেশকে নাস্তিক হিসেবে চিহ্নিত করলেও কৃষ্ণাকে প্রবল ভাবে আস্তিক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। 'মায়াবী ও কৃষ্ণা'তে রত্না জানায় যে দয়াল চাঁদকে বিয়ে করতে রাজি হওয়ার পর দয়াল চাঁদ নিজের ভজালি তার ঘরে রেখেই চলে গেছে। এই প্রেক্ষিতে কৃষ্ণা বলে --- রত্নাকে ভগবান রক্ষা করেছেন, নাহলে দয়াল চাঁদ ভোজালি ফেলে রেখে চলে যাবে কেন ! এমনকি, প্রবল বিপদের মধ্যে মাথা খাটিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার পরামর্শ না দিয়ে বৈজুনাথকে কৃষ্ণা বলে, 'ঈশ্বরকে ডাকুন'। 'বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা' কাহিনিতে কৃষ্ণাকে বলতে দেখা যায় ---'ভালো কাজ করতে যত বিপদে পড়ি... আমার বিশ্বাস, মা ---- ভগবান সে-বিপদে রক্ষা করবেন। নাহলে মানুষের সাধ্য কতটুকু বলো? সত্যি বলছি মা, এ বিশ্বাস আমার আছে বলে, সেই বিশ্বাসের জোরেই আমার সাহস আসে --- কখনো ভয় হয়না'[২৬]

গোয়েন্দা হতে গেলে নাস্তিক হওয়া জরুরি কিনা তা তর্কসাপেক্ষ কিন্তু এতটা দৈব নির্ভরতা একজন গোয়েন্দার পক্ষে খানিক বেমানান বলেই মনে হয়। আসলে লেখিকা যে সময়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণাকে নির্মাণ করেছেন সেই সময়ে নারী জীবনে শিক্ষার আলো একটু একটু করে প্রবেশ করতে শুরু করলেও অন্তঃপুরের মানসিকতার বেড়া ভেঙে মেয়েরা বেরোতে পারেনি। বলা বাহুল্য কৃষ্ণা চরিত্রটি সেই সময়ের প্রেক্ষিতে বাঙালী নারী পাঠকের জীবনের থেকে অনেক দূরবর্তী জগতের নারী। প্রায় অন্য জগতের বাসিন্দা হওয়ার পরও যে সে মন মানসিকতায় বেশ খানিকটা পাঠক সমাজেরই কাছের মানুষ এমনটা প্রতিপন্ন করার জন্য লেখিকা তার চরিত্রের এই দিকটি বারবার উচ্চকিত করেছেন বলে মনে হয়।

- **প্রণবেশ**

কৃষ্ণা সিরিজে প্রণবেশ বেশ উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বলা বাহুল্য এই উল্লেখযোগ্য চরিত্রকে লেখিকা সযত্নে খানিকটা খাটো করে দেখিয়েছেন যাতে কৃষ্ণা চরিত্রটিকে বেশ উচ্চকিত

করে দেখানো সম্ভব হয়। প্রণবেশ মিত্র কৃষ্ণা চৌধুরীর মামা। এর বাইরে প্রণবেশের আর কোনও পরিচয় নেই। প্রথম কাহিনি ‘গুপ্ত ঘাতক’-এ জানা যায় প্রণবেশের এম.এসসিতে বোটানি ছিল। ‘আই-এসসি, বি-এসসি এবং এম-এসসি এই ছয়টা বৎসর বোটানিক্যাল-গার্ডেনে আসা-যাওয়া করিয়া এবং গাছ-লতাপাতা নাড়াচাড়া করিয়া ওই সবের উপরে প্রণবেশের যে দারুণ বিতৃষ্ণা জাগিয়াছে, এই কথাটাই প্রণবেশ কমপক্ষে একশতবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কৃষ্ণাকে জানাইলেন।”[২৭]

বলা বাহুল্য শিক্ষাগত দিক থেকে প্রণবেশ কোনও অংশে পিছিয়ে নেই। লেখিকা সামগ্রিক ভাবে যে উচ্চশিক্ষিত বিত্তশালী সমাজের ছবি দেখিয়েছেন প্রণবেশ সেই সমাজেরই প্রতিনিধি। কিন্তু শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে লেখিকা একেবারেই অকর্মণ্য করে রেখেছেন। কোনও কাহিনির কোনও অংশেই জানা যায়না প্রণবেশের পেশা কী। জীবন অতিবাহিত করার জন্য তার রোজগারের রাস্তা কী সে সম্পর্কে লেখিকা একেবারেই চুপ। আবার বেকার হত দরিদ্র অবস্থাও যে তাঁর নয় তা কাহিনি পড়লেই বোঝা যায় : “প্রণবেশ আজকাল ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়েন এবং সেগুলো বিশেষ করে রবার্ট ব্লেকের সম্বন্ধে লেখা। কোনোকালে তিনি এ-সব বই পড়েননি, এবং বরাবর এ ধরণের উপন্যাসগুলোকে তিনি গাঁজা’ নাম দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। আজকাল দেখা যায়, কৃষ্ণাকে গোপন করে তিনি এইসব বই পড়েন।”[২৮]

গল্পের বই পড়া, থিয়েটার সিনেমা দেখতে যাওয়া, কখনো গায়ে মাটি মেখে ব্যায়াম করা ছাড়া আর কোনও বিশেষ কাজ নেই প্রণবেশের। আর কাহিনির প্রয়োজনে সে কৃষ্ণার অভিভাবক। মা এবং বাবা মারা যাওয়ার পর কৃষ্ণার আত্মীয়দের মধ্যে একমাত্র প্রণবেশ আছে। তাই কৃষ্ণার যাবতীয় ভার তাঁর কাঁধে। ‘গুপ্ত ঘাতক’ কাহিনিতেই দেখা যায় কৃষ্ণা মা এবং বাবা মারা যান। তারপর থেকে কৃষ্ণা মামা প্রনবেশের কাছে থাকতে শুরু করে। তারা দুজনেই কলকাতায় থাকে। তারা যে বাড়িতে থাকে সেটি কৃষ্ণার ঠাকুরদার তৈরি ভবানীপুরের বাড়ি । তাঁর নিজের বাড়ি সম্বন্ধে কিছু জানা জায় না। যাইহোক একটি ষোল সতের বছরের মেয়েকে একেবারেই অভিভাবকহীন করতে চাননি বলেই এই চরিত্রের অবতারণা। প্রণবেশের বয়স কত তার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে প্রণবেশের সঙ্গে কৃষ্ণার আচরণ দেখে মনে হয় সে ঠিক কৃষ্ণার পিতৃস্থানীয় নয়। তবে তাকে দেখাশুনোর ভার নিয়েছেন প্রণবেশ। ‘গুপ্ত ঘাতক’ কাহিনিতে যদিও দুষ্কৃতীদের হাতে পড়ে নাজেহাল হয়েছেন, কিন্তু ফিরে আসার পর যখনই জেনেছেন কৃষ্ণার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। তখনই কৃষ্ণাকে খুঁজে বের করতে তৎপর হয়েছে। আর তাঁর নির্দেশে পুলিশ জাহাজের

শৌচালয় খুলে সন্ধান করতেই কৃষ্ণাকে পাওয়া গেছে। 'হত্যার প্রতিশোধ'-এ দেখা যায় দুষ্কৃতিদের হাতে খুব সহজেই কাবু হয়ে পড়ার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রণবেশ সকালবেলা উঠে গায়ে মাটি মেখে ব্যায়াম করতে শুরু করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে গায়ে জোর না থাকার জন্য মাত্র দুজন মানুষ মিলে তাঁকে ধরে বেঁধে কাবু করে ফেলেছিল। যাতে পরবর্তী সময়ে এমনটা আর না হয় তারজন্য তিনি শরীর চর্চায় মন দেন। এর ফলে সামগ্রিক ভাবে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য না পালটালেও কিছুটা পরিবর্তন আসে। প্রথম কাহিনিতে কৃষ্ণা তাঁকে ইয়ং চাংয়ের খোঁজ নিতে বলায় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু 'মুক্তি-পথে কৃষ্ণা'তে দেখা যায় কৃষ্ণার নির্দেশে নয়, নিজের কৌতূহলের বশে অপরাধীর পিছু নিতে গিয়ে তাদের হাতে বন্দী হন। লছমীবাই কৃষ্ণাকে বন্দী করার পর তাকে প্রণবেশের সম্বন্ধে বলে --- "একদিক দিয়ে তিনি বোকাসোকা ভালো মানুষ, অন্যদিক দিয়ে এমন ভয়ানক যা কল্পনা করা যায় না। প্রথম রাত্রেই চৌরঙ্গীর বাড়ি থেকে আনবার সময় তিনি আমাদের দু'জন লোককে এমন জখম করেছেন --- যার ফলে তাদের বিছানা নিতে হয়েছে।"[২৯]

প্রণবেশেকে মাঝে মধ্যে অপরিণত, ছেলেমানুষ হিসেবে দেখিয়েছেন লেখিকা। এরফলে কিশোরী কৃষ্ণাকে তাঁর পাশে দাঁড় করিয়ে তাকে পরিণত প্রমাণ করা অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। ব্যোমকেশকে প্রণবেশের খবর জানাতে গিয়ে কৃষ্ণা বলে ---

> "আর বলেন কেন, এই এক বুড়ো খোকাকে নিয়ে সামলাতে সামলাতে আমার জীবন গেল। পরশু কোথা থেকে সাইকেল জোগাড় করে তাতে চড়বার চেষ্টা করছিলেন। না হোক পঞ্চাশবার বারণ করে বাইরে গেছি, দু'টি ঘণ্টাও যায়নি, ফিরে এসে দেখি সর্বনাশ ব্যাপার! মামাবাবু সাইকেল উল্টে পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গেছেন। তখনই ডাক্তার ডাকি। ডাক্তারের পরামর্শ মতো তাঁকে তখনই পাঠাতে হয় মেডিকেল কলেজে। দিব্য আরামে একটি কেবিনে হাতে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছেন আর কি।"[৩০]

প্রণবেশের ছেলেমানুষীর সঙ্গে তার সবকিছুতেই অপটু হওয়ার আভাস দিয়েছেন লেখিকা। সাইকেল থেকে পড়ে পা ভাঙ্গাই শুধু নয়, 'কৃষ্ণার অভিযান' কাহিনিতে পুরনো প্রসঙ্গ টেনে এনে কৃষ্ণা জানায়, সে যখন সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিল, তখন সাঁতার না জানার কারণে প্রণবেশ ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচাতে পারেনি। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অন্যলোকের কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়েছে। বলা বাহুল্য নিজের অপারগতা স্বীকার করে নিয়ে প্রণবেশ কৃষ্ণার কাছে নতী স্বীকার করেছেন --- "ভাগনী হলেও কৃষ্ণাকে তিনি বেশ একটু সমীহ

করে চলেন। তাঁর নিজের বুদ্ধির চেয়ে কৃষ্ণার জ্ঞান বুদ্ধি যে অনেক বেশি, তা তিনি স্বীকার করে চলেন। তাঁর নিজের বুদ্ধি নাই, ভাগনী কৃষ্ণার সাহসে তিনি দীপ্যমান"[৩১] ।

কৃষ্ণাকে তিনি যেমন সমীহ করেন, তেমন ভালোবাসেন। 'বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা' কাহিনিতে বম্বেমেল দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর কৃষ্ণার হদিশ না পাওয়ার ফলে প্রণবেশ খুব ভেঙ্গে পড়েন। লেখিকা জানান, তাঁর যে বিরাট বপু নিয়ে সবাই বিদ্রূপ করত, তা শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে।

কৃষ্ণার সব কাহিনি এক জায়গায় করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই চরিত্রটি নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখিকার যত্নের খামতি রয়েছে। যার ফলে তাঁর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আরেকটি সব সময় খাপ খায়না। কৃষ্ণাকে তিনি সমীহ করেন, একথা বিভিন্ন কাহিনিতে বারবার বলার পরও তাঁর মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য সামঞ্জস্যহীন। পার্ব্বতীবাইকে কিভবে দুষ্কৃতিরা কলকাতার ব্যাস্ত রাস্তা থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেল, তা নিয়ে কৃষ্ণার মা বিস্ময় প্রকাশ করতেই প্রণবেশ বলেন --- "মেয়েছেলেরা যত চালাক হোক, তারা মেয়েছেলে"[৩২]

এরপর কৃষ্ণা মনে করায় তাঁকেও একদিন এমন ভাবেই গুণ্ডারা অপহরণ করেছিল।

কৃষ্ণার ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রসঙ্গ বিভিন্ন কাহিনিতে বারবার এলেও প্রণবেশকে বিভিন্ন কাহিনিতে বারবার নাস্তিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শারীরিক ভাবে খুব বেশি শক্ত সমর্থ না হলেও যুক্তিহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন চরিত্র হিসেবে তাঁকে উপস্থাপন করেননি লেখিকা। কিন্তু 'কারাগারে কৃষ্ণা'তে হঠাৎ করে তাঁর চরিত্র অন্যরকম ভাবে দেখানো হয়। কৃষ্ণার দূরসম্পর্কের এক মাসি চিঠি লিখে তাঁর বিপদের কথা জানান। কৃষ্ণা যাওয়ার দিন ঠিক করার পর --- "লজ্জিত প্রণবেশ মাথা চুলকিয়ে বললেন, "না-না তা ঠিক নয়, কথাটা হচ্ছে – রবিবার নিষ্ফলা বার কিনা...."[৩৩]

প্রণবেশের মতো মানুষের মুখে এমন কথা বেমানান। 'কৃষ্ণার অভিযান' কাহিনিতে দেখা যায় কৃষ্ণা ফোর্থ ইয়ারের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন সাহায্য প্রার্থনা করে রাজেন্দ্রপ্রসাদ টেলিগ্রাম করেন। টেলিগ্রাম পাওয়ার পর কৃষ্ণা নিজের পরীক্ষার অজুহাত দিয়ে বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার ভান করলে প্রণবেশ রেগে যান। আবার 'কারাগারে কৃষ্ণা' কাহিনিতে সম্পূর্ণ তার বিপরীত রূপ। প্রণবেশের দূরসম্পর্কের এক বোন রুমা বিপদে পড়ে সাহায্য চেয়ে কৃষ্ণাকে চিঠি পাঠান। কৃষ্ণা তাঁকে সাহায্য করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে

প্রণবেশ বলেন, ---'কোন জাত তাও জানিনে, তবু আমাকে তার নাম গোত্র বলতে হবে এ হতেই পারেনা। কোথাকার কে পথের মেয়ে, কোন হারানো সম্পর্ক ধ'রে কিনা --"[৩৪]

সামগ্রিক ভাবে প্রণবেশ চরিত্রটিকে দেখলে তাঁর এই আচরণ তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান।

প্রণবেশ চরিত্রটি প্রায় সব কাহিনিতে উপস্থিত এবং কৃষ্ণা সিরিজের বেশ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কিন্তু তারপরও এই চরিত্র মানুষের মনে তেমন ভাবে দাগ কাটতে সক্ষম হয়নি। ব্যোমকেশ বক্সী সিরিজের অজিত, ফেলুদা সিরিজের তোপসে বা লালমোহন, কিংবা মিতিনমাসি সিরিজের টুপুর, বা দীপকাকু সিরিজের ঝিনুকের মতো সম আয়তনে উপস্থিত থেকেও প্রণবেশ পাঠক মনে দাগ কাটতে পারেননি। সামগ্রিক ভাবে এটি একটি মাঝারি চরিত্র হিসেবেই রয়ে গেছে। আলাদা উল্লেখযোগ্য কোনওকিছুই তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়না। এমনকি ছেলে মানুষী কিংবা বোকামির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। মূলত বাপ-মা মরা কিশোরীর অপরিণত অভিভাবকের এই চরিত্রের আর কোনও পরিচয় গড়ে ওঠেনি।

- ## ব্যোমকেশ

কৃষ্ণা সিরিজের প্রথম কাহিনি 'গুপ্ত ঘাতক' থেকেই ব্যোমকেশ উপস্থিত। এই সিরিজের সব কাহিনিতেই তাঁকে দেখা যায়। গোয়েন্দাদের বুদ্ধিকে উচ্চকিত করার জন্য পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বুদ্ধিহীন করে উপস্থাপন করার রীতি প্রায় সব গোয়েন্দা কাহিনিতেই দেখা যায়, কৃষ্ণা সিরিজও তার ব্যাতিক্রম নয়। কৃষ্ণার কোনও কাহিনিতেই তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় সেভাবে পাওয়া না গেলেও বেশিরভাগ কাহিনিতেই ব্যোমকেশকে খাটো করার চেষ্টা চোখে পড়ে। সত্যেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে কখনও তিনি কাজ করেছেন এমন ইঙ্গিত থাকলেও মূলত প্রনবেশের হাত ধরেই কাহিনির মধ্যে তাঁর আগমন। 'গুপ্ত ঘাতক'-এ ইউ-উইনকে নিয়ে যখন সত্যেন্দ্র খুব অস্থির হয়ে রয়েছেন, তখন প্রনবেশকে বলতে শোনা যায় ---

> "আমার এক বন্ধু সমরেশের সঙ্গে দেখা হল, সে বললে, তারই বড়ভাই নাকি বিখ্যাত ডিটেকটিভ, তাঁর নাম বললেই যে কেউ চিনবে, আপনিও চিনবেন । আমি ভাবছি, যদি তাঁকে এইসব তদন্তের ভার দেওয়া হয় --"
>
> ব্যাগ্র ভাবে মিঃ চৌধুরী বলিলেন, "তার নাম কি বল দেখি ?"

প্রনবেশ বলিলেন, "সমরেশের দাদার নাম ব্যমকেশবাবু। তিনি নাকি আপনার সঙ্গে কাজ করেছিলেন।"

......

প্রনবেশ বেশ গর্বের সঙ্গে বলিলেন, "এখানেই থাকেন পুলিশে তাঁর ভয়ানক নাম, ভয়ানক প্রতিপত্তি। যেখানে যার যে কাজ পড়ে, ব্যোমকেশবাবুই সব করে দেন।[৩৫]

১৯৩২ সাল (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) থেকে বাঙালি পাঠক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের সঙ্গে পরিচিত। ব্যোমকেশ বক্সী সিরিজের জনপ্রিয়তা শুধু সমকালেই নয় এখনও পর্যন্ত বর্তমান। বলা বাহুল্য সমকালেও এই এই সিরিজ জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিল। এই অতি জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্রের নামে একজন সরকারী গোয়েন্দাকে নির্মাণ করলেন লেখিকা, যদিও পদবিটা বদলে দিলেন। কৃষ্ণা সিরিজের ব্যোমকেশ বক্সী নন, তিনি ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। নামটা যে একেবারে কাকতালীয় ভাবে মিলে যায়নি কৃষ্ণার কথায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় --- "কৃষ্ণা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "রাগ কোরো না মামা, তোমায় ভালো কথাই বলছি, আবার ব্যোমকেশ নাম নিয়ে কোনও লোক তোমায় না ঠকায়, তাই আমি ভাবছি"।"[৩৬]

অতি জনপ্রিয় এক গোয়েন্দা চরিত্রের নাম নিয়ে একটি সরকারি গোয়েন্দা নির্মাণ করে তার পাশাপাশি কৃষ্ণার বুদ্ধি রহস্য উন্মোচনের ধরণ তুলে ধরে কৃষ্ণা চরিত্রটিকে পাঠক মনে বেশ যোগ্যতাসম্পন্ন গোয়েন্দা চরিত্র হিসেবে তুলে ধরার ইচ্ছা ছিল বলে মনে হয়। প্রভাবতী দেবী ব্যোমকেশ চরিত্রটির পরিচয় প্রথমে একজন ভালো সফল গোয়েন্দা হিসেবে দেখালেও পরবর্তী কালে আস্তে আস্তে তার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে থাকেন। শুধুমাত্র সহজ সরল বুদ্ধিহীন প্রণবেশের মুখেই তাঁর প্রশংসা নয়, লেখিকার নিজস্ব বয়ানেও তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, "ব্যোমকেশবাবু মিঃ চৌধুরীর পুরাতন বন্ধু। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন --- বেশ নামও করিয়াছেন"[৩৭]।

তবে এমন কথা বললেও প্রথম কাহিনী থেকেই তিনি চরিত্রকে সারবত্তাহীন করে তৈরি করেন। সত্যেন্দ্র চৌধুরীর হত্যা হওয়ার পর ব্যোমকেশ কৃষ্ণাকে আশ্বস্ত করেন : "ব্যোমকেশ গম্ভীর-হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কোনো ভাবনা নেই তমার মা, এ তোমাদের বার্মা-পুলিশ নয়, ক্যালকাটা-পুলিশ, দু-চারদিনের মধ্যে হত্যাকারীকে ধরে তবে ছাড়বে। হত্যাকারী সামনেই আছে, যখন খুশি ধরলেই পারি, কেবল কয়েকটা প্রমাণের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি"[৩৮]।

এমন আত্মবিশ্বাসের ছবি বারবার বিভিন্ন কাহিনিতে পাওয়া যায় ---

> গর্বিত ভাবে গোঁফে তা দিয়া লইলেন, বলিলেন, "এ কি আর যার তার কাজ মা, পুলিশে কাজ করে আমার চুল পেকে গেছে। এর চেয়ে বড় বড় খুন, চুরি-ডাকাতির কিনারা আমি করছি, অপরাধীকে ধরে এনেছি, সে সব ব্যাপারে কত যে মাথা ঘামাতে হয়েছে, তা আর কি বলব তমাকে। কত জায়গায় মরণাপন্ন হয়ে বন্দী হয়েছি, আবার কি রকম ফিকিরে যে পালিয়েছি, তাও বলবার মতো নয়; সে সব কথা বলতে গেলে একখানা মস্ত বড় বই হয়ে যায়।"[৩৯]

এই প্রসঙ্গে প্রনবেশ তাঁকে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লেখার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি বলেন যে খাতা-কলম নিয়ে বসে বসে লেখা তাঁর পোষায় না। প্রনবেশ যদি লেখে তাহলে তিনি বলতে পারেন। লক্ষণীয় এখানে ব্যোমকেশের কাহিনির আদল মনে পড়ে। ব্যোমকেশের গোয়েন্দা জীবনের গল্প যেমন ব্যোমকেশের বন্ধু আজিত লেখে তেমনই প্রনবেশকে তিনি অনুরোধ করেন।

তবে ব্যোমকেশকে লেখিকা প্রথম থেকেই একেবারে অপদার্থ করে বানান নি। ইউ-উইন তাঁদের বংশের যে নক্সার খোঁজ করছে, তার একটি নকল নিজের হাতে বানিয়ে ফেলেন। পরবর্তী কাহিনিগুলিতে ক্রমাগত ব্যোমকেশের প্রতি কৃষ্ণার শ্রদ্ধা কমতে থাকে। তার বাবার হত্যাকারী হিসেবে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া চাকরকে গ্রেফতার করার জন্য কৃষ্ণা ব্যোমকেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়। ব্যোমকেশ সম্পর্কে কৃষ্ণা মনে করে ---

> ব্যোমকেশের সহিত এই কয় মাস মিশিয়া তাহার মধ্যে সে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখিতে পায় নাই যাহাতে আশ্চর্য হইতে হয়। অতি সাধারণ একজন পুলিশ অফিসার যাহা করিয়া থকেন, তিনিও তাহাই করেন, সূত্র খুঁজিয়া অপরাধীকে ধরার প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই, অপরাধী যেন আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, হাতে কেবল হাতকড়া লাগানোর অপেক্ষা।[৪০]

বলা বাহুল্য কৃষ্ণা সম্বন্ধে ঠিক এই একই কথা বারবার মনে হয়। কিন্তু যেহেতু লেখিকা তাকে বুদ্ধিমান গোয়েন্দা হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তাই কৃষ্ণা সম্পর্কে তিনি এমনটা বলেন না। এবং কৃষ্ণাও নিজেকে ব্যোমকেশের চেয়ে অনেক বড় গোয়েন্দা ভাবে। এমনকি বিভিন্ন সময়ে তার বয়স অনুযায়ী পিতৃস্থানীয় ব্যোমকেশের সঙ্গে সে অভব্য

আচরণও করে। 'হত্যার প্রতিশোধ'-এ কৃষ্ণাকে বলতে দেখা যায় --- "আপনি একজন এতবড় ডিটেকটিভ হয়েও তার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলেন না কাকাবাবু ?"[৪১]

ইয়ং-চাংয়ের সৌভাগ্যের প্রতীক আংটি চুরি হওয়া প্রসঙ্গে কৃষ্ণা বলে যে মহীদল কোনও চাকরকে হাত করে ইয়ং-চাং এবং মা-পানের জলের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে তাদেরকে অচৈতন্য করে চুরি করেছে। কিন্তু ব্যোমকেশ এই মতের বিরোধিতা করে। পরে মা-পান জানায় তার খুব সতর্ক ঘুম, কিন্তু আগের রাতে কিছুতেই ঘুম ভাঙেনি, বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়েছে। এই ঘটনার পর লেখিকা ব্যোমকেশ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন --- "কৃষ্ণার তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁহাকে আহত করিয়াছে। তিনি মনে মনে একটু জ্বালা অনুভব করিতেছিলেন"[৪২]

বলা বাহুল্য গোয়েন্দা কাহিনির পাঠকদের কাছে এই সামান্য বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভাবতে পারা বেশ শক্ত। এবং এই বুদ্ধির জন্য কারো মনে জ্বালা হওয়া খানিক হাস্যকর বলেই মনে হয়। যাইহোক 'হত্যার প্রতিশোধ'-এর শেষ অংশে দেখা যায় ইয়ং-চাং তাঁর সৌভাগ্যের প্রতীক পারিবারিক আংটি ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যোমকেশের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেন। এরপর সরকারের তরফ থেকেও তিনি পুরস্কৃত হন এবং তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণাও।

'কলঙ্কী চাঁদ' কাহিনিতে দেখা যায় কৃষ্ণা নিজেই রহস্যের সমাধানে নামতে চায়। তার ধারনা জন্মায় যে --- "ব্যমকেশবাবু তার তদন্তের ফল নিয়ে নিজে প্রচার করে লোকের কাছে প্রশংসা অর্জন করতে চান, সে তা জানে। তাঁর নিজের যে বিশেষ কোনও ক্ষমতা নাই, তাও সে জানে।"[৪৩]

সেই কারণে প্রণবেশ যখন ব্যোমকেশকে জানায় যে পাশের বাড়ির চুরির সময় চোরকে কৃষ্ণা দেখেছে, এবং তাকে সে চেনে, কৃষ্ণা প্রণবেশের ওপর বিরক্ত হয়।

'মায়াবী ও কৃষ্ণা'তে ট্রেনে ধরমচাঁদের সঙ্গে ব্যোমকেশের আলাপ হয়। সেই মুহূর্তে ধরমচাঁদকে বিশেষ ভাবে সন্দেহজনক মনে না হলেও ব্যোমকেশ তাঁকে নিজের আসল পরিচয় দেন না। তিনি নিজের পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে তাঁর পরিচয় এবং উদ্দেশ্য গোপন রাখেন। ধরমচাঁদকে তিনি নিজের পরিচয় দেন ব্যাঙ্কের কর্মী হিসেবে, নিজের নাম বলেন হৃদয় চ্যাটার্জী। সুটকেসের ওপর 'ব্যোমকেশ' লেখা রয়েছে --- এই বিষয়ে ধরমচাঁদ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান --- সুটকেসটি আসলে তাঁর ভাইয়ের, তবে সে পুলিশের চাকুরে নয়, কলেজে পড়ে। বাড়ির চাকর জামা-কাপড় গুছিয়ে দেওয়ার সময় ভুল করে এই ব্যাগ দিয়ে দিয়েছে। তবে ধরমচাঁদের কথায় বোঝা যায় গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বশীল

অফিসার হিসেবে ব্যোমকেশের নাম আছে। ধরমচাঁদ বলেন --- "আপনার সুটকেশের উপর 'ব্যোমকেশ' নামটা রয়েছে কি না; আমি ভাবছিলাম অন্যরকম। মানে পুলিশের একজন বড় অফিসার সেই ব্যোমকেশবাবুই হবেন হয়তো"[৪৪]

এই কাহিনিতেই দেখা যায় রামরাও বলছেন --- অনেকদিন থেকেই তাঁর নাম শুনে আসছেন, কিন্তু সাক্ষাতের সৌভাগ্য এই আজ প্রথম হলো। 'বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা'তে দেখা যায় পুলিশ অফিসার মৃন্ময় ব্যোমকেশকে বলে --- "এ শুধু আপনারই গৌরব নয় ব্যোমকেশবাবু, এ আমাদের সমস্ত বাঙালি জাতির গৌরব যে আমাদের এই বাংলাদেশে আপনার মতো একজন সুদক্ষ পুলিশ অফিসার আছেন। বাস্তবিক আমরা যে কতখানি গর্ব্ব করি আপনাকে নিয়ে সে কথা আপনাকে বলে জানানো যায় না"[৪৫] ।

আসলে ব্যোমকেশকে লেখিকা সব জায়গাতেই হেয় প্রতিপন্ন করেননি, বরং অন্যদের কাছে তিনি সম্মানীয় আসনেই আছেন। কিন্তু তারপর তাঁর থেকে কৃষ্ণাকে আরও বিচক্ষণ প্রমাণ করে কৃষ্ণাকে তিনি বেশ অনেকটা উঁচু আসনে বসাতে চেয়েছেন। কৃষ্ণার অনেক ভুল সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায়, কলকাতার বাড়ির চোরা খুপরির সন্ধান দেওয়া থেকে বর্মায় গিয়ে ইউ-উইনের গাড়িতে উঠে বসা ইত্যাদি নানা রকম ভুল চোখে পড়লেও ব্যোমকেশের সঙ্গে যখন কোনও বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হয়, তখন কখনোই কৃষ্ণার ভুল হয়না। 'মুক্তি-পথে কৃষ্ণা'তে দেখা প্রনবেশের খোঁজ করার সময় একটি বাড়িতে সন্ধান চালানোর সময় কৃষ্ণা দৃঢ় কণ্ঠে বলে সেই বাড়িতেই প্রনবেশকে আটকে রাখা হয়েছিল। ব্যোমকেশ বিদ্রূপ করে বলেন, ওই বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণা রোমান্স খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু তারপর কৃষ্ণা প্রণবেশের চিঠি এবং কলম দেখিয়ে নিজেকে ঠিক প্রমাণ করে। বেশিরভাগ তদন্তের ক্ষেত্রেই দেখা যায় কৃষ্ণার সঙ্গে ব্যোমকেশের মতামত মিলতে চায়না। 'কৃষ্ণার জয়যাত্রা'তে দেখা যায় কোটিপতি ব্যাবসায়ী আদমজীর মৃত্যুকে পুলিশের তরফ থেকে আত্মহত্যা বলা হচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণা মনে করে এই মৃত্যুটি আসলে খুন। আদমজীর মেয়ে মিস রাবেয়ার অনুরোধে কৃষ্ণা এই কেসের তদন্তের ভার নেয়। এই প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ কৃষ্ণাকে বলেন --- "তুমি তদন্তের ভার নিয়েছ শুনে আমি খুশি হতে পারলাম না কৃষ্ণা, কারণ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমায় এ কাজের ভার নিতে হয়েছে। তোমার আমার সঙ্গে যে সম্পর্ক তাতে এ রকম বিপক্ষ মনোভাব কি ভালো?"[৪৬]

আসলে ব্যোমকেশ চরিত্রটি কৃষ্ণা সিরিজে ব্যাবহার করার মূল উদ্দেশ্য প্রাইভেট ডিটেকটিভের সরকারি সাহায্য যাতে কোনও ভাবে বিঘ্নিত না হয়। লেখিকা প্রথমে কৃষ্ণার পরিচয় দিতে গিয়ে জানান, সত্যেন্দ্র চৌধুরী মেয়েকে ছেলের মত করেই গড়ে তুলেছেন।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তেমনটা দেখাতে গেলে কাহিনি বাস্তবতার গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাই এক অর্থে ব্যোমকেশকে তিনি কৃষ্ণার সহকারী বানিয়ে ফেলেছেন বললে আত্যুক্তি হয়না। বেশিরভাগ কাহিনিতেই কৃষ্ণা অপরাধীদের হাতে বন্দী থেকেছে। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে রাস্তা চিনিয়ে পুলিশ বাহিনি ডেকে নিয়ে এসেছে, কিংবা প্রণবেশের অনুরোধে ব্যোমকেশ কৃষ্ণাকে খুঁজতে খুঁজতে সঠিক জায়গায় উপস্থিত হয়েছে। উপস্থিত হওয়ার পর অপরাধীদের বাগে আনার দায়িত্ব নিয়েছেন ব্যোমকেশ ও তাঁর বাহিনি। ব্যোমকেশকে খাটো করে কৃষ্ণাকে উচ্চকিত করা হলেও একথা মেনে নিতেই হয় ব্যোমকেশ পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির না হলে অপরাধ চক্রগুলিকে ধ্বংস করা সম্ভব হতো না।

❖ কাহিনি বিন্যাস :

প্রভাবতী দেবীর কৃষ্ণা কেন্দ্রিক রচনাগুলিকে একত্র করে ২০২০ সালে 'দেব সাহিত্য কুটির' 'গোয়েন্দা কৃষ্ণা' বইটি প্রকাশ করে। বইটিতে ১১টি কাহিনি সঙ্কলিত হয়েছে :

১ গুপ্ত ঘাতক

২ হত্যার প্রতিশোধ

৩ গ্রহের ফের

৪ কালঙ্কী চাঁদ

৫ কারাগারে কৃষ্ণা

৬ মায়াবী ও কৃষ্ণা

৭ কৃষ্ণার অভিযান

৮ কৃষ্ণার পরিচয়

৯ বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা

১০ মুক্তি-পথে কৃষ্ণা

১১ কৃষ্ণার জয়যাত্রা

এর মধ্যে প্রথম দুটি কাহিনি কৃষ্ণার গোয়েন্দা হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট। আশ্চর্য বিষয় 'কৃষ্ণার পরিচয়' কাহিনিটিতে কৃষ্ণার গোয়েন্দাগিরির পরিচয় একেবারেই অনুপস্থিত। এখানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে দেবাশীষ নামের এক যুবককে পাওয়া যায়। কাহিনির শেষে দৃশ্যে কৃষ্ণার উপস্থিতি চোখে পড়ে। বিলেত ফেরত ডাক্তার সোমেন জানান --- "শুভ্রা দেবীর মাসতুতো বোন কৃষ্ণা দেবী... এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন শুভ্রা দেবীর মন্ত্রী ও সহায়, অবশ্য সকলের অন্তরালে!"[৪৭]

আর কাহিনির শেষ স্তবকে দেখা যায় --- "এই কথা বলিয়া পর্দ্দার অন্তরাল হইতে হাস্যময়ী এক কিশোরীকে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া শুভ্রা দেবী বলিল, "এই কৃষ্ণা"..."[৪৮]

'কৃষ্ণার পরিচয়' নামক কাহিনিতে কেন অন্য আরেকজন গোয়েন্দা মূল ভূমিকায় রয়েছে এটি একটি আশ্চর্য বিষয়। পাশাপাশি প্রভাবতী দেবী গোয়েন্দা দেবাশীষকে নিয়ে কোনও সিরিজ রচনা করেছেন কিনা সে বিষয়ে কিছু জানা যায়না।

১১টি কাহিনির মধ্যে পুর্বোল্লেখিত তিনটি কাহিনি বাদ দেওয়ার পর যে আটটি কাহিনি বাকি পড়ে থাকে সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই অপরাধীদের পরিচয় ও অপরাধের ধরণ সম্বন্ধে জানা জরুরি।

কাহিনি	আপরাধীর পরিচয়	অপরাধের ধরণ
গ্রহের ফের	খাঁজাহান বাড়ি চট্টগ্রামে। অতি কুৎসিত চেহারার লোক। ১২ বছর বয়স থেকে জেলের সঙ্গে তার পরিচয়। বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সঙ্গে সে জড়িত। একটি ডাকাত দলের দলপতি, ছেলের চুরির ব্যাবসাও করে।	বসিরহাটের মহাকুমার শাসক (এস.ডি.ও) অতুল মিত্রের একমাত্র সন্তান দেবীপ্রসাদ মিত্রকে অপহরণ করে। মুক্তিপণ প্রথমে ১০ হাজার এবং পরে ২০হাজার টাকা দাবি করে। শিশু পাচারের উদ্দেশ্যে আরও অনেক শিশুকে অপহরণ করে। অনুসন্ধানে নামা কৃষ্ণাকেও বন্দী করে আরাকানে বিক্রির পরিকল্পনা করে।
কলঙ্কী চাঁদ	পান্না সিং বাড়ি পাঞ্জাবে। দ্বীপান্তরের কয়েদী। আন্দামান থেকে পালিয়ে এসেছে। অল্প বয়স থেকেই চুরি-জুয়াচুরি, পরবর্তী সময়ে ডাকাতি, নরহত্যা। রাজদ্রোহী – ভারতের অনেক খবর জাপান ও জার্মানকে জানায়।	সমর সিংকে দিয়ে মিঃ সেনের আয়রন চেস্ট থেকে মূল্যবান দলিলপত্র ও একটি মুক্তোর মালা চুরি করায়। মেয়ে রত্নাকেও অপহরণ করে। পরে পুলিশ অফিসার অমল চ্যাটার্জীর ভাইঝি প্রতিমা ও কৃষ্ণাকে বন্দী করে। কৃষ্ণাকে টার্কিতে নিয়ে

		গিয়ে সুলতানের কাছে বিক্রির পরিকল্পনা করে।
	মিঃ সেন (আসল নাম অমলেন্দু, পরে বদলে করেন কুমারেশ) বয়স ৪৫। জন্ম কলকাতায়। যৌবনে করাচিতে চলে যান। সেখানে ব্যাবসায়ী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। দিল্লি, কলকাতা, নিউইয়র্ক, ইংল্যান্ড, কেপটাউনেও তাঁর ব্যাবসা বিস্তৃত।	ম্যাট্রিক পাশ করার পর লাহোরে গিয়ে তাঁর ম্যানেজার মোহন সিংয়ের সঙ্গে অপরাধ কর্মে জড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন ধরনের অপরাধ কর্ম করেছেন তিনি। মোহন সিং কাবুলের আমির বাচ্চাই সাকোর কাছ থেকে একটি মুক্তোর মালা চুরি করে এনেছিল। মিঃ সেন তার কাছ থেকে সেটি হস্তগত করেন।
	সমর সিং অল্প বয়স থেকেই সে চুরি-জুয়াচুরির অপরাধে জেল খেটেছে। ডাকাতি, নরহত্যাও করেছে।	এই কাহিনিতে পান্না সিংয়ের নির্দেশে সে রত্নাকে মুক্তমালা পরা অবস্থায় অপহরণ করে।
কারাগারে কৃষ্ণা	মাও তুং/ আ-চিন সম্ভ্রান্ত ব্যাবসায়ী আউচি লিংয়ের একমাত্র সন্তান। পড়াশুনোর জন্য তিনি আমেরিকায় ছিল। পিতার মৃত্যুর পর ভবতোষ চৌধুরী সব সম্পত্তি দখল করে নিলে সে আ-চিন নাম নিয়ে কৃষ্ণাদের বর্মার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। উচ্চ শিক্ষিত হলেও স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে সে একেবারেই ভালো	ভবতোষ চৌধুরীর কাছ থেকে পিতৃ-সম্পত্তি উদ্ধার করার চেষ্টায় সে ভবতোষ চৌধুরীকে বন্দী করে তাঁর ওপর উৎপীড়ন চালায়। তাঁর মেয়ে রুমা আইনি সহায়তার চেষ্টা করলে তাকেও বন্দী করে। কৃষ্ণা এঁদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলে তাকেও বন্দী করে। [এই

	নয়। বিভিন্ন অপরাধ কর্মের সঙ্গে সে যুক্ত। বসন্ত হওয়ার কারণে তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়, এছাড়া মুখে অসংখ্য গর্ত হয়ে যাওয়ার দরুণ তাকে কদাকার দেখতে।	কাহিনিতে বলা হয়েছে কৃষ্ণার বাবা-মাকে সেই হত্যা করেছে, {পৃ. ২২০} কিন্তু 'গুপ্ত ঘাতক' এবং 'হত্যার প্রতিশোধ'-এ দেখা গেছে কৃষ্ণার বাবা-মাকে উই-উইন হত্যা করেছে।]
	ভবতোষ চৌধুরী বাংলা দেশের এক গ্রামের ছেলে। ছোট থেকে ডানপিটে, লোকের সঙ্গে ঝগড়া মারামারিতে ওস্তাদ। এই কারণে তাঁর বড় ভাই একদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। ভবতোষ মালয়ে গিয়ে আউচি লিং নামের এক সম্ভ্রান্ত ব্যাবসায়ীর কাছে চাকরি পান। ওখানের এক স্থানীয় মেয়েকে বিয়ে করেন, তাঁদের এক কন্যা সন্তান হয় – রুমা। এই রুমাই কৃষ্ণাকে চিঠি লিখে সাহায্য চায়।	আউচি লিংকে হত্যা করে জাল উইলের সাহায্যে প্রিতিপন্ন করেন আউচি লিং সব সম্পত্তি ভবতোষের নামে করে গেছেন, বিধর্মী পুত্রকে তাঁর কোনও কিছুই দেননি। এরপর রবার বাগান, কারখানা সব বিক্রি করে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করে তিনি ল্যাংটিংয়ে চলে আসেন।
মায়াবী ও কৃষ্ণা	অমরনাথ/ ধরমচাঁদ ভূপালের নামকরা দস্যু। বয়স ত্রিশ- বত্রিশ। 'ধনীর বিভীষিকা, দরিদ্রের পরম বন্ধু'। তের বছর বয়সে বিদ্যালাভের জন্য পিতৃহীন অমরনাথ পিতামহ দুনিচাঁদের সঙ্গে লন্ডনে গিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষিত, নিজের সম্পত্তি	রত্নাকে অপহরণ করেন, পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চান। পরে কৃষ্ণা তদন্তে নামলে তাকেও বন্দী করেন। তবে কৃষ্ণাকে বেশ খাতির করেই রাখেন। এমনকি সময় কাটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের বইয়ের জোগান দেন।

	থেকে বঞ্চিত। নেহওয়াল সিংয়ের কাছ থেকে নিজের পিতামহের হারানো সম্পত্তি উদ্ধারে বদ্ধপরিকর।	[রোহিণীতে বেনোয়ারীলালকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে মাত্র। আর কোনও গুরুত্ব নেই নেই এই খুনের।]
	নেহওয়াল সিং নেহওয়াল সিংয়ের শ্বশুর ধনপৎ সিং এককালে অমর নাথের পিতামহের জাহাজ কোম্পানিতে ক্যাশিয়ার ছিলেন। অসৎ উপায়ে ধনপৎ সিং দুনিচাঁদের সবকিছু নিজের নামে করে নেন। তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে নেহওয়াল সিং সব সম্পত্তির মালিক হয়ে বসে।	শ্বশুরকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে শ্বশুরের সব সম্পত্তি করায়ত্ত করেন।
কৃষ্ণার অভিযান	রাজা রাও মহাকালের মন্দিরের সেবায়েত বংশধর, মন্দিরের বর্তমান মালিক বলা চলে। শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার দলের লোক ছড়িয়ে আছে। তাকে ধরে দেওয়ার জন্য সরকার পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। গোঁড়া হিন্দু।ওই অঞ্চলের আদি-বাসিন্দারা সবাই তার অনুগত। ব্রিটিশ শাসনকেও	এই কাহিনির মূল সমস্যার সঙ্গে রাজা রাওয়ের অপরাধ কর্মের সরাসরি যোগ নেই। রাজা রাওয়ের অপরাধের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাও রাজা রাজের নিজের হাতে সঙ্ঘটিত হয়নি। রাজা রায় তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যারা পুলিশের কাছে খবর সরবরাহ করে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়, কিন্তু তাঁর

	সে তোয়াক্কা করেনা। নিজের ইচ্ছে মত কাজ করে।	লোকজন গোটা গ্রাম পুড়িয়ে দেয়।
	রাজেন্দ্র প্রসাদ পুরিতে কৃষ্ণাকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। বাড়ি পাটনায়। মস্ত কারবারি মানুষ, বড় জুয়েলার। কেবল রায়পুরে নয়, বম্বে, নাগপুর, জব্বলপুরেও তাঁর জুয়েলারি দোকান আছে।	রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক পূজারীকে দিয়ে মহাকালের মঙ্গল-চক্র চুরি করান। নিজের কাছেই রেখে রটিয়ে দেন সেটি চুরি হয়েছে। স্ত্রী-পুত্রকে আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে রেখে পুলিশ ও কৃষ্ণাকে জানান যে রাজা রাও তাদেরকে অপহরণ করেছে।
বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা	আলি মহম্মদ লাহোরের অধিবাসী, অমানুষিক কার্য-কলাপের জন্য পাঞ্জাবে পরিচিত। সেখানকার পুলিশ তাকে ধরে দেওয়ার জন্য দুহাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।	আলি মহম্মদ ও রজনী দত্ত একসঙ্গে নারী পাচারের জন্য সুন্দরী মেয়েদের বন্দী করে তাদেরকে টার্কি কিংবা আরবে পাচার করে। বম্বেমেল দুর্ঘটনায় ট্রেনে থাকা কৃষ্ণা আহত হলে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাচার করার উদ্দেশ্যে আটকে রাখে।
	রজনী দত্ত বাংলার কুখ্যাত অপরাধী। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন ভালো ছাত্র ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।	

	শিউলাল মিশ্র মজঃফরপুর জেলার লোক। লোটা কম্বল সম্বল করে কলকাতায় এসে চার বছরের মধ্যে চারটি হোটেল খুলে ফেলে। আলি মহম্মদের দলকে টাকা দিয়ে সেই বাঁচিয়ে রেখেছে।	প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাবসায়ী দেবীপ্রসাদের স্ত্রীকে অপহরণ করে পাচার করার পিছনে উস্কানি দেয় শিউলাল মিশ্র।
মুক্তি-পথে কৃষ্ণা	লছমী ডাকাত দলের সর্দার সুন্দরলালের মেয়ে লছমী। বেথুন কলেজে পড়াশুনো করেছে। সেই সময়ে সুন্দরলালের বিষয়ে জানার জন্য কৃষ্ণা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল। কৃষ্ণার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সুন্দরলালের ফাঁসি হয়।	সুন্দরলালের মৃত্যুর পর আফিং ও কোকেনের চোরা ব্যাবসার ভার নেয় লছমী। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কৃষ্ণাকে শাস্তি দিতে চায়। কৃষ্ণাকে ডেকে আনার জন্য প্রথমে প্রণবেশকে বন্দী করে।
	সুচেৎ সিং এই দলের সদস্য। প্রকাশ্যে সস্তা রেস্টুরেন্ট চালায়। শান্তা তারই মেয়ে।	কোকেনের চোরা ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত। কৃষ্ণাকে চায়ের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বন্দী করে।
	আগারওয়ালা জাল নোট ছেপে বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া তার মূল কারবার। তাছাড়া লছমীর দলের সঙ্গেও সে যুক্ত।	কাহিনির মূল সমস্যাতে তার কোনও সক্রিয় ভূমিকা নেই। এতদিনের অপরাধের জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়।

কৃষ্ণার জয়যাত্রা	মিঃ রুস্তমজী স্যার আদমজীর ব্যাক্তিগত সচিব। বয়স প্রায় ৪০ বছর। ১৭বছরের রাবেয়াকে তিনি বিয়ে করতে চান।	আদমজী ইউরোপে থাকাকালীন তাঁকে হত্যা করে তাঁর জায়গায় তাঁর মতো দেখতে – ডিসুজাকে বসান রুস্তমজী। তাঁর মেয়ে রাবেয়ার সঙ্গে বিয়ে দিতে অস্বীকৃত হলে তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেন।
	ডিসুজা ভালো শিকারি ছিল। আদমজীর সঙ্গে তার চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল। সেই কারণেই রুস্তমজীর ষড়যন্ত্রের ফলে সে আদমজী সেজে বসে।	স্যার আদমজীকে সে হত্যা করে।
	গোলাম মহম্মদ ডাকাত দলের সর্দার।	আদমজীর আরদালি সেজে তাঁর সঙ্গে ইউরোপে যায়। মিসেস আদমজীকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে। নওরোজীর খাবার জলে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে।
	নওরোজি স্যার আদমজীর একমাত্র সন্তান। তার মা ইউরোপীয় ছিলেন। ছেলের পড়াশুনোর জন্য তিনি ইউরোপেই থেকে গেছিলেন। আদমজী বছরে দুবার ইউরোপে গিয়ে তাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে	সত্যি ঘটনা জানানোর জন্য কৃষ্ণাকে বন্দিনী করে নিয়ে আসে। আবার সব জানানো হয়ে গেলে তাকে ছেড়ে দেয়।

	আসতেন। নওরোজী সেখানেই বড় হয়েছে। রুস্তমজীর ষড়যন্ত্রে তাকে জেল খাটতে হয়েছে। কিন্তু আসলে সে কোনও অপরাধ কর্মের সঙ্গে জড়িত নয়।	

কৃষ্ণার কাহিনিগুলিতে মূলত যে অপরাধগুলো উঠে এসেছে তারমধ্যে প্রধান হল অপহরণ বা বন্দী করে রাখা। প্রায় সব কাহিনিতেই কখনও না কখনও কৃষ্ণাকে অপরাধীরা বন্দী করেছে। কৃষ্ণা চরিত্র বিশ্লেষণের সময় তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কাহিনিগুলির কেন্দ্রিয় অপরাধের দিকে তাকালেও বোঝা যায় বন্দী করে রাখা বিষয়টি লেখিকা বারবার করে দেখিয়েছেন। 'গ্রহের ফের'-এ কিশোর দেবুকে, 'কলঙ্কী চাঁদ'-এ রত্নাকে, 'মায়াবী ও কৃষ্ণা'তে রত্নাকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়ার কথা রয়েছে। 'কারাগারে কৃষ্ণা'তে ভবতোষ চৌধুরী ও তাঁর মেয়েকে রুমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এই কাহিনিগুলির মূল অপরাধ এগুলিই। এর পাশাপাশি 'বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা'তে দেবীপ্রসাদের স্ত্রীকে, 'কৃষ্ণার জয়যাত্রা'য় রাবেয়াকে বন্দী করে রাখার চিত্র পাওয়া যায়, তবে এখানে বন্দী করা বিষয়টা প্রধান অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত নয়। 'কৃষ্ণার অভিযান'-এ অবশ্য এসবের বিপরীত ছবি পাওয়া যায়, এখানে রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজেই নিজের স্ত্রী সন্তানকে আটকে রেখে রটিয়ে দেন রাজা রাও তাদেরকে অপহরণ করেছে। 'মুক্তি পথে কৃষ্ণা' ও 'বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা' কাহিনি দুটির মূল অপরাধ কৃষ্ণাকে বন্দী করা। এখানে কৃষ্ণা গোয়েন্দার ভূমিকায় নেমে বন্দী হয়নি। এখানে তার বন্দী হওয়া একেবারেরই ব্যক্তিগত সঙ্কট। তবে এই ব্যাক্তি সঙ্কট থেকে বেরতে গিয়ে কৃষ্ণা বড় বড় অপরাধীদের ধরিয়ে দিয়েছে এবং অন্যান্য অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে। 'বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা'তে নারী পাচার চক্রের পরিচালকরা ধরা পড়ে আর 'বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা'তে কোকেনের কারবারি এবং জাল নোটের কারবারিরা ধরা পড়ে।

কৃষ্ণার কাহিনিগুলি একত্র করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কাহিনিগুলির মধ্যে খুব বেশি বৈচিত্র নেই। সব কাহিনির রহস্য ও রহস্যের সমাধান প্রায় কাছাকাছি। গোয়েন্দা কাহিনির সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয় খুনের তদন্ত, তা কৃষ্ণার একটি কাহিনিতে ধরা পড়েছে – 'কৃষ্ণার জয়যাত্রা'। আর অন্যের সম্পত্তি বেদখল করে ফুলে ফেঁপে ওঠার গল্প রয়েছে --- 'কারাগারে কৃষ্ণা', 'মায়াবী ও কৃষ্ণা', 'কৃষ্ণার অভিযান' এবং 'কৃষ্ণার জয়যাত্রা'তে। 'গ্রহের ফের'-এ যেমন শিশুপাচার প্রসঙ্গ রয়েছে, তারসঙ্গে তাল মিলিয়ে 'বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা'তে

রয়েছে নারী পাচার চক্রের প্রসঙ্গ। বলা বাহুল্য কৃষ্ণা সিরিজের কাহিনি সংখ্যা খুব বেশি নয়, আর তার পাশাপাশি অপরাধের বৈচিত্রও খুব বেশি নেই। এমনকি কৃষ্ণার তদন্তের ধরণের মধ্যেও কোনও বিশেষত্ব নজর কাড়ে না। কৃষ্ণার তদন্তের ধরনের মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কৃষ্ণার চিত্র সংগ্রহের ফাইল, এটিতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অপরাধীর ছবি ও অপরাধের সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। সুচেৎ সিং বা আউলিংয়ের সমস্ত রেকর্ড সেখানে রয়েছে। রহস্য সমাধানের জন্য কৃষ্ণাকে খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয়নি। কারণ বারবার সে সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে, তারপর সেই জাল থেকে বেরতে গিয়ে অপরাধীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জেনেছে এবং পুলিশকে খবর দিয়েছে। কৃষ্ণা যে সব অপরাধীদেরকে ধরিয়ে দিয়েছে তারা সবাই মস্ত বড় ক্রিমিনাল--- নারী পাচার, শিশুপাচার, আফিং- কোকেনের কারবারি, কিংবা অন্যের সম্পত্তি হাতিয়ে বসা বিরাট বড় ব্যাবসায়ী । একমাত্র 'কৃষ্ণার অভিযান' কাহিনিতে মঙ্গল চক্র নিজের কাছে লুকিয়ে রেখে সেটি চুরি হয়েছে বলা রাজেন্দ্রপ্রসাদ এতবড় দাগি অপরাধী নন। কোনও জটিল পরিস্থিতিতে কিংবা লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ যে কিভাবে অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তার পরিচয় কৃষ্ণা সিরিজে একেবারেই পাওয়া যায় না। বড় বড় সমস্যার সমাধান করার জন্যই কৃষ্ণাকে নির্মাণ করেছেন লেখিকা। সমকালে তা বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ বাংলা সাহিত্যের পাঠক এর আগে মেয়ে গোয়েন্দা দেখেনি। মানুষ তাৎক্ষনিক ভাবে মুগ্ধও হয়েছে। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে কৃষ্ণার নাম পাঠকের মন থেকে এবং বাংলা সাহিত্য জগত থেকে একটু একটু করে মুছে গেছে। এখনও কৃষ্ণার যতটুকু পরিচিতি তা ঐতিহাসিক কারণেই --- বাংলার প্রথম মেয়ে গোয়েন্দা হিসেবেই , উন্নত মানের গোয়েন্দা হিসেবে নয়।

❖ কুমারিকা সিরিজ

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে লেখিকা প্রভাবতী দেবী একটি নতুন গোয়েন্দা সিরিজ রচনায় হাত দেন। ‘দেব সাহিত্য কুটীর’—এর উদ্যোগে প্রকাশিত এই সিরিজটির নাম ‘কুমারিকা সিরিজ’। এই সিরিজে তিনি গোয়েন্দা অগ্নিশিখা রায়ের রহস্য সমাধানের কাহিনি বর্ণনা করতে থাকেন। এই সিরিজের মোট ১১টি বই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বহুদিন তার কোনও সংস্করণ বাজারে না থাকার কারণে প্রকাশ কালের বেশ খানিকটা পরের পাঠকের কাছে এই কাহিনিগুলি অজানাই থেকে গেছিল। ২০২১ সালে ‘দেব সাহিত্য কুটীর’ ‘কুমারিকা সিরিজ’-এর ১১টি কাহিনি নিয়ে ‘গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ’ বইটি প্রকাশ করে।

খুব সঙ্গত কারণেই এই সিরিজের আলোচনা করতে গেলে কৃষ্ণা সিরিজের সঙ্গে তুলনা করতেই হয়। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক লেখককেই দুটি আলাদা গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করতে দেখা যায়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা আলাদা পাঠকগোষ্ঠীর জন্য লেখা হয়ে থাকে। যেমন, সমরেশ বসু শিশু-কিশোর পাঠকদের জন্য ‘গোয়েন্দা গোগল’-এর কাহিনিগুলি সৃষ্টি করেন, আর বড়দের জন্য নির্মাণ করেন ‘গোয়েন্দা আশোক ঠাকুর’। আবার এমনও দেখা যায়, একই গোয়েন্দাকে নিয়ে লেখক কখনও বড়দের কাহিনি রচনা করেন আবার কখনও কিশোর সাহিত্য রচনা করেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতাকে নিয়ে প্রথম উপন্যাস প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য লিখলেও যখন ‘আনন্দবাজার পূজাবার্ষিকী’তে তাঁকে গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে হয়, তিনি নতুন চরিত্র নির্মাণ করেন না। শুধুমাত্র লেখার ধরণ পরিবর্তন করে তিনি কিশোর পাঠকদের কাছে প্রজ্ঞাপারমিতাকে ‘মিতিন মাসি’ রূপে হাজির করেন। কিন্তু প্রভাবতী দেবী সরস্বতী গোয়েন্দা কৃষ্ণার পর যখন গোয়েন্দা শিখাকে নির্মাণ করেন তখন তাঁর পাঠক গোষ্ঠী এবং কাহিনির ধরণ দুটো ক্ষেত্রেই বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। এই দুই সিরিজই তিনি তৎকালীন আধুনিক নারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য রচনা করেন।

কৃষ্ণার কাহিনিগুলি লেখার সময় লেখিকা প্রভাবতী দেবীর সামনে কোনও বাঙালি মেয়ে গোয়েন্দার উদাহরণ ছিল না। কিন্তু তিনি যখন ‘কুমারিকা সিরিজ’ রচনায় হাত দেন তখন তাঁর সামনে রয়েছে গোয়েন্দা কৃষ্ণার দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য কৃষ্ণা সিরিজের কাহিনির থেকে ‘কুমারিকা সিরিজ’-এর কাহিনি অনেক বেশি পরিণত। কিন্তু সমস্যা হল, তাঁর সামনে থাকা দৃষ্টান্ত আসলে তাঁর নিজেরই তৈরি চরিত্র। তিনি কাহিনির ক্ষেত্রে নিজের আগের

সিরিজকে অতিক্রম করে যেতে পারলেও চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তা পারলেন না। শিখাকে তিনি কৃষ্ণারই প্রতিচ্ছবি হিসেবে তৈরি করলেন।

অনুমান করা যায় কৃষ্ণা সিরিজের জনপ্রিয়তার পরে প্রকাশক তাঁকে আবার মেয়ে গোয়েন্দার কাহিনি লিখতে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণাকে নিয়ে প্রথম কাহিনি ‘গুপ্ত ঘাতক’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। আর তার প্রায় দু’বছর পর লেখিকা শিখা চরিত্রটি নির্মাণ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ‘কুমারিকা’ সিরিজ রচনায় সম্মতি দিয়ে তিনি একটি চিঠিতে প্রকাশককে লেখেন ---- “কুমারিকা সিরীজ নামটি অতি চমৎকার হয়েছে এবং এই নামটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এই নামটিই দেবেন”[৪৯]

এই সিরিজের নাম থেকেই অনুমান করা যায় একটি কুমারী মেয়ের কাহিনি বর্ণিত হতে চলেছে। তাই কৃষ্ণা যেমন বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু কৃষ্ণার ক্ষেত্রে যেমন বারবার সোচ্চার ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল, শিখার ক্ষেত্রে লেখিকা তেমন উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। তৎকালীন ‘নবকল্লোল’ পত্রিকার পাতায় ‘দেব সাহিত্য কুটীর’-এর বিজ্ঞাপনে দেখা যায় কৃষ্ণা এবং কুমারিকা সিরিজের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রকাশক এগুলিকে যে শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেন, তা হল --- *‘কলেজ গার্লদের ডিটেকটিভ উপন্যাস’*। ফলত দুটি চরিত্রই কলেজের ছাত্রী। শুধুমাত্র এইটুকু মিলই নয়, আরও বহুমিল রয়েছে এই দুই চরিত্রের মধ্যে, চরিত্র বিশ্লেষণে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে।

কৃষ্ণা এবং কুমারিকা সিরিজের সময়কাল সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার ধারনা পাওয়া মুশকিল। কারণ বইগুলি আলাদা ভাবে পাওয়া যায় না। কুমারিকা সিরিজের প্রথম বই অগ্নিশিখার চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল ১৫ই মার্চ, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম প্রকাশের দিক থেকে তা কৃষ্ণার পরবর্তী সময়ের হলেও কৃষ্ণা সিরিজের সব বই প্রকাশিত হওয়ার আগেই কুমারিকা সিরিজের ১১টি বই প্রকাশিত হয়ে যায়। সেই সময়ের ‘নবকল্লোল’ পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেখা যায় কৃষ্ণা সিরিজের ৯টি এবং কুমারিকা সিরিজের ১১ টি বইয়ের বিজ্ঞাপন একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। । অর্থাৎ, শিখার সব বই প্রকাশিত হয়ে গেলেও তখনও কৃষ্ণার দুটি বই প্রকাশিত হয়নি। ফলত আমরা বুঝতে পারি এই দুই সিরিজই লেখিকা সমান্তরাল ভাবে লিখেছেন। কিন্তু কেন তিনি একটি সিরিজ না লিখে দুটো আলাদা সিরিজ লিখলেন, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া ভার।

❖ গোয়েন্দা অগ্নিশিখা রায়

তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি কিশোরীদের সামনে একটি আদর্শ তুলে ধরার জন্য প্রভাবতী দেবী সরস্বতী অগ্নিশিখা চরিত্রটি বানিয়ে ছিলেন। তাঁর মনের কথাই 'দুর্গম পথে শিখা' কাহিনিতে প্রফেসর রাজকুমার সেনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেন ---"শিখার আদর্শে বাঙলার মেয়েরা উদ্বুদ্ধ হোক --- অন্যায়-অধর্মের বিরুদ্ধে চলুক তাদের অভিযান ! মঙ্গলময়ী নারী রূপে করুক তারা সমাজের মঙ্গল ---- দেশের মঙ্গল !"[৫০]

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্রচলিত 'মঙ্গলময়ী' নারীর যে ধারণা সেই আবর্ত থেকে আধুনিক নারীদের বের করে আনার জন্য, তাদেরকে ক্ষমতা সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যেই লেখিকার এই চরিত্র নির্মাণ। তাই শিখার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা কিংবা মঙ্গলময়ী রূপে দেশের মঙ্গল করার কথার মাধ্যমে লেখিকা নারীর 'মঙ্গলময়ী' বিশেষণের নতুন সংজ্ঞা খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

অগ্নিশিখা রায় এক কলেজ পড়ুয়া মেয়ে, সে বিজ্ঞানের ছাত্রী। তার বাবা মারা গেছে, মা বেঁচে রয়েছেন। কাকা মেজর অতুল কৃষ্ণ রায়ের কাছে সে মানুষ। কাকা- কাকিমার কোনও সন্তান না থাকায় শিখাই ওই পরিবারের একমাত্র সন্তান। জ্ঞান হওয়া থেকে বাবাকে সে দেখেনি। পিতৃতুল্য কাকা আসীম স্নেহে তাকে মানুষ করে তুলেছেন। তাঁর নিজের সন্তান নেই, শিখাই তাঁর সব। প্রথম কাহিনি 'অগ্নিশিখা' থেকে জানা যায় শিখার জন্ম হয়েছিল চট্টগ্রামে। সম্ভবত পড়াশুনোর জন্য সে একা কলকাতায় থাকে, আর তার দেখাশুনো করার জন্য সেখানে থাকে তার চারক রতন। 'শিখার সাধনা' কাহিনিতে দেখা যায় শিখার মা যোগমায়া দেবী ও কাকিমা অপর্ণা দেবী যশোর থেকে কলকাতায় এসেছেন। পরের দিকের কাহিনিতে তার মায়ের উপস্থিতি দেখা গেলেও প্রথমে কলকাতাতে সে একাই থাকত। রচনার সময়কালে একটি তরুণীর এভাবে একা থাকার ছবি বেশ অভিনব এবং এ থেকে তার সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নামকরণের ক্ষেত্রে লেখিকা বেশ দৃপ্ত নাম রেখেছেন। শিখার প্রকৃত নাম অগ্নিশিখা রায়। তার নাম সম্পর্কে লেখিকা লেখেন --- "অগ্নিশিখা চিরদিনই যা কিছু স্পর্শ করে --- দহন করে। এরা তা জানে না, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে মনে করেছে অগ্নিশিখাকে। জানেনা এই অগ্নিশিখাই একদিন সমস্ত পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করবে।"[৫১]

তবে অগ্নিশিখা নামটা আকারে বেশ বড় হওয়ার কারণে লেখিকা কাহিনির সব জায়গায় 'শিখা' বলে উল্লেখ করেছেন। আর উপন্যাসের বেশির ভাগ চরিত্র শিখাকে 'মিস রায়' বলে সম্বোধন করে। শুধু তার নামই নয়, মিঃ ব্রহ্ম, মেজর রায়, ইনস্পেক্টর গুপ্ত ইত্যাদি সম্বোধনের মধ্যে লেখিকার ঔপনিবেশিক প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু সম্বোধনের কথাতেই নয়, কৃষ্ণা বা শিখার গায়ের রঙ, তাদের ইউরোপিয় ছদ্মবেশ ধারণ নিয়ে লেখিকা যে উচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন, তা তাঁর ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিচায়ক।

লেখিকা এখানে নিজের বয়ানে শিখার শক্তি সামর্থের কথা না বললেও, মীরার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকের সামনে শিখার খানিক পরিচয় তুলে ধরেছেন ----

> শিখাকে মীরা ভালভাবেই চেনে। সাধারণ মেয়ে হতে এ মেয়ে একেবারেই পৃথক। বাল্যে সে পিতাকে হারিয়েছে, কাকা তাকে ছেলের মতই শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। মীরা জানে শিখার শারীরিক শক্তি অনেক বেশী। ছেলেদের মত সে দুর্দ্দান্ত, মেয়েদের মতো নুয়ে পড়ার ভাব তার মোটেই নেই। তার ওপর আছে তার কর্ম্মশক্তি, অসম্ভব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।[৫২]

সেই সময়ে দাঁড়িয়ে যেখানে সংসার সামলানো এবং সন্তানের জন্ম দেওয়াতেই মেয়েদের সার্থকতা খোঁজা হত, সেখানে একটি মেয়েকে শিক্ষিত করে তোলা, তার শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য শরীর চর্চা করানো, গুলি চালানো ইত্যাদি বিষয়গুলিকে 'ছেলেদের মতো' বলে আখ্যা দেওয়া একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু লেখিকা যখন 'মেয়েদের মতো নুয়ে পড়া স্বভাব' শব্দবন্ধটি ব্যাবহার করেন --- তখন মেনে নিতে হয়, ব্যাক্তিগত জীবনে তিনি যতই প্রতিষ্ঠিত, দৃঢ়চেতা নারী হন না কেন, আসলে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার জাল ছিঁড়ে তিনি বের হতে পারেননি। তবে শিখাকে নির্মাণ করার সময় তিনি সমাজ নির্ণীত ঘেরাটোপের মধ্যে শিখাকে আটকে রাখেন নি। সে সব ধরনের অস্ত্র চালাতে জানে, তার যখন সন্দেহ হয় যে আয়িমা তাকে ভুল রাস্তায় নিয়ে যেতে পারে, তখন দেখা যায় --- "ষ্টেনগান নামিয়ে রেখে কটিবন্ধ থেকে রিভলভারটা বার করে তার ললাট লক্ষ্য করে শক্ত কণ্ঠে বললে, "শোন, এতদূর এসে তুমি যদি ভরাডুবি করবে ভেবে থাকো, তার আগে আমি তোমায় খুন করব।"[৫৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কৃষ্ণার ক্ষেত্রেও কৃষ্ণার বাবা কৃষ্ণাকে বলেছিলেন, তাঁর ছেলে নেই, তাই তিনি কৃষ্ণাকে ছেলের মতো করে মানুষ করেছেন। শিখার ক্ষেত্রে আলাদা ভাবে তা বলা না থাকলেও শিখার কোনও দাদা বা ভাই নেই। ব্যাক্তিগত জীবনে অনেক ভাই-বোনের

মাঝে সাধারণ এক কন্যা সন্তান হিসেবে বেড়ে ওঠার আক্ষেপ হয়ত এক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল থেকেছে।

কৃষ্ণার কাহিনিতে লেখিকা বারবার জানিয়েছেন কৃষ্ণা অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু তার সব পারদর্শিতার ছবি কাহিনিগুলোর মধ্যে ফুটে ওঠেনি। শিখার কাহিনিতে লেখিকা সেভাবে বারবার শিখা কী পারে তার বর্ণনা না দিয়ে বরং বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পাঠককে তার বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। 'বিজয়িনী শিখা'তে দেখা যায় রমজান ডাকাতের দলের লোককে দেখার পর ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যান গাড়ি চালাতে ভয় পায়। তখন শিখা সেই ঘোড়ার গাড়ি চালাতে শুরু করে, জানায় চট্টগ্রামে থাকতে সে ঘোড়ার গাড়ি চালানো শিখেছে। পাশাপাশি তার শারীরিক সামর্থের পরিচয় দিয়েছেন লেখিকা। 'বিজয়িনী শিখা'তে সে গাছে শত্রুর ডেরা থেকে পালিয়ে যায়, 'অগ্নিশিখা'তে ছোরা দিয়ে শিক কেটে অপহৃত বন্ধু মীরাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে।

শিখার মধ্যে শুধু দৃঢ় আত্মবিশ্বাসই নয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঔদ্ধত্বের ভাবও লক্ষ করা যায়। 'বিজয়িনী শিখা'তে যখন পুলিশ তাকে মহারাজের গয়নার বাক্স চুরির সন্দেহ ভাজন হিসেবে গ্রেফতার করতে চায়, শিখা নিজের কার্ড দিয়ে বলে বলে --- "এই নিন আমার কার্ড --- আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে সাহায্য করে আপনার সুনাম বাড়াতে সাহায্য করব।"[৫৪]

কৃষ্ণার কাহিনিতে আমরা বারবার কৃষ্ণাকে বলতে দেখেছি, সে গোয়েন্দা নয়, সে মানুষের বিপদে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় মাত্র। কিন্তু শিখার ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। লেখিকা জানান ---"শিখা যে অবশেষে এই ডিটেকটিভ লাইনটাই বেছে নেবে তা কেউ ভাবতে পারেনি।"[৫৫]

শিখার সহপাঠীরা যখন অবাক হয়ে বলত---- "আমরা ভাবতেই পারিনি যে তুমি শেষপর্যন্ত ডিটেকটিভ হবে।"[৫৬]

শিখা তখন কৃষ্ণার মতো বিনয় না দেখিয়ে সরাসরি উত্তর দেয় ---

> "ছেলেবেলা থেকেই য়্যাডভেঞ্চারটা আমার ভাল লাগে। একটা বড় য়্যাডভেঞ্চারে নাম কিনে ফেললুম। পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট প্রচুর উৎসাহ দিচ্ছে। একটা বড় চাকরিরও অফার পেয়েছি। তবে আমি মনে করছি যে মাইনের চাকরি আমি নেবো না। হুকুম দিয়ে আমায় কেউ কোনদিন কাজ করাতে পারবে না, আমি যা করব আমার খুশি

> মতই করব। নিত্য-নূতন উত্তেজনার পিছনে ছুটতে কি যে আনন্দ তা যদি জানতে---”[৫৭]

অর্থাৎ, শিখা স্বীকার করে যে সে ডিটেকটিভ। আর মেয়ে হিসেবে সে বেপরোয়া, উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের। যে সময়ে মেয়েদের চাকরি করতে পারাটাও এক ধরণের স্বাধীনতা বলে স্বীকৃত হত, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে অন্য কারোর কথায় তাকে কাজ করতে হবে বলে সে চাকরি পেয়েও করতে চায়না। এমনকি তাকে এমন কথাও বলতে শোনা যায় যে, গোয়েন্দাগিরিও সে ছেড়ে দিতে পারে। তার গোয়েন্দাগিরি করতে ভালো লাগে বলে সে গোয়েন্দাগিরি করছে, যখন ভালো লাগবেনা তখন আর এই কাজ করবে না। অর্থাৎ, শুধুমাত্র নিজের জীবনে শর্তে বাঁচার আনন্দে সে বাঁচতে চায়, আর সেই কারণেই সে গোয়েন্দাগিরি করে। সংবাদ পত্রে শিখার সম্বন্ধে লেখা বের হয় ---

> কুমারী অগ্নিশিখা রায় চট্টগ্রামের মেয়ে এবং সায়েন্স কলেজের ছাত্রী। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় আমরা পুর্ব্বেই পেয়েছি। তাঁর খুল্লতাত মেজর অতুলকৃষ্ণ রায়ের নাম বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন। কুমারী অগ্নিশিখা স্বেচ্ছায় ডিটেকটিভের কাজ নির্ব্বাচন করে নিয়েচেন তাঁর জীবনে, সে জন্য তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। কুমারী রায় বাঙ্গালী মেয়েদের সামনে আদর্শস্থানীয়া হয়ে থাকুন, এবং দীর্ঘজীবন লাভ করে পরের হিতব্রত পালন করে যান এই কামনা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে করছি।[৫৮]

শিখার গোয়েন্দাগিরি করার ক্ষেত্রে কাকা মেজর রায়ের প্রথমে মন থেক সায় না থাকলেও তিনি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। যদিও এই খবর পড়ে তাঁর খারাপ লেগেছিল, উপহাস বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু সন্তান স্নেহে বড় করে তোলা ভাইঝিকে তিনি তার কাজ থেকে আটকানোর চেষ্টা করেন নি, কিংবা কখনও কোনও বিরূপ মন্তব্য করেন নি। কিন্তু শিখার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকই তাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে এবং ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ করতেও ছাড়েনি। শিখার কাকিমার ভাই সুরনাথ শিখার মাকে বলেন --- “তাই তো বড়দি তোমার মেয়ে মস্ত বড় ডিটেকটিভ হয়েছে গো। সেই যে সব ডিটেকটিভ, যাদের গল্পের বই আমরা পড়ি। তবে বাপু, মেয়ে ডিটেকটিভ একমাত্র কৃষ্ণা ছাড়া আর কাকেও দেখনি ! এবার দেখছি অগ্নিশিখা রায়ের ডিটেকটিভ-কাহিনী পড়তে হবে।”[৫৯]

তবে এসব ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করতে হলেও শিখার মা কিন্তু তাকে আটকানোর চেষ্টা করেননি। কিন্তু শিখার মামা বলেন,

"আমি তোমায় বলে রাখছি শিখা। তুমি হাজার লেখাপড়াই কর আর যত খুশি গোয়েন্দাগিরি কর, জেনো তুমি মেয়ে ছাড়া আর কিছু নও। যত কুচরিত্র লোকেদের পিছনে ঘুরে বেড়ানোর মন্দ দিকটা একবার ভেবে দেখেছ ? তুমি বড় হয়েছ তোমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে বাধা নেই কিছু। মেয়েছেলে কত বিষয়ে দুর্ব্বল --- তার ওপর তুমি ভরা-সমত্থ মেয়ে। তোমার এখন বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করবার বয়স।"[৬০]

তার উত্তরে শিখা বলে ---

"কিন্তু তোমার রমজানের দলকেও তো হটিয়ে দিলুম মেয়েছেলে হয়ে। তোমাদের মতে মত দিয়ে আজ ঘোমটা টেনে, বউ সেজে এলে, কি সর্ব্বনাশ হয়ে যেতো বলতো ? বদমায়েসের হাতে গৃহস্থের বউ-ঝিরা কি কখন পড়ে না ? কিন্তু সেই বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে কজন বউ-ঝি ?"[৬১]

কৃষ্ণার মধ্যে এই প্রতিবাদী মনোভাব থাকলেও তাকে এমন জোরালো ভাবে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। কৃষ্ণার প্রতিচ্ছবি হওয়ার পরও শিখা এখানে খানিকটা আলাদা হয়ে যায়। তবে সব ক্ষেত্রেই যে মেয়ে বলে তাকে বিদ্রূপের মুখে পড়তে হয়েছে কিংবা অপরাধীরা মেয়ে বলে তাকে সসম্মানে শুধুমাত্র গৃহবন্দী করে রেখেছে, এমন নয়। 'বিজয়িনী শিখা'য় দেখা যায় পুলিশ শিখাকে গ্রেফতার করতে চাইলে শিখার সঙ্গে যখন বচসা শুরু হয় তখন পুলিশের লোক শিখাকে হুমকি দেয় থানায় নিয়ে গিয়ে মেয়ে-পুলিশ দিয়ে শায়েস্তা করবেন। কিন্তু ওই সময়ে পুলিশে মেয়েদের যোগদানের বিষয় নিয়ে সংশয় রয়েছে। অন্যদিকে কৃষ্ণার কাহিনিতে মেয়ে অপরাধী থাকলেও কোনও পুরুষকে তার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে দেখা যায় নি।

একটি পেশাদার গোয়েন্দার সব বৈশিষ্ট্য থাকার পরও শিখাকে পেশাদার গোয়েন্দা বলা যায় না। কারণ, শিখা নিজের সম্পর্কে বলে --- "আপনারা আমাকে যা ভাবছেন আমি ঠিক তা নই, আমি সখের গোয়েন্দা। পারিশ্রমিকের কথা লিখেছেন, ও কথাটি আমাকে আর কখনও বলবেন না।"[৬২]

কিন্তু শিখা না চাইলেও গোয়েন্দাগিরির জন্য তার প্রাপ্তি নেহাত কম নয়। শুধুমাত্র সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া কিংবা পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে অস্টিন গাড়ি পাওয়াই নয়, 'শিখার সাধনা'য় হীরের নেকলেস উদ্ধার ও চোরকে গ্রেফতার করার জন্য আনন্দিলাল

শিখাকে পাঁচ হাজার টাকা দেন। রাজাবাহাদুর শিখাকে একটি অটোমেটিক পিস্তল উপহার দেন। 'শিখা ও সবিতা'য় শ্রীরামপুর জুট মিলের টাকা উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য মিলের পক্ষ থেকে তাকে একটি জড়োয়া নেকলেস দেওয়া হয়। 'রহস্যময়ী শিখা' কাহিনির শেষে মোহনচাঁদ তার মায়ের দামি মুক্তোর মালা শিখাকে দিয়ে যায়। তবে বেশিরভাগ কাহিনিতেই তার সম্মান অর্জন করার ছবি দেখা গেলেও আর্থিক লাভের চিত্র দেখা যায় না।

শিখার কাহিনিগুলি তার কলেজ জীবনের সময় থেকে শুরু হলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিখার জীবনের অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। 'দুর্গম পথে শিখা' কাহিনিতে দেখা যায় শিখার কলেজের স্টুডেন্ট ইউনিয়ন তাকে প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে সম্বর্ধনা জানানোর ব্যাবস্থা করেছে। বোঝা যায় লেখিকা শিখাকে নির্দিষ্ট একটি বয়সের মধ্যে আটকে রাখেননি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিখার চরিত্রগত পরিবর্তন কিংবা তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের মানুষের ব্যাবহারের পরিবর্তন চোখে পড়ে না।

শিখার বাবাকে আমরা কাহিনিতে দেখতে পাইনা। কিভাবে তিনি মারা গেছেন, তার উল্লেখও কোনও কাহিনিতে নেই। কৃষ্ণার ক্ষেত্রে আমরা প্রথম কাহিনিতে তাঁর হত্যার দৃশ্য দেখতে পাই। পিতার হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই অপরাধীর পিছনে সে ধাওয়া করে, তারপর অন্য মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এই পথকেই সে বেছে নেয়। কিন্তু শিখার ক্ষেত্রে বিষয়টা তেমন নয়। কৃষ্ণাকে তার বাবা মানুষ করেছিলেন 'ছেলের মতো' করে। কিন্তু শিখার বাবা নেই। শুরু থেকেই তাকে কলকাতায় একলা থাকতে দেখা যায়। তার ছোটবেলার কোনও বর্ণনাও কোনও কাহিনিতে নেই, যা থেকে বোঝা যায় শিখাকে কে এমন তুখোড় ভাবে মানুষ করে তুলল। পাশাপাশি শিখার মায়ের যে ছবি আমরা পাই তা তথাকথিত ঘরোয়া মায়ের ছবি। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে শিখাকে কেউ এভাবে গড়ে তোলেনি, নিজের ইচ্ছায় ও প্রচেষ্টায় সে নিজেই নিজেকে এমন ভাবে গড়ে তুলেছে। আর সেই কারণেই বোধয় সে কৃষ্ণার তুলনায় অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয়ী, সোচ্চার ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে।

- **রতন**

রতন শিখার চাকর। তবে তার সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক মালিক-চাকরের সম্পর্কের মতো নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তা আত্মীয়তার জায়গায় পৌঁছে গেছে। শিখার সবকটা কাহিনিতেই রতনের উপস্থিতি রয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রেই রতন তাকে তার কাজে সহায়তা করেছে।

বিশ্বযুদ্ধের সময় শিশু রতন তার পরিবারকে হারায়। মেজর রায় রতনকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে ওই পরিবারেই রয়ে গেছে। বাড়ির চাকর হলেও সে শিখার ভাইয়ের মতো হয়ে উঠেছে। এই পরিবার ছাড়া তার আত্মীয় পরিজন কেউ নেই। শুধু একটি কাহিনিতে তার দূর সম্পর্কের মাসি-মেসোর সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তাদেরকে দেখা যায়নি।

'অগ্নিশিখা' কাহিনিতে দেখা যায় রতন অপরাধীদের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়। নাহলে রহিমের মতো তারও গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হত। মাংপো তাকে মীরার মুক্তিপণের টাকা আনার দায়িত্ব দেয়। শিখা পালানোর সময় অপরাধীরা যখন শিখাকে খুঁজতে থাকে তখন রতন শিখাকে খুঁজে পায় এবং তার হাতে গুলি ভরা রভলভার তুলে দেয়। কাহিনির শেষে শিখা জানায়, রতন যদি তাকে রভলভার না দিত তাহলে সে কিছুতেই অপরাধীদের সঙ্গে পেরে উঠত না। তাই মীরার বাবা স্যার অশোক মিত্র জানান, শিখার সঙ্গে রতনকেও সরকারের তরফ থেকে পুরস্কৃত করা হবে। 'বিজয়িনী শিখা'তে দেখা যায়, শিখা রতনকে বলে --- "তোমার রিভলভারটা তুলে নাও রতন, --- এ দু'জনকে গুলি করতে আমার রিভলভারই যথেষ্ট, তবুও তোমারটা প্রস্তুত রাখো---"[৬৩]

একথা এক মালিক তার ভৃত্যকে বলছে, একথা ভাবতে পারা কঠিন। বরং মনে হয় এক গোয়েন্দা তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে নির্দেশ দিচ্ছে। তারপর ডাকাত দলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর শিখা যখন নিজেই ঘোড়ার গাড়ি চালাতে শুরু করে, তখন রতন রিভলভার হাতে তার পাশে সতর্ক হয়ে বসে থাকে। 'দুর্গম পথে শিখা' কাহিনিতে শিখার সঙ্গে ইনস্পেক্টর বিমলেন্দু থাকলেও রতন শিখার সঙ্গে বম্বেতে মেজর রায়ের কাছে যায়। শুধু এই কাহিনিতেই নয়, শিখার প্রতিটি ট্রেনের যাত্রাতেই রতন তার সঙ্গী হয়েছে। আর অনেক ক্ষেত্রেই সে নিজের অজান্তেই শিখার অ্যাসিস্ট্যান্টের ভূমিকা পালন করেছে।

- ## মেজর অতুল কৃষ্ণ রায়

অনেকগুলি কাহিনিতে তাঁর উল্লেখ থাকলেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে পিতৃহীন শিখাকে তিনি যত্নে বড় করে তুলেছেন। শিখার ক্ষেত্রে 'মেজর রায়ের ভাইঝি' পরিচিতিটাও বেশ সুবিধেজনক হয়ে উঠেছে। এই কারণেই পুলিশের বড় পোস্টে থাকা মানুষদের সঙ্গে তার সহজ সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। তবে কাহিনিগুলিতে

তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি বিশেষ নেই। ‘শিখার আবিষ্কার’ কাহিনিতে বিষ প্রয়োগের ফলে মেজর রায়কে অসুস্থ অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। ‘শিখার কালরাত্রি’ কাহিনিতে তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য পুরীতে গেলেও খানিক সুস্থ ছিলেন। কিন্তু তারপর আবার তাঁকে অসুস্থ, শয্যাশায়ী অবস্থায় দেখা যায়। প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁর উপস্থিতি খুব কম হলেও কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর নেপথ্য ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

- ## যতীন্দ্রনাথ বসু

শিখার বেশির ভাগ কাহিনিতেই ইনস্পেক্টর যতীন বোসের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় । ‘রহস্যময়ী শিখা’তে দেখা যায় দমদম থেকে মোটরে করে ফেরার সময় দুষ্কৃতিরা গুলি ছুঁড়ে গাড়ির চাকা ফাটিয়ে দেয়। তারপর মারামারির সময় লাঠি দিয়ে মেরে যতীন্দ্রনাথের মাথা ফাটিয়ে দেয়। তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ‘শিখা ও রাজকন্যা’ কাহিনিতে গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে অবনীশ ও তিনি আহত হন। তারপর তাঁকে মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়াও বাকি কাহিনিগুলিতে তিনি ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় শিখাকে নানা রকম সাহায্য করেন।

- ## বিমলেন্দু চৌধুরী

তরুণ পুলিশ অফিসার। শিখার মামার বাড়ির দিক থেকে একটা সম্পর্ক আছে। শিখার মাকে সে মাসিমা বলে ডাকে। শিখা বয়সে তার থেকে ছোট হলেও শিখাকে সে ‘দিদি’ সম্বোধন করে। বেশিরভাগ সময় সে বাইকে করে বিভিন্ন জায়গায় যায়।

তার একটি কুকুর আছে, নাম পপি। ওর জন্ম স্কটল্যানণ্ড ইয়ার্ডে, ওর মা এখনও ওখানে কাজ করছে। বিমলের বড় সাহেব বিলেত যাওয়ার সময় তাকে দিয়ে গেছে। বিমল বলে সে গন্ধ শুঁকে অপরাধী ধরতে পারে। কিন্তু শিখা তা বিশ্বাস করেনা। বিভিন্ন কাহানিতে পপিকে নিয়ে শিখা উপহাস করে। কিন্তু কোনও কাহিনিতে পপির সক্রিয় ভূমিকা পাওয়া যায় না। সম্ভবত সেই সময় কুকুরকে দিয়ে অপরাধী শনাক্তকরণের চেষ্টা ভারতীয় পুলিশ বাহিনিতে ছিল না। তাই লেখিকা বারবার শিখার মুখ দিয়ে উপহাস করিয়েছেন।

তবে বিমলেন্দুর শিখার প্রতি কোনও বিদ্বেষ বা বিরূপ মনোভাব নেই। সে সবসময় শিখার প্রশংসা করে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী অনেক কেসে তাকে সাহায্য করেছে।

- দেবাশিষ

এই চরিত্রটি এই সিরিজের উল্লেখ যোগ্য চরিত্র নয়, শুধুমাত্র একটি কাহিনিতেই তার উপস্থিতি। তাও নামটা দেখে থমকে যেতে হয়। 'শিখার কালরাত্রি' কাহিনিতে তার পরিচয় সে শিখার বন্ধু মনীষার বর। কিন্তু ব্যাক্তি দেবাশিষের পরিচয় হল সে কলকাতা পুলিশে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। এই সিরিজে এই চরিত্রটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কিন্তু কৃষ্ণা সিরিজের 'কৃষ্ণার পরিচয়' গ্রন্থে দেবাশিষ নামের এক গোয়েন্দাকে দেখতে পাওয়া যায়। ওই কাহিনিতে দেবাশিষই মূল গোয়েন্দা। তাই এই দেবাশিষকে দেখে প্রশ্ন জাগে লেখিকা কি এই চরিত্রটিকে নিয়ে কোনও গোয়েন্দা সিরিজ লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন!

উপরোক্ত চরিত্রগুলি ছাড়াও শিখার কাহিনিতে উচ্চপদস্থ পুলিশের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ইনস্পেক্টর অমরেশকে অনেক কটা কাহিনিতে দেখতে পাওয়া গেছে। 'রহস্যময়ী শিখা'তে – ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বসন্ত গুপ্ত , চব্বিশ পরগণা পুলিশের সি আই ডি ইনস্পেক্টর মণীশ চৌধুরী, 'শিখার কালরাত্রি'তে ইনস্পেক্টর অবনীশ মজুমদার। 'শিখার ছদ্মবেশ'-এ দেখা যায় গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমশনার মিঃ প্রভাত মিত্রকে। তিনি বয়সে তরুণ, সুনাম আছে। তাঁর কর্ম দক্ষতায় খুশি হয়ে সরকার তাঁকে বিশেষ বৃত্তি দিয়ে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন গোয়েন্দা বিভাগীয় কাজে অভিজ্ঞ হয়ে আসার জন্য। 'শিখা ও রাজকন্যা'তে চব্বিশ পরগণার পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট মিস্টার নিকোলাস রাসবিহারী ব্রহ্ম, শিয়ালদহ স্টেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মৃন্ময় গুপ্ত , পোর্ট পুলিশের পদস্থ অফিসার মিঃ চক্রবর্তী প্রমুখদের দেখা মেলে 'কুমারিকা সিরিজে'।

❖ নির্মাণ কৌশল

❖ কাহিনি বিন্যাস

'কুমারিকা সিরিজ'-এর কাহিনিগুলি বেশ মনোরঞ্জক কাহিনি। লেখিকা সুখপাঠ্য সহজ সরল ভঙ্গীতে কাহিনিগুলিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। একেবারে প্রথম পর্যায়ের মেয়ে

গোয়েন্দার গোয়েন্দাগিরি হলেও শিখাকে গোয়েন্দা হিসেবে খুব নিম্নমানের মনে হয়না। যদিও একথা ঠিক, পুলিশের সাহায্য না পেলে শিখা অনেক ক্ষেত্রেই রহস্য সমাধান করতে পারত না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা শিখাকে তদন্তে সাহায্য করার আর্জি জানাচ্ছেন। সব মিলিয়ে বলা যায় শিখার কাহিনিগুলিতে গোয়েন্দা এবং পুলিশের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে রহস্য সমাধান সম্ভব হয়েছে।

কাহিনি বুননের ক্ষেত্রে লেখিকা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন। 'কৃষ্ণা সিরিজ'-এর কাহিনির ক্ষেত্রে সম্পত্তি উদ্ধার এবং অপরাধীর কবল থেকে পালানোর বাইরে গিয়ে অন্য ধরণের কাহিনি তিনি রচনা করতে পারেন নি। কিন্তু 'কুমারিকা সিরিজ'-এর ক্ষেত্রে তিনি সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টায় তিনি আংশিক ভেবে সফল হয়েছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি কাহিনির নাম এবং চরিত্রের নাম বদল করে, পাশাপাশি কাহিনিতে সামান্য হেরফের ঘটিয়ে প্রায় একই গল্প বারবার পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

গোয়েন্দা কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখিকা প্রভাবতী দেবী কয়েকটি প্রসঙ্গ বারবার তাঁর বিভিন্ন কাহিনিতে উপস্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রে অপহরণ প্রসঙ্গের কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। গোয়েন্দা কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে এটিই লেখিকার সবচেয়ে পছন্দের বিষয়বস্তু বলে মনে হয়। কৃষ্ণা সিরিজের প্রায় সবকটি কাহিনিতেই এই প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। 'কুমারিকা সিরিজ'-এর 'অগ্নিশিখা' কাহিনিতে শিখা তার জন্মস্থান চট্টগ্রামে যায়, বন্ধু মীরা তার সঙ্গী হয়। এখানে যাওয়ার পর মীরা অপহৃত হয়। শিখা তাকে অপহরণকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। 'বিজয়িনী শিখা' কাহিনিতে রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে তাঁর সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর কাকা রামেশ্বর পাণ্ডে মরিয়া হয়ে ওঠেন। তিনি রাজাবাহাদুরের একমাত্র কন্যা রুমাকে অপহরণ করে লুকিয়ে রাখেন, শিখা তাকেও উদ্ধার করে।

কিছু ক্ষেত্রে শিখা নিজেও বন্দী হয়, 'দুর্গম পথে শিখা' কাহিনিতে ডাক্তার ইস্পাহানি তাকে বন্দী করে রাখেন। নিজের গবেষণার 'হিউম্যান ট্রায়াল' হিসেবে তাকে ব্যাবহার করেন। 'শিখা ও রাজকন্যা' কাহিনিতে রাজকুমারী রুমাকে সাহায্য করার জন্য এবং রাজা বাহাদুরকে দুষ্কৃতিদের জাল থেকে বের করার জন্য শিখা 'কুইন প্যালেস'-এ দাসী সেজে থাকতে শুরু করে। একদিন আড়ি পেতে কথা শোনার সময় সে অপরাধী লি চংয়ের হাতে ধরা পড়ে ও বন্দী হয়। 'রহস্যময়ী শিখা' কাহিনিতে শিখা যাতে তার বন্ধুর বাবা দৌলতরামকে সাহায্য না করতে না পারে তার জন্য মোহনচাঁদ তাকে বন্দী করে রাখে।

‘শিখার সাধনা’য় রাস্তায় গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটার পর দুনিচাঁদ আগরওয়ালা তাকে চিকিৎসা করানোর নাম করে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে বন্দী করে রাখে। ‘বিজয়িনী শিখা’য় তাকে মাঝরাতে ঘুমের ঘোরের মধ্যে মোটরে করে তুলে নিয়ে যায় রামেশ্বর পাণ্ডে এবং তাঁর শাগরেদ অসীম বোস।

এবার আসা যাক লেখিকার দ্বিতীয় প্রিয় বিষয়ে। সম্পত্তি বেদখল হওয়ার কাহিনি ‘কৃষ্ণা সিরিজ’-এর মতো এখানেও উপস্থিত। ‘শিখার সাধনা’ কাহিনিতে শঙ্কর রাও ইন্দিরা দেবীকে নিয়োগ করে মহারাজের সম্পত্তি নিজের কব্জায় করে ফেলেন এবং তাঁর একমাত্র পুত্র রাজকুমার পার্থ সিংকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কাঞ্চনগড়ের রাজ কুমার পার্থ সিংকে তার সৎমা মহারাণী ইন্দিরা দেবী মারার চেষ্টা করলেও সে বেঁচে থাকে এবং লুকিয়ে তাঁদের ক্রিয়া কলাপের ওপর নজর রাখতে থাকে। ইন্দিরা দেবী রাজা কে দমিয়ে রেখে তাঁর পরিচয়কে ব্যাবহার করে নানা অপরাধ করতে থাকে। এমনকি বিভিন্ন গহনার দোকান থেকে মূল্যবান গহনা চুরি করেন। শেষে শিখা চুরির রহস্য এবং শঙ্কর রাওয়ের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়। পার্থ সিং নিজের অধিকার ফিরে পায়। ‘রহস্যময়ী শিখা’ কাহিনিতে দেখা যায়, দৌলতরামের বাবা মোহনচাঁদের ঠাকুরদা রাজা বাহাদুরের দারোয়ান ছিলেন। রাজা বাহাদুর দৌলতরামকে পড়াশুনো শেখান, সুপারিশ করে পুলিশে চাকরির ব্যাবস্থা করে দেন। তিনি মোহন চাঁদের সঙ্গে দৌলত রামের পুত্র জয়নারায়ণকেও বিলাতে পড়াশুনো করতে পাঠান। বিলেত যাওয়ার আগেই মোহনচাঁদের বাবা মারা যায়। কর্মচারীদের ওপর সবকিছু দেখার ভার ছিল। ক্রমে মিথ্যে দেনার দায়ে মোহনচাঁদের সব সম্পত্তি নিলামে বিক্রি হয়। সে সম্পত্তি দৌলত রামের সম্বন্ধী কিনে নেন, আর পিছন থেকে টাকার যোগান দেন দৌলতরাম। সেই টাকা মোহনচাঁদের তহবিল থেকেই তিনি সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ, অন্যায় ভাবে মোহনচাঁদের সম্পত্তি তারা হাতিয়ে নেন। অন্যদিকে জয়নারায়ণ মোহনচাঁদের সই জাল করে তার বাকি অর্থ হাতিয়ে নিয়ে নিজের ব্যাবসা শুরু করে। পাশাপাশি তার মায়ের মুক্তোর মালাও চুরি করে। নিঃস্ব হওয়ার পর মোহনচাঁদ অপরাধ জগতের পরিচিত মুখ হয়ে ওঠে।

‘শিখা ও রাজকন্যা’ কাহিনিকে সরাসরি সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার কাহিনি বলা যায় না। তবে এখানেও রাজাবাহাদুরকে দুষ্কৃতিরা নিজেদের কব্জায় রাখে। তাদের অঙ্গুলি হেলনেই তিনি চলতে বাধ্য হন। রাজকুমারী রুমা ও তার পিতাকে দুষ্কৃতিদের জাল থেকে বের করার জন্য শিখা রুমার দাসী জাহ্নবী বাই সেজে কুইন প্যালেসে প্রবেশ করে। তারপর একদিন যখন লি চং রাজা বাহাদুরকে শাসাচ্ছে তখন আড়ি পেতে কথা শোনার সময় শিখা

তার হাতে ধরা পড়ে ওই প্রাসাদের একটি ঘরে বন্দী হয়। পরে লি চংয়ের চর সুধীরবন্ধু তাকে মুক্ত করে রঞ্জিতের সঙ্গে পুলিশের কাছে যেতে সাহায্য করে। শিখা লালবাজার থেকে পুলিশ নিয়ে এসে বাড়ি ঘেরাও করার বন্দবস্ত করে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা যায় অপরাধীরা বিজয়েন্দ্রকে হত্যা করেছে। বাড়ির তলার একটি ঘর থেকে নকল নোট, নোট জাল করার মেশিন, কোকেন উদ্ধার হয়। কিন্তু দলের মাথা লি চং ধরা পড়ে না। কিন্তু রায় বাহাদুরের ডায়েরী থেকে বিভিন্ন ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে হানা দিয়ে আউলিংকে ধরা হয়। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়, রুমার গভর্নেস মিসেস লিংয়ের দীর্ঘদিনের কারাবাস হয়। বিজয়েন্দ্রের মুখাগ্নির জন্য সুধীরবন্ধু এগিয়ে এসে জানায়, তাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হলেও সে একটি গাছে আটকে বেঁছে যায়। শেষ পর্যন্ত মূল অপরাধী লি চংকে পাওয়া যায় না, আউলিংকে গ্রেফতার করা হয়, বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

এই কটি কাহিনি পড়লে 'কুমারিকা সিরিজ'-এর কাহিনিগুলিকে প্রায় কৃষ্ণা সিরিজের ঘটনারই পুররাবৃত্তি বলে মনে হয়। কিন্তু লেখিকা এই সিরিজে 'কৃষ্ণা সিরিজ'-এর গতানুগতিকতা থেকে কাহিনিগুলিকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। 'শিখার আবিষ্কার' অভিনব কাহিনি। কোনও অপরাধ নয় নিজের দিদিকে আর্থিক সাহায্য করতে চেয়ে নিজের সন্তানকে অপহরণ করার ঘটনা সাজিয়েছেন এক আসহায় ব্যাক্তি। 'শিখার কালরাত্রি'তে গোয়েন্দা কাহিনির সঙ্গে মিশেছে গা-ছমছমে কাহিনি --- উগান্ডা থেকে আনানো দুটি বৃহদাকৃতির বাজ পাখিদের দিয়ে হত্যা কাণ্ড। 'শিখার ছদ্মবেশ' অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণীর হত্যা রহস্য কিংবা 'শিখার অগ্নি-পরীক্ষা'তে ব্যাবসায়ী শ্রীপতি গাঙ্গুলীর হত্যার তদন্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে লেখিকা নিজের কলমের অভিনবত্ব দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাই অন্য উপন্যাসগুলির কাহিনি বিন্যাসের দিকে একবার তাকানো প্রয়োজন।

'শিখা ও সবিতা'তে মাতাল শিবনাথ চোখের সামনে হত্যার দৃশ্য দেখে পুলিশের কাছে গিয়ে সব জানায়। এই কাহিনিতে প্রথম কাহিনির মীরাকে আবার দেখা যায়। রমাকান্ত অপরাধী দলের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করার জন্য খুন হয়ে যায়। শ্রীরামপুর মিলের টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তোলার পর নারায়ণের দল সেটাকে হাতানোর চেষ্টা করে। রাস্তার মাঝে বোমা ভর্তি ঠ্যালা গাড়ির সঙ্গে জুট মিলের ভ্যানের প্রায় ধাক্কা লাগানোর চেষ্টা করা হয়, তারপর ইচ্ছা করে ঝামেলা বাধিয়ে টাকা লুট করে দলের অন্য লোকেরা তাদের গাড়িতে করে চম্পট দেয়। শ্রীরামপুর গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নৌকো থেকে টাকা উদ্ধার হলেও শিখা রাণী ওরফে সবিতাকে ধরতে পারেনা। সবিতা কেন নিজের বরের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর দিয়ে

শিখাকে চিঠি দিয়েছিল, তা কাহিনিরে শেষেও স্পষ্ট হয়না। ধরে নিতে হয় শিখাকে এক ভুয়ো তদন্তে ব্যস্ত রাখার জন্য এই পরিকল্পনা করেছিল রাণী ওরফে সবিতা।

'দুর্গম পথে শিখা' কাহিনিতে মেজর অতুল কৃষ্ণ রায়কে সাপের বিষ প্রয়োগ করে অসুস্থ করে ফেলেন ডাক্তার ইস্পাহানি। তারপর শিখা সেখানে গেলে তাকেও বন্দী করে সাপের বিষ প্রয়োগ করেন, তারপর আবার এন্টিডোট প্রয়োগ করে সুস্থ করে তোলেন। শিখা শেখান থেকে পালানোর সময় এন্টিডোট চুরি করে নিয়ে পালায়। তার সাহায্যে মেজর রায় ভালো হয়ে ওঠেন। এই কাহিনির সঙ্গে উপকাহিনি হিসেবে রামেশ্বরের কাহিনি যুক্ত হয়। তার কাছ থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেলে ইস্পাহানি তাকেও অসুস্থ করে তোলে। তার ছোটছেলে জওহরলালকে কাজে লাগিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করলে সে তার দাদা সুন্দরলালের হাতে খুন হয়।

'শিখার আবিষ্কার' কাহিনিটি কুমারিকা সিরিজের একেবারে অন্যরকম স্বাদের কাহিনি। ধনী ব্যাবসায়ী নন্দলাল সিঙ্গীর একমাত্র সন্তান ব্রজদুলালকে অপহরণ করার হুমকি দিয়ে চিঠি আসতে থাকে। পুলিশ সব রকম ব্যাবস্থা নেওয়ার পরও অপহরণ আটকানো যায় না। তদন্ত করে শিখা জানতে পারে, আসলে নন্দলাল নামে ব্যাবসার মালিক, তাঁর শ্বশুরের ব্যাবসার আসল মালিক তাঁর স্ত্রী কাত্যায়নী দেবী। তাঁর দিদির সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখায় কাত্যায়নী দেবীর আপত্তি থাকায় নন্দলাল লুকিয়ে তাঁর দিদির বাড়িতে যান। ভাগ্নির বিয়ে এবং ভাগ্নের পড়াশুনোর জন্য টাকার ব্যাবস্থা করার জন্য নন্দলাল নিজের সন্তানকে অপহরণ করার নাটক করেন। শেষ পর্যন্ত শিখা কাত্যায়নী দেবীর কাছে তাঁর ছেলেকে তুলে দেওয়ার ফলে কাত্যায়নী দেবী যে টাকা দিতে চান তা শিখা নন্দবাবুর বোনের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাবস্থা করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজেও যে অর্থের মালিকানা নারীর হাতে থাকলে সেই সংসারের মাথা হয়ে উঠতে পারে, তার চিত্র দেখা যায়এই কাহিনিতে।

'শিখার কালরাত্রি' যতটা না গোয়েন্দা কাহিনি তারচেয়ে বেশি রোমাঞ্চ কাহিনি। মেজর রায়ের শরীরের অবস্থা ভালো করার জন্য পুরীতে যান সবাই। সেখানে যে বাড়িতে থাকা হয়, সেই বাড়িকে সবাই ভূতের বাড়ি বলে। খুন হওয়ার পরে মৃতদেহ রক্তশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় উগাণ্ডার দুটি বাজ পাখিকে লেলিয়ে দিয়ে এই খুন করানো হচ্ছে। শিখার রভলভারের গুলিতে দুটি পাখি মারা যায়। প্রভাবতী দেবী গোটা কাহিনি জুড়ে একটা গা-ছমছমে পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন ।

'শিখার ছদ্মবেশ' কাহিনিতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে রোজীর খুনের তদন্তে নেমে রাজা চন্দন সিংয়ের নিরুদ্দেশ হওয়ার রহস্য সমাধান করে ফেলে। পলাশগড়ের রাজা চন্দন সিংয়ের সঙ্গে মিঃ পোর্টারের মেয়ে রোজীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু রাজা চন্দন সিং দেনার দায়ে ডুবে ছিলেন। বিজয়পুর স্টেটের রাজকুমারী অনুলেখার সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা চলছিল। এদিকে বিলাসপুরের রাজা অজয় সিংও বিজয়পুরের রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চান। তাই বিজয়পুরের রাজাকে তিনি জানান পলাশপুরের রাজার প্রচুর দেনা রয়েছে। বিজয়পুরের মহারাজ জানান যদি চন্দন সিং সব দেনা পরিশোধের দলিলপত্র দেখাতে পারেন তাহলে মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে পারেন। সেই কারণে চন্দন সিং কলকাতার এক মাড়োয়ারি ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকা ধার নিয়ে অন্যান্য দেনা শোধ করার চেষ্টা করেন। ইচ্ছে ছিল, বিয়েতে পাওয়া প্রচুর যৌতুক--- প্রায় তিন কোটি টাকা থেকে পরে তা শোধ করে দেবেন। এবং টাকার জন্য এই বিয়ে করলেও পরে রোজীকেও তিনি বিয়ে করবেন। কিন্তু তার আগেই তাঁকে হত্যা করা হয়। শিখার ধারণা বিলাসপুরের রাজার প্ররোচনায় মিঃ পোর্টার চন্দন সিংকে হত্যা করেন। এমনকি নিজের মেয়ে রোজীকেও তিনিই হত্যা করেন। তবে এই কাহিনির শেষে রাজা চন্দন সিংয়ের হত্যা রহস্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পেলেও রোজির মৃত্যু সম্পর্কে শুধু অনুমান ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।

'শিখার অগ্নি-পরীক্ষা' কাহিনিটি অন্য সব কাহিনির থেকে আলাদা, এখানে ঘটনার ঘনঘটা নেই। নামকরা ব্যাবসায়ী শ্রীপতি গাঙ্গুলীর হত্যার পর কাহিনির সূত্রপাত। খুব দৃঢ় সংবদ্ধ কাহিনি। এখানে শিখা অপরাধীদের পিছনে ধাওয়া করেনা, শ্রীপতি বাবুর বাড়ির এবং ব্যাবসার লোকজনদের জেরা করে শিখা অসঙ্গতি গুলো জুড়ে জুড়ে আসল ঘটনায় পৌঁছোতে চায়। শেষ পর্যন্ত জানা যায়, শ্রীপতি গাঙ্গুলীর ব্যাবসার পার্টনার মনোহর চাটুজ্জে তাঁর অজান্তে ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা তোলেন, তিনি যখন ব্যাঙ্কের নোটিশ পেয়ে সবটা বুঝতে পেরে পুলিশকে জানাতে যান, তখন মনোহর তাঁকে হত্যা করেন। তারপর তাঁর কর্মচারীদের জন্য তুলে আনা টাকাও চুরি করেন। কুমারেশের তৎপরতায় বেহারিকে হত্যাকারী সাজানোর চেষ্টা চলে। এখানে অপরাধীকে ধরার ক্ষেত্রে শিখার কোনও ভূমিকা নেই। যদিও এখানে শিখার কৃতিত্ব দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আসলে রহস্যের সমাধান পুলিশই করেছে। কুমারেশের নজর পরীক্ষা থেকে তাদের ওপর নজরদার বসানো, সবই পুলিশ করেছে। শিখা সাবাইকে জেরা করে ঘটনার অসঙ্গতি ধরার চেষ্টা করেছে। ডেপুটি কমিশনর মনোহরের পিছু করার জন্য একটি লোককে নিয়োগ করেন। সে পিছু করে সব খবর এনে পুলিশকে জানালে পুলিশ মনোহর বাবুর সম্বন্ধী গোপেশ্বর ও

কুমারেশের সঙ্গে মনোহর বাবুকে গ্রেফতার করেন। এই কাহিনির সম্পূর্ণ জট যেমন সে ছাড়ায়নি, তেমনই কাহিনির শেষে তার কোনও প্রাপ্তির ছবিও নেই।

❖ অপরাধ ও অপরাধী :

গোয়েন্দা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গোয়েন্দার চরিত্র এবং কাহিনির প্রেক্ষাপট যতটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ অপরাধী চরিত্র নির্মাণ। গোয়েন্দার খ্যাতি ও কৃতিত্ব অপরাধী চরিত্রের ওপরেই নির্ভরশীল। অপরাধী চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মোটামুটি দু' ধরণের চরিত্রকে বেছে নিয়েছেন, তার মধ্যে এক ধরণের অপরাধীরা কুৎসিত ভয়ঙ্কর খুব নিম্নমনের মানুষ; অন্যদিকে এক ধরণের অপরাধী যারা কোনও ভাবে বঞ্চনার শিকার হয়ে বাধ্য হয়ে অপরাধ জগতে পা রেখেছেন। দ্বিতীয় ধরণের অপরাধীরা সচারাচর কম বয়সী, সুদর্শন, সুশিক্ষিত। আর একটি উল্লেখ যোগ্য বিষয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধী চরিত্রগুলি অবাঙালি। তবে এই ছকের বাইরেও কিছু অপরাধী চরিত্র তিনি নির্মাণ করেছেন। নিচের ছকে সব ধরণের অপরাধীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

কাহিনি	অপরাধীর পরিচয়	অপরাধের ধরণ
অগ্নিশিখা	মাংপো বংশানুক্রমে দস্যু। পূর্বপুরুষরা জলদস্যু ছিল। বাবার নাম লো-অন, নরহত্যা ও ডাকাতির অভিযোগে তার ফাঁসি হয়েছিল। বছরের কয়েক মাস, মাছ ধরার সময় সে চট্টগ্রামে থাকে। বঙ্গোপসাগরের সর্বত্র তার অবাধ গতি। ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের সময় তার ওপরে বঙ্গোপসাগরের উপকূল	ক) মাছের ব্যাবসার আড়ালে সে যে দস্যু একথা পুলিশ জানলেও, প্রমাণের অভাবে তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। খ) ভারত সরকারের বড় অফিসার স্যার অশোক মিত্রের মেয়ে মীরাকে অপহরণ করেছে। মুক্তিপণ হিসেবে ২০ হাজার টাকা দাবি করেছে।

	চৌকি দেওয়ার ভার দিয়েছে। কিন্তু তলে তলে সে জাপানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।	
	মা চীন মাংপোর সাগরেদ। তার ওপর ডাকাতি ও নরহত্যার কেস রয়েছে। সরকার তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।	মীরা ও শিখাকে বন্দী করে রাখার ক্ষেত্রে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
শিখার সাধনা	শঙ্কর রাও / ডাক্তার রবিশঙ্কর উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার। বিরাট অপরাধী দলের নেতা। আসল নাম শঙ্কর রাও। খুন, চুরি-ডাকাতি, চোরা-কারবার সবকিছুর হোতা।	ক) গরিব ঘরের মেয়ে ইন্দিরাকে খুঁজে এনে মহারাজের কাছে নিজের বোন পরিচয় দিয়ে দুজনের কাছে আসার সুযোগ করে দেন। খ) মরফিন ইনজেকশন দিয়ে মহারাজকে প্রায় অচৈতন্য অথর্ব করে রেখেছিলেন।
	ইন্দিরা দেবী সুন্দরী ছলনাময়ী নারী। মহারাজের দ্বিতীয় স্ত্রী।	ক) মহারাজের সেক্রেটারি হিসেবে আসেন। তারপর মহারাণী রুক্মিণীকে স্লো পয়জন করে মেরে ফেলে মহারাজকে বিয়ে করেন।

		খ) বম্বের জুয়ালারি ফার্মে ডাকাতি করান।
	দুনিচাঁদ আগরয়ালা শঙ্কর রাওয়ের ম্যানেজার। চালের কল, আটার কল, গেঞ্জির কল আছে।	জাল নোট ছাপেন।
বিজয়িনী শিখা	আসীম বোস বাবা সরকারী দপ্তরে বড় চাকরী করতেন। আসীম পড়াশুনোয় ভালো ছিল। কলেজে ঢুকে সে বিগড়ে গেল। বাবা মারা যাওয়ার পর সে দুহাতে বাবার টাকা ওড়াতে লাগল।	জাল নোট ছাপানোর কাজে সক্রিয় ভূমিকা ছিল । মহারাজের গয়নার বাক্স ডাকাতি করে নিয়ে যায়।
	রামেশ্বর পাণ্ডে ছোটবেলা থেকেই দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। সেই জন্য তাঁর পিতার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি ইউরোপে চলে যান। পিতা মহাদেব পাণ্ডে মারা যাওয়ার সময় তাঁকে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করে সব সম্পত্তি পূর্ণেন্দু নারায়ণের নামে করে যান। রামেশ্বরের দাবি ওই উইল জাল করে বানিয়েছেন পূর্ণেন্দু।	ভাইপোর কাছ থেকে সম্পত্তি হাতানোর জন্য তার কন্যা রুমাকে অপহরণ করে আটকে রাখে।

	পূর্ণেন্দুর পুত্র রাজা বাহাদুর। লন্ডনে একটি বিরাট দস্যুদল পরিচালনা করতেন। লণ্ডন পুলিশের তাড়া খেয়ে তিনি চলে যান আয়ারল্যাণ্ডে। সেখান থেকেও তাঁকে পালাতে হয়। সব জায়গায় তাঁর নামে ওয়ারেন্ট ঝুলছে। তারপর আসেন বম্বেতে।	
শিখা ও সবিতা	রাণী/ সবিতা মধুচক্রের মাথা	একটি ভাড়া বাড়িতে থেকে একটি মধুচক্র পরিচালনা করে।
	নারায়ণ বাবু ধরণের সাজে থাকেন। গিলে করা পাঞ্জাবি, চুনট করা কাঁচি ধুতি, পায়ে বার্নিশ করা লাপেট পড়েন। অন্যান্য অপরাধীদের চেয়ে আলাদা দেখতে।	অপরাধী দলের লিডার।
	হাসি লেডি টাইপিস্ট গোবিন্দ, ভবানী প্রসাদ, রেখা --- এরা রাণীর সাগরেদ।	শ্রীরামপুর কারখানার টাকা লেনদেনের খবর অপরাধীদের কাছে পৌঁছে দেয়।

রহস্যময়ী শিখা	মোহনচাঁদ বিহারের সমৃদ্ধ পরিবারের ছেলে। বয়স বেশি নয়, সুপুরুষ, চেহারার মধ্যে বনেদিয়ানার ছাপ আছে। বিয়ে পাশ করে লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে গেছিল। সেখানে জয়নারায়ণ তার সবকিছু অসৎ ভাবে হাতিয়ে নেয়। তারপর সে দস্যু আর্থার মুরের সঙ্গে দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। দেশে ফিরে এসে যুক্তপ্রদেশে দস্যু দলের সর্দার হয়ে ওঠে।	ক) পুলিশ অফিসার দৌলত রামের বাড়ি থেকে মুক্তোর হার চুরি করে। তবে সে মুক্তোর হার আসলে তার মায়ের, দৌলতরামের ছেলে জয়নারায়ণ চুরি করেছিল। খ) শিখাকে অপহরণ করে গ) দিল্লিতে ব্যঙ্ক লুট করে। ঘ) জাল নোটের কারবার করে।
	মুরারি সরকার বাঙালি হলেও ছোট থেকে আগ্রায় মানুষ।	দুই পুলিশ কনস্টেবলকে সে গুলি করে খুন করেছে।
	রাণী মোহনচাঁদের দলের কর্মী।	
	জয়নারায়ণ পুলিশ অফিসার দৌলতরামের পুত্র। লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পড়ে এসে ব্যাবসা শুরু করে।	লণ্ডণে থাকার সময় মোহনচাঁদের মায়ের মুক্তোর মালা চুরি করে। তার সই জাল করে তার সমস্ত টাকা তুলে

	মোহনচাঁদকে সারানোর জন্য সে একটি দল তৈরি করে। সেই দলের সাহায্যে নানা অপকর্ম করে মোহনচাঁদের নামে চালিয়ে দেয়।	নিয়ে দেশে এসে ব্যাবসা শুরু করে।
	গিরিধারী লাল দৌলতরামের সম্বন্ধী।	মোহন চাঁদের পারিবারিক সম্পত্তি সব হাতিয়ে নেয়। রটিয়ে দেয় তার বাবা সব বন্ধক রেখেছিল।
দুর্গম পথে শিখা	ডাক্তার ইস্পাহানি মস্ত ডাক্তার, থাকেন বোম্বাইয়ে। বিলেতে নানা রকম রিসার্চ করেছেন। তিনমাস হল দেওপুরাতে একটি বাংলো নিয়েছেন, সেখানে সাপের বিষ সম্বন্ধে রিসার্চ করছেন। ওই অঞ্চলের সাপুড়েদের কাছ থেকে চড়া দামে সাপ কেনেন। "বাবা আদ্দিস আবাবার মানুষ"। কাজের জন্য তিনি বোম্বাইতে থাকতেন, সেখানেই ইস্পাহানির জন্ম। কুৎসিত চেহারা।	ক) ইস্পাহানি অনেক ধরণের চুরি জালিয়াতি ছিনতাই ইত্যাদি তার দলকে দিয়ে করিয়েছে। খ) মেজর রায়কে সাপের বিষ দিয়ে অসুস্থ করে দেয়। গ) শিখাকে অপহরণ করে নিয়ে আসে। তার ওপরও সাপের বিষ প্রয়োগ করে।
	জালিম উত্তর ভারতের অধিবাসী। আগে মিলেটারিতে কাজ	

	করত, ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে ছিল। সে কাজে তার সুখ্যাতিও ছিল। তারপর তাকে বর্মায় যেতে হয়। সেখানে মেজর রায়ের তাঁবে কাজ করত। সে মিলেটারি কানুন ভেঙে অপরাধ করেছিল, সে জন্য মেজর রায় তাকে সাবধান করে দেন। আবার সে অপরাধ করলে মিলেটারি কানুনে তার সাজা হয়। তারপর বোম্বাইয়ে ডাক্তার ইস্পাহানির কাছে আশ্রয় পায়। ইস্পাহানি তাকে রামেশ্বরের হাতে তুলে দেয়।	ক) জালিম লেফটনান্ট এয়ার মার্শালকে গুলি করে মারে, মেজর রায়কেও আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। খ) ইস্পাহানির হয়ে নানা রকম অপরাধ কর্ম করত।
	রামেশ্বর রামেশ্বরের একটি দুর্দান্ত দস্যুর দল ছিল, তাদের লুটপাটের টাকাতেই রামেশ্বরের ব্যাবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। এক্ষেত্রে জালিম হয়ে ওঠে রামেশ্বর জালানের ডানহাত। চুরি, ডাকাতি, খুন এইসব করে বেড়ায়। ক্লাইভ স্ট্রীটের ডাকাতিও তার কাজ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সে কিছুদিন রামেশ্বর জালানের	সমাজের চোখে ব্যাবসায়ী সেজে থাকলেও তার দলকে দিয়ে চুরি ডাকাতি করাত।

	চিটাগং ব্রাঞ্চের জুট ডিপার্টমেন্টে কাজ করত।	
	সুন্দরলাল ব্যাবসায়ী রামেশ্বরের ছেলে। স্বভাব আচরণের দিক থেকে ভদ্র । বাবার ব্যাবসায় তার ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।	ভাই জওহরলাল সম্পত্তির ভাগ চাইতে আসলে তাকে গুলি করে হত্যা করে সুমুদ্রের জলে ফেলে দেয়।
শিখার আবিষ্কার	এই কাহিনিতে কাউকে সেভাবে অপরাধী বলা যায় না। নন্দলাল সিঙ্গী তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্য নিজের ছেলেকে অপহরণের ছক সাজান।	
শিখার কালরাত্রি	পরমেশ্বরী বহুবারের দাগী আসামী। জাল নোট তৈরি, সিঁধ কাটা নানা রকমের অভিযোগ আছে তার নামে।	ক) পুরুষোত্তম দাস নাম নিয়ে চালানী-কারবারের আড়ালে চোরা-কারবার চালায়। খ) আফ্রিকার উগাণ্ডা থেকে ওখানকার দু খানা বাজ পাখি আনায়। দু-তিনদিন উপবাসী রেখে তাদেরকে নির্দিষ্ট মানুষের ওপর লেলিয়ে দেয়। পাখি দুটো গলার নালি ঠুকরে শরীরের রক্ত খেয়ে নেয়।
	কিশোর দাস আগরওয়ালা ধনী ব্যাবসায়ী	আফিমের চোরা কারবার করেন।

	দুলি চাঁদ ভাড়াটে খুনি	এক হাজার টাকার বিনিময়ে পশুপতিনাথকে হত্যা করে।
শিখার ছদ্মবেশ	মিস্টার পোর্টার আগে পলাশগড়ের চাকরি করতেন। প্রায় দেড় বছর আগে তিনি বিলাসপুর স্টেটের চিফ সেক্রেটারি হয়ে চলে গেছেন।	ক) বিলাসপুরের রাজার প্ররোচনায় পলাশগড়ের রাজা চন্দন সিংকে হত্যা করেন। খ) সম্ভবত নিজের মেয়ে রোজিকেও হত্যা করেন।
	অজয় সিং বিলাসপুরের রাজা	রাজকুমারী অনিলিখাকে বিয়ে করার জন্য তাঁর প্রতিদ্বিন্দী রাজা চন্দন সিংকে হত্যা করান।
শিখার অগ্নি-পরীক্ষা	মনোহর চাটুজ্জে শ্রীপতি বাবুর পার্টনার এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ।	শ্রীপতি বাবুর নাম করে ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক লক্ষ টাকা তোলেন। শ্রীপতি বাবু সব জানতে পারার পর যখন পুলিশকে জানানোর জন্য ফোন করেন, তখন মরিয়া হয়ে তাঁর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন।
	কুমারেশ সেক্রেটারি । বাড়ি বাগবাজারে, সেখানে তাঁর মা থাকেন। এম। এ পাশ। ইংরেজি ভালো জানে। মন দিয়ে কাজ করে।	মনোহর চাটুজ্জের সব কাজের শাগরেদ।

শিখা ও রাজকন্যা	লি চং শিক্ষিত, সুপুরুষ, বয়স চল্লিশের মধ্যে। সামগ্রিক ভাবে তার মধ্যে আভিজাত্যের ছোঁয়া আছে। তার বাবা ছিল চিনা আর মা ছিল ইউরোপিয়ান। মায়ের আদল পাওয়ার জন্য তাকে ইউরোপিয়ান বলেই মনে হয়। পিকিংয়ের পুলিশ তাকে খুঁজছে, সে ভারতে এসে রয়েছে।	কোকেনের ব্যাবসা করে।
	আউলিং রাজাবাহাদুরের সেক্রেটারি, আসলে লি চংয়ের সাগরেদ। সে ও তার বোন মিসেস লিং রাজাবাহাদুর চীনে থাকার সময় যখন অসুস্থ হয়েছিলেন, সেবা করে তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।	ক) রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণকে সে পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। খ) রাজাবাহাদুরকে গুলি করে হত্যা করে।

❖ অস্ত্র প্রসঙ্গ :

শিখার কাহিনিতে বেশ অনেকগুলি হত্যার প্রসঙ্গ রয়েছে। 'শিখার কালরাত্রি'তে দেখা যায় দুটি বিশাল আকৃতির পাখিদের দু-তিনদিন অভুক্ত রেখে তাদেরকে মানুষের ওপর লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'দুর্গম পথে শিখা' কাহিনিতে ডাক্তার ইস্পাহানি সাপের বিষকে অস্ত্র হিসেবে ব্যাবহার করেছেন। আর এই কাহিনিতে পালিয়ে যাওয়ার সময় শিখা গুলি চালিয়ে কাঁচের ঘরগুলো থেকে বিষাক্ত সাপগুলোকে মুক্ত করে তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যাবহার করেছে। 'শিখা ও সবিতা'তে শিবনাথ ঘোষ লেকের ধারে যে খুনের দৃশ্য দেখে, সেখানে অস্ত্র হিসেবে ছুরি ব্যাবহার করা হয়। 'শিখার সাধনা'তে ডাক্তার রবিশঙ্কর মরফিন ইনজেকশন দিয়ে মহারাজকে প্রায় অচৈতন্য অথর্ব করে রেখেছিলেন। 'শিখার অগ্নি-পরীক্ষা'য় শ্রীপতি বাবু যখন পুলিশকে ফোন করেন, তখন মনোহর চাটুজ্জে মরিয়া হয়ে তাঁর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন। এই হত্যাগুলো ছাড়াও শিখার কাহিনিগুলিতে অনেক হত্যার দৃশ্য রয়েছে, আর তার বেশির ভাগটাই ক্ষেত্রেই অস্ত্র হিসেবে রিভলভার ব্যবহৃত হয়েছে।

❖ লড়াইয়ের দৃশ্য :

গোয়েন্দা কাহিনিতে গুণ্ডা, বদমায়েশদের উপস্থিতি থাকলেও সব সময়ে তাদেরকে খুব বেশি সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায় না। ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়ার পর গোয়েন্দা অন্য কারোর বয়ান থেকে জানতে পারেন, কেমন ভাবে মারামারি, গোলাগুলি চলেছিল। পাশাপাশি গোয়েন্দাকেও অনেক সময় সরাসরি মার-দাঙ্গায় জড়াতে দেখা যায় না। কিন্তু শিখার কাহিনিতে লেখিকা বেশ অনেক বার মারামারি , গোলাগুলির দৃশ্য পাঠকের সামনে সরাসরি তুলে ধরেছেন। 'শিখার সাধনা'য় লালবাজার পুলিশ অফিসের সামনে আততায়ী ইনস্পেক্টর জতীন্দ্রনাথের ওপর গুলি চালায়। 'বিজয়িনী শিখা'তে শিখা রমজান ডাকাতের লোক হামলা করলে এক ডাকাতের পায়ে গুলি করে। 'রহস্যময়ী শিখা'কাহিনিতে বড়বাজারে ঝুনঝুনালালের গদিতে ডাকাতি হয়। তিন লক্ষ টাকা নিয়ে বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। বোমার ভয়ে কেউ এগোতে সাহস পায় না। 'দুর্গম পথে শিখা' কাহিনিতে শিখা যখন প্রথমবার ইস্পাহানির কবল থেকে বেরিয়ে পালাতে যায়, তখন গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে এগোতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়। দ্বিতীয়বার পালাবার সময় সে সরাসরি জালিমের বুকে গুলি করে। তারপর যখন অনেক লোক তাকে ধরার জন্য ছুটে আসতে থাকে, শিখা সাপ

রাখা কাঁচের ঘরে গুলি করে, কাঁচ ভেঙে পড়ে সব সাপ বেরিয়ে পড়ে। শিখা এই সুযোগে পালিয়ে যায়। এই দৃশ্যগুলোর মাধ্যমে লেখিকা পাঠকের মনে বেশ টানটান উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

❖ তদন্তের ধরণ :

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী গোয়েন্দা শিখার কাহিনিগুলি রচনার ক্ষেত্রে বেশ নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। অনেক গোয়েন্দা কাহিনিতেই বিভিন্ন ঘটনার কারণ লিখেই লেখক দায়মুক্ত হন। কিন্তু লেখিকা এই কাহিনিগুলির ক্ষেত্রে সবিস্তারে গোয়েন্দার তদন্তের খুঁটিনাটি বর্ণনার চেষ্টা করেছেন। 'বিজয়িনী শিখা'তে শিখা রাজাবাহাদুরকে দেওয়া ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ সংগ্রহ করে নিয়ে কেমিক্যাল টেস্টের জন্য যতীন্দ্রনাথের কাছে পাঠায়। রিপোর্টে জানা যায় তাঁকে স্লো পয়জন করা হচ্ছে। সে কিভাবে সবার নজর এড়িয়ে সিরিঞ্জ সংগ্রহ করে তারপর সেটাকে কিভাবে সংরক্ষণ করে পরীক্ষার জন্য পাঠায়, তার প্রতিটা স্তরের বর্ণনা লিখেছেন লেখিকা। 'শিখা ও সবিতা' কাহিনিতে দেখা যায় :

> থানায় ফিরে এসে শিখা কেমিকেলগুলো খুব সাবধানে মিশিয়ে জলে গুলে একটা সলিউশন তৈরী করে নিল। তারপর জামাটা ভালভাবে সেই সলিউশনের জলে ডুবিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে জামার ওপর দু-রকম রঙের ছাপ ফুটে উঠল। একটা রঙ হল সাদা মতো, আর একটা রঙ হল ফিকে হলদে মত। ফিকে রঙটা ছাবকা ছাবকা হয়ে সারা জামায় ফুটে উঠেছে। লাল কালির একটা কলম দিয়ে শিখা ঐ ফিকে জায়গাটা বর্ডার টেনে মার্কা করে দিল। বলল, "এই জায়গায় রক্তের দাগ ছিল।"
>
> জামার বুকের কাছে আঙুল দিয়ে বলল, "এখানটাতে ছুরির ঘা পড়েছিল। যে লোকটা ছুরি চালিয়েছে, তার এনাটমির জ্ঞান আছে ভালই। একেবারে হৃদপিণ্ডের ওপরে গিয়ে পড়েছিল আঘাতটা। দুটো ঘা মারার আর দরকার হয়নি। সেও ভালভাবে জানত, একটা ঘা-ই মোক্ষম হয়েছে, ওতেই কাজ হাসিল হয়ে গেছে।"[৬৪]

'শিখার অগ্নি-পরীক্ষা' কাহিনিতে ঘটনার ঘনঘটা বিশেষ নেই। শ্রীপতি গাঙ্গুলী খুন হওয়ার পর তাঁর ভাইঝি শিখাকে তদন্ত করার অনুরোধ জানায়। প্রত্যেকটি চরিত্রকে জেরা করার মধ্য দিয়ে খুনের দিনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা চলতে থাকে। প্রতিটা জেরার বর্ণনা লেখিকা যথাসম্ভব নিখুঁত ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। আর শিখা প্রত্যেকের

বয়ানের মধ্য থেকে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা যুক্তিযুক্ত ভাবে বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেছে।

প্রভাবতী দেবী তদন্তের ক্ষেত্রে ছদ্মবেশ ধারণকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর রচনায়। শিখার বিভিন্ন কাহিনিতে তাকে ছদ্মবেশ ধারণ করে তদন্তে নামতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য এই ছদ্মবেশ ধারণ সবক্ষেত্রে বাস্তবানুগ বলে মনে হয়না। তবে কাহিনি বুননের সঙ্গে রসগত বৈষম্য সৃষ্টি করেছে বলেও মনে হয়না। ‘বিজয়িনী শিখা’তে রমিয়াকে বেঁধে ফেলে তার পোশাক পরে তার ছদ্মবেশে এঁটো বাসন নিয়ে বেরিয়ে যায়। ‘অগ্নিশিখা’ কাহিনিতে তার পাহারায় থাকা আ-পানের পোশাক পরে আ-পান সেজে সে শত্রুদের ডেরা থেকে পালায়। এই দুই ক্ষেত্রে তাকে পালানোর জন্য বাধ্য হয়ে অন্যের পোশাক পরে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হয়। তবে লেখিকা শুধু অন্যের পোশাক পরে তার চাল-চলন নকল করার বর্ণনাতেই থেমে থাকেননি। ‘শিখা ও সবিতা’তে খাকির ট্রাউজার, বুশকোট, মাথায় লোহার টুপি, কোমরে বেল্টের সঙ্গে রিভলভার এঁটে সে ছদ্মবেশ ধরে। বন্ধু মীরাও তাকে চিনতে পারে না। ‘শিখার ছদ্মবেশ’ কাহিনিতে বেশ কয়েকবার শিখা ছদ্মবেশ ধারণ করে। যেহেতু অ্যাংলো- ইণ্ডিয়ান সমাজের মধ্যে গিয়ে তদন্ত করতে হয়, তাই বারবার তাকে ইউরোপীয় ছদ্মবেশ ধারণ করতে দেখা যায়। লেখিকা বারবার তার ইংরেজি উচ্চারণ ও গায়ের রঙের কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, ইউরোপীয়র বেশে শিখা একেবারেই বেমানান নয়। কিন্তু বাঙালি মেয়ের স্বাভাবিক মুখ ভঙ্গিমা এবং উচ্চতাকে সে কিভাবে ঢেকে ফেলেছে, তা বুঝতে পারা শক্ত। বরং নিজের পেশাগত পরিচয় সংক্রান্ত ছদ্মবেশ অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। ‘শিখার আবিষ্কার’ কাহিনিতে শিখা মালতী রায়ের বাড়িতে ভোটার লিস্ট তৈরির জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছে – এই পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছ থেকে তাঁর পরিবার সংক্রান্ত সব তথ্য জোগাড় করে ফেলে। ‘শিখার অগ্নি-পরীক্ষা’তে শিখা মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী সেজে কুমারেশের বাড়িতে গিয়ে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারে কুমারেশ মিথ্যে কথা বলছে। খুনের পরের দিন সে মায়ের নিউমনিয়ার কারণে বাড়িতে আসেনি, এসেছিল অন্য কোনও কারণে। কুমারেশের মাও সরকারি তৎপরতায় মুগ্ধ হন। এই চিত্র পাঠকের মনে কোনও অবিশ্বাসের জন্ম দেয় না।

❖ পুলিশের ভূমিকা :

গোয়েন্দা কাহিনির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, চালাক গোয়েন্দা ও বোকা পুলিশের উপস্থিতি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশের অপরাধীকে হাতকড়া পারানো ছাড়া আর কোনও ভূমিকা থাকে না। কিন্তু শিখার কাহিনির ক্ষেত্রে গোয়েন্দা ও পুলিশ উভয়ের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়।

'শিখা ও সবিতা' কাহিনিতে একটি হত্যার পর পুলিশের তদন্ত চিত্রে দেখা যায় ---

> জুনিয়র অফিসার হঠাৎ বলে উঠল, "মোটরের চাকার দাগ পেয়েছি স্যার --- এই যে স্পষ্ট রয়েছে।"
>
> বড়বাবু পকেট থেকে একখানা ম্যাগ্নিফাইং-গ্লাশ বের করে ঘাসের ওপরটা পরীক্ষা করলেন। বললেন, "হ্যাঁ দেখছি গারিখানাকে এইখানে ঘোরানো হয়েছিল। আর চাকার দাগের ওপর দাগ রয়েছে --- একই চাকার দাগ। মনে হয় দু-একবার ব্যাক করেছে আবার এগিয়েছে ---- তবে এখানটা থেকে মোড় ঘুরিয়েছে, বেশ বঝা যাচ্ছে। একটা ফটো তুলে নাও দাগগুলোর।"[৬৫]

ঠিক এর উল্টো ছবিও দেখা যায় 'রহস্যময়ী শিখা' কাহিনিতে। পুলিশি তৎপরতা দেখানোর বদলে পুলিশ কমিশনার মিস্টার গুপ্ত শিখাকে বলেন, কলকাতা জাল নোটে চেয়ে গেছে। দিল্লি থেকে ডিটেকটিভ অফিসার লাল সিং আসছে সাহায্য করার জন্য। তাতে বাংলার পুলিশ বিভাগের দুর্নাম হয়ে যাবে । তাই তিনি চান এই জাল নোটের তদন্ত করুক শিখা। আবার শিখার আবিষ্কার' কাহিনিতে গোয়েন্দা ও পুলিশ উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিখা বিমলেন্দুকে নন্দবাবুর পিছু নিয়ে তিনি রোজ সন্ধ্যেতে কোথায় যান দেখে আসতে বলে। বিমলেন্দু এই কাজ করে তথ্য জোগাড় করে শিখাকে যদি ঐ বাড়ি চিনিয়ে না দিত তাহলে রহস্যের সমাধান হত না।

❖ পিতৃতান্ত্রিক চরিত্র নির্মাণ :

বর্তমান সময়েও বেশিরভাগ মানুষ *'মেয়ে গোয়েন্দা'* বিষয়টিকে *'সোনার পাথর বাটি'* বলে মনে করেন। বলাবাহুল্য বিশ শতকের পাঁচের দশকে অনেকের কাছে *'মেয়ে গোয়েন্দা'* বিষয়টি বাঁকা হাসির খোরাক যুগিয়েছিল। লেখিকা প্রভাবতী দেবী সেই চিত্রই

বারবার তাঁর লেখার মধ্যে সরাসরি তুলে ধরেছেন। 'শিখার সাধনা' কাহিনিতে শিখার কাকিমা বলেন ---

> "মেয়েছেলে নাকি ডিটেকটিভের কাজ করবে --- যতসব গাঁজাখুরি কথা। বলে --- যার কাজ তারেই সাজে। পুরুষের যা কাজ পুরুষেই করুক, মেয়েদের ও সব কাজে হাত দেওয়ার দরকার কি বাপু ? তুই যেমন লেখাপড়া করছিলি তেমন কর, লেখাপড়া ছেড়ে হৈ হৈ করে বেড়ানো কি উচিত হচ্ছে, না ভালো হচ্ছে ? মেয়েছেলের পথেঘাটে কত বিপদ ! তার ওপর গুণ্ডা বদমায়েশদের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে---"[৬৬]

এই সমালোচনার জন্য শিখার কাকিমাকে দোষারোপ করা চলেনা। কারণ তৎকালীন মানসিকতায় নারীর সীমাবদ্ধতার পরিসর আরও ছোট ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধীরা শিখাকে ভয় পেয়ে তাকে তদন্ত থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য হুমকি চিঠি পাঠায়। কখনও বা অপহরণ করে আটকে রাখে, যাতে সে কোনও ভাবে তাদেরকে বিপদে না ফেলতে পারে। দস্যু মোহনচাঁদও সেই ভয় থেকে শিখাকে বন্দী করে রাখে। কিন্তু যখন সামনাসামনি কথাবার্তা হয়, তখন পুরুষ হিসেবে তার আস্ফালনের ছবি দেখা যায় : "একটা কথা মনে রাখবেন মিস রায়, মেয়েরা যত শিক্ষিতাই হোক, যত বুদ্ধিমতীই হোক তবু মেয়ে ছাড়া তারা আর কিছু নয় ! তাদের সাধ্যের একটা সীমা আছে।"[৬৭]

নারী জীবনের উদ্দেশ্য বিবাহিত জীবনে সুখে শান্তিতে থাকা একথা আমরা শিখার মামার মুখেও শুনতে পাই। কিন্তু শুধু পুরুষের মুখেই নয়। কাত্যায়নী দেবীর মুখেও সেই একই কথার পুররাবৃত্তি লক্ষ করা যায় --- "বড় ঘরের মেয়ে ! তা, ধন্যি সখ মা, তোমার ! এমন সুন্দরী, বড়লোকের মেয়ে, কোথায় বিয়ে থা করে ঘর সংসার করবে, তা নয়---"[৬৮]

তবে কাত্যায়নী দেবী মুখে এই কথা বললেও আসলে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে নিজের অজান্তেই প্রচলিত নারী-পুরুষ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বাঁধাধরা ধারনাকে ভেঙে ফেলেছেন। তিনি বড়লোকের মেয়ে, তাঁর বর তাঁর বাবার কোম্পানির মাইনে করা কর্মচারী ছিল। তাই বিয়ে এবং সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরও তিনি সেই উভয়ের সামাজিক অবস্থান ভুলতে পারেননি। নন্দলাল বাবু নামের মালিক হলেও কত্যায়নী দেবী কোম্পানির কোনও কিছুতেই তাঁর মতের তোয়াক্কা করেন না। এমনকি সাংসারিক কোনও ক্ষেত্রেও বরের মতকে পাত্তা দেন না তিনি।

পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার একেবারে যথার্থ উদাহরণ হল 'দুর্গম পথে শিখা' কাহিনির সোহানি। ইস্পাহানি অত্যন্ত খারাপ মানুষ জানার পরও সে বলে ---

> "তবু তিনি আমার স্বামী। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন । তারপর তাঁর যে-পরিচয় পেয়েছি, আমি জানি তিনি অনেক অন্যায়, অনেক পীড়ন, অনেক অত্যাচার করেছেন --- করছেনও; তবু সে সবের বিচারও আমি করেছি। করে দেখেছি, তাঁর মধ্যে শয়তান যেমন আছে, তেমনি ভগবানও আছেন। তবু সব দেখে, সব জেনে আমি তাঁকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, পূজা করি।"[৬৯]

এই চরিত্র এবং এই সংলাপ ব্যাবহারের মাধ্যমে লেখিকা একদিকে তাঁর সময়কালের মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের সামনে শিখার মতো একটি আদর্শ চরিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি এমন মেয়েদের ছবি দেখিয়ে তিনি যেন পাঠক সমাজকে সাবধান করতে চেয়েছেন।

❖ বিভিন্ন নারী চরিত্র

শিখা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, চট্টগ্রামে জন্ম। তার মা যশোরে থাকতেন আর পড়াশুনোর জন্য সে থাকত কলকাতাতে। পাশাপাশি কলকাতায় শিখা দোতলা বাড়িতে থাকে এবং তার নিজস্ব টু-সিটার অস্টিন গাড়ি রয়েছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার তাকে এই গাড়িটি উপহার দিয়েছে। 'শিখা ও সবিতা' কাহিনিতে বেশ কয়েকবার এই গাড়িতে চেপে তাকে এদিক ওদিক যেতে দেখা যায়। শুধুমাত্র সে নিজেই নয়, তার আশে পাশে থাকা সহপাঠী বন্ধু সবাই শুধু আর্থিক ভাবে স্বচ্ছলই নয়, উচ্চবিত্ত এবং প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান। 'অগ্নিশিখা'য় মীরা শিখার বন্ধু। তার বাবা বড় সরকারি অফিসার। সে মোটর চালাতে জানে। 'শিখা ও সবিতা'তে তাকে শিখার অস্টিন গাড়ি চালাতে দেখা যায়। শ্রীরামপুর জুট মিলের ছোট বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শিখা মীরাকে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পরিচয় দেয়। মীরার পাশাপাশি সুজিতা নামের একটি বন্ধুর উল্লেখ পাওয়া যায় 'রহস্যময়ী শিখা' কাহিনিতে । এই কাহিনিতে দেখা যায় ধনী ব্যাবসায়ী দৌলতরামের কন্যা রুবি তার সহপাঠি ছিল। 'দুর্গম পথে শিখা' কাহিনিতে দেখা যায় কলেজ জীবনে শিখার পাশে বসত বিনতা। তার আরেক বন্ধু মনীষার কথা যানা যায় 'শিখার কালরাত্রি' কাহিনিতে। সরাসরি কাহিনিতে তার উপস্থিতি দেখা না গেলেও, পুরীতে মনীষার বর দেবাশিষের বাড়িতে শিখার গোটা পরিবার কিছুদিনের জন্য থাকে। 'শিখার ছদ্মবেশ'-এ মিস নেলা পিটারসন নামের এক

অ্যাংলো তরুণীকে দেখতে পাওয়া যায়। শিখার থেকে সে বয়সে ছোট, তাই বন্ধু বলা যায় না। তার পিতাও মেজর রায়ের সঙ্গে মিলেটারিতে কাজ করতেন, সেই সূত্রেই শিখার সঙ্গে তাদের পারিবারিক বন্ধুত্ব ছিল। এই মেয়েটি শিখাকে তদন্তের কাজে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। সে নিজেই শিখার সহকারি হিসেবে কাজ করতে চেয়েছে এবং নিজের ভূমিকা সে অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে পালন করেছে। সে রোজির বাড়িতে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করে তার বাক্স ঘেঁটে পুরনো চিঠিপত্র বের না করলে এই কাহিনির রহস্য সমাধান হত না। এই সব নারীই বিত্তশীল পরিবারের মেয়ে। বিশ শতকের পাঁচের দশকে সম্ভবত উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে ছাড়া কলেজ পড়ুয়া মেয়ের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তাই একুশ শতকের লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন মধ্যবিত্ত পরিবারের চরিত্রকে গোয়েন্দা বানাতে পারেন এবং তার উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্ত বন্ধুদের কথা সহজে বলতে পারেন, প্রভাবতী দেবীর পক্ষে সেই পরিসর দেখানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই শিখা চরিত্রটি এলিট মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে রয়ে গেছে। সাধারণ ছাপোষা পরিবারের মেয়েরা সেই কাহিনি পড়ে মুগ্ধ হলেও, এই চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পারার খুব বেশি সম্ভাবনা ছিল না।

❖ কৃষ্ণার কাহিনি ও শিখার কাহিনির তুলনা :

লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী যে সময়ে দাঁড়িয়ে নারী গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেছেন, তা সময়ের থেকে অনেক বেশি অগ্রণী মানসিকতার পরিচায়ক। শিখা সম্পর্কে মূল কথা ও চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কৃষ্ণার অনুষঙ্গ বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি। ‘কুমারিকা সিরিজ’-এর সামগ্রিক নির্মাণ কৌশল আলোচনার ক্ষেত্রেও বারবার কৃষ্ণার প্রসঙ্গ এসেছে। আসলে একই লেখিকার দুটি চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে পরবর্তী সময়ে নির্মিত চরিত্রের সঙ্গে পূর্ববর্তী চরিত্রের তুলনা বাদ দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

কৃষ্ণা ও শিখা উভয়েই পিতৃহীন এবং একক সন্তান। কৃষ্ণা পড়াশুনোয় ভালো একথার উল্লেখ কৃষ্ণার অনেকগুলি কাহিনিতেই পাওয়া যায়। কিন্তু শিখার ব্যাপারে লেখিকা বেশি বাক্য ব্যায় করেননি। শুধু জানিয়েছেন সে বিজ্ঞানের ছাত্রী, তৎকালীন প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যা মেধার পরিচায়ক। কৃষ্ণার পড়াশুনোর ক্ষেত্রে তার গোয়েন্দাগিরি অনেক সময়েই বাধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শিখার ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। কারণ, শিখার বেশিরভাগ কাহিনি তার কলেজ জীবন শেষ হওয়ার পরের ঘটনা। তবে এসব সামান্য পার্থক্য বাদ দিলে কৃষ্ণা আর শিখা আসলে প্রায় একই ধরণের চরিত্র। আর্থ- সামাজিক দিক থেকে তো বটেই,

এমনকি ব্যাক্তিত্বের দিক থেকেও দুজনে প্রায় সমকক্ষ। কৃষ্ণার ক্ষেত্রে কাহিনি যতটা গতানুগতিক শিখার ক্ষেত্রে ঠিক ততটা নয়। কৃষ্ণার সব কাহিনিতেই কৃষ্ণাকে অপহরণ করা হয়, তারপর সে সেই জাল ছিঁড়ে বেরবার চেষ্টা করতে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধু নিজেকেই অপরাধীর হাত ছাড়িয়ে বের করে এমন নয়, অনেক ক্ষেত্রেই নিজের সঙ্গে অন্য অপহৃতাকেও উদ্ধার করতে দেখা যায়। 'কুমারিকা সিরিজ'-এর কিছু কাহিনির ক্ষেত্রে গোয়েন্দাকে অপহরণ করার ছবি থাকলেও সেটাই মূল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেনি। আর তার থেকেও বড় কথা, বেশির ভাগ কাহিনি জুড়ে লেখিকা শুধু অপহৃত হওয়া এবং অপরাধীর হাত থেকে পালানোর গল্প বলেননি। তিনি 'কুমারিকা সিরিজ'-এ বিভিন্ন স্বাদের কাহিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

কৃষ্ণার কাহিনির ক্ষেত্রে মূলত গুপ্তধন উদ্ধার কিংবা অপহরণকারীকে ধরার চিত্র পাওয়া যায়। শুধুমাত্র একটি কাহিনিতেই কৃষ্ণাকে হত্যার তদন্ত করতে দেখা গেছিল। কিন্তু শিখার কাহিনিগুলির ক্ষেত্রে আমরা দেখি, প্রায় সবকটি কাহিনিতেই হত্যার দৃশ্য উপস্থিত। এবং হত্যা পরবর্তী সময়ে তার তদন্তের ভার পড়েছে শিখার ওপর। আসলে কৃষ্ণা এবং শিখার মধ্যে মূলগত পার্থক্য হল, কৃষ্ণা পুরোপুরি সখের গোয়েন্দা। তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বিপদের সময়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো। কৃষ্ণাকে বারবার বলতেও দেখা যায়, সে পেশাদার গোয়েন্দা নয়, মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য । কিন্তু শিখার বন্ধুরা যখন তাকে বলে যে তারা ভাবতেই পারেনি, শিখা গোয়েন্দাগিরিকে তার পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে --- তখন শিখা অস্বীকার করেনা যে সে গোয়েন্দা। বরং কোথাও কোথাও তাকে বলতে দেখা যায়, এখন গোয়েন্দাগিরি ভালো লাগছে বলে সে গোয়েন্দাগিরি করছে, যেদিন ভালো লাগবেনা সেদিন অন্যকিছু করবে। যে কাজ তাকে মানসিক আনন্দ দেবে, সেই কাজই সে করবে। অর্থাৎ, পরোপকার নয়, শিখার জীবনের মূল উদ্দেশ্য থ্রিলিং কিছু করা। এখানেই কৃষ্ণা আর শিখা আলাদা।

অতিরিক্ত লেখার চাপ থাকার জন্য হোক, কিংবা দুটি সিরিজ সমান্তরাল ভাবে লেখার জন্য হোক কৃষ্ণা এবং শিখার কাহিনিতে মিলের তালিকা অনেক বড়। রাজা মহারাজা থেকে ধনী ব্যাবসায়ীদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব, ধনী পরিবারের উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে অপরাধ জগতের মাথা হয়ে ওঠা, অপরাধী দলের লোকজনের বাড়ির সামনে ভিখারি সেজে বসে থাকা, গোয়েন্দাকে হুমকি চিঠি পাঠানো, পুলিশের উচ্চ-পদস্থ ব্যাক্তিদের সঙ্গে ব্যাক্তিগত পরিচিতি ... আরও নানা বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। উপরোক্ত আলোচনাতে সে প্রসঙ্গ

বারবার এসেছে। তাই সাদৃশ্যের আলোচনা দীর্ঘ না করে বৈসাদৃশ্যের দিকে একবার তাকানো যাক।

কৃষ্ণার কাহিনিগুলিতে মূলত অপরাধের যে চিত্র পাওয়া যায় তা অপহরণ বা সম্পত্তি বেদখল হওয়ার কাহিনি। কিন্তু শিখার কাহিনিতে সেই প্রসঙ্গ কয়েকবার এলেও, লেখিকা এখানে বিভিন্ন ধরণের রহস্য তুলে ধরেছেন। অপরাধ কাহিনির একটি বহুল প্রচলিত বিষয় হল হত্যা। কৃষ্ণার বাবা-মায়ের হত্যা প্রসঙ্গ বাদ দিলে কৃষ্ণার কাহিনিগুলিতে সরাসরি হত্যার কাহিনি প্রায় নেই, একমাত্র 'কৃষ্ণার জয়যাত্রা' কাহিনিতে কৃষ্ণাকে রুস্তমজী ও তাঁর স্ত্রীর হত্যার তদন্ত করতে দেখা যায়। এছাড়া কৃষ্ণার আর সরাসরি কোনও হত্যার তদন্ত করার সুযোগ হয়নি। কিন্তু শিখার কাহিনিগুলিতে অনেক হত্যার প্রসঙ্গ রয়েছে। 'শিখার অগ্নি-পরীক্ষা'য় শ্রীপতি গাঙ্গুলীর হত্যা, 'শিখার ছদ্মবেশ'-এ রোজি ও রাজা চন্দন সিংয়ের হত্যা, 'শিখার কালরাত্রি'তে পশুপতি নাথ কনড়িয়ার হত্যা, 'দুর্গম পথে শিখা'য় জওহরলালের হত্যা, 'শিখা ও সবিতা'য় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির খুনের রহস্য --- এসবের তদন্ত করে গোয়েন্দা অগ্নিশিখা রায়। হত্যার তদন্তের পাশাপাশি শিখাকে মৃত্যুর সম্মুখিনও হতে হয়। কৃষ্ণা বারবার বন্দী হলেও তার ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়নি। বরং তাকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া ইউ-উইন পরে জানায় সে অল্প বয়সী তরুণী, তাকে দেখে মায়া হয় বলে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। উল্টোদিকে 'শিখার সাধনা'য় আততায়ী এসে শিখাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু শিখা বিছনায় পাশবালিশে চাদর জড়িয়ে রেখে নিজে খাটের তলায় লুকিয়ে থাকার দরুন বেঁচে যায়।

এছাড়া আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, কৃষ্ণাকে গোয়েন্দা হিসেবে তেমন কিছু তদন্ত করতে দেখা যায় না। বন্দী দশা থেকে পালিয়ে পুলিশকে অপরাধীদের ঘাঁটি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু শিখার বেশিরভাগ কাহিনিতে শিখাকে গোয়েন্দা হিসেবে যথাযথ তদন্ত করতে দেখা যায়।

নির্দেশিকা

১। আবাহন দত্ত, আনন্দ বাজার পত্রিকা, 'বিস্মৃত এক সরস্বতী', অনলাইন সংস্করণ, ১৭ আগস্ট, ২০১৯

২। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'গুপ্ত- ঘাতক', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৫৩

৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'হত্যার প্রতিশোধ', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা; ২০২০ পৃ. ৫৭

৪। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'হত্যার প্রতিশোধ', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ১০১

৫। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'হত্যার প্রতিশোধ', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ১০১

৬। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'মুক্তি-পথে কৃষ্ণা', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪৮৭

৭। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'কৃষ্ণার অভিযান', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৩০৭

৮। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'কৃষ্ণার পরিচয়', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪০৬

৯। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'গুপ্ত-ঘাতক', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ১৮

১০। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'গুপ্ত-ঘাতক', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ১৬

১১। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'গুপ্ত-ঘাতক', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৩৯

১২। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'কারাগারে কৃষ্ণা', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ২২৮

১৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'কারাগারে কৃষ্ণা', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ২৩০

১৪। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'মায়াবী ও কৃষ্ণা', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ২৮৬

১৫। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'কৃষ্ণার অভিযান', গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৩৪২

১৬। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কৃষ্ণার অভিযান’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৩৫৭

১৭। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪১৪

১৮। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘মুক্তি-পথে কৃষ্ণা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪৯৮

১৯। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘মুক্তি-পথে কৃষ্ণা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪৭৫

২০। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কলঙ্কী চাঁদ’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ১৬৩

২১। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কলঙ্কী চাঁদ’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ১৫৭

২২। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪৫৪

২৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কারাগারে কৃষ্ণা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ২০২

২৪। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কৃষ্ণার জয়যাত্রা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৫১০

২৫। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘হত্যার প্রতিশোধ’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ১০১

২৬। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪৫২

২৭। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘গুপ্ত-ঘাতক’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ২৭

২৮। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কলঙ্কী চাঁদ’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ১৬০

২৯। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘মুক্তি-পথে কৃষ্ণা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪৮৭

৩০। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কৃষ্ণার জয়যাত্রা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৫১২

৩১। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কলঙ্কী চাঁদ’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ১৫৩

৩২। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪৫৩

৩৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কারাগারে কৃষ্ণা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ১৯৫

৩৪। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কারাগারে কৃষ্ণা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ১৯৪

৩৫। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘গুপ্ত-ঘাতক’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ২৬

৩৬। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘গুপ্ত-ঘাতক’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ২৬

৩৭। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘গুপ্ত-ঘাতক’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৩০

৩৮। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘গুপ্ত-ঘাতক’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৩৫

৩৯। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘গুপ্ত-ঘাতক’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৩৭

৪০। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘হত্যার প্রতিশোধ’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৬১

৪১। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘হত্যার প্রতিশোধ’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৫৬

৪২। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘হত্যার প্রতিশোধ’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৭১

৪৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কলঙ্কী চাঁদ’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ১৫৬

৪৪। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘মায়াবী ও কৃষ্ণা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ২৪৫

৪৫। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪৩৯

৪৬। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কৃষ্ণার জয়যাত্রা’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৫১১

৪৭। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কৃষ্ণার পরিচয়’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪০৬

৪৮। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘কৃষ্ণার পরিচয়’, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ৪০৬

৪৯। রণিতা চট্টোপাধ্যায়, ‘সম্পাদকের নিবেদন’, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৬

৫০। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘দুর্গম পথে শিখা’, গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ২২৭

৫১। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘শিখার সাধনা’, গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৮৭

৫২। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘অগ্নিশিখা’, গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৩০

৫৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘অগ্নিশিখা’, গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৪২

৫৪। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘বিজয়িনী শিখা’, গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১০৫

৫৫। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘শিখার সাধনা’, গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৫৮

৫৬। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘শিখার সাধনা’, গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৫৮

৫৭। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘শিখার সাধনা’, গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১,পৃ. ৫৮

৫৮। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘শিখার সাধনা’, গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৫৮

৫৯। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘শিখার কালরাত্রি’, গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৩২৬

৬০। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ‘বিজয়িনী শিখা’, গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১০৯

৬১। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'বিজয়িনী শিখা', গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১০৯

৬২। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'বিজয়িনী শিখা', গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১১০

৬৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'বিজয়িনী শিখা', গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১০৭

৬৪। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'শিখা ও সবিতা', গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১৫৬

৬৫। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'শিখা ও সবিতা', গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১৪৫-১৪৬

৬৬। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'শিখার সাধনা', গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৭৫

৬৭। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'রহস্যময়ী শিখা', গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ২১২

৬৮। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'শিখার আবিষ্কার', গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ২৮০

৬৯। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'দুর্গম পথে শিখা', গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ, সম্পা. রণিতা চট্টোপাধ্যায়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ২৫৪

চতুর্থ অধ্যায়

কিশোরী গোয়েন্দা দলের আবির্ভাব

নলিনী দাশের গণ্ডালু সিরিজ

নলিনী দাসের পরিচয় লেখার সময় অধিকাংশ লেখকই লেখেন তিনি উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর মেয়ে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর মেয়ে। প্রচারের আলোতে থাকা মানুষদের আত্মীয় হওয়ার এ এক বড় সমস্যা। স্বনামধন্য হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকার পরও এমন ভাবেই পরিচিত হতে হয় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। তবে নলিনী দাসের সন্তান স্থানীয় প্রজন্ম তাঁকে তাঁর নামেই চিনেছে, তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার গুণেই মুগ্ধ হয়েছে ; তাদের কাছে তিনি 'গণ্ডালু'র রচয়িতা। গণ্ডালুর রচয়িতার পাশাপাশি নারী শিক্ষার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য নারী হিসেবেও তাঁর নাম স্মরণযোগ্য। এই বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাক্তিগত জীবনের দিকে তাকানো জরুরি।

উপেন্দ্রকিশোরের দ্বিতীয় মেয়ে পুণ্যলতার বিয়ে হয় বিহার সিভিল সার্ভিসের অফিসার অরুণনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে। বাবা বিহারের ছোটবড় বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করার দরুণ নলিনীর ছোটবেলা কাটে গড়পার রোডে, মামার বাড়িতে এবং ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের হস্টেলে। তিনি ব্রাহ্মবালিকা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ডায়োসেশন কলেজ থেকে পাশ করেন আই. এ । তারপর স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শন নিয়ে বি এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। তাঁর পুত্রবধূ কৃষ্ণা রায় স্মৃতিচারণায় বলেন --- "উনি ঈশান স্কলার ছিলেন। একদিন আমাকে সোনার মেডেলগুলো দেখাতে দেখাতে বললেন, 'জানো রাধাকৃষ্ণানের হাতে একটা পেপারে ৯৮ পেয়েছিলাম। আমাকে এত মেডেল পেতে দেখে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এগিয়ে এসে বলেছিলেন--- দেখি মেয়েটি কে"[১]।

শিক্ষা জীবন শেষ হওয়ার পর তিনি অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। প্রথমে 'ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউট'-এ এবং তারপর 'বেথুন কলেজ'-এ তিনি অধ্যাপনা করেন। দীর্ঘদিন হেস্টিং হাউসে 'স্টেট ইনস্টিটিউড অফ এডুকেশন ফর উইমেন'-এ অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৫৪-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন। এরপর ১৯৬৮

থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত তিনি বেথুন কলেজের অধ্যক্ষর দায়িত্ব পালন করেন। নলিনী দাশের পুত্রবধূ কৃষ্ণা রায়ের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় ---

“ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক থাকাকালীন উচ্চশিক্ষার্থে তিনি বিদেশে যান । ফিরে এসে মেয়েদের জন্য খোলা হেস্টিংসের বি টি কলেজেই ভাইস প্রিন্সিপাল এবং পরে প্রিন্সিপাল হন”।[২]

তাঁর মেধা এবং পেশাগত জীবনের সাফল্য আকাশ ছোঁয়া হলেও পেশাগত ক্ষেত্রের বাইরে তাঁর পরিচিতি ‘সন্দেশ’-এর সম্পাদক হিসেবে। বলা বাহুল্য এখানেও তিনি সমান ভাবে সফল। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর অরুণ নাথ চক্রবর্তী ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিন্যুয়ের বাড়িটা তৈরি করেন, যেখান থেকে দীর্ঘদিন ‘সন্দেশ’-এর অফিস চলেছে। নব কলেবর লাভের পর বর্তমানে এখান থেকেই ‘সন্দেশ’ প্রকাশিত হয়। নলিনী দাস ছিলেন ‘সন্দেশ’-এর মেজ সম্পাদক। বড় সম্পাদক লীলা মজুমদার এবং ছোটো সম্পাদক সত্যজিৎ রায়। কৃষ্ণা রায়ের লেখা থেকে জানা যায় যে নলিনী দাস “মৃত্যুর আগে শেষ কথা বলেছিলেন ---- ‘সন্দেশের মলাটটা তো বেশ হয়েছে”।[৩] এই ভালোবাসার জায়গা থেকেই তাঁর কলম ধরা।

“১৯৬১সালে তৃতীয় পর্যায়ে ‘সন্দেশ’ প্রকাশের সময় থেকে তিনি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন আর ১৯৭৫ সাল থেকে ১৮ বছর ‘সন্দেশ’ সম্পাদনার কাজ করেছেন”[৪] মূলত ‘সন্দেশ’ পত্রিকার জন্য তাঁর গল্প লেখার শুরু।

তাঁর প্রথম লেখা ‘রা-কা-যে-টে-না-পা’ (১৯৫৯) । ছেলের জন্মদিনের উপহার হিসেবে এই প্রকাশিত বইটি তুলে দেন তিনি। পরিচিত মহলের বাচ্চাদের হাতেও বইটি দেওয়া হয়। তাদের নাম এবং তাদের চরিত্র নিয়ে লেখা বই হাতে পেয়ে তারা খুব খুশি হয়। বলা বাহুল্য এই কাহিনিটিও খুদে গোয়েন্দাদের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি। এনিড ব্লাইটনের ‘ফেমাস ফাইভ’-এর প্রভাব তাঁর গোটা সাহিত্য জীবনের ওপর লক্ষ করা যায়। এবং তাঁর সৃষ্টি গণ্ডালুও তার ব্যাতিক্রম নয়।

‘সন্দেশ’-এ গোয়েন্দা গণ্ডালুর মোট ২৯টি কাহিনি প্রকাশিত হয়--- ১৩৬৮-র শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১৩৯৯-এর শারদীয়া সংখ্যা পর্যন্ত ।

> তাঁর জীবৎ কালে এর ১৬টি গল্প সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশ পায় ‘গোয়েন্দা গণ্ডালু’ *(১৯৭৫), ‘রঙ্গনগড় রহস্য’ (১৯৭৮), ‘রাণী রূপমতির রহস্য’(১৯৮৬), ‘হাতিঘিসার হানাবাড়ি’ (১৯৮৮)* আর ‘অলৌকিক

বুদ্ধমূর্তি রহস্য ’ (১৯৯০) বইতে। আরও দুটি গল্প গ্রন্থভুক্ত হয় অন্যত্র। বাকি ১১টি অগ্রন্থিত ছিল। সম্প্রতি তাঁর পুত্র অমিতানন্দ এগুলি গ্রন্থভুক্ত করে গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র ’ নামে দুই খণ্ডে(২০০৯, ২০১২)।[৫]

“তাঁর অন্যান্য গল্পের মধ্যে মধ্যরাতের ঘোড়সওয়ার ’ প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দ পাবলিশার্স ’ থেকে ১৯৮০ সালে। এর বাইরেও তাঁর বেশ কিছু গল্প সন্দেশ ’ ও অন্যত্র প্রকাশিত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। অমিতানন্দ এগুলিকে গ্রন্থভুক্ত করে গল্প ও উপন্যাস সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড) ’ বইতে ২০1৪ সালে”।[৬]

বলা বাহুল্য বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে ‘নিউ স্ক্রিপ্ট’ প্রকাশনা থেকে। কিন্তু এই বই প্রকাশের সময় অমিতানন্দ ‘রা-কে-টে- না-পা’-এর প্রথম পর্বের সন্ধান পাননি। পরবর্তী সময়ে ‘সন্দেশ’-এর ২০১৬সালের জুলাই সংখ্যায় সেটি প্রকাশ পায়। তাঁর শেষ বই ‘সাত রাজার ধন এক মাণিক’ (১৯৯৩) বর্তমানে পুনঃপ্রকাশিত ‘সত্যজিতের ছেলেবেলা’ নামে।

একজন অসম্ভব ভালো মেধাবী ছাত্রী, একজন অত্যন্ত সফল অধ্যক্ষর পাশাপাশি একজন সফল সম্পাদক । এতো সাফল্য সত্ত্বেও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তিনি সফল লেখিকা হিসেবে পরিচিতি পেলেননা সেভাবে। বর্তমান কিশোর প্রজন্ম যখন মিতিন মাসি, টুপুর, ঝিনুককে জনপ্রিয়তার নিরিখে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়েছে তখন গোয়েন্দা গণ্ডালুর কথা প্রায় কেউই জানেনা সেইভাবে। প্রশ্ন উঠতে পারে এই ধরনের সাহিত্য খুব বেশি দিন পাঠক মনে টিকে থাকে কিনা, তবে সে প্রশ্নের উত্তরের সামনে উদাহরণ হিসেবে বসে আছে ব্যোমকেশ, ফেলুদার পাশাপাশি পাণ্ডব গয়েন্দারাও। তাহলে সেই তালিকায় গণ্ডালু নিজের জায়গা করে নিতে পারল না কেন, তা বোঝার জন্য গণ্ডালু সিরিজের কাহিনিগুলোর দিকে তাকানো প্রয়োজন।

‘নিউ স্ক্রিপ্ট’ থেকে বেরনো ‘গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র’-র দুখণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে গণ্ডালুর ২৯টি কাহিনি। প্রথম খণ্ডে ১৪টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫টি কাহিনি রয়েছে। বইয়ের প্রথমেই কাহিনিগুলির পত্রিকা প্রকাশ এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের নথি দিয়ে দিয়েছেন সম্পাদক। তবে কালানুক্রমিক তালিকা তৈরি করতে গিয়ে নজরে পড়ে যে কাহিনি নির্বাচন সম্পূর্ণ ভাবে কালানুক্রম অনুযায়ী নয়। অর্থাৎ, কিছু কিছু কাহিনি যা ক্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় খণ্ডে সঙ্কলিত হওয়ার কথা সেগুলি প্রথম খণ্ডে জায়গা পেয়েছে। কাহিনিগুলি রচনার বা ‘সন্দেশ’-এ প্রকাশের কালানুক্রম অনুযায়ী তালিকা তৈরি করলে দেখা যায় ;

ক্রম	পত্রিকা প্রকাশ	কাহিনি
১।	শ্রাবণ, ১৩৬৮	গোয়েন্দা গণ্ডালু
২।	চৈত্র, ১৩৭০	নিখিল বঙ্গ কবিতা সংঘ
৩।	শারদীয়া, ১৩৭১	জমিদার বাড়ির রহস্য
৪।	শারদীয়া, ১৩৭২	গুণ্ডা ও গণ্ডালু
৫।	জ্যৈষ্ঠ , ১৩৭৩	সোনার খনির সন্ধানে
৬।	শারদীয়া, ১৩৭৪	টাওয়ার হিলের রহস্য
৭।	শারদীয়া, ১৩৭৫	গণ্ডালু ও তিব্বতি গুহার ভূত
৮।	শারদীয়া, ১৩৭৬	নন্দন কাননের রহস্য
৯।	শারদীয়া, ১৩৭৭	অভিসপ্ত রাজবাড়ি
১০।	শারদীয়া, ১৩৭৮	তপোবন রহস্য
১১।	শারদীয়া, ১৩৭৯	হাতিঘিসার হানাবাড়ি
১২।	শারদীয়া, ১৩৮০	খোয়াই রহস্য
১৩।	চৈত্র, ১৩৮২ – শারদীয়া, ১৩৮৩	রঙ্গনগড় রহস্য
১৪।	শারদীয়া, ১৩৮৪	গণ্ডালু ও রাণী রূপমতির রহস্য
১৫।	শারদীয়া, ১৩৮৫	গণ্ডালু ও অলৌকিক বুদ্ধমূর্তি রহস্য
১৬।	শারদীয়া, ১৩৮৬	গণ্ডালু ও হিড়িম্বাদেবী রহস্য
১৭।	শারদীয়া, ১৩৮৭	ঝাউতলার ভূত
১৮।	শারদীয়া, ১৩৮৮	কলকাতায় গণ্ডালু
১৯।	শারদীয়া, ১৩৮৯	নন্দিনী নিরুদ্দেশ
২০।	শারদীয়া, ১৩৯০	নীলাঞ্জনার দুর্ভোগ
২১।	শারদীয়া, ১৩৯১	মাউন্ট আবুর রহস্য

২২।	শারদীয়া, ১৩৯২	ডন পেরেরার দ্বীপ
২৩।	শারদীয়া, ১৩৯৩	রঙ্গন পাহাড়ের রহস্য
২৪।	শারদীয়া, ১৩৯৪	দেওদার গঞ্জের ভূত
২৫।	শারদীয়া, ১৩৯৫	গুপ্তাসাহেবের গুপ্তধন
২৬।	শারদীয়া, ১৩৯৬	সিমলার মামলা
২৭।	শারদীয়া, ১৩৯৭	সামলে চল গণ্ডালু
২৮।	শারদীয়া, ১৩৯৮	কাঞ্চনপুরের রাজবাড়ি
২৯।	শারদীয়া, ১৩৯৯	শিখর রহস্য

❖ চরিত্র নির্মাণ

'গোয়েন্দা গণ্ডালু'তে দেখা যায় বোর্ডিং স্কুলের চারটি মেয়েকে , এরা হল কালু, মালু, বুলু, টুলু ; এদের ভালো নাম যথাক্রমে কাকলি চক্রবর্তী, মালবিকা মজুমদার, বুলবুলি সেন, এবং টুলু বোস। কাহিনিগুলি টুলুর জবানিতে পাঠকের কাছে হাজির হয়েছে। টুলুর জবানিতে পাওয়া যায়---

> "কলকাতা থেকে অনেক দূরে নির্জন জায়গায় আমাদের বোর্ডিং স্কুল। দূরে রেলের লাইন দেখা যায় বটে, কিন্তু আমাদের কাছাকাছি কোনও স্টেশন নেই। কাঞ্চনপুর স্টেশনে নেমে পনেরো কিলোমিটার মোটরে কি বাসে আসতে হয়। ...... আমাদের স্কুলের মস্ত বড় বাড়ি , একতলা দোতলার বেশির ভাগ ঘরেই ক্লাস হয়, তিনতলায় হোস্টেল, আর টিচারদের থাকার ঘর। ...... বোর্ডিং-এ আমরা শতখানেক মেয়ে থাকি। তাছাড়া মণিকাদি, অণিমাদি, বড় মিস বিশ্বাস, মিস বোস ইত্যাদি পাঁচ-ছজন টিচার আছে। তাঁদের প্রত্যেকের আলাদা ঘর। তিনজন মেট্রন এখানেই থাকেন, তাঁদের আমরা মাসিমা বলি। তাছাড়া ঝি, মালি, জমাদার, দারোয়ান, বেয়ারা মিলিয়ে দশ পনেরটি লোক আছে।
>
> হেডমিস্ট্রেস অঞ্জলিদি আর অন্যান্য মেয়েরা ও কিছু টিচার কাঞ্চনপুর থেকে আসেন। কিছু ছাত্রী কাছাকাছি অন্যান্য জায়গা থেকেও আসে।"[৭]

> ‘কাঞ্চনপুর থেকে যেসব বাস আমাদের স্কুলের দিক দিয়ে যেত তারমধ্যে সারাদিনে চারটে মাত্র ঠিক আমাদের স্কুলের উত্তর দিকে বড় রাস্তা ধরে স্কুলের ফাটকের সামনে দিয়ে ঝাউতলার দিকে চলে যেত। অন্য বাস গুলো আমাদের স্কুলে পৌঁছোবার এক কিলোমিটার আগে উত্তর দিকে মোড় নিয়ে দেওদারগঞ্জ যেত।”[৮]

কালু মালু টুলু বুলু এই চারজন অর্থাৎ এক গণ্ডা মেয়ের দলকে সহপাঠীরা গণ্ডালু নাম দেয়।এরা চারজন হস্টেলের একই ঘরে থাকে। টুলু আর বুলু অনেক ছোটবেলা থেকেই এই বোর্ডিং-এ থাকে। কালুও কোনও একটা সময়ে এখানে ভর্তি হয়। সব শেষে আসে মালু। মালু খুব কল্পনা প্রবণ , সাহিত্য ভালোবাসে, কবিতা লেখে। আর কালু খুবই বাস্তববাদী ডানপিটে সাহসী মেয়ে, অঙ্ক, বিজ্ঞান ভালোবাসে। দুই বিপরীত মেরুর দুই মেয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ‘খোয়াই রহস্য’তে। জলবসন্ত হওয়ার জন্য মালু ছুটিতে বাড়ি যেতে পারেনা বলে কালুও প্রচণ্ড পেটে ব্যাথার নাটক করে হস্টেলে থেকে যায়। টুলুর মতে তার আর বুলুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেশি, সেই কারণে মালুর সঙ্গে কালুর বন্ধুত্ব বেশি জোরালো হয়। তবে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে গেলে কালু ও মালুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতার মূল কারণ --- লেখিকা এদের দুজনকেই উচ্চকিত করতে চেয়েছেন বেশি করে। সবকিছুর নেতৃত্বে থাকে সাহসী কালু, তার সাহসিকতা আর বুদ্ধির জোরেই বেশির ভাগ রহস্যের সমাধান হয়। মালু কল্পনা বিলাসী হলেও সেও ভীতু নয়, অ্যাডভেঞ্চারে তার গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভুমিকা থাকে। বুলু খুব ভীতু , বাকি বন্ধুদের সঙ্গে থাকার দরুণ বাধ্য হয়ে তাকে নানা অ্যাডভেঞ্চারের অংশীদার হতে হয়। সে গুহার মধ্যে বা পোড়োবাড়িতে যেতে চায় না। সে ভূতে খুব ভয় পায়, পাশাপাশি গুণ্ডাদেরকেও। কালু এবং মালু দুটো চরিত্রকেই লেখিকা যত্নের সঙ্গে বানিয়েছেন। কাহিনিতে এরা দুজন যতটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে টুলু ও বুলু পাঠকের কাছে ঠিক ততটা পাত্তা পায়না । কিন্তু এদের বাদ দিয়ে দিলে শুধুমাত্র গণ্ডালুদের সদস্য সংখ্যা কমে যায় তাই নয়। সামগ্রিক ভাবে কাহিনির রচনা কৌশলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির পাঠকরা সব সময় যে খুব সাহসী হয় এমন নয়, বেশির ভাগ কিশোর কিশরীই টুলুর মতো--- খুব সাধারণ, সাজ্ঘাতিক বুদ্ধি না থাকলেও বোকা নয়, দুঃসাহস না থাকলেও ভিতু নয়। তাই তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আসে বুলু। অন্যদিকে শুধুমাত্র রহস্য উদ্ঘাটন কিংবা অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া নয়, বরং সেগুলকে কাছ থেকে দেখে পাঠকের কাছে তার গল্প শোনানোর জন্যও প্রয়োজন একটি চরিত্র। লেখিকা সর্বজ্ঞ

কথনভঙ্গি থেকেও রচনা করতে পারতেন কাহিনিগুলি। কিন্তু উত্তম পুরুষ কথনরীতি ব্যবহারের ফলে পাঠকের সঙ্গে তিনি অনেক বেশি করে একাত্ম হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কাহিনির কথা শেষাংশ উল্লেখ করা যায় ---- "এই চোরা চালানকারীদের দল ধরা পড়ার খবর দেশের সমস্ত খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, তোমরা দেখনি? সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারজনের সাহস আর বুদ্ধির কথা খুব ফলাও করে লিখেছিল। কোনও কোনও পত্রিকায় আবার আমাদের ফটোও ছেপেছিল। রাজস্থানী পোশাকে তোমাদের পরিচিত গণ্ডালুদের চিনতে পেরেছিলে তো?"[৯]

সম্পাদকীয় কথনরীতিতেও পাঠকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা বলতে পারেন লেখক, যেমনটা বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসে লক্ষ করা করা যায়। তবে সেখানে পাঠক এবং লেখক প্রায় সমবয়স্ক ও সমমনস্ক হওয়ার জন্যে লেখক নিজেই উপস্থিত হতে পারেন সহজে। কিন্তু গণ্ডালুদের ক্ষেত্রে লেখিকা এবং পাঠক সমাজ সমবয়সী নয়। পরিণত বয়সের এক লেখিকা ছেলেমানুষদের জন্য কলম ধরেছেন এখানে। তাই সেই ছেলেমানুষ পাঠক সমাজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরির মাধ্যম হিসেবে তিনি নির্মাণ করেছেন পাঠকের সমবয়সী এক চরিত্র। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করেছে টুলু বোস। অনেকগুলি কাহিনির শেষেই সে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি এভাবে কথা বলে গেছে। পাশাপাশি তাদের ছেলেমানুষি মনটাও ফুটে উঠেছে টুলুর জবানীতে। প্রায় প্রত্যেক কাহিনিতেই দেখা যায় গণ্ডালুরা যখন পথ হারিয়ে ফেলেছে কিংবা কোনও গুহায় কি ঘরে বন্দী হয়ে রয়েছে তখন তাদের প্রথম কাজই হচ্ছে ঝোলা থেকে খাবার বের করে খেতে শুরু করা। এবং তাদের খাওয়ার বর্ণনা লেখিকা বেশ ফলাও করে লিখিছেন সব কাহিনিতেই। 'খোয়াই রহস্য'-তে পাওয়া যায় --- "আমরা যখন কোনও অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরোই, কিছু খাবার সর্বদা সঙ্গে রাখি, আজও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। বিপদের কথা ভুলে থেকে খাওয়া দাওয়া করলে মনে সাহস আর শক্তি বাড়ে, তাছাড়া পেটটা ঠাণ্ডা থাকলে মাথাটাও ঠাণ্ডা রাখতে সুবিধে হয়, এ আমরা বহুবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি।"[১০]

এই কথাটাই বার বার প্রায় প্রত্যেক কাহিনিতে লিখেছেন লেখিকা। 'নন্দনকাননের রহস্য'তেও এই বক্তব্য সামান্য ভাষাগত ব্যবধানে উপস্থাপিত হওয়ার পরই দেখা যায় --- "বুলু আর আমি কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে খাবার বের করে কাগজের প্লেটে রাখলাম -- মাংসের সিঙ্গাড়া, --ঘরে তৈরি চকলেট কেক, সন্দেশ আর চারটে আপেল। তাছাড়া ফ্লাস্কে ছিল গরম কফি।"[১১]

এছাড়াও প্রত্যেক গল্পে রেস্তরাঁতে কিংবা কোনও আত্মিয়ের বাড়িতে খাওয়ার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। বোধয় লেখিকা মনে করতেন যে কিশোর কিশোরীদের কাছে খাবারের বর্বণা বেশ মনোগ্রাহী হবে। এমনকি বিপদের মধ্যে আটকা পড়ে থাকার সময়ও সেই প্রসঙ্গ আসে। কৈফিয়ত হিসেবে শোনা যায় খাবার খেলে মাথা ভালো কাজ করে। এধরনের মন্তব্য একজন অধ্যাপকের মন্তব্য হিসেবে বেমানান, কিন্তু যখন টুলুর মতো স্কুল পড়ুয়া মেয়ে এমন কথা বলে তখন তা বেমানান মনে হয়না।

বুলু অর্থাৎ বুলবুলি গুপ্ত হল গণ্ডালু দলের একমাত্র ভীতু মেয়ে। যে গুহায় ঢোকার সময় বলে তার ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে। কোনও ভয়ের পরিস্থিতি এলেই তার হাত ঠাণ্ডা হয়ে যায়, সে টুলুর হাত আঁকড়ে ধরে। সবকিছুতেই সে ভয় পায় -- গুণ্ডা ডাকাত, একটু রহস্য জনক মানুষ, ভুত, এমনকি না খেতে পেয়ে মরে যাওয়ার ভয়ও সে পায়। নন্দনকাননের বাড়ির মধ্যে আটকা পড়ার পর ভয় পেয়ে সে বলে --- *"ওমা, কী হবে? খোঁজ করবে না? যদি আমরা এই বন্ধ ঘরে না খেতে পেয়ে মরে-টরে যাই!"*[১২]

সব সময়ই কালুকে ও বাকিদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে ঝঞ্ঝাটের মধ্যে না জড়িয়ে বরং পুলিশকে জানানো উচিৎ। এবং চূড়ান্ত দমবন্ধ পরিস্থিতিতে সে প্রায় কাঁদকাঁদ হয়ে যায়, এবং আফসোস করে কেন এদের সঙ্গে সে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে ! মালুর পক্স হলে বুলু বলে ---

"'তোর না হয়ে আমার যদি জলবসন্ত হত, তাহলে বেশ তুই অ্যাডভেঞ্চার করতি, আর আমাকে মাঝরাতে অভিযানে বেরোতে হত না--- *!!'* [১৩]

তবে অ্যাডভেঞ্চারে আগ্রহ তেমন না থাকলেও বন্ধুদের থেকে দূরে থাকতে সে নারাজ। তাই নিমরাজি হয়ে সব অ্যাডভেঞ্চারেই তাকে থাকতে হয়। অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির পাঠক সবসময় সাহসী হয়না। ভিতু মানুষের সংখ্যাই বেশি, বিশেষত স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে বুলুর মতো ভিতুর সংখ্যাই বেশি। তারা যাতে অভিযানের দলে ভয় পেতে পেতে বুলুর হাত ধরে কাহিনির মধ্যে নিজের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে, তার জন্য এই চরিত্রটি নির্মিত। এর পাশাপাশি বুলুর অবস্থা বর্ণনা করে পাঠক মনে সহজেই খানিকটা আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বুলুকে একেবারে নির্বিচারে খাটো করেননি লেখিকা। 'নীলাঞ্জনার দুর্ভোগ'-এ দেখা যায়, এই ভিতু বুলুই খুব ভালো টেনিস খেলে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করে।

মালু অর্থাৎ মালবিকা মুখোপাধ্যায় গণ্ডালুরদের মধ্যে সবচেয়ে পরে ভর্তি হয় এই বোর্ডিং স্কুলে। "একমাথা রুক্ষ কোঁকড়া চুলওয়ালা কবি-কবি দেখতে মেয়েটি...... মালু

ভালোবাসে কাব্য--- ইংরেজি বাংলা এমনকি সংস্কৃত ! ...... অঙ্ক ক্লাসে চোখে জল আসে। সে লুকিয়ে কবিতা লেখে, রমাঞ্চকর গল্পের বই পড়ে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজেকে গল্পের নায়িকা বলে কল্পনা করে।”[১৪]

সে অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করে, এবং তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে কালুর সঙ্গে তার মতবিরোধও দেখা দেয়। কিন্তু কল্পনা প্রবণ হলেও সে বুলুর মতো ভিতু নয়। তিব্বতী গুহার ভূতের কথা সে কালুর মতো অবিশ্বাস করেনা। কিন্তু ভূতের ব্যাপারে ভীত হতেও দেখা যায়না তাকে। কালুর মধ্যে যেমন যে কোনও কিছুর পিছনে লুকিয়ে থাকা সত্যিটা জানার তাগিদ কাজ করে, মালুর মধ্যে তেমনটা নয়। সে নানা রকম কল্পনা করে নিয়ে সেই কল্পনার জাল খোলার টানে এগিয়ে যায়। এবং বুদ্ধির দিক থেকে সে কালুর থেকে মোটেই পিছিয়ে নয়, এবং বিভিন্ন বিষয়ে সে পারদর্শী। টাওয়ার হিলে কালু হারিয়ে যাওয়ার পর যখন কেউ কিছু বুঝতে পারছে না, তখন মালুর নেতৃত্বে কালুর মোর্সকোডের মানে উদ্ধার করে তারা কালুর কাছে পৌঁছয়। বেশির ভাগ কাহিনির জট ছাড়ানোর কাজ কালু করলেও ‘জমিদার বাড়ির রহস্য’তে দেখা যায় কালু রহস্য সমাধান করার আগেই মালু রহস্য সমাধান করে ফেলেছে। শুধু বুদ্ধিই নয়, তার সাহসীকতার পরিচয়ও পাওয়া যায় কাহিনিগুলিতে। ‘রাণী রূপমতির রহস্য’-তে দেখা যায় মালু একাই সোনা পাচারকারীদের দলে মিশে তাদের ডেরায় গিয়ে হাজির হয়, এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফিরে আসে। তার জন্য সোনা পাচারকারী দল ধরা পড়ে। অর্থাৎ, মলবিকা মজুমদার একদিকে যেমন কবি অন্যদিকে গোয়েন্দা দলের সফল সক্রিয় সদস্যও। কাহিনি পড়তে পড়তে কালুর কাঠখট্টা স্বভাব ও শুধুমাত্র যুক্তি অনুসন্ধানের মাঝে মালুর উপস্থিতি গোয়েন্দা কাহিনির টানটান উত্তেজনার মধ্যে অন্যরকম মাধুর্যের স্বাদ বয়ে আনে।

গণ্ডালু চার সমবয়সী মেয়ের দল হলেও তাদের পাণ্ডা বলা যেতে পারে কালু, অর্থাৎ কাকলি চক্রবর্তীকে। কালু খুব বাস্তববাদী সিরিয়াস ধরনের মেয়ে। “কালু কাঠখোট্টা, ডানপিটে, অসমসাহসী মেয়ে, কোন কবিত্ব কল্পনার সে ধার ধারে না। তার ভাল লাগে অঙ্ক, বিজ্ঞান, ড্রিল আর দৌড়-ঝাঁপ। অণিমাদি যখন পদ্য পড়ান তখন তার ঘুম পায়।”[১৫]

সে কোনও রকম অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে না, ভূত জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়কে বুজরুকি ছাড়া আর কিছু মনে করেনা। প্রত্যেকটা আপাত রহস্যময় জিনিসের পিছনে লুকিয়ে থাকা আসল কারণ খুঁজে বের করাই তার উদ্দেশ্য। ‘তিব্বতী গুহার ভুত’-এ যখন সাদা কাপড় পরা ভূতকে দৌড়ে চলে যেতে দেখে বাকিরা খুব ভয় পায় তখন কালু কোনও মতে বিশ্বাস করেনা যে ওটা সত্যি ভূত। শুধুমাত্র নিজের কৌতূহল নিরশন করেই সে ক্ষান্ত হয়না,

অন্যদের মন থেকে কুসংস্কার মেটানোর দিকেও তার আগ্রহ খুব বেশি। তাই ভূত সাজার পোশাক পাওয়া যাওয়ার পর সে সেটা পরে নানীদিকে দেখায়, যাতে তার মন থেকে এসব কুসংস্কার দূর হয়ে যায়। 'খোয়াই রহস্য'তে জানা যায় সে খুব ভালো মর্সকোড জানে, 'নীলাঞ্জনার দুর্ভোগ'-এ জানা যায় সে টেনিস খেলে। কালু ভীষণ ভাবে প্রত্যুৎপন্নমতি, যে পরিস্থিতিতে বাকি সবাই দিশেহারা হয়ে যায়, সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। এর পাশাপাশি তার গায়ের জোরও অন্যান্যদের তুলনায় বেশি। যখন কোথাও ঘুরতে বেরোয় তখন তার দড়ির সিঁড়ি নিতে ভোলে না। একদিকে খেলাধুলো ভালোবাসে অন্যদিকে পড়াশুনোতে ভালো, মর্সকোডের ব্যবহার খুব ভালো জানে। সবকিছুতেই সে পারদর্শী। স্কুল পড়ুয়া কিশোর কিশোরীরা যেমনটা হতে চায়। কল্পনার রাজ্যে গিয়ে নিজেদেরকে যেমন ভাবে দেখতে চায় কালু ঠিক সেরকমই। শুধুমাত্র একটা জায়গাতেই সে খুব একটা পারদর্শী নয়, তা হল কবিতা লেখায়। তার পদ্যের নমুনা এরকম --- "আমি তো ভাই,/ মিলটিল রেখে পদ্য লিখতে চাই---/ কিন্তু ছন্দ-টন্দ কিছু ঠিক থাকে না যে ছাই !/ তা বলে দল থেকে আমাকে একেবারে বাদ দিয়ে দিবি কি তাই?"[১৬]

এই একটা জায়গায় সে মালুর চেয়ে একটু পিছিয়ে। কালু মালু দুটো চরিত্রকে সমান ওজনের রাখার জন্য এবং কালু চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখিকা এমন নগণ্য কিছু খামতি রেখেছেন কালুর মধ্যে।

গণ্ডালুদের কাহিনিতে আরও কিছু চরিত্র বারবার ফিরে আসে ; তাদের সহপাঠী কাজল, হাসি, সীতারা তো বটেই এছাড়া তাদের শিক্ষিকা আনিমাদি, তাঁর ঠাকুরদা, রঙ্গলালদা, কেষ্টদাসী প্রমুখ। তবে এদের বিষয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই, কারণ এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোনও ভাবে কাহিনিকে বিশেষ প্রভাবিত করেনি। আরও দুজনের নাম উল্লেখযোগ্য—পুলিশ অফসার শ্রী গনেশ গাঙ্গুলী এবং তাঁর সহকারী শ্রী বিদ্যুৎ বসু । গোয়েন্দা কাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী এরা কম বুদ্ধির অকর্মণ্য পুলিশ। রহস্য উন্মোচনে তাদের সক্রিয় ভুমিকা বিশেষ নেই। গণ্ডালুরা রহস্য সমাধান করে ফেলার পর তারা এসে অপরাধীদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তবে 'অলৌকিক বুদ্ধমূর্তি'তে দেখা যায় কালু আর মালু সার্কাসের দলের ট্রাকে করে চলে গেলে তাদের অনুসরণ করার জন্য টুলু আর বুলু পুলিশের সাহায্য নেয়। পুলিশের জীপে করে তাদের ধাওয়া করে। তবে তাদের সাহায্য নিলেও গণ্ডালুদের কৃতিত্ব কিছু কমে না, আসল রহস্যের সমাধান শেষ পর্যন্ত তারাই করে।

আরেকটি চরিত্র যার কথা উল্লেখ না করলেই নয় সে হল দাদুর পোষা শিম্পাঞ্জি অঙ্গদ। তাদের ইংরেজির শিক্ষিকা অণিমাদির ঠাকুরদা হল গণ্ডালুদের আদরের দাদু। 'দ্য ফেমাস ফাইভ'-এর আদলে গণ্ডালু নির্মিত হলেও সব চরিত্র হুবহু এক নয়, যেমন জর্জের মতো কোনও চরিত্র নেই গণ্ডালুতে। তবে জুলিয়ানের সঙ্গে কালুর এবং অ্যানির সঙ্গে টুলুর কিছু ক্ষেত্রে বুলুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খানিকটা মিল আছে। তেমন 'টিম্মি'র সম্পূর্ণ অনুকরণ না হলেও তার মতো 'অঙ্গদ'ও গণ্ডালুদের সঙ্গী ও সহকারী। প্রথম কাহিনি 'গোয়েন্দা গণ্ডালু'তেই অঙ্গদের আবির্ভাব। তাকে প্রথমে খাটো আকৃতির মানুষ ভেবে ভুল করেছিল গণ্ডালুরা। তার আসল পরিচয় জানার পর থেকে তার সঙ্গে গণ্ডালুদের ভাব হয়ে যায়। অনেক কাহিনিতেই তাদের সঙ্গে অঙ্গদকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা দেখা যায়। যেমন, 'অলৌকিক বুদ্ধমূর্তি রহস্য'তে যখন বুদ্ধমূর্তিটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন অঙ্গদ ঘাড় ধরে একটা বাঁদরকে গাছের মগডাল থেকে নামিয়ে আনে, যার গলার মেডেলের মধ্যে লুকনো ছিল ঐ মেডেলটা। আবার 'খোয়াই রহস্য'তে দেখা যায় গণ্ডালুরা যখন ভেজালকারবারীদের গুদামে আটকা পড়ে গেছে তখন অঙ্গদ এসে তাদের উদ্ধার করে। তবে যেহেতু গণ্ডালুরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে, এবং ঘুরতে গিয়ে রহস্য উন্মোচনের কাহিনি বেশি তাই অঙ্গদের উপস্থিতি তাদের কাহিনিতে কমই। কিন্তু তাদের স্কুলের আশেপাশে ঘটা কাহিনিগুলতে অঙ্গদ বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে।

❖ রচনা কৌশল

গণ্ডালুদের নির্মাণ করার সময় লেখিকা তাদের স্কুলটাকে শহর দূরবর্তী এক গ্রাম্য এলাকায় নিয়ে যান। যেখানে গাছ গাছালির ছায়াঘন পরিবেশে ডানপিটে কিশোরীদের কার্যকলাপ এবং গাছমছমে পরিবেশ তৈরি করা যাবে সহজে। তবে শহর থেকে দূরবর্তী এলাকায় থাকলেও গোয়েন্দা দল মোটেই গ্রাম্য নয়। বরং তাদের মধ্যে শহুরে ভাবই লক্ষ করা যায়। তার যথাযথ কারণও রয়েছে। তারা প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত সফল প্রতিষ্ঠিত বাবা-মায়ের সন্তান। যদিও কোনও কাহিনিতে তাদের বাবাদের পেশার কোনও নির্দিষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু তাও বোঝা যায় যে তাঁরা সুশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত মানুষ। মালুর সম্পর্কে খানিকটা জানা যায়--- তারা আগে বর্মায় থাকত। তারপর ভারতে চলে আসে, এও জানা যায় যে মালুর বাবা মায়ের চিঠি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে। কিন্তু সরাসরি বাবার পেশার উল্লেখ

নেই। অন্যদের ক্ষেত্রেও তাই। 'রাণী রূপমতির রহস্য'তে এদের সবার বাবা-মায়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বোঝা যায় যে এদের বন্ধুত্বের কারণে তাঁদের পরিবারের মধ্যেও সখ্য গড়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন কাহিনিতে বিভিন্ন জনের আত্মীয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, 'গণ্ডালু ও তিব্বতী গুহার ভূত'-এ সম্পূর্ণ ঘটনাই ঘটে সোনাদা ও ঘুমের মাঝামাঝি অবস্থিত কালুর কাকার ফার্মহাউসে; 'হাতিঘিসার হানাবাড়ি'টা মালুর জ্যাঠামশাই শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদারের বাড়ির কাছেই; আবার ফুলওয়ারিগাঁওতে বুলুর দাদু রিটায়ার্ড প্রফেসর অশ্বিনীকুমার গুপ্তর বাগান বাড়িতে জমাট বাঁধে 'তপোবন রহস্য'। 'আভিশপ্ত রাজবাড়ি'তে জানা যায় টুলুর বড় মামা চিত্তরঞ্জন দত্ত পেশায় অধ্যাপক। সবমিলিয়ে আর্থ-সামাজিক বিচারে গণ্ডালুরা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেনির প্রতিনিধি।

গোয়েন্দা গণ্ডালুরা পেশাদার গোয়েন্দা নয়, তারা স্কুলের ছাত্রী। কাহিনিগুলি সম্পূর্ণ ভাবেই কিশোর বয়সের অ্যাডভেঞ্চার। তারা ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে এবং ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সন্দেহ জনক কিছু চোখে পড়লে তারা রহস্যের পিছনে ছুটে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিচিত মহলের মানুষদের জন্য তারা রহস্য উন্মোচনে নামে। 'জমিদার বাড়ির রহস্য'তে তারা যেমন অণিমাদির বাবার মণিমুক্ত উদ্ধার করেছে, 'নন্দনকাননের রহস্য'তে তাদের সহপাঠী সীতার বাবার সম্পত্তির দলিল উদ্ধার করে দিয়েছে, 'অলৌকিক বুদ্ধমূর্তি রহস্য'তে অণিমাদির বুদ্ধমূর্তি উদ্ধার করে দেয়। তবে 'রাণী রূপমতির রহস্য'তে তারা সোনা পাচারকারী দলকে ধরিয়ে দেয় এখানে তাদের কোনও রকম পূর্বপরিচিতির প্রসঙ্গ নেই। কাহিনিগুলিতে যতটুকু অপরাধ চিত্র দেখানো হয়েছে তা শিশুমননে যেন কোনও রকম ভয়ানক প্রভাব বিস্তার না করতে পারে তার দিকে নজর রেখেছেন লেখিকা। এই কারণে মনে হয় কোনও কাহিনিতে কোনও খুনের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়না, গোয়েন্দা কাহিনির ক্ষেত্রে যা একটা উল্লেখযোগ্য উপাদান। এখানকার অপরাধীরা অতটা নিষ্ঠুর নয়। তারা ভূত সেজে ভয় দেখায়, সুড়ঙ্গের মধ্যে বেঁধে রাখে, আটকে রাখে, কিন্তু খুন করেনা। 'গণ্ডালু ও তিব্বতী গুহার ভুত'-এ গণ্ডালুরা গুদাম ঘরের তলা থেকে খুঁজে বের করে কালুর কাকাকে। 'তপোবন রহস্য'তে বুলুর দাদুও ও কাকুকে গুণ্ডারা লুকনো ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছিল, তারা সেই ঘর আবিষ্কার করে তাঁদের উদ্ধার করে।

গণ্ডালুদের কাহিনির মধ্যে সুড়ঙ্গ আর গুহার উপস্থিতির হার বড্ড বেশি। 'গুণ্ডা ও গণ্ডালু', 'টাওয়ার হিলের রহস্য', 'গণ্ডালু ও তিব্বতী গুহার ভূত', 'হাতিঘিসার হানাবাড়ি' 'গণ্ডালু ও রাণী রূপমতির রহস্য' এসবেতেই তারা অভিযান চালাতে চালাতে টানেল বা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে। আর গুহার মধ্যে না ঢুকলে তারা আবিষ্কার করে লুকনো ঘর ---

'জমিদার বাড়ির রহস্য'তে যেমন দেখা যায় দাদুর লাইব্রেরীর পিছনে একটি চোরা কুঠুরি আছে, 'নন্দনকাননের রহস্য'তে যদিও তাদের ঢুকে পড়ার মতো ঘর দেখতে পাওয়া যায়না, কিন্তু দলিলটা উদ্ধার হয় লুকনো চোরা খুপরি থেকে। 'তপোবনের রহস্য'তে তারা গুদাম ঘরের মধ্যে একটা লুকনো ঘরের সন্ধান পায় – যেখানে বুলুর দাদু আর কাকাকে আটকে রাখা হয়েছিল। অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে একটা গা ছমছমে আবহ আনার জন্য লেখিকা বারবার এই ধরনের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু বারবার একই রকমের পরিবেশের বর্ণনার জন্য কাহিনিগুলো অনেক সময় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে ।

গণ্ডালুদের অ্যাডভেঞ্চারের খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল। এবার আসা যাক তাদের অনুসন্ধান পদ্ধতিতে। কালুর একটি খাতা আছে যেটাতে সে নোট নেয়, কোন কোন বিষয়গুলো সন্দেহজনক এবং তাদেরকে কী ভাবে এগোতে হবে অনুসন্ধানের পথে সে বিষয়ে সংক্ষেপে সে লিখে রাখে। মালুর একটা লাল ডায়েরী আছে। যেটাতে সে মাঝে মাঝে কবিতা লেখে এবং নানা রকম কল্পনার কথা লিখে রাখে। এই ডায়রিতে মাঝে মাঝে রহস্য উন্মোচনে কাজে লাগতে পারে এমন সঙ্কেত লিখে নেয় মালু। 'জমিদার বাড়ির রহস্য'তে হুমকি চিঠির আদলে যে সঙ্কেত এসেছিল তা মালু ডায়েরীতে লেখে এবং সঙ্কেত খুঁজে বের করে হারানো রত্ন উদ্ধার করে। 'নন্দন কাননের রহস্য'তেও কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় যে পদ্যের মাধ্যমে প্রাথমিক সঙ্কেত রেখে গেছিলেন তাও মালু তার ডায়রিতে লিখে বার বার দেখে সঙ্কেত খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকে। এই ডিকোডিং এর মাধ্যমে রহস্য সমাধানের বিষয়টা বেশ আকর্ষণীয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 'নন্দন কাননের রহস্য', এখানে একটি পদ্যের মধ্যে ছিল প্রাথমিক সঙ্কেত --

নন্দন কানন শোভা মনোরম কিবা
দিবা নিশি দেখি বসি সব কাজ ছাড়ি,
প্রস্ফুটিত ফুলদল কিবা মনোহর ।
তাহাদেরই মাঝে আমি এ জীবন যাপি,
সঙ্গি মম লতা গুল্ম সঙ্গী মম গাছ,
এ-নির্জন বাসে মোর খেদ নাই মনে,
প্রকৃতির রূপে তৃপ্ত আমার অন্তর।
রূপে মগ্ন নিদ্রা মোর, রূপে পূর্ণ জাগা,

প্রকৃতির রূপে চক্ষু মুগ্ধ হয়ে আছে,

তাই মোর কাছে বিশ্ব এমন সুন্দর।

নাগরিক জীবনের কাঁদা আর হাসা,

অনায়াসে তাই আমি ভুলে যেতে পারি।

ঋতুতে ঋতুতে নব রূপ দেখি তাই।,

কি প্রভাতে কি সন্ধ্যায় মনোহর অতি।

এই মোর জীবনের দৈনিক লিপিকা

আমার লেখনী যেন রূপস্রষ্টা তুলি,

দুই চোখ ভরে দেখি প্রাণ ভরে আঁকি,

কত তার রূপ-রেখা কত তার রং

ফোটাতে পারি বা কত পারি না কতক,

নন্দন কানন মোর পরম সুন্দর।[১৭]

এই পদ্যটির শেষ অক্ষরগুলি পর পর সাজালে যে সঙ্কেত পাওয়া যায় তা হল --- ‘বাড়ির পিছনের গাছের সারি ইতি কালিকিংকর’। এই পদ্যটি দেখে পাঠক লেখিকার কলমের জোরকে বুঝে নিতে পারেন। পদ্যটির প্রত্যেকটা পঙক্তির শেষ অক্ষরকে তিনি মুন্সিয়ানার সঙ্গে সাজিয়েছেন, এবং প্রত্যেকটা শব্দের শেষে ব্যাবধান রাখার জন্য তিনি কয়েকটা পংক্তির পর যতি চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। এবং বলা বাহুল্য যে এর ফলে কোনও ভাবে পদ্যের স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ হয়নি। এর পর তারা বাড়ির পিছনে গাছের সারির কাছে অনুসন্ধান করে কিছু গাছ এবং মধ্যে মধ্যে বেশ অনেকটা করে ফাঁক দেখতে পায়। যে গাছগুলো পায় সেগুলোর নামের প্রথম অক্ষর সাজিয়ে তারা যে সঙ্কেত উদ্ধার করে, তা হল ---

ছাতিম-দেবদারু-রসাল (আম) = ছাদের, কিংশুক-নাগকেশর-রেড়ী = কিনারে, চালতা-করবী-ফুরুস-টগর = চারফুট, বান্দরলাঠি-যুকালিপটাস = বায়ু । ছাদের বায়ু কোণের কিনারা থেকে চারফুট দূরে টাইলস খুঁড়ে তারা দলিল আবিষ্কার করে।

আরেকটি ব্যাপার বারবার বিভিন্ন কাহিনিতে দেখতে পাওয়া যায়, তা হল গণ্ডালুরা যখন অনেক লোকের সামনে নিজেদের মধ্যে দরকারি কথা সেরে নিতে চায় তখন তারা

সঙ্কেতে কথা বলে। যেমন --- "খুড়শ্বশুরের বদান্যতায় সম্মানিত নরখাদকের দেহবসান হস্তান্তরিত জন্মান্তরের নরক-যন্ত্রণায় কণ্টকিত"[১৮] । প্রত্যেকটা শব্দের প্রথম অক্ষর সাজিয়ে হয় --- খুব সন্দেহ জনক জনক। বেশির ভাগ কাহিনিতেই অন্তত একবার এভাবে তাদের কথা বলতে দেখা গেছে।

❖ কাহিনি বিন্যাস

গণ্ডালু সিরিজের হারিয়ে যাওয়ার একটা মূল কারণ মনে হয়, কাহিনি বয়নের একঘেয়ে ধরণ। এই একঘেয়ে ধরণ নিয়ে আলোচনার শুরুতে গণ্ডালু সিরিজের কাহিনিগুলোকে কাহিনির বিষয়বস্তু অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেনিতে বিন্যাস্ত করে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে গণ্ডালুদের স্কুলের চারপাশের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলির কথায় আসা যাক।

- **কাঞ্চনপুর ও ঝাউতলা কেন্দ্রিক অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্য সমাধানের কাহিনি**

প্রকাশকাল অনুয়ায়ী গণ্ডালু সিরিজের প্রথম কাহিনি 'গোয়েন্দা গণ্ডালু'। এখানে চার বন্ধুকেই দেখা যায়। মালু রোজ রাতে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পায়। পাশাপাশি উপলব্ধি করে কেউ তাদের ওপর নজর রাখে এবং পাশের হানাবাড়িতে চলে যায়। হানা বাড়িটি সম্বন্ধে শোনা যায় বাড়িটি কোনও এক জমিদার বানিয়েছিলেন। একসময়ে তাঁর ছেলে বা মেয়ে সম্ভবত দুর্ঘটনায় মারা যায়, আর নাতি বা নাতনি হারিয়ে যায়। তারপর জমিদার তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক জমি আর টাকাকড়ি ভালো স্কুল বানানোর জন্য দান করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। পরে এই সিরিজের অন্যান্য গল্প পড়ে জানা যায় আসলে জমিদারের মেয়ে এবং জামাই বর্মা থেকে ফেরার সময় রাস্তায় মারা যান এবং তাঁদের সন্তানরা হারিয়ে যায়।

গণ্ডালুরা দেখে রোজ রাতে দেখতে পায় চাদর মুড়ি দেওয়া একটা বেঁটে লোক দারওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তারপর ঝি কেষ্টদাসীর কাছে চলে যায়। কেষ্টদাসীর মাধ্যমে মনিকাদির সঙ্গে তার চিঠি আদান প্রদানও হতে থাকে। একদিন সেই বেঁটে লোকটা মনিকাদির ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপরের দিন থেকে অনিমাদি বেপাত্তা হয়ে যায়, এবং জানা যায় মনিকাদি কোথাও বেরিয়েছে।

গণ্ডালুরা পোড়ো জমিদার বাড়িতে হানা দেয়। সেখানে গিয়ে সব রহস্যের সমাধান হয়। দেখা যায় নিখোঁজ জমিদার নাতি নাতনির সন্ধান করতে করতে ফিরে এসেছেন। আর আনিমাদিও নিজের দাদুর সন্ধান করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা একে অপরকে খুঁজে পেয়েছেন। আর যে বেঁটে লোককে গণ্ডালুরা সন্দেহ করছিল, সে আসলে অনিমাদির দাদুর পোষা শিম্পাঞ্জি।

রহস্য উন্মোচিত হয়। এবং এরপর থেকে অনিমাদির দাদু গণ্ডালুদেরও দাদু হয়ে ওঠে। বেশ কিছু কাহিনিতে ঘুরে ফিরে এই দাদু আর এই দাদুর বাড়ি, অর্থাৎ পোড়ো জমিদার বাড়ির প্রসঙ্গ আসে। আর পোষা শিম্পাঞ্জি অঙ্গদকে তাদের সহকারী সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যায়।

এই চরিত্র এবং প্রায় একই প্রেক্ষাপটে রচিত হয় 'জমিদার বাড়ির রহস্য'। বড়দিনের ছুটি কাটাতে গণ্ডালুরা জমিদার বাড়িতে এসেছিল। হঠাৎ মালু বেপাত্তা হয়ে যায়।

কিছুদিন আগে আনিমাদির কাছে একটা চিঠি এসেছিল, তাতে লেখা ছিল --- "পালাইয়া যাইলেই হবে ? করিবই তোর অপমান! আছি কেমন বেদে ভায়াদের গলেমালে ! দেমাকে বুঝে তোর পায়া চুলকাল ? আমাকে মারিলে তোর দেমাকের মাঝে ফরফরানির কতা থাকে"[১৯] ।

চিঠি পড়ে আনিমাদি ফেলে দিয়েছিল। অনুমান করা গেছিল আনিমাদির কাছে কখনো প্রত্যাখ্যাত কোনও ব্যাক্তির লেখা চিঠি এটি। মালু তার ডায়রিতে নোট করে রাখে লেখাটি। তাদের আরও মনে পড়ে পুজোর ছুটির পর তারা যখন ফিরছিল, রাস্তায় একটি লোক তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তারা বর্মা থেকে এসেছে কিনা। কালুর ধমকে সে চলে গেলেও এরপর থেকে লোকটিকে স্কুল বাড়ির আসে পাসে দেখা যায়। এমনকি অঙ্গদের সঙ্গেও সে ভাব করে নেয়।

মালুর নিরুদ্দেশের পিছনে ঐ লোকটির হাত আছে ধরে নেয় গণ্ডালুরা। প্রথমে নিজেরা খানিকক্ষণ খোঁজার পর পুলিশে জানায়। বড় দারোগা শ্রী গনেশ চন্দ্র গঙ্গপাধ্যায় এবং ছোটো দারোগা বিদ্যুৎ বসু আসেন। তাঁরা বহু বছরের চাকর ঘনশ্যামকে ধরে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু দাদু জানায় এত বছরের চাকর ঘনশ্যাম, তাকে দিয়ে কোনও অনিষ্ট সম্ভব নয়। গণ্ডালুরা আবার তদন্তে নেমে পড়ে।

জমিদার বাড়ির লাইব্রেরীতে গণ্ডালুদের অবাধ যাতায়াত ছিল। মালু প্রায়ই সেখানে পড়তে যেত। প্রথমে সেখানে কিছু পাওয়া না গেলেও অঙ্গদ বারবার পশ্চিমের ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মারছে দেখে গণ্ডালুরা আবার সেখানে যায়। কালুর নজর পড়ে পশ্চিমের ঘুলঘুলির দিকে । বাইরে থেকে তারা দেখেছিল ঘুলঘুলির জাল ছেঁড়া, কিন্তু ভিতর থেকে দেখল ঘুলঘুলির জাল আস্ত রয়েছে। তাছাড়া বাকি সব ঘুলঘুলি দিয়ে আলো আসলেও ঐ ঘুলঘুলি দিয়ে আলো আসছে না। অর্থাৎ, বাড়ির পশ্চিম দেওয়াল আর লাইব্রেরীর পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যে ফাঁক আছে। এরপর তারা মাপামাপি করে নিশ্চিত হয় যে, তাদের ধারণা ঠিক। লাইব্রেরির একটা আলমারির বই এলোমেলো হয়ে রয়েছে দেখে সেখানে যেতেই মালুর ডায়েরি পাওয়া যায়। ডায়েরিতে অন্যান্য তথ্যের পাশাপাশি আনিমাদির চিঠির প্রতিলিপি পাওয়া যায়। আর দেখা যায় মালু শব্দগুলি উপর নিচ করে সাজিয়েছে।

পালাইয়া যাইলেই হবে করিই তোর	অপমান আছি কেমন	বেদে ভায়াদের গোলেমালে	দেমাকে বুঝে তোর	পায়া চুলকাল আমাকে মারিলে তোর	দেমাকের মাঝে ফরফরানির	কতা থাকে

প্রত্যেকটা শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর পরপর সাজালে পাওয়া যায় --- “লা-ই-বে-রি-র প-ছি-ম দে-ও-য়া-লে য়া(আ)-ল-মা-রি-র মা-ঝে-র তাকে”[২০] ।

ঐ মাঝের তাকেই মালুর ডায়েরিটা পাওয়া গেছিল। তারা ঐ তাক হাতড়াতে হাতড়াতে নিজেদের অজান্তেই কোনও গোপন স্প্রিংয়ে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ফেলে। এর ফলে আলমারি সমেত বিরাট একটা দরজা খুলে যায়, পিছনে অন্ধকার । কালু তার মধ্যে ঢুকতেই আবার দরজা বন্ধ হতে শুরু করে। বুলু প্রাণপণে দরজা আটকে রাখে, আর এই সুযোগে টুলু চেয়ার এনে দুই দরজার মাঝে বসিয়ে দেয়। এরপর মালুকে ওখান থেকে উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে পাওয়া যায় একটা ন্যাকড়ার পুতুল। অনিমাদি জানায় যে সেটা তার ছেলেবেলার খেলার পুতুল, বর্মায় ফেলে এসেছিল। দাদু অর্থাৎ জমিদার জানান যে ঐ চোরা খুপরিতে ধন-সম্পত্তি রাখা হতো। সিপাহী বিদ্রোহের সময় নেতাদেরও ওখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

সেই সময় বাড়ির বাইরে একটা আওয়াজ শুনে তারা বেরিয়ে এসে দেখে মাথায় হাত দিয়ে পড়ে আছে সেই চেনা বুড়ো। আনিমাদি তাকে দেখে চিনতে পারে এই ব্যাক্তি রঙ্গলালদা, তাদের বর্মার বাড়ির পুরনো কাজের লোক। রঙ্গলালদার জ্ঞান ফেরার পর সে আনিমাদিকে চিনতে পারে, কিন্তু মালুদের চিনতে পারেনা। মাথায় চোট লাগার জন্য তার স্মৃতির কিছু অংশ কাজ করা বন্ধ করে দেয়। রঙ্গলালদা জানায় যে আনিমাদির বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বর্মা থেকে পালিয়ে আসার সময় সব দামি হিরে জহরতগুলো ঐ ন্যাকড়ার পুতুলের পেটের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মারা যাওয়ার সময় ওটা রঙ্গলালের হাতে দিয়ে যান। পুরনো কাজের কর্মচারী হওয়ায় সে ঐ চোরা কুঠুরির সন্ধান জানত। তাই কাঞ্চনপুরে এসে আনিমাদি বা তার দাদুকে খুঁজে না পেয়ে সে ঐ পুতুলটা নিজের কাছে না রেখে ঐ গোপন কুঠুরিতে ফেলে দেয়। তারপর ডাকযোগে আনিমাদিকে চিঠি পাঠায়।

এই কাহিনি পড়ে জমিদারকে অনিমাদির ঠাকুরদা বলে মনে হয়। কারণ এই জমিদার বাড়ির পুরনো কর্মচারী ছিল সে, তারপর অনিমাদির বাবার কাছে কাজ করত। কিন্তু পরবর্তী কিছু কাহিনিতে জানা জানা যায় জমিদার আসলে তার ঠাকুরদা নন, দাদামশাই। প্রশ্ন জাগে দাদামশাইয়ের কর্মচারী কীভাবে বর্মায় আনিমাদিদের বাড়ির কর্মচারী হয়ে উঠল। কিন্তু তার কোনও সদুত্তর কোনও কাহিনিতে পাওয়া যায়না।

আনিমাদির জীবন ইতিহাসের প্রসঙ্গ এরপরও একটি কাহিনিতে ফিরে আসে, তবে সেটা কাঞ্চনপুর কেন্দ্রিক নয়। তাও এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যায় যে 'গুণ্ডা ও গণ্ডালু' কাহিনিতে আনিমাদির হারানো ভাই বোনকে খুঁজে পাওয়া যায়।

'নন্দন কাননের রহস্য' কাহিনিতে গণ্ডালুদের স্কুল ও হোস্টেল চত্বরের বাইরে বেরিয়ে রহস্য সমাধান করতে দেখা যায়। গণ্ডালুদের স্কুলের থেকে খুব বেশি দূরে নয় নন্দন কানন, এটি বিশাল বাগান বাড়ি। পত্রিকায় লেখা বেরোয় এবং কানাঘুষো শোনা যায় যে, ওটা ভূতের বাড়ি। কিন্তু গণ্ডালুদের সহপাঠী সীতা বাড়ির আসল ইতিহাস জানায় তাদের। শ্রী কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বুড়ো বয়সে খুব খামখেয়ালি হয়ে পড়েছিলেন। দুই ছেলের হাতে ব্যাবসার দায়িত্ব দিয়ে তিনি এই নির্জন জায়গায় বাড়ি তৈরি করে থাকতে শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে থাকত ভাগ্নে তপন। তাঁরা দুজন মিলে বাড়ির চারপাশে বিভিন্ন ফুল আর ফলের গাছ লাগাতেন। তপনকে তিনি কোনও কাজের সন্ধান করতে দেননি। তপন চ্যাটার্জি ঝাউতলার একটি মেয়েকে বিয়ে করেন, এদের দুজনের সন্তান সীতা।

বয়স বাড়ার সঙ্গে রামকিঙ্করের খামখেয়ালিপনাও বেড়ে যায়। তিনি বিভিন্ন জিনিস লুকিয়ে রেখে মজা করতেন। তপনবাবুকে বলতেন সম্পত্তি তাঁর হাতে দিয়ে যাবেন না, মাথা খাটিয়ে বের করে নিতে হবে। তিনি মারা যাওয়ার পর কোনও উইল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর ছেলেরা এসে তপনবাবুকে বেদখল করে করে দেয়, তিনি স্ত্রী কন্যা নিয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে আসেন। শ্বশুর বাড়ি থেকে চাইত তিনি মামলা লড়ুন, কিন্তু তিনি তা চাননি। অশান্তির জেরে তিনি গৃহত্যাগী হন। সীতা তখন খুব ছোটো। সীতার দাদামশায় মারা যাওয়ার পর থেকে তপনবাবু শাশুড়িকে প্রতি মাসে টাকা পাঠাতেন, কিন্তু নিজে ফিরে আসেননি। সীতা গণ্ডালুদের কাছে ঐ বাড়ির উইল খুঁজে দেওয়ার আর্জি জানায়। এবং তাদের কাছে কালিকিঙ্করের ডায়েরি তুলে দেয়। গণ্ডালুরা অনেক চেষ্টার পর ডায়েরির মধ্যে একটা ছড়া খুঁজে পায়, যার শেষ অক্ষরগুলো সাজালে পাওয়া যায় –'বাড়ির পিছনের গাছের সারি --- ইতি কালিকিঙ্কর'। তারা বাড়ির পিছনে গিয়ে অনুসন্ধান করে ১৩/১৪টা গাছ পায়। সেই গাছ গুলোর নামের প্রথম অক্ষর সাজিয়ে পায় --- 'ছাদের কিনারে চারফুট বায়ু'। তারা সেখানে গিয়ে অনেক খোঁজা খুঁজির পর ছাদের কিনারের ছারফুট দূরে বায়ুকোণ বরাবর একটা আলগা টাইলস খুঁজে পায়। সেটা খুলে তার তলা থেকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাক্স বের করে। সেই বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায় রামকিঙ্করের উইল।

এই কাহিনিটি খুবই বুদ্ধিদীপ্ত এবং রোমাঞ্চকর। মাঝে গণ্ডালুদের ঘরের মধ্যে আটকে পড়ার জায়গাগুলোতে লেখিকা দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। আম গাছের আরেক নাম রসাল কিংবা ভ্যারেণ্ডা গাছের আরেক নাম রেড়ী তারা এগুলো নিজেদের ক্লাস থেকে জানতে পারে । সোঁদাল গাছের গায়ে বাঁদরের ছবি লাগানো দেখে তাদের খেয়াল হয় – সোঁদালের আরেক নাম বান্দরলাঠি। এসব ঘটনাগুলোয় তাদের কৃতিত্ব খাটো হয়না। তবে যখন জানা যায় যে তাদের আবিষ্কারের আগেই তপনবাবু নিজে রহস্য সমাধান করে উইল খুঁজে পায়েছিলেন। শুধুমাত্র তারা যাতে নিজেদের হাতে এটা খুঁজে বের করতে পারে তার জন্য তিনি যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে দিয়েছিলেন, তখন গণ্ডালুদের এতো বুদ্ধিদীপ্ত অভিযানের কাহিনি খানিকটা ম্লান হয়ে যায়। অথচ লেখিকা যে কেন এমনটা করলেন তার যুক্তিযুক্ত সদুত্তর পাওয়া যায়না।

'খোয়াই রহস্য' , 'অলৌকিক বুদ্ধমূর্তি রহস্য', 'নীলাঞ্জনার দুর্ভোগ' , 'টাওয়ার হিলের রহস্য' , 'সোনার খনির সন্ধানে', 'রঙ্গন গড়ের রহস্য', 'ঝাউতলার ভূত', 'রঙ্গন পাহাড়ের রহস্য', 'নন্দিনী নিরুদ্দেশ', 'কাঞ্চন পুরের রাজবাড়ি' --- এই কাহিনিগুলো মূলত গণ্ডালুদের স্কুল ও হোস্টেল চত্বরের আশপাশের ঘটনা। বাকি কাহিনিগুলিতে দেখা যায় হয় পুজর

ছুটিতে কিংবা বড়দিনের ছুটিতে তারা কোথাও বেড়াতে গিয়ে কোনও না কোনও ভাবে একটা রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে 'টাওয়ার হিলের রহস্য', 'রঙ্গন পাহাড়ের রহস্য', এবং 'কাঞ্চনপুরের রাজবাড়ি'র কাহিনি সম্পূর্ণ ভাবে লেখিকার বর্ণিত অঞ্চলের ইতিহাস এবং ভৌগোলিক অবস্থানকে কেন্দ্রে রেখে রচিত।

- **মাটির তলায় রহস্য**

লেখিকার একটি অন্যতম প্রিয় বিষয় হল মাটির তলায় ঘর বানিয়ে মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে অপরাধ কর্ম চালানো। কিংবা গুপ্তধন লুকনোর জন্য বা অন্য কোনও কারণে মাটির তলায় ঘর বানিয়ে রাখা।

'খোয়াই রহস্য'-এর কাহিনি বুননও বেশ কৌতূহল উদ্দীপক। গণ্ডালু সিরিজের বেশির ভাগ কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রেই লেখিকা আগে থেকে ইঙ্গিত দিয়ে দেন রহস্যটা আসলে কী। এরপর তিনি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি বর্ণনা করেন, কিভাবে গণ্ডালুরা ঝুঁকি নিয়ে সেই অপরাধীদের ধরিয়ে দিল। কিন্তু এই কাহিনিতে যতক্ষণ না গণ্ডালুরা রহস্যের সমাধান করে ফেলে তার আগ পর্যন্ত পাঠক জানতে পারে না যে অপরাধীদের আসল উদ্দেশ্য আসলে কী।

মালুর পক্স হওয়ার কারণে বাকিরাও ছুটিতে হোস্টেলেই থেকে যায়। মাঝরাতে মাঝে মধ্যেই তারা ট্রাকের শব্দ শুনতে পায়, কিন্তু আলো দেখতে পায়না। গাড়ির চাকার দাগ ধরে তারা অনুসন্ধান চালাতে থাকে। তারা দেখতে পায় খোয়াইয়ের মধ্যে দিয়ে মাটির রাস্তা ধরে ঝাউতলা অবধি ট্রাকগুলো লুকিয়ে যাতায়াত করে। আর খোয়াইয়ের কাছে কিছু টিনের ছাউনি দেওয়া দোকান গজিয়ে উঠেছে। তারা অবাক হয় যে জনমানবশূন্য এমন জায়গায় কেন এতগুলো দোকান গজিয়ে উঠেছে। কালু একটা দোকানে কাগজ পেন্সিল কিনতে যায়, দোকানদার জানায় যে তাদের কাছে ওসব জিনিস নেই। অন্য একটা দোকানের কাছে যেতেই দোকানদার বলে ওঠে এখানে কিছু পাওয়া যাবে না। তারা লক্ষ করে যে এমন জনমানবশূন্য এলাকায় দোকান গড়ার পরও তাদের জিনিস বিক্রির কোনও তাগিদ নেই। তারা অনুমান করে যে এর পিছনে নিশ্চয়ই আন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। একদিন সুযোগ বুঝে তারা গুদাম ঘরে ঢুকে পড়ে। বাইরের গুদাম ঘরে পাকা মেঝে, কিন্তু পিছন দিকে কাঠের মাঝে, এই মেঝে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তারা চারজনের হুড়মুড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। নিচে দেখতে বিভিন্ন ধরনের মেশিন, শিশি, বাক্স, কৌটো, কাগজপত্র ইত্যাদি।

কাগজগুলো আসলে ‘হরলিক্স মলটেড মিল্ক’, ‘আমুল বেবি ফুড’ জাতীয় জিনিসের। এরপর তারা দেখতে পায় ওষুধের শিশি, ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল; কোনোটা লেবেলিং করা আবার কোনোটা লেবেল ছাড়া। তারা বুঝতে পারে এসব ভেজালকারীদের কারবার। কিন্তু যেখানে তারা পড়ে গেছে সেখান থেকে ওপরে উঠে বেরবার কোনও উপায় খুঁজে পায়না। শেষ পর্যন্ত অঙ্গদ এসে হাজির হয়। তার কোমরে দড়ির মই বেঁধে তাকে ওপরে পাঠিয়ে দেয় গণ্ডালুরা। তারপর এক এক করে মইয়ের সাহায্যে বাইরে বেরিয়ে আসে। এরপর পুলিশে খবর দেয় তারা। এবং এই মস্তবড় কুখ্যাত ভেজালকারীর দল ধরে পড়ে যায়।

এরপর ‘অভিশপ্ত রাজবাড়ি’ কাহিনিতে দেখা যায় গণ্ডালুরা টুলুর মামার বাড়ি জগদ্ধাত্রীপুরে ছুটি কাটাতে গেছে। সেখানেকার পোড়ো রাজবাড়ির ভিতরে ঢুকে তারা দেখতে পায় মধ্যযুগীয় পোশাক পরে এক রাজা ও রাজকন্যা যুদ্ধ করছে। ফিরে এসে বড়মামা প্রফেসর চিত্তরঞ্জন দত্তের কাছ থেকে জানতে পারে যে ঐ রাজবাড়ি একটি কিংবদন্তী আছে -- জগদ্ধাত্রীপুরের প্রজাবৎসল রাজা দুর্গাপ্রসাদ অপুত্রক মারা যাওয়ার পর তাঁর নাবালক দৌহিত্র হরপ্রসাদের হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেন তাঁর কন্যা চণ্ডিকা দেবী। তিনি লেখাপড়া, অস্ত্রচালনা, ঘোড়ায় চড়া, রাজকার্য পরিচালনা সবই জানতেন। বদনপুরের জমিদার দর্পনারায়ণ জগদ্ধাত্রীপুরের কয়েকটি প্রজাকে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করালেন। সবাই যখন তাই নিয়ে ব্যস্ত তখন তিনি রাজবাড়ি আক্রমণ করেন। রক্ষীদের পরাজিত করে রাজকুমারীকে আক্রমণ করতে করেন। তখন দর্পনারায়ণের অনুচররা দেখলেন চণ্ডিকাদেবী হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন, তারপর দেবী মূর্তির ভিতর থেকে স্বয়ং জদদ্ধাত্রী বেরিয়ে এসে তাঁর খড়্গ দিয়ে দর্পনারায়ণকে হত্যা করলেন।

দেশ স্বাধীন হাওয়ার পর দলিলপত্রের অভাবে জগদ্ধাত্রীপুরের রাজারা রাজবাড়ির অধিকার পেলেন না।

একদিন সকালে উঠে গণ্ডালুরা দেখতে পায় যে রাজবাড়িতে যে রাজকুমারীকে যুদ্ধ করতে দেখেছিল, তিনিই বড়মামি ছোটমামির সঙ্গে কথা বলছেন। পরে মামাদের কাছ থেকে জানতে পারে তিনি রাজবংশের মেয়ে পার্বতী, জনহিতকারী কাজের জন্য চাঁদা চাইতে এসেছিলেন। গণ্ডালুরা তখন বুঝতে পারে যে তিনি আর যাই হন প্রেত নন।

আবার তারা রাজবাড়িতে হানা দেয়। এবং গিয়ে দেখতে পায় তলোয়ার নিয়ে রাজা দর্পনারায়ণ আর রাজকুমারী চণ্ডিকা যুদ্ধ করছেন। বুলু ভয় পেয়ে পালাতে যায়, বাকিরা তাকে আটকানোর জন্য ছুটে যেতেই পুরনো কাঠের মেঝে ভেঙে তারা নিচে পড়ে যায়।

অনেক কষ্টে তারা সেখান থেকে সুড়ঙ্গ রাস্তা খুঁজে বের হয় এবং রাজা রাজকুমারীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে হাজির হয়ে তারা জানতে পারে যে রাজবাড়ির প্রচলিত কাহিনি নিয়ে তাঁরা ঐ রাজবাড়ির মধ্যে মঞ্চ তৈরি করে নাটক করবেন। কিন্তু রাজকুমারীর অদৃশ্য হওয়ার দৃশ্যটা তাঁরা কীভাবে দেখাবেন বুঝতে পারছেন না। গণ্ডালুরা তাদের আসার পথ জানিয়ে দেওয়ায় সেই সমস্যার সমাধান হয়। নির্দিষ্ট দিনে নাটক অভিনয় হয়, গণ্ডালুরাও তাতে অংশগ্রহণ করে।

পরে গণ্ডালুরা রাজবাড়ির অধিকার থেকে বঞ্চিত পার্বতীকে ঐ ঘরের সংলগ্ন সুড়ঙ্গের সন্ধান দেয়। সুড়ঙ্গের পাশের খুপরিতে বড়বড় সিন্দুক আছে তাও জানায়। সেই সিন্দুক থেকে উদ্ধার হয় অনেক মূল্যবান জিনিস এবং রাজবাড়ির বৈধ দলিলপত্র।

তবে এই কাহিনিতে গণ্ডালুদের বিশেষ কৃতিত্ব কিছু নেই। কারণ তারা হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে গোপন রাস্তা দেখতে পায়, নিজেদের চেষ্টায় তারা কিছু খুঁজে বের করেনি এখানে।

'রঙ্গন পাহাড়ের রহস্য'তে দেখা কিছু পুরাতত্ত্বের গবেষক ছেলেমেয়ে তাদের গবেষণার জন্য কাঞ্চনপুর জায়গাটাকে বেছে নিয়েছে। এর মধ্যে দুজন আমেরিকান ছেলে মেয়ে মার্টিন ও মার্থা এবং দুজন ভারতীয় মদন আর শঙ্কর। এদের সঙ্গে গণ্ডালুদের আলাপ হয়। বিদেশী ছেলেমেয়ে দুজন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বে আগ্রহী থাকলেও মদন ও শঙ্কর তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। গণ্ডালুরা দাদুর লাইব্রেরি থেকে এক পর্যটকের বই পড়ে জানতে পেরেছিল পর্যটক শুনেছিলেন রঙ্গন পাহাড়ের উত্তর ঢালে ঝাউলতার রাজার প্রমোদভবন ছিল। কিন্তু তিনি সেটা খুঁজে বের করতে পারেন নি। গণ্ডালুরা সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। মার্থা ও মার্টিন তাদের সঙ্গে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ঠিক হয় শনিবার তারা একসঙ্গে যাবে। শনিবার মার্থা ও মার্টিনের জন্য অপেক্ষা করার সময় মার্থা এসে জানায় যে গত রাতে মদন আর শঙ্করের সঙ্গে মার্টিনের ঝগড়া হয়। শঙ্কররা গণ্ডালুদের সঙ্গে থাকার ব্যাপারটা পছন্দ করছেনা, তাদের বক্তব্য গণ্ডালুরা সঙ্গে থাকলে তাদের কাজ পণ্ড হবে। উল্টোদিকে মার্টিনের বক্তব্য এরা সঙ্গে থাকলে তাদের কাজের সুবিধে হবে। এই বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কির মধ্যে উঠে আসে আরও অন্যান্য প্রসঙ্গ। শঙ্কররা মাঝে মধ্যেই মার্থাদেরকে না জানিয়ে নিজেদের মতো চলে যায়। রঙ্গন পাহাড় একবার ঘুরে আসার পরে আরও একবার মার্টিন সেখানে যেতে চাইলে শঙ্কর আর মদন আপত্তি জানায়। এসব নিয়ে ঝগড়ার পর শঙ্কর ও মদন আলাদা ভাবে কাজ করবে বলে বেরিয়ে যায়। শেষ রাতে ঝোঁকের মাথায় মার্টিন একটা লাঠি নিয়ে তাদেরকে খুঁজতে বের হয়। তার ধারণা রঙ্গনগড়ে

নতুন কিছু আবিষ্কার হতে চলেছে। আর মদন ও শঙ্কর তার পুরো কৃতিত্ব দুজনে নিতে চায়। কিন্তু তাদের স্কলারশিপের নিয়ম অনুসারে চারজনকেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এবং বিশ্ববিদ্যালয় মার্টিনকেই তাদের দলের নেতা নির্বাচন করে দিয়েছে।

এরপর মার্থা ও গণ্ডালুরা রঙ্গনপাহাড়ে যায় সেখানে গিয়ে আহত মার্টিনকে খুঁজে পায়। সে জানায় তাকে কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। এরপর ছ'জন মিলে রঙ্গন পাহাড়ে অভিযান শুরু করে। পাহাড়ের লাগোয়া সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে খানিকটা ওপরে ওঠার পর দড়ির মইয়ের সাহায্যে পাহাড়ের একটি খাঁজে গিয়ে তারা পৌঁছয়। এবং তারপর সেখান থেকে নামে গিয়ে পৌঁছয় ঝাউতলার রাজাদের প্রমোদ ভবনে। এই প্রমোদ ভবনও মাটির তলায় চাপা পড়ে গেছিল। তারা সেটা আবিষ্কার করে। সেখানে গিয়ে নানা ধরনের মূর্তি দেখতে পায়।

মার্টিন জানায় বিদেশে থাকতে শঙ্কর আর মদন বারবার দেশে ট্রাংককল করত, চিঠি পাঠাত, মনে হয় ওখানকার লাইব্রেরিতে পাওয়া তথ্য সরবরাহ করত। যখন শুনল যে গবেষণার জন্য এই অঞ্চলে আসা হবে তারা খুবই খুশি হয়েছিল। গণ্ডালুরা বুঝতে পারে সেই কারণে ঐ অঞ্চলে জঙ্গল কেটে খোঁড়াখুঁড়ি করা শুরু করেছিল দুষ্কৃতিরা। ভিতর থেকে তারা বুঝতে পারে যে বাইরে কিছু খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। বহু কষ্টে মার্থা আর কালু সেখান থেকে বেরিয়ে পুলিশে গিয়ে খবর দেয়। আকস্মিক ভাবে পুলিশ এসে পড়ায় খুঁড়ে বের করা মূর্তি লুকনোর সময় পায়না তারা, শঙ্কর মদন সহ দুষ্কৃতিরা ধরা পড়ে যায়। একটা ঐতিহাসিক আবিষ্কারের পাশাপাশি বিদেশে মূর্তি পাচারকারি দলকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় গণ্ডালুরা।

'কলকাতায় গণ্ডালু'তে দেখা যায় মাটির নিচে রয়েছে এক পাতালঘর যেখানে চুরি করা বাচ্চাদেরকে লুকিয়ে রাখে ছেলেধরার দল। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় যেন জলের ট্যাঙ্ক। কিন্তু নিচে নামার পর দেখা যায় ভিতরে মাঝারি মাপের ঘর রয়েছে। ঘরগুলোতে বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়।

মাটির তলায় রহস্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় জায়গা দখল করে আছে গুহা ও টানেলের মধ্যে গণ্ডালুদের আটকে পড়া। বহু কষ্টে রাস্তা খুঁজে বের হওয়ার কাহিনি।

- ## গুহা ও টানেল প্রসঙ্গ

‘গুণ্ডা ও গণ্ডালু’তে গণ্ডালুদের প্রথমবার গুহার মধ্যে ঢুকতে দেখা যায়। যদিও কোনও রহস্য ভেদ করার জন্য নয়, শুধু মাত্র অ্যাডভেঞ্চারের জন্যই তারা গুহায় ঢুকেছিল। কিন্তু তারপর যাদেরকে তারা সন্দেহজনক মানুষ বলে মনে করে তাদের পিছু করার জন্য বেশ কয়েকবার গুহার মধ্যে ঢুকতে হয়। এই গুহা বা টানেলের মধ্যে অভিযান লেখিকার খুবই প্রিয় একটি বিষয়। অনেকগুলি কাহিনিতে এই অনুষঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। ‘রাণী রূপমতির রহস্য’তে তাদেরকে ‘চম্পা বাউলির টানেল’-এর মধ্যে ঢুকতে দেখা যায়। সেখানে নেমে তারা চারটে টানেলের সন্ধান পায়, যার মধ্যে দুটোর মুখ বন্ধ। টানেল বরাবর যদি কোনও ম্যানহোল থাকে তাহলে তারা সেখান দিয়ে নিচে নামতে পারবে, এই ভাবনা নিয়ে তারা অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু সব ম্যানহোলই নিরন্ধ্র ভাবে আটকানো। ঝারনার কাছে পাথরগুলো লক্ষ করে দেখে যে একটি পাথরে কোনও শ্যাওলা নেই, তাদের সন্দেহ হয় ওটাকে সরানো যায়। কিন্তু তারা চেষ্টা করেও তা সরাতে পারেনা।

একদিন মালুকে রাণী রূপমতির পুতুলের মতো পোশাক পরে ঘুরতে দেখে এক মেয়ে মালুর কাছে এসে চুপচুপি বলে যায় --- যেন পরের দিন ভোরে সে চম্পা বাউলির কাছে পৌঁছে যায়, দেরি হলে তারা খুব রেগে যাবে। পরের দিন ভোরে মালু রূপমতি পোশাক পরে চম্পা বাউলির কাছে হাজির হল। সেখানে ঐ রকম পোশাক পরা সব মেয়েদের দলে মালু মিশে গেল। বাকি তিনজন একটু দূরত্ব রেখে তাকে পিছু করতে থাকল। লোকগুলো চোখের আড়াল হতেই তারা এগিয়ে এসে দেখল, যে পাথরটা দেখে তারা সন্দেহ করেছিল, সেটা সরানো। নিচে চৌকো গর্ত, আর তাতে মই লাগানো রয়েছে। তারা তরতর করে নিচে নেমে যায়। আর একটা ফ্যাকড়া সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে সব কারবার দেখতে থাকে। রাজস্থানি পোশাক পরা ছেলে মেয়ে গুলো প্রত্যেকে হাতে একটা করে প্যাকিং বাক্স নিয়ে ওপরে উঠে যায়। তারপর একজন মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে জানাতে থাকে যে সে বাক্স পায়নি। গোলমাল বেধে যায়। এরপর সবাই ওপরে উঠে গিয়ে মই তুলে নিয়ে পাথর দিয়ে রাস্তা আটকে দেয়। গণ্ডালুরা সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকা পড়ে যায়। তারা প্রথমে বেরনোর চেষ্টা করে, তারপর বেরোতে না পেরে সুড়ঙ্গের মধ্যে অনুসন্ধান শুরু করে। যেখানে লোকগুলো লণ্ঠন জ্বেলে কাজ করছিল সেখানে গিয়ে দেখতে পায় সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা সরু ঘর মতো রয়েছে। সেখানে কিছু তাকে মালুর রাজস্থানি পোশাকের মতো গলাপি-স্ট্রবেরি-মেরুন রঙের পোশাক পরা পুতুল, আবার কিছু তাকে বিভিন্ন রঙের পুতুল অংশ রাখা রয়েছে। পুতুলের ঘাগরাগুলো কৌটোর মতো, আর পুতুলের মাথা থেকে

কোমরের অংশগুলো সেই কৌটোর ঢাকনা। ঘাগরার সঙ্গে ঢাকনা লাগিয়ে দুবার ঘুরিয়ে দিলেই পুতুল হয়ে যাচ্ছে। পিছনের আরেকটি তাকে দেখতে পায় কিছু পাথর সাজানো রয়েছে। পাথরগুলো ঘাগরার কৌটোয় একেবারে ফিট করে যাচ্ছে। এরমধ্যে কিছু কাগজে মোড়া ঐ আকৃতির জিনিস পায় কালু। বুঝতে পারে যে 'রূপমতি পুতুল'-এর মধ্যে সোনার তাল ঢুকিয়ে পাচার করা হচ্ছে। এই সময়ে লোকগুলো ফিরে এসে পাথর সরিয়ে নিচে নামে। এই সুযোগে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ওরা নিজেদের হোটেলে পালিয়ে আসে। ফিরে এসে দেখতে পায় মালু তাদের আগেই সুযোগ মতো পালিয়ে চলে এসেছে। এবং জানতে পারে পুলিশ অফিসার মিস্টার বাজপেয়ীর তাদের পিছু নিয়েই এই কুখ্যাত সোনাপাচারকারী দলকে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

'টাওয়ার হিলের রহস্য'তে অবশ্য কোনও অপরাধীকে পাকড়াও করার ঘটনা নেই। অ্যাডভেঞ্চারের জন্যই তাদের এই অভিযান। লোকমুখে শোনা যায়, ঝাউতলার রাজা দর্পনারায়ণ নাকি টাওয়ার হিলে রাজকুমারী মালবিকাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু মালবিকা সেখান থেকে পালিয়ে যান। পর্যটকের বই পড়ে গণ্ডালুরা জনাতে পারে স্থানীয় লোক যেটাকে টাওয়ার হিল বলে, সেটা নয় আসলে অন্য একটা পাহাড় টাওয়ার হিল এবং সেখানেই ছিল দর্পনারায়ণের দুর্গ। পর্যটকের তথ্য অনুযায়ী সেই পাহাড়ে যায় গণ্ডালুরা। পাহাড় বেয়ে বন্ধুর পথ ধরে কালু এগিয়ে যায়, বাকিরা ঘুর পথে টাওয়ারের চুড়োয় পৌঁছে প্রথমে কালুকে খুঁজে পায়না। তারপর কালু মর্স কোডে তাদেরকে সঙ্কেত পাঠাতে থাকে। তার সঙ্কেত ধরে বাকিরাও পাথর সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ঢুকেই সবাই আটকা পড়ে যায়। এর পর সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে নানা রকম গা ছমছমে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তারা পৌঁছয় প্রচলিত টাওয়ার হিল অর্থাৎ ঝাউতলার টাওয়ারে। সেখানে পৌঁছে একটা কাঠের সিন্দুক দেখতে পায়, আর মধ্যে পায় 'কাঞ্চনপুরের রহস্য' বইটি। লিপিকা বসুর লেখা বই পাওয়ার পর তারা বুঝতে পারে যে দাদুর লাইব্রেরিতে পাওয়া রহস্যময় চিঠিগুলো আসলে লিপিকা বসুই লিখেছিলেন। এবং সেই চিঠির মাধ্যমে তিনি গণ্ডালুদের টাওয়ারহিলে বার বার ডাকছিলেন যাতে সেখানে গিয়ে তারা বইটা পায়। যেহেতু গণ্ডালুরা কাঞ্চনপুরের ওপর লেখা বই থেকে অনেক আগেই পর্যটকের বানানো মানচিত্র কেটে নিজের কাছে রেখেছিল, তাই লিপিকা বসু জানতে পারেননি আসল টাওয়ার হিল কোনটা। সেই কারণে স্থানীয় লোক যেটাকে টাওয়ার হিল বলে সেখানেই বইটা রেখেছিলেন।

'গণ্ডালু ও তিব্বতি গুহার ভূত'-এ দেখা যায় কালুর কাকা ফার্মের জন্য একটা নতুন গুদাম ঘর বানালে নানা রকমের উপদ্রপের সামনাসামনি হতে হয়। শেষ পর্যন্ত গণ্ডালুরা গুদাম ঘরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে গুদামের মেঝেতে একটা দরজা আবিষ্কার করে। সেটা খুলে নিচে গিয়ে কালুর কাকাবাবুকে উদ্ধার করে এবং কাকাবাবুকে নিয়ে গণ্ডালুরা গুহার ভিতর দিয়ে পথ খুঁজে চলে। ওল্ড মিলেটারি রোডের দিক দিয়ে তারা বেরোয়। মিলেটারি জিপে করে সবাই বাড়ি ফেরে। এরপর পুলিশ আসে, অপরাধিরা ধরা পড়ে। জানা যায় তারা নতুন গুদামের নিচের সুড়ঙ্গকে নিজেদের চোরাই জিনিস জমা করার ডেরা বানিয়েছিল। সেই কারণে ভূতের ভয় দেখাত, যাতে বেশি মানুষ ওখানে না যায়।

'হাতিঘিসার হানাবাড়ি'-তে জেঠুর বাগানের সীমানায় লুকিয়ে নজরদারী চালানোর সময় তারা লক্ষ করে যে হানাবাড়ির রহস্যময় শব্দ থেমে যাওয়ার পর গানের শব্দ এগিয়ে আসে। নেপালি লোকদুটো ঝোপ থেকে বেরিয়ে বেড়ার কাছে যায়। গণ্ডালুরা নদী পেরিয়ে বেড়ার কাছে যেতে যেতেই তারা গায়েব হয়ে যায়। এইগায়েব হওয়ার বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তারা ঝোপের কাছে একটা সুড়ঙ্গের মুখ আবিষ্কার করে। দুটো সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা চলে গেছে হানাবাড়ি অবধি। যার সাহায্যে নকল সাধুরা ঐ বাড়িতে সহজেই পৌঁছে যেতে পারত। অন্য সুড়ঙ্গটি চলে গেছিল নদীতে নামার সিঁড়ির তলায়, সেখানে তারা নকল নোট ছাপানোর মেশিন বসিয়ে তাদের কাজ চালাচ্ছিল।

'রঙ্গনগড়ের রহস্য'তেও বিভিন্ন সুড়ঙ্গ নালার মধ্য দিয়ে গিয়ে লীলার বাবা ডক্টর বসুকে উদ্ধার করে।

শুধুমাত্র টানেল বা ঘরের নিচে ঘরই নয় সামগ্রিক ভাবে মাটির তলায় রহস্যের বীজ পুঁতে রাখার একটা প্রবণতা পাওয়া যায় গোটা সিরিজ জুড়ে। যেমন 'কাঞ্চনপুরের রাজবাড়ি'র গুপ্তধন ঘরের মধ্যে মাটির তলায় কুঠুরিতে রাখা, 'রঙ্গন পাহাড়ের রহস্য'তে ঝাউতলার রাজাদের প্রমোদ ভবন আবিষ্কৃত হয় মাটির তলা থেকে। এর পাশাপাশি প্রায় এই প্রসঙ্গের গায়ে লেগে থাকা আরেকটি প্রসঙ্গও বেশ কিছু কাহিনিতে নজরে পড়ে, তা হল লুকানো ঘরের প্রসঙ্গ।

- **ঘরের মধ্যে ঘর**

আপাত ভাবে যা চোখে পড়ছে না, কিন্তু খুঁজে পেতে তার হদিস বের করা সম্ভব এমন লুকনো ঘরের বিষয়টি নলিনী দাসের বেশ পছন্দের। গণ্ডালু সিরিজের তৃতীয় কাহিনি 'জমিদার বাড়ির রহস্য'তে এই অনুষঙ্গ টেনে আনেন লেখিকা । এবং পরবর্তী অনেক কাহিনিতেই এই বিষয়টি উপস্থিত। 'তপোবন রহস্য'তে দেখা যায়, গণ্ডালুরা বুলুর দাদুর বাড়ি যাচ্ছে। লাতেহার থেকে ২৫/২৬ কিলোমিটার দূরে ফুলওয়ারিগাঁওতে নির্জন আর দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে বুলুর দাদু প্রফেসর আশ্বিনী কুমার গুপ্তের বাগানবাড়ি 'তপোবন'। তিনি মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন। অবসরের পর নিজস্ব গবেষণাগার বানিয়ে গবেষণা শুরু করেন। বুলুর ছোটকাকু উচ্চ শিক্ষিত হয়ে চাকরি না করে ঐ গবেষণাতে যোগ দেন।

গণ্ডালুরা সীতাদের সঙ্গে ট্রেনে করে যাত্রা শুরু করে, যেতে যেতে তাদের সন্দেহ হয় যে কিছু গুণ্ডা তাদের পিছু নিয়েছে। বোকারোতে গিয়ে দেখা যায় যে বুলুর ছোটকাকা তাদেরকে নিতে আসেনি। বুলু সীতার বাবাকে আশ্বস্ত করে যে তার ছোটকাকা জানিয়েছেন তিনি বোকারোতে নিতে আসতে না পারলে রাঁচি রোড অথবা লাতেহারে অপেক্ষা করবেন। সীতারা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যায়। কিন্তু লাতেহার পৌঁছে দেখা যায় ছোটকাকু আসেননি। তারা এদিক ওদিক খবরাখবর নিতে থাকে। তখন তাদের সন্দেহভাজনদের মধ্যে একজন এসে জানায় যে ফুলওয়ারিগাঁওয়ের প্রফেসর সাত-আট দিন আগে বাড়ি বন্ধ করে কলকাতায় চলে গেছে। বুলু জানায় শেষ পাওয়া চিঠিটা লেখা হয়েছিল বুধবার আর সেদিন শনিবার, অর্থাৎ লোকটা মিথ্যে বলছে। তারা বারওয়াডিহি থেকে প্যাসেঞ্জার আসা পেসেঞ্জার ট্রেনে উঠে পড়ে । আর লোকগুলকে শুনিয়ে বলতে থাকে তারা ম্যাক্লুস্কিগঞ্জে যাবে। কিন্তু উলটোদিকের ট্রেনে উঠেও তারা দেখে লকগুলো তাদের পিছু নিয়েছে। ম্যাক্লুস্কিগঞ্জে নেমে তারা দেখতে থাকে গণ্ডালুরা নেমেছে কিনা। গণ্ডালুরা তাদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য নামে, কিন্তু ট্রেন ছারার আগের মুহূর্তে আবার উঠে পড়ে। কালু প্ল্যান করে কাকানা স্টেশনে নেমে রাঁচির বাস ধরে বীণাদের বাড়ি যাবে। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তারা কাকানা স্টেশনে নেমে পড়ে। কিন্তু ওয়েটিং রুমের দরজার কাছে পৌঁছে বুঝতে পারে যে গুণ্ডারা তাদের পিছু ছাড়েনি। ওয়েটিং রুমের বাইরে দরজার কাছে গুণ্ডারা পাহারা দিতে থাকে। ওয়েটিং রুমের বাথরুমের জানলাটা শুধু ছিটকিনি লাগানো ছিল। তাতে কোনও শিকও ছিলনা। গণ্ডালুরা ওখান থেকে পালায়। গ্রামের বউয়ের মতো শাড়ি পরে ঘোমটা টেনে উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে হেঁটে তারা পালিয়ে যায়।

ছোটনাগপুরের ম্যাপ দেখে কালু ঠিক করে – রাঁচি থেকে সোজা পশ্চিমে গেলে নেতার হাট, নেতারহাট থেকে লাতেহার যাওয়ার পথে তুলসিপুরগ্রামে অনিমাদিদের চাকর রঙ্গলালের বাড়ি। তুলসিপুর ফুলওয়ারিগাঁওয়ের থেকে খুবই কাছে। বুলু জানায় রঙ্গলালের ভাই বংশীলাল তার দাদুর কাছে কাজ করে। তারা বংশীলালের বাড়িতে থাকতে শুরু করে। তার কাছ থেকে জানতে পারে, বুধবার পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিক ছিল, বৃহস্পতিবার কাজ করতে গেলে নতুন দারওয়ান রামভকত সিং জানায় কাজ করার দরকার নেই, বাবুরা ভোরের ট্রেনে কোথায় চলে গেছে। এরপর গণ্ডালুদের তপোবন অভিযান শুরু হয়। বংশীলালের আট দশ বছরের দুই ডানপিটে ছেলে রঘুয়া আর হরিয়া গণ্ডালুদের সহকারি হয়ে যায়। তারা জানায় যে গণ্ডালুরা গুণ্ডাদের বর্ণনা দিয়েছিল ঠিক তেমন দেখতে দুজন লোক লুকিয়ে লুকিয়ে সিংজির সঙ্গে দেখা করে। এরমধ্যে মালুর কাকাবাবু আসেন তিনি রঙ্গলালকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পুলিশে খবর দেন। রঘুয়া হরিয়া গণ্ডালুদেরকে জানায় যে সিংজিরা তিনজনে পরামর্শ করছিল যে, পুলিশ লেগেছে এবার তাড়াতাড়ি কাজ গুছাতে হবে। তারা আরও জানায় পশ্চিম দিকের বড় বড় গাছের তলায় যে ঘর আছে সেখানে গুদামের কাছে গিয়ে সিংজিরা কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

গণ্ডালুরা গুদাম ঘরে হানা দেয়, দরজা খোলা পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। হঠাৎ সিংজিরা আসে তাদেরকে দেখতে পায় না , তবে দরজা তালাবন্ধ করে দিয়ে চলে যায়। আটকা পড়ে তারা শলাপরামর্শ করতে থাকে। কালু বলে যে ঘরটা বাইরে থেকে দেখে মনে হয় চওড়ার থেকে লম্বায় বেশ খানিকটা বেশি, কিন্তু ভিতর থেকে বর্গক্ষেত্রর মতো মনে হচ্ছে। এরপর দেওয়ালের ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা গাছ-গাছড়া ধরে তারা টানাটানি করতে থাকে। দুধারের লতাপাতার বোঝা খুব শক্ত ভাবে আটকে রয়েছে, কিন্তু মাঝেরগুলো একেবারেই আলগা ভাবে বসানো। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা মাঝের অংশ ফাঁকা করে ফেলে একটা দরজা খুঁজে পায়। তালা দেওয়া না থাকায় সহজেই তারা ভিতরে ঢুকে পড়ে। সেখানে গিয়ে দাদু ও কাকুকে উদ্ধার করে। জানতে পারে সিংজিরা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের বন্দী করে রেখেছিল। এবং এও জানতে পারে দাদু লজ্জাবতী গাছ থেকে ক্যান্সারের ওষুধ তৈরির গবেষণায় সফল হয়েছেন। সাধারণ মানুষের সেবার জন্য তাঁর এই আবিষ্কার। কিন্তু সিংজিরা সেই পেটেন্ট নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাতে চাইছে। এরপর পুলিশ আসে। জানা যায় সিংজিরা রঘুয়া আর হরিয়াকে একটা ঘরে আটকে রেখেছিল। কিন্তু তারা একটা বড় ঘুলঘুলি দিয়ে পালিয়ে গিয়ে সবাইকে খবর দিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে। এরপর অপরাধীরা গ্রেফতার হয়।

বেশ রোমাঞ্চকর কাহিনি। ঘটনার বুনন খুব ভালো। তবে ঘরের মধ্যে ঘর থাকার মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নেই। এর আগেও অনেক কাহিনিতে এই প্রসঙ্গ দেখা গেছে। আর কাহিনির সবচেয়ে উপভোগ্য অংশ গুণ্ডাদের পিছু নেওয়ার বর্ণনা খুবই মনগ্রাহী হলেও তাদের পিছু ছাড়িয়ে পালিয়ে যাওয়াটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। বউ সেজে ঘোমটা টেনে পালিয়ে যাওয়ার জন্য শাড়িগুলো তারা কীভাবে সংগ্রহ করল, তার কোনও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কাহিনিতে নেই।

'কাঞ্চনপুরের রাজবাড়ি'তে দেখা যায় ঘরের নিচে একটি ছোট্ট ঘর রয়েছে, এর মধ্যে কাঞ্চনপুরের ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রয়েছে।

- **গুপ্তধন প্রসঙ্গ**

আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনির রহস্য সাধারণত আধুনিক সমাজের সমস্যা নিয়েই তৈরি হয়। আর রূপকথার গল্প আমাদের নিয়ে যায় রাজপ্রাসাদ রাজকুমার রাজকুমারী গুপ্তধনের কল্পলোকে। গণ্ডালু সিরিজের কাহিনিগুলিতে লেখিকা এই দুই ঘরানাকে একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। 'কাঞ্চনপুর রাজবাড়ি'তে আমরা রাজবংশের শেষ বংশধর কমল আর চন্দ্রকে দেখতে পেলাম। ঝাউতলা এবং কাঞ্চনপুর দুই রাজবংশের রেসারেসির গল্প শুনলাম , একে প্রায় আধুনিক যুদ্ধ বলা যেতে পারে। এবং সবশেষে মরে যাওয়া রাজা, মানে রাজবংশের উত্তরাধিকারি সূর্যকান্তিও ফিরে এলেন। জানালেন গাড়ির ব্রেক ফেল করে দেওয়া হয়েছে জেনে তিনি গাড়িতে চড়েননি। এরপর সেই দুর্ঘটনা এবং তাঁর বাবার হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য তিনি অনেক বছর গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

জগদ্ধাত্রীপুরের রাজবংশের কন্যা পার্বতীদেবীকেও তাঁর রাজবাড়ির দলিলের সঙ্গে গুপ্তধনের সন্ধান দেয় গণ্ডালুরা (অভিশপ্ত রাজবাড়ি)। নৈনিতালে ঘুরতে গিয়ে গণ্ডালুরা 'গুপ্তাসাহেবের গুপ্তধন' উদ্ধার করে দেয়। 'জমিদার বাড়ির রহস্য' উদ্ঘাটন করে তারা অনিমাদির ছোটবেলার খেলার পুতুল উদ্ধার করে আনে, যার মধ্যে অনেক দামী 'হীরে জহরত' রাখা ছিল। 'নীলাঞ্জনার দুর্ভোগ' কাটার পর তার ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটের মধ্যে থেকে যে হীরে পাওয়া যায় তাকেও গুপ্তধনের চেয়ে কম বলা যায়না।

- **ভূতের প্রসঙ্গ**

বুলু চরিত্রটি খুবই ভিতু, সে সবকিছুতেই ভয় পায়, চোর ডাকাত থেকে শুরু করে ভূত অবধি সবেতেই তার ভয়। স্কুলের পড়া ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগই এমন ভিতুই হয়। ছোটবেলা থেকে শোনা রূপকথার রাক্ষস- খোক্ষস, শাঁকচুন্নি, ব্রহ্মদৈত্য সব এক জোট হয়ে ভূতের ভয়ের জন্ম দেয়। লেখিকা এইসব কাঁচা পাঠকদের মন থেকে সেই ভয় তাড়িয়ে যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টায় নামেন। গণ্ডালু সিরিজের বেশ কয়েকটা কাহিনিতে আসে এই ভূত প্রসঙ্গ।

গণ্ডালু সিরিজের সপ্তম কাহিনি 'গণ্ডালু ও তিব্বতি গুহার ভূত'-এ লেখিকা প্রথমবার ভূতের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। সোনাদা আর ঘুমের মাঝে কালুর কাকাবাবুর ফার্মহাউস। ছুটিতে তাদের সেখানে বেড়াতে যাওয়ার কথা। কিন্তু যাওয়ার আগে তারা কাকাবাবুর টেলিগ্রাম পায়, তিনি তাদেরকে ওখানে যেতে বারণ করেন। নিউ জলপাইগুড়িতে রিফ্রেশমেন্ট রুমে খেতে এসেও একটা রহস্যময় চিঠি পায়। জেদ করে কালু কাকার ফার্মেই গিয়ে হাজির হয়। গিয়ে জানতে পারে কাকাবাবু ১০দিন হল কাজের জন্য বাইরে গেছেন, রামকিঙ্কর নামের এক ভদ্রলোকের হাতে চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে সব দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। সেখানেও তাদের নামে সাবধান করা চিঠি আসতে থাকে। তারা কাজের ঝি নানীর কাছে শোনে যে তিব্বতি গুহার কাছে নতুন গুদাম ঘর করার জন্য ভূতেরা ক্ষেপে গেছে, রাতের বেলায় ভূতের কান্না শোনা যাচ্ছে। ভয়ে নেপালী কুলিরা ফল বাগানে কাজ করতে যেতে চাইছে না। বেশির ভাগ কর্মচারীরাই বলছে নতুন গুদাম বন্ধ করে তিব্বতি ভূতকে শান্ত করা প্রয়োজন। গণ্ডালুরাও এক রাতে জানলা দিয়ে তিব্বতি ভূতকে দেখতে পায়।

এরপর তারা দার্জিলিং-এ টুলুর মামার বাড়ি যায়। সেখানে গিয়ে জানতে পারে দার্জিলিং-এ লোক গিজগিজ করছে আর দামি গয়না চুরির ঘটনাও ঘটে চলেছে। এখানে কালুর কাকাবাবুর ফার্মের নতুন কর্মচারী হেম সিংকে আর শেয়ালবাবুকে দেখতে পায়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে শেয়ালবাবু হোটেলে হোটেলে কিউরারি ফেরি করে, আর হেম সিং এবং তার মতো দেখতে আরেকজনকে (ফার্মের আরেক কর্মচারী, হেম সিংয়ের ভাই ক্ষেম সিংকে) প্রায় দেখা যায়। এখানে গিয়ে তারা আবার চিঠি পায় সোমবারের আগে সোনাদায় যেতে বারণ করা হয় সেই চিঠিতে। তারা খুকু আর বুকুকে সঙ্গে নিয়ে শনিবার রাতেই ফিরে আসে। দুই দলে ভাগ হয়ে তারা 'তিব্বতি ভূত' ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায় হাতে পেয়ে ফসকে যায়। গুদাম ঘরের মধ্যে খুব শব্দ হতে থাকে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর তারা কিছুই পায়না। পরের দিন সকালে গিয়ে গুদাম ঘর খোঁজার সময় মালু হোঁচট খেয়ে

পড়ে যাচ্ছিল। তখন তারা লক্ষ করে কাঠের মেঝের একটা অংশ আলগা, চাপ দিলে দরজার মতো খুলে যায়। সেখান দিয়ে সবাই নিচে নেমে পড়ে। প্রথমেই তাদের নজরে আসে নকল চুল দাড়ি। তারপর পাওয়া যায় কালুর কাকাবাবুকে। তিনিই নকল চুল-দাড়ি পরে রামকিঙ্কর সেজে ছিলেন। তাঁর কাজের জন্য বাইরে যাওয়ার খবর রটিয়ে দেন যাতে অসাবধানতা বশত অপরাধীরা ভুল করে বসে, আর তিনি হাতে নাতে ধরে ফেলতে পারেন। তিনিই বারবার গণ্ডালুদের চিঠি দিয়ে সাবধান করেছিলেন, যাতে তারা কোনও বিপদে না পড়ে। আগের রাতে তিনিও 'তিব্বতি ভূত' ধরার জন্য চেষ্টা করছিলেন। তাদের পিছু করে তিনি নিচে পড়ে যান তারপর পায়ে চোট পান। সে জন্য তারা একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলেও তিনি আর পিছু নিতে পারেন নি। তবে ঢালু সুড়ঙ্গের মুখে ভারি পাথর আটকে দেন, নিচ থেকে ঐ পাথর সরানো কোনও ভাবে সম্ভব নয়।

কাকাবাবুকে নিয়ে গণ্ডালুরা গুহার ভিতর দিয়ে পথ খুঁজে চলে। ওল্ড মিলেটারি রোডের দিক দিয়ে তারা বেরোয়। মিলেটারি জিপে করে সবাই বাড়ি ফেরে। এরপর পুলিশ আসে, অপরাধিরা ধরা পড়ে। জানা যায় তারা নতুন গুদামের নিচের সুড়ঙ্গকে নিজেদের চোরাই জিনিস জমা করার ডেরা বানিয়েছিল। সেই কারণে ভূতের ভয় দেখাত, যাতে বেশি মানুষ ওখানে না যায়।

কাহিনিটি ভালো এবং সুখপাঠ্য। কিন্তু খটকা লাগে কালুর মতো বুদ্ধিমতি মেয়ে নকল চুল দাড়ি লাগানো কাকাবাবুকে চিনতে পারল না! এই বিষয়টা পাঠকের কাছে খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়না।

'হাতিঘিসার হানাবাড়ি'তে দেখা যায়, গণ্ডালুরা হাতিঘিসায় মালুর জ্যাঠামশাই শ্রীমনোরঞ্জন মুজুমদারের বাড়িতে যায়। যাওয়ার পথে এক সন্যাসী নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে বুলেকে সাবধান করে দেয় -- যেন সে হানাবাড়ির ধারে কাছে না যায়, সেখানে বিপদ আছে। জেঠুর কাছ থেকে জানা যায় -- মালুর ঠাকুরদা আর তাঁর এক বন্ধু উমেশ চন্দ্র রায় বর্মায় ব্যাবসা করতেন। উমেশ বাবুদের দামি পাথরের ব্যাবসা ছিল, আর মালুর ঠাকুরদার ছিল সেগুন কাঠের ব্যাবসা। তরাই অঞ্চলেও তাঁর ব্যাবসা ছিল বলে তিনি হাতিঘিসায় বাড়ি করেন। উমেশ বাবুও ওখানে মস্ত জমি কেনেন। ১৯৪১-এ যুদ্ধের সময় মালুর ঠাকুরদা ওখানে চলে আসলেও উমেশ বাবুরা আসতে পারলেন না। তাঁদের বাড়ি অর্ধেক তৈরি অবস্থাতেই রয়ে গেল। শোনা যায় বোমা পড়ার সময় উমেশবাবু ও তাঁর স্ত্রী রেঙ্গুনে মারা যান। কিন্তু তাঁদের ছেলে রমেশবাবু কোথায় গেলেন জানা যায় না। রমেশবাবুর একমাত্র সন্তান বাসন্তী কলকাতায় মামার বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করেছিল। তার

অনুরোধে মালুর জেঠু রেঙ্গুনে গিয়ে জানতে পারে যে উমেশবাবু মারা গেছেন, কিন্তু রমেশবাবুদের কোনও খবর জানা যায়না। লোকে বলে তিনি কোনও সন্যাসীকে সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন।

গণ্ডালুরা হানাবাড়ির ওপর নজর রাখতে থাকে। কখনো সেখান থেকে খটাখট আওয়াজ শোনা যায়, কখনো রহস্যময় ভৌতিক আলো দেখা যায়, কখনো বা সন্যাসীরা গান করতে করতে বাড়ির কাছের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায়। জেঠুর বাগানের সীমানায় লুকিয়ে নজরদারী চালানোর সময় তারা লক্ষ করে একটি ঝোপের কাছে যারা যাচ্ছে তারা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অনুসন্ধান শেষে জানা যায় আসলে ঝোপের কাছে একটা সুড়ঙ্গ আছে যার একটা অংশ চলে গেছে বাড়ির দিকে, যেটা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে নকল সন্যাসীরা নানা রকম টুনি বাল্ব জাতীয় আলো জ্বালিয়ে ভৌতিক আবহ তৈরি করত। আর সুড়ঙ্গের আরেকটি অংশ চলে গেছে নদীর ঘাটের সিঁড়ির নিচে, রহস্যময় শব্দের উৎসস্থল সেখানেই। সেখানে নকল টাকা ছাপানোর মেশিন বসিয়ে তারা নিজেদের কারবার চালাচ্ছিল।

ভৌতিক রহস্যের সমাধানের পাশাপাশি হানাবাড়ি থেকে বাড়ির দলিল খুঁজে বের করে তারা বাড়ির প্রকৃত মালিক বাসন্তীর হাতে তুলে দেয়। আর অপরাধীরা স্বীকার করে সন্যাসীকে সম্পত্তি দিয়ে দেওয়ার গুজব তারাই রটিয়েছিল --- তাদের কারবারের জন্য বাড়িটাকে ব্যাবহার করবে বলে।

'ঝাউতলার ভূত' কাহিনিতেও 'গণ্ডালু ও তিব্বতি গুহার ভূত'-এর মতো ভূতের পোশাক পরে বাঁশি বাজিয়ে ভয় দেখানোর ছবি দেখা যায়। গণ্ডালুদের সহপাঠী মিনতির বাবা মা নেই, ঠাকুমার কাছে থাকে। তার বাবা কয়েক শ' বিঘা জমি কিনেছিলেন, তার আয় থেকেই তাদের সংসার চলত। মিনতির দাদাকে মাইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর জন্য বলাই সাহার কাছে কিছু জমি বন্ধক দেয় তারা। এক সময়ে দাদা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তারসঙ্গে মালতিরা কোনও ভাবে যোগাযোগ করতে পারে না। দাদা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে বলাই সাহা জমির দখল নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, বারবার গুণ্ডা পাঠাতে থাকে। এবং রাতের বেলা ভূতের কান্না শোনা যেতে থাকে। গণ্ডালুরা তদন্তে নামে। অনুসন্ধানে নেমে টাওয়ারের নিচে আটকা পড়ার সময়ে গণ্ডালুরা একটা বাক্সের মধ্যে ভূত সাজার সরঞ্জাম খুঁজে পায়। তাদের অনুসন্ধানের শেষে মিনতির দাদাও ফিরে আসে এবং গণ্ডালু ও মিনতির দাদার কথোপকথনের মাধ্যমে বোঝা যায়, মিনতিদের জমির একটা অংশে আকরিক লোহা পাওয়া যেতে পারে। দাদা এবং তার এক সহপাঠী পরীক্ষা করে এটা জানতে পেরেছে এবং তারা খুব ভালো ক্রেতাও জোগাড় করে ফেলেছে। সম্ভবত বলাই সাহাও এই তথ্য জেনে

ফেলেছিল। যে কারণে গুণ্ডা পাঠিয়ে ভয় দেখানোর পাশাপাশি ভূতের ভয় দেখানোর ব্যাবস্থাও করে, যাতে ভয় পেয়ে মালতিরা অন্য কোথাও চলে যায়।

'ডন পেরেরার দ্বীপ'-এ অতিলৌকিক আবহকে বেশ সার্থকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। গোয়ায় বেড়াতে গিয়ে এই আবহের মুখমুখি হয় গণ্ডালুরা। সমবয়সী দুই স্থানীয় বন্ধুর কাছ থেকে তারা প্রচলিত কাহিনি জানতে পারে --- পেরেরাদের পূর্বপুরুষ ছিল জলদস্যু। প্রচুর ধন-সম্পত্তি জমিয়েছিল তারা। সেই টাকায় ডন পেরেরা উত্তর গোয়ার নির্জন উপকূলে একটা পাথুরে দ্বীপ কিনে দুর্গের মতো প্রাসাদ বানিয়ে সে জমিদার সেজে বসে। সাধারণ মানুষদের সে নিচু নজরে দেখত, আবার অভিজাত সমাজে মেশার মতো শিক্ষা তার ছিল না। ক্রমে তার ছেলে মেয়েরা দেশে বিদেশে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তার কাছে শুধু বাপ মা মরা নাতনি ডোনা রয়ে যায়। তার নিঃসঙ্গ জীবনে প্রেম আসে। জ্যোৎস্না রাতে সেই তরুণ বাঁশি বাজাত আর ডোনা তার সঙ্গে দেখা করতে চলে যেত। ডন জানতে পেরে একরাতে বাঁশির শব্দ অনুসরণ করে গিয়ে বন্ধুকের গুলির সাহায্যে তাকে হত্যা করে। এরপর ডোনার কী হল সে নিয়ে নানা কাহিনি আছে। কিন্তু শোনা যায় ডন পেরেরা এরপর পাগল হয়ে যায়। তাকে আর লোকালয়ে দেখা যায় নি। তার সাগরেদ ফ্রান্সিস ওরফে ডেভিলই সবকিছুর যোগান দিত। জ্যোৎস্না রাতে জেলেরা নাকি দূর থেকে দেখতে পেত, ডন বন্দুক হাতে নির্জন সমুদ্র তীরে দৌড়চ্ছে আর শূন্যে গুলি ছুঁড়ে হাহা করে হেসে উঠছে। এটি দু'শ বছর আগের কাহিনি। আঙ্কেল জনের কাছ থেকে গণ্ডালুরা জানতে পারে যে প্রায় ৫০/৬০ বছর আগে ডন পেরেরার এক বংশধর ঐ দুর্গে থাকতে আসে। কিন্তু রহস্যজনক ভাবে তাঁর পরিবারে একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। সবাই বলতে শুরু করে এ ডন পেরেরা আর ডেভিলের ভূতের কারসাজি। কাজের লোকেরা ভূতের ভয়ে পালাতে চাইল। শেষে তাঁর ছেলে মারা গেলে তিনি মনের দুঃখে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে যান। আর তখন থেকে মানুষের মুখে মুখে আবার ভূতের কাহিনি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় মানুষরা ডেভিলের ভূতকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে দেখেছে বলতে থাকে। এছাড়া চালক বিহীন একটা নৌকা ঘুরতে দেখা যায় দ্বীপের কাছাকাছি।

গণ্ডালুরা দ্বীপে হানা দেয়। সেখানে গিয়ে পেরারাদের বংশধর ক্যাপ্টেন পেরেরাকে উদ্ধার করে তাঁর কাছ থেকে জানতে পারে --- ক্যাপ্টেন পেরেরার ঠাকুরদা এখানে বসবাস করার জন্য এসেছিলেন, তখন ক্যাপ্টেন পেরেরা খুবই ছোট। তাঁর বাবাকে মেরে ফেলে দুষ্কৃতিরা। তখন তাঁরা সেখান থেকে চলে যান। ক্যাপ্টেন নৌবিভাগের ইঞ্জিনিয়র ছিলেন অবসরের পর তিনি আবার এই দ্বীপের বাড়িতে ফিরে আসেন। ফিরে এসে রিমোট চালিত

নৌকো নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁর সহকারি গ্যাসপারকে দেখতে ডেভিলের মতো, তিনি ডেভিলেরই বংশধর। তাঁকে দেখেই লোকে ডেভিলের ভূত বলে ভয় পায়। বর্তমানে কিছু দুষ্কৃতি তার কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল। গণ্ডালুরা এসে তাঁকে উদ্ধার করে। আর সঙ্গে ভূতের রহস্যেরও সমাধান হয়।

কাহিনিতি বেশ রোমহর্ষক কাহিনি। তবে শেষের দিকে বর্ণনার ক্ষেত্রে একটু জোলো হয়ে উঠেছে। দুষ্কৃতিরা ফিরে এসে যখন তারা যে ঘরে আছে তার চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেয়, তারা জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে মোকাবিলা করে যায় পুলিশ আসার আগ অবধি, কিন্তু তা দুষ্কৃতিদের চোখেই পড়েনা। শেষের দিকের এই বর্ণনার ত্রুটি টুকু বাদ দিলে কাহিনির বুননের জন্য 'ডন পেরেরার দ্বীপ' গণ্ডালু সিরিজের সেরা কাহিনিগুলোর মধ্যে জায়গা করে নিতে পারে।

'দেওদার গঞ্জের ভূত'-এর কাহিনির ধরনটা সামান্য আলাদা। এখানে অপরাধী তার চোরা-কারবার যাতে ধরা না পড়ে, তার জন্য ভূতের ভয় দেখিয়ে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে। বনলতাদের বাড়ির কাছাকাছি জঙ্গলের ধারে অমাবস্যার রাতে সাদা কাপড়পড়া ভূত দেখা যায় আর ভূতের গোঙানিও শোনা যায়। গণ্ডালুরা তদন্তে নেমে বনলতার বৃক্ষপ্রেমী দাদুকে উদ্ধার করার পাশাপাশি প্রায় সব রহস্যই সমাধান করে ফেলে। জানা যায় খড়ের ব্যাবসায়ী কালা শেখ আসলে খড়ের গাদার তলায় লুকিয়ে জঙ্গলের কাঠ কেটে চোরা চালানের ব্যাবসা করত। মইয়ের মাথায় কাপড় টাঙিয়ে তার মধ্যে টুনি বাল্ব জ্বালিয়ে ভূত সাজিয়ে রাখা হত। সঙ্গে থাকত এক ধরনের অদ্ভুত আওয়াজের বাঁশি, যার সুর গোঙানির মতো। কিন্তু গণ্ডালুরা বুঝতে পারে না গুদাম ঘরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে 'পালিয়ে যা, বাঁচতে চাস তোঁ পালিয়ে যা' বলে চিৎকারটা হচ্ছে কী করে। এক্ষেত্রে অঙ্গদ তাদেরকে সাহায্য করে। সে তার খুঁজে বের করে, তারপর সেটা অনুসরণ করে টেপরেকর্ডার খুঁজে বের করে আনে। বোঝা যায় এমন ভাবে ওটা সেট করা ছিল যে দরজা খুললেই প্লে সুইচে টান পড়ছিল, আর ঐ কথাগুলো বেজে উঠছিল।

- **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রসঙ্গ**

একদিকে যেমন ভূতের সংস্কারকে পাঠকের মন থেকে মুছে দিতে চেয়েছেন লেখিকা পাশাপাশি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রসঙ্গও তিনি হাজির করেছেন তাঁর লেখাতে। এই ধরনের কাহিনিগুলির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে জনহিতকারী আবিষ্কার করছেন বৈজ্ঞানিকরা, তাঁরা চান যে সাধারণ মানুষ তাঁদের আবিষ্কারের সুফল ভোগ করুক। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী দল সেগুলোকে নিজেদের করায়ত্ত করে লাভবান হতে চাইছে। আর সেই কারণে তারা বিজ্ঞানীদের আটকে রাখছে। 'রঙ্গন পাহাড়ের রহস্য'তে দেখা যায় লীলার বাবা ডক্টর বসু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফুল-ফল-তরকারি, দানা শস্যের ফলন বাড়িয়ে তোলার উপায় উদ্ভাবন করেছেন, এই পদ্ধতিতে খুব বেশি জলের জোগানও প্রয়োজনীয় নয়। এটি প্রয়োগ করতে পারলে যে কোনও দেশের খাদ্যাভাব পুরপুরি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর এই ফর্মুলা হাতিয়ে নিয়ে নিজেরা তার প্রয়োগ করে ফুলে ফেঁপে উঠতে চাইছে যারা, তারা তাঁকে আটকে রেখেছে। বুলুর দাদু প্রফেসর গুপ্ত লজ্জাবতী লতা থেকে ক্যান্সারের অব্যার্থ ওষুধ তৈরি করেছেন ('তপোবন রহস্য')। তাঁর কাছ থেকে ওষুধের ফর্মুলা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁকেও আটকে রাখা হয়েছে তাঁর গবেষণার কাঁচামালের গুদামঘরে। লীলার দাদা ডক্টর অমল কৃষ্ণ বসুকেও তাঁর গবেষণাগারে বন্দী করে রাখা হয় ('শিখর রহস্য')। তিনি খুব কম ব্যায়ে সৌরশক্তি ব্যাবহারের ফর্মুলা আবিষ্কার করেছিলেন। একটি জাপানী দল তাঁর ফর্মুলা এবং গবেষণাগার দুইই হাতিয়ে নিতে চায়। সেই জন্য তারা প্রথমে তাঁর গবেষণা নিয়ে মানুষের মনে ভয় তৈরি করার জন্য নানা রকম গুজব ছড়ায়। তাতে কাজ না হওয়ায় তাঁকে বন্দী করে রাখে। এবং বলা বাহুল্য সব ক্ষেত্রেই গণ্ডালুরা গিয়ে তাঁদেরকে উদ্ধার করে। উদ্ধার করতে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনায় রমাঞ্চ আছে। তবে 'তপোবন রহস্য' এবং 'শিখর রহস্য' দুই কাহিনির বর্ণনা এতো বেশি কাছাকাছি যে, দুটি কাহিনি পড়ার পর মনে হয় যেন একটি কাহিনির দুটি শাখা।

- **আধুনিক নাগরিক অপরাধ**

গণ্ডালু সিরিজের প্রথমের দিকের কাহিনি গুলিতে লুকনো সম্পত্তি দলিল খুঁজে বের করা বা ভূতের ভয় দেখিয়ে চোরা চালান করার প্রসঙ্গ থাকলেও পরের দিকের কাহিনিগুলিতে লেখিকার সমকালীন নাগরিক সমাজের অপরাধ চিত্রও উঠে এসেছে। বৈজ্ঞানিক

আবিষ্কারকে করায়ত্ত করা অবশ্যই তার মধ্যে অন্যতম। তবে এই রহস্যগুলোকে আলাদা করে আলোচনা করার কারণে এই অংশে ঐ প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে আলোচনা করা হলো।

'রাণী রূপমতির রহস্য'তে দেখা যায় পুতুলের মধ্যে সোনার তাল ঢুকিয়ে পাচার করা হচ্ছে। 'হাতিঘিসার হানাবাড়ি'তে নকল নোট ছাপানোর কারখানার হদিস পায় পাঠক। 'গণ্ডালু ও হিড়িম্বাদেবীর রহস্য' এবং 'রঙ্গন পাহাড়ের রহস্য'তে দেখা যায় আন্তর্জাতিক মূর্তি চোরা চালানকারিরা ধরা পড়ছে। এসবই আধুনিক অপরাধ, তবে কয়েকটি কাহিনি একেবারেই আধুনিক নাগরিক জীবনের সঙ্গে খুব বেশি করে সম্পৃক্ত । 'কলকাতায় গণ্ডালু'তে দেখা যায় একদল মানুষ অন্ধ-বোবা-খোঁড়া সেজে একসঙ্গে ভিক্ষা করে বেরায়। শেষ পর্যন্ত জানা যায় তারা আসলে এই নকল ভেক ধরে কলকাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে ছেলে ছুরি করে এনে আটকে রাখে এবং মোটা টাকার মুক্তিপণ আদায় করে। 'সামলে চল গণ্ডালু'তে দেখা যায় হারিয়ে যাওয়া তিন শিশু রাস্তায় গান গেয়ে ছবি এঁকে যে টাকা উপার্জন করে, তার একটা ভাগ আদায় করে নেয় একদল ছেলেধরা। এবং তারা যাতে কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের বাড়ি ফিরে যেতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে তারা। 'সিমলার মামলা' কাহিনিতি একেবারেই নাগরিক একটি রহস্য। এখানে দেখা যায় একটি জাতীয় স্তরের ছবি প্রদর্শনী থেকে আসল ছবি চুরি হয়ে যেতে থাকে। তার বদলে চবির ফ্রেমে রয়ে যায় ভাড়া করে আনা আর্ট কলেজের দুজন ছাত্রের আঁকা ছবির প্রতিকৃতি।

- **ডি-কোডিং**

আলোচনার শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে গণ্ডালুরা সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে কোডে কথা বলে। সেগুলি ডি-কোডিং করা খুবই সহজ, প্রত্যেকটা শব্দের আদ্যাক্ষর জুড়ে নিলে তাদের বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যায়। শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে কোড ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাবহারেই যে তারা পটু, এমন নয়। বিভিন্ন ধরনের কোডকে ডি-কোড করার ক্ষেত্রেও তারা সমান দক্ষ।

গণ্ডালু সিরিজের দ্বিতীয় কাহিনি 'জমিদার বাড়ির রহস্য' থেকেই এই সাঙ্কেতিকতার ব্যাবহার শুরু করেন লেখিকা। এখানে একটি উটকো চিঠি আসে অণিমাদির কাছে। সেই চিঠির প্রত্যেকটা শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর জুড়ে তারা পায় 'লাইবেরির পছিম দেয়ালে মাঝের য়ালমারির মাঝের তাকে'। সেখান থেকে তারা চোরা কুঠুরি খোলার সুইচ পায় কালু। এবং সেই কুঠুরি খুলে সেখান থেকে মালু ও বিভিন্ন মূল্যবান রত্ন খুঁজে বের করে আনে।

‘নন্দন কানন রহস্য’তে যেমন দেখা যায় কালিকিঙ্করের লেখা পদ্যের শেষ অক্ষর জুড়ে তারা সঙ্কেত খুঁজে পায় ‘বাড়ির পিছনের গাছের সারি’। সেই গাছের সারির কাছে গিয়ে গাছের নামগুলি পরপর সাজিয়ে সেগুলির আদ্যাক্ষর জুড়ে পায় –‘ছাদের কিনারে চারফুট বায়ু’, অর্থাৎ, ছাদের কিনারে বায়ুকোণ বরাবর চারফুট গেলে কিছু পাওয়া যাবে। অনুসন্ধান করে তারা সেখান থেকে সীতার বাবা তপন চ্যাটার্জির বৈধ দলিল খুঁজে বের করে দেয়।

‘কাঞ্চনপুর রাজবাড়ি’র কাহিনিতে দেখা যায় খুব সহজ সরল সঙ্কেত। কাঞ্চনপুর রাজবংশের শেষ বংশধর কমল আর চন্দ্রের ঠাকুমার দেব বন্দনার আদ্যাক্ষর জুড়ে জুড়ে গণ্ডালুরা সঙ্কেত খুঁজে পায় ‘সদর মহল না অনদর ডান বাম না মাঝখানে ঘর ডান হতে বিশ বাম হতে বিশ সোজা দশ পদ সহজ হদিস’। হদিস অনুযায়ী তারা ঘরের ঐ অংশের পাথর সরায় এবং নিচে একটি কুঠুরি দেখতে পায়। সিঁড়ি দিয়ে মাটির তলায় নেমে যায় তারা। সেখান থেকে উদ্ধার হয় কাঞ্চনপুরের রাজাদের ধনসম্পত্তি ।

‘ঝাউতলার ভুত’-এ ডি-কোডিংয়ের ভূমিকা খুব বেশি না হলেও এখানে এক ধরনের ডিকোডিং পাওয়া যাচ্ছে। মনিতির দাদার পাঠানোর চিঠিগুলির কোনও অর্থ বোঝা যাচ্ছিল না। প্রথম অক্ষর শেষ অক্ষর বসিয়ে চেষ্টা করার পর তারা লক্ষ করে চিঠির পিছনে ১-২-৩-৪-৫-৬-৭-৮-৯ লেখা। তারা প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর দ্বিতীয় শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর, তৃতীয় শব্দের তৃতীয় অক্ষর, এভাবে অক্ষর সাজিয়ে চিঠির পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

প্রত্যেকটা কাহিনি আলাদা আলাদা ভাবে পড়লে পাঠক চমক পেতে পারেন। কিংবা বছরে একবার একটি কাহিনি প্রকাশিত হলে পাঠক এই সিরিজের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন। কিন্তু সব কাহিনি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর যখন তা একত্রিত হয়ে হাতে আসে তখন পাঠক সবকটা কাহিনিকে এক সঙ্গে পেয়ে বিশেষ খুশি হতে পারেন না। কারণ কয়েকটি ছকের বাইরে কাহিনিগুলি খুব বেশি বেরোতে পারেনি।

❖ মূল্যায়ন

গণ্ডালু সমকালে জনপ্রিয়তা পেলেও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা খুব বেশি আদরনীয় হয়ে উঠতে পারেনি। ১৯৬১ থেকে ‘সন্দেশ’-এর পাতায় প্রকাশিত হতে থাকা এই সিরিজটির শেষ কাহিনি প্রকাশিত হয় ১৯৯২-এ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার জনপ্রিয়তার ধারা অব্যাহত ছিল না। ১৯৬৫ সালে সত্যজিতের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে আসে ফেলুদা। এর

আগে ব্যোমকেশের মতো গোয়েন্দা সিরিজ থাকলেও ফেলুদা আসার পর গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠক সম্পূর্ণ ভাবে ফেলুদা প্রেমী হয়ে ওঠে। কাহিনি প্রকাশের পরবর্তী কালে সত্যজিতের চলচ্চিত্রায়ণ একটি বড় কারণ তো বটেই, কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ হল ফেলুদা সব বয়সের পাঠকের কাছে সমান ভাবে আদৃত হল। ব্যোমকেশ বক্সীতে যে রহস্যের জট, এবং যে ধরনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা দেখা যায় তা কিশোর কিশোরীর পড়ার উপযোগী নয়। অন্যদিকে 'গণ্ডালু'র মতো কাহিনিগুলো মূলত কিশোর পাঠ্য অ্যাডভেঞ্চার। বয়স্ক পাঠক অবশ্যই এই ছেলেমানুসির স্বাদ নিতে পারেন। কিন্তু ফেলুদার কাহিনির রহস্য নির্মাণ অনেক বেশি পরিণত। অর্থাৎ, একই সঙ্গে পরিণত ক্রাইম থ্রিলার, অন্যদিকে এমন কোনও বিষয়বস্তু নেই যার জন্য তা জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক বা প্রাপ্ত মনস্ক না হলে পড়া যাবেনা। পাশাপাশি তোপসের মতো কিশোর সহকারীর উপস্থিতি, যার সঙ্গে আত্মস্থতার মাধ্যমে কিশোর পাঠক পৌঁছে যাবে কাহিনির নায়কের কাছে। সব মিলিয়ে ছোট বড় নির্বিশেষে বাঙালি গোয়েন্দা কাহিনির পাঠক ফেলুদাপ্রেমী হয়ে উঠল।

কিছুদিন বাদে আরও বেশকিছু গোয়েন্দার আবির্ভাব হয়, ফেলুদার জনপ্রিয়তা না কমলেও বাঙালি পাঠক সমাজ কিছু কিছু গোয়েন্দা সিরিজকে সাদরে গ্রহণ করল। পত্রিকাপ্রেমী বাঙালি পাঠক কাকাবাবু, অর্জুন, পাণ্ডব গোয়েন্দা, মিতিন মাসি সবাইকেই কম বেশি গ্রহণ করল। গণ্ডালুদের মতো স্কুল পড়ুয়াদের দল 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' এসে তাদের জায়গা দখল করে নিল। বা বলা যেতে পারে তাদের থেকেও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেল। ১৯৮১তে 'পাণ্ডব গয়েন্দা'দের আগমন। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডব গোয়েন্দাও 'ফেমাস ফাইভ'-এর আদলে রচিত। বলা বাহুল্য এই সিরিজটি গণ্ডালু সিরিজের চেয়ে অনেক বেশি সাফল্য পায়। বর্তমানের তরুণ প্রজন্ম পাণ্ডব গয়েন্দার কাহিনি না পড়লেও 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' নামটির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু 'গণ্ডালু'র সঙ্গে তাদের কোনও পরিচিতি নেই। 'গণ্ডালু' সম্পূর্ণ ভাবেই মেয়ের দল। 'গণ্ডালু ও তিব্বতী গুহার ভূত'-এর মতো উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রিক কয়েকটা কাহিনিতে বুকুকে কিংবা 'তপোবন রহস্য'তে রঘুয়া-হরিয়াকে তাদের সহকারী হিসেবে পাওয়া গেলেও অভিযানের দলে এই ছেলেগুলো পুরপুরি যুক্ত হয়ে পড়েনা। অর্থাৎ, গণ্ডালুরা আসলে মেয়ের দল। তাই কিশোরী পাঠকদের কাছে এটি যতটা আদরণীয়, কিশোর পাঠকের কাছে ততটা নয়। অন্যদিকে 'পাণ্ডব গয়েন্দা'দের পাণ্ডা বিলু হলেও তাদের দলে বিচ্চু ও বাচ্চু দুই কিশোরী রয়েছে। ফলত এই কাহিনির সঙ্গে কিশোর কিশোরী উভয়ই একাত্মতা অনুভব করতে পারে। পাশাপাশি তারা একেবারেই সাধারণ মধ্যবিত্ত, সাধারণ পাঠকের সঙ্গে তাদের আত্মিয়তা গড়ে ওঠে সহজেই। গণ্ডালুদের লেখিকা যতটা এলিট

পরিবারের মেয়ে হিসেবে এঁকেছেন সেখানে দাঁড়িয়ে বাবা মায়ের একক সন্তান হওয়া একেবারে অবাস্তব না হলেও বোর্ডিং স্কুলের একটি ঘরে থাকা সব কটি মেয়েই সিঙ্গেল চাইল্ড, তাও সেটা বিশ শতকের ষাটের দশকে--- এটা মেনে নিতে পারাটা একটু কঠিন বলে মনে হয়। এছাড়া তাদের অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারে বলতে গেলে মনে পড়ে, কাঞ্চনপুরের কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যে রহস্য উন্মোচন করাটা খুব অস্বাভাবিক না হলেও অন্যান্য জায়গায়, যেমন 'গুণ্ডা ও গণ্ডালু'তে চেরাপঞ্জি বা শিলং-এ তারা যেরকম স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা দেখে তাদের স্কুল পড়ুয়া মেয়ে নয়, বরং কলেজ পড়ুয়া বলে মনে হচ্ছে। অথচ যে সময়ে কাহিনিগুলি রচিত তখনকার সময়ে স্কুল পড়ুয়াদের, বিশেষত মেয়েদের এতটা স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেরানোর অবকাশ ছিল বলে মনে হয়না। তবে গোয়েন্দা কাহিনি সব সময় বাস্তব নির্ভর হতে হবে এমন নয়, কারণ গোয়েন্দা কাহিনিতে যে ধরনের অপরাধ দেখানো হয় বাস্তবে দাঁড়িয়ে তা পুলিশ খুব সহজেই সমাধান করতে পারে, গোয়েন্দা কাহিনির পুলিশের মতো বাস্তবের পুলিশ অত বোকা হয়না। যাই হোক, বাস্তবতা বিচারের মাপ কাঠির বাইরে আসলে দেখা যায় গণ্ডালু আসলে অবদমিত স্বপ্ন পুরনের কাহিনি। কাহিনির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে ঘরবন্দি মেয়েদের এক টুকরো আকাশ খুঁজে পাওয়ার কাহিনিসম্ভার।

নির্দেশিকা

১। কৃষ্ণা রায়, 'যেমন দেখেছি', সম্পা। সন্দীপ রায় , সন্দেশ, জুলাই ২০১৬, নিউ স্ক্রিপ্ট , কলকাতা, পৃ.২৭

২। তদেব পৃ. ২৬

৩। তদেব পৃ. ২৭

৪। প্রসাদ রঞ্জন রায়, 'রা-কে-যে-টে-না-পা'র কথা', , সম্পা। সন্দীপ রায় , সন্দেশ, জুলাই ২০১৬, নিউ স্ক্রিপ্ট , কলকাতা, পৃ.৪

৫। তদেব পৃ. ৫

৬। তদেব পৃ. ৫

৭। নলিনী দাস, 'গোয়েন্দা গণ্ডালু', গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৩

৮। নলিনী দাস, 'জমিদার বাড়ির রহস্য', গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৮

৯। নলিনী দাস, 'রাণী রূপমতির রহস্য', গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১২৯

১০। নলিনী দাস, 'খোয়াই রহস্য', গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০৯, পৃ ৩১৬

১১। নলিনী দাস, 'নন্দনকাননের রহস্য', গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০৯, পৃ.২৪৪

১২। তদেব, পৃ. ২৪৫

১৩। নলিনী দাস, 'খোয়াই রহস্য', গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০৯, পৃ.২৯৫

১৪। নলিনী দাস, 'গোয়েন্দা গণ্ডালু', গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০৯, পৃ ১৫

১৫। তদেব, পৃ১৫

১৬। নলিনী দাস, 'নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ', গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৫৪

১৭। নলিনী দাস, 'নন্দনকাননের রহস্য', গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২৩৪-২৩৫

১৮। নলিনী দাস, 'রাণী রূপমতির রহস্য', গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১১৬

১৯। নলিনী দাস, 'জমিদার বাড়ির রহস্য', গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪৪

২০। তদেব, পৃ. ৪৭

২১। নলিনী দাস, 'গুণ্ডা ও গণ্ডালু', গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৬৫

২২। তদেব, পৃ. ৮১

২৩। তদেব, পৃ. ৮০

পঞ্চম অধ্যায়

সখের গোয়েন্দাগিরিতে বিবাহিত নারীর পদার্পণ

মনোজ সেনের দময়ন্তী

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কৃষ্ণার পর আবার মেয়ে গোয়েন্দার আগমন দেখা যায় আরেক লেখিকার লেখনীতে, তিনি নলিনী দাস। ১৯৬২ সালে নলিনী দাস চার স্কুল পড়ুয়া মেয়ের দল 'গণ্ডালু'কে পাঠকের দরবারে হাজির করেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে শুধুমাত্র লেখিকার হাত ধরেই নয়, বাংলা সাহিত্যে লেখকদের কলমেও মেয়ে গোয়েন্দাদের আগমন ঘটতে থাকে। বলা বাহুল্য সব মেয়ে গোয়েন্দা পাঠকের মনে স্থায়ী জায়গা দখল করতে সক্ষম হয়নি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হয়ে রয়ে গেছে দুই নারী গোয়েন্দা --- প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি ওরফে মিতিন মাসি এবং গোয়েন্দা গার্গী। সুচিত্রা ভট্টাচার্য এবং তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতনামা দুই লেখকের সৃষ্টি এই দুই গোয়েন্দা একুশ শতকে রচিত গোয়েন্দা কাহিনির সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র বলা যেতে পারে। এদের পাশাপাশি থাকা নন্দিনী সোম, রঞ্জাবতী, দময়ন্তীদের নাম ফিকে হয়ে গেছে। অথচ দময়ন্তীর নাম পাঠকের মনে থাকার থাকার মতো করেই কাহিনিগুলি সৃজন করেছিলেন লেখক মনোজ সেন। আর মিতিন বা গার্গীর আগেই বাংলা সাহিত্যে পদার্পণ করেছিল দময়ন্তী। কিন্তু তারপরেও একুশ শতকের গোয়েন্দা পাঠকদের কাছে দময়ন্তী প্রায় অপরিচিত নাম বলা চলে।

❖ মনোজ সেন

২০১৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র ১'। লেখক মনোজ সেন বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে প্রায় টানা কুড়ি বছর 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় লেখালেখি করেন। "... রোমাঞ্চ পত্রিকায় রহস্য, অলৌকিক, বিজ্ঞানভিত্তিক, রূপকথা ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার পাতা ছোট ও বড়দের উপযোগী কাহিনি লিখেছেন"[১]।

'রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী' গ্রন্থের ভূমিকায় মনোজ সেন জানান ---

> আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দময়ন্তী দত্তগুপ্তের গল্প, 'সরল অঙ্কের ব্যাপার' নিয়ে আমি সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছিলুম। সেটা ছিল গোয়েন্দা গল্প, প্রকাশিত

হয়েছিল 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায়। সম্পাদক স্বর্গত রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও উৎসাহে যতদিন 'রোমাঞ্চ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ততদিন ধরে আমি দময়ন্তী দত্তগুপ্তের গল্প লিখে গেছি। রঞ্জিতবাবুর চলে যাওয়া আর সেইসঙ্গে 'রোমাঞ্চ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও বেশ কয়েক বছর লিখেছি।[২]

অর্থাৎ, দময়ন্তীর অনেক কাহিনিই রয়েছে। প্রকাশিত দুটি খণ্ডে মোট এগারোটি কাহিনি সঙ্কলিত হয়েছে। 'বুকফার্ম' মনোজ সেনের প্রকাশিত লেখার সঙ্কলন প্রকাশ করছে। আশা করা যায় দময়ন্তীর কাহিনি নিয়ে আরও বেশ কিছু খণ্ড প্রকাশিত হবে। তবে দময়ন্তীর সব কাহিনি পাঠকের কাছে পৌঁছবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ভূমিকার শেষে মনোজ সেন জানান --- "আর একটি কথা। দময়ন্তীর অনেক গল্প আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। সেগুলি ছড়িয়ে আছে পুরোনো 'রোমাঞ্চ'র বা অন্যান্য পত্রিকার পাতায়। সেগুলোর সন্ধান পেলে বুকফার্মের কাছে পৌঁছে দিলে কৃতজ্ঞ হব।"[৩]

দময়ন্তীর কাহিনিগুলি বিশ্লেষণের আগে মনোজ সেনের ব্যাক্তিগত জীবনের দিকে একবার তাকানো প্রয়োজন। কারণ, দময়ন্তীর কাহিনিগুলোর মধ্যে তার ব্যাক্তিগত জীবন বিশেষত পেশাগত জীবনের অনেক খানি ছাপ রয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

লেখক মনোজ সেনের জন্ম ১৯৪০খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট স্তরের পড়াশুনো করেন। এরপর বি ই কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে স্নাতক হওয়ার পর চাকরি জীবনে পদার্পণ করেন। ভারি নির্মাণ সংস্থা 'হেড রাইসন'-এর চাকরি দিয়ে পেশাগত জীবন শুরু এবং 'টার্নকী ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া'র ডিরেক্টর পদ থেকে ১৯৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৭২সালে 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'সরল অঙ্কের ব্যাপার' প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি লেখালেখি করেন। মূলত গোয়েন্দা কাহিনি, অলৌকিক কাহিনি, বিজ্ঞান ভিত্তিক ও রূপকথা জাতীয় কাহিনি লিখেছেন। মনোজ সেন তাঁর এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, তিনি আগাথা ক্রিস্টির লেখা থেকে গোয়েন্দা কাহিনি লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তবে তাঁর গোয়েন্দা দময়ন্তী একেবারেই মিস জেনি মারপেলের মতো নয়, বয়স এবং পেশাগত দিক থেকে সে একেবারেই তাঁর ধারেকাছের কেউ নয়। তবে প্রথম গল্পে আমরা দময়ন্তীকে রহস্য সমাধানের জন্য তদন্তে নামতে দেখতে পাই না। এমনকি খুনের জায়গাতেও তাকে যেতে দেখা যায় না। শুধুমাত্র ঘরে বসে অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিবেশী খুনের রহস্য সমাধান করে ফেলে দময়ন্তী। পরের কাহিনিগুলোতে দময়ন্তীকে তদন্ত করতে দেখা যায়।

❖ দময়ন্তী

দময়ন্তীর গোয়েন্দা জীবনের সূত্রপাত তার বিবাহিত জীবন শুরু হওয়ার তিন বছর পর। দময়ন্তীর বিষয়ে এই কাহিনিতে তার বর সমরেশের বয়ান থেকে জানা যায় যে, দময়ন্তী ইতিহাসে এম.এ. করেছে ; চার বছর প্রেম করার পর তাদের বিয়ে হয়েছে ; আর তিন বছর ধরে পঁচাত্তর নম্বর অর্কিড রোডের বাড়িতে তারা সংসার করছে। শিশুপাঠ্য রহস্য কাহিনির জন্য মনোজ সেন খুদে গোয়েন্দা সাগর রায় চৌধুরীকে নির্মাণ করার ফলে দময়ন্তীকে সেদিকের পথ মাড়াতে হয়নি। ফলত দময়ন্তীর কাহিনিগুলি সম্পূর্ণ ভাবেই পরিণত পাঠকের জন্য।

'সরল অঙ্কের ব্যাপার'-এ দময়ন্তীর পেশাগত জীবনের নির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তী কাহিনিগুলিতে দেখা যায় সে অধ্যাপিকা, 'ভুবনেশ্বরী গার্লস কলেজ'-এ সে ইতিহাস পড়ায়। বর সমরেশ দত্তগুপ্ত পেশায় ইঞ্জিনয়র। দময়ন্তীর পূর্বজীবনের কোনও প্রসঙ্গ কাহিনিগুলিতে চোখে পড়ে না। তার বিবাহপূর্ব আত্মীয় স্বজন কোনও কিছুরই কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না । তাই মানুষ দময়ন্তীর চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জন্মগত আর্থ-সামাজিক অবস্থান, কিংবা তার শিক্ষা, বেড়ে ওঠা কোনওটা নিয়েই বিশেষ কিছু বলার থাকে না। দময়ন্তী ইতিহাসের অধ্যাপিকা এবং সময় সুযোগ পেলে সে রহস্য সমাধান করে, এইটুকুই তার পরিচয়। নিজের সম্পর্কে দময়ন্তী বলে --- "কোনও ঘটনার পিছনের পারম্পর্য এবং তার কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করে তার বিশ্লেষণই যেমন ঐতিহাসিকের কর্তব্য, আমারও তাই"[৪]।

'সরল অঙ্কের হিসেব'-এ দময়ন্তী একেবারেই গৃহবধূ। সে রহস্য সমাধান করে ফেলায় সমরেশের বন্ধু ইন্সপেক্টর শিবেন সেন অবাক হয়। কিন্তু অন্যান্য কাহিনিতে দেখা যায় দময়ন্তী গোয়েন্দা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। তবে যেহেতু টাকার বিনিময়ে সে রহস্যের সমাধান করেনা। তাই কেউ তাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিছু করতে বললে তা সে সযত্নে এড়িয়ে যায়। 'নকল হীরে' কাহিনিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসায়ী শৈবাল মিত্র দময়ন্তীকে বলেন, তাঁর মেয়ে দীপান্বিতাকে খুনের দায় থেকে বাঁচাতে পারলে দময়ন্তী যত টাকা চায়, তাকে দেবেন। উত্তরে দময়ন্তী জানায় --- "দেখুন, প্রফেশনাল প্রাইভেট ডিটেকটিভ বলতে যা বোঝায়, আমি তা নই। টাকা নিয়ে আমি কাজ করি না। আর কাউকে বাঁচানোর কোনো দায়িত্ব আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। কোথাও কোনও রহস্য থাকলে, আমি সেটার জট ছাড়ানোর চেষ্টা করতে পারি মাত্র"[৫] ।

প্রথম খণ্ডের বাকি কাহিনিগুলির ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই কোনও মক্কেল বা পরিস্থিতির পাকে পড়া ব্যক্তি এসে দময়ন্তীকে সেই কেস সমাধানের অনুরোধ জানাচ্ছে না। দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রথম পাপ' কাহিনিতে দেখা যায় মালবিকা হালদার, 'ইজ্জত'-এ অরবিন্দ আচার্য দময়ন্তীর কাছে কেস নিয়ে হাজির হন। 'ভগ্ন অংশ ভাগ'-এ বিখ্যাত ব্যবসায়ী অশোকনাথ ঘোষাল দময়ন্তীর হাতে তদন্তের ভার দেবে বলে তাকে ডেকে পাঠায়। তবে বেশির ভাগ কাহিনির ক্ষেত্রে তার পরিচয় পেয়ে তদন্তের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি তাকে একটি সমান্তরাল তদন্ত চালানোর কথা বলছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সমরেশ বা দময়ন্তীর বন্ধু স্থানীয়। 'চরৈবেতি'তে যেমন কর্নেল নিরঞ্জন ঘোষ দময়ন্তীর ছোটবেলার বন্ধু রত্নাবলির বর। রত্নাবলি ও সমরেশের কাছ থেকে দময়ন্তীর গোয়েন্দাগিরি কথা শুনে এবং গবেষণা সংক্রান্ত নথিপত্র পাচার হওয়ার বিষয়ে দময়ন্তীর আগ্রহ দেখে নিরঞ্জন তার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। 'সূর্য গ্রহণ' কাহিনিতে সমরেশের বন্ধু রঞ্জিতের কাছে মুধুপুরে ছুটি কাটাতে গিয়ে দময়ন্তীর কলেজের সহপাঠী ডি আই জি জয়ন্ত চতুর্বেদীর সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু রঞ্জিতের মুখে তার গোয়েন্দাগিরির কথা শুনে জয়ন্ত বলে, --- "সে কী, তুমি আজকাল প্রফেসারি ছেড়ে ডিটেকটিভগিরি শুরু করলে নাকি ? মেয়েছেলের লাইন এসব নয় হে, চোর-ছ্যাচোড় গুণ্ডা-দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া তোমাদের কম্ম নয়"[৬] ।

এমন কথা বললেও এক্সিকিউটিভ চিফ নিশীথ সান্যাল দময়ন্তীকে ইন্দার সিংয়ের মৃত্যুর তদন্ত ভার দেওয়ার পর জয়ন্ত দময়ন্তীকে সাহায্য করে। 'রাজমহিষীর রহস্য'তে সমরেশ নিজের কাজের সূত্রে রাজমহিষীতে যায়। সেখানে গিয়ে কৃত্তিবাস সাঁতরার বাড়িতে ওঠে। কৃত্তিবাসকে সবাই গ্রামের প্রধান বলে মান্য করে। কৃত্তিবাস সাঁতরার নাতি চন্দ্রশেখর, শিবেন সেনের বন্ধু। যদিও এখানে দময়ন্তী জেরার ভঙ্গীতে কারোর সঙ্গে কথা বলে না। একেবারে সাধারণ কথা বার্তার আড়ালে নিজের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জোগাড় করতে থাকে। তবে শুধুমাত্র কৃত্তিবাস সাঁতরার আত্মীয় পরিচয়ের জন্যই শেষ পর্যন্ত নিজের তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রামের সবার সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। আবার 'পর্বত বহ্নিমান' কাহিনিতে মুনিয়া খুন হওয়ার পর তার পরিবারের কেউ দময়ন্তীকে তদন্তে নামার অনুরোধ জানায় না, বরং তার তদন্ত করা নিয়ে ব্রতীশেখর রায়, উজ্জ্বল মজুমদার, শর্মিষ্ঠা সবাই বিরক্ত হন। কিন্তু তারপরও দময়ন্তী তদন্ত চালাতে পারে। কারণ, এই কেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর শিবেন সেন সমরেশের বন্ধু। অর্থাৎ, গোয়েন্দা হওয়ার পরও গোয়েন্দা হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা মূলত পরিচয়ের ভিত্তিতেই। তার এবং সমরেশের পরিচিত মহল তার রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে। 'সূর্য গ্রহণ'-এ একবার তার ওপর আততায়ীর

হামলা হলেও দময়ন্তীকে নিজস্ব স্বাচ্ছন্দের ঘেরাটোপের বাইরে গিয়ে তদন্ত করতে হয়নি। কিন্তু দময়ন্তী যে রহস্যগুলোর সমাধান করেছে সেগুলি প্রশংসাযোগ্য। দময়ন্তীর কাহিনিগুলির সমাধান সম্পূর্ণ ভাবেই বুদ্ধি নির্ভর। গোয়েন্দাগিরি করার জন্য প্রজ্ঞাপারমিতার মতো মারামারি (সর্প রহস্য সুন্দরবনে) কিংবা গার্গীর মতো নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে রহস্য উন্মোচন (ধূসর মৃত্যুর মুখ ; নীল রক্ত নীল বিষ) করতে দেখা যায় না। বলা যায় দময়ন্তীর কাহিনিগুলি গুনগত মানের দিক থেকে যতটা এগিয়ে গোয়েন্দা হিসেবে দময়ন্তী ততটা এগোতে পারেনি। 'সাহিত্য তক্কো' আয়োজিত একটি ওয়েবিনারে অধ্যাপক নির্মাল্য ঘোষ বলেন --- লেখক মনোজ সেন তাঁর মেয়ে গোয়েন্দার নাম দময়ন্তী রাখার পিছনে মূল কারণ পৌরাণিক দময়ন্তীর বুদ্ধিদীপ্ততা। পৌরাণিক দময়ন্তী যেমন স্বয়ম্বর সভায় নলের রূপ ধারণ করে থাকা দেবতাদের গলায় মালা না দিয়ে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে আসল নলকে বরন করে, তেমনই গোয়েন্দা দময়ন্তী নিজের বুদ্ধির সাহায্যে আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করে।

- ## দময়ন্তীর গোয়েন্দাগিরি

এখনও পর্যন্ত দময়ন্তীর গোয়েন্দাগিরির যে কাহিনিগুলি নিয়ে 'বুকফার্ম' থেকে দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে --- 'রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী ১' ও 'রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী ২'। প্রথম খণ্ডের মধ্যে রয়েছে ---

১। সরল অঙ্কের ব্যাপার

২। নকল হিরে

৩। রাজমহিষীর রহস্য

৪। পর্বতো বহ্নিমান

৫। সূর্য গ্রহণ

৬। চরৈবেতি

আর দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ---

১। প্রথম পাপ

২। অন্ধ তামস

৩। ইজ্জত

৪। নীলকান্তপুরের হত্যাকাণ্ড

৫। ভগ্ন অংশ ভাগ

লেখক মনোজ সেন জানিয়েছেন 'সরল অঙ্কের ব্যাপার' গল্পটির মধ্য দিয়ে তাঁর লেখক জীবনের সূত্রপাত। দময়ন্তীর ক্ষেত্রেও তার গোয়েন্দা জীবনের সূত্রপাত এখান থেকেই। দময়ন্তীকে অপরাধীর পিছনে ধাওয়া করতে দেখা না গেলেও বেশিরভাগ কাহিনিতে তার নিজের মতো করে তদন্তে নামতে দেখা যায়। দময়ন্তীর দুটি কাহিনিতে দময়ন্তীকে একেবারে আর্মচেয়ার ডিটেকটিভের ভূমিকায় পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রথমেই 'সরল অঙ্কের ব্যাপার' কাহিনির উল্লেখ করতে হয়। কাহিনির শুরুতেই সমরেশ দময়ন্তীকে মতিলাল জজোড়িয়ার খুনের খবর শোনায়। দুপুর দুটো থেকে চারটের মধ্যে তিনি তাঁর বৈঠকখানার ঘরে খুন হয়েছেন। তদন্তের দায়িত্বে আছেন সমরেশের বন্ধু সিআইডিতে কর্মরত শিবেন সেন। মতিলালকে মাথায় ডাণ্ডা মেরে হত্যা করা হয়েছে। তিনি প্রায় দশ বছর আগে তেত্রিশ নম্বরের বাড়িতে আসেন। তিনি বিবাহিত নাকি বিপত্নীক সে বিষয়ে স্থানীয় মানুষদের ধারনা পরিষ্কার নয়। তিনি যখন আসেন তখন সঙ্গে করে তাঁর এক ১৪বছরের কিশোর ভাইপোকে নিয়ে আসেন। এছাড়া আসে চাকর রাজু এবং দারোয়ান সূর্যকান্ত সিং। মাস খানেক আগে তাঁর আরেক ভাইপো এসে উপস্থিত হয়, তখন থেকে বাড়িতে প্রায়ই অশান্তি হতে থাকে। বাতের ব্যাথা বাড়ার দরুন মতিলাল অফিসে যেতেন না, বাড়িতে বসেই অফিসের কাজকর্ম দেখতেন। তিনি যে ঘরে খুন হন সেখানে একটি রক্তাত তোয়ালে এবং একটি হিপোডার্মিক সিরিঞ্জ পাওয়া যায়। যেহেতু দুপুরবেলা নতুন ভাইপো রামেশ্বর এসে মতিলালের সঙ্গে দেখা করত, তাই পুলিশ প্রাথমিক ভাবে তাকেই খুনি বলে মনে করছে।

সবটা শুনে দময়ন্তীর খটকা লাগে। তার মনে হয় ঘটনাটা সাজিয়ে রামেশ্বরকে খুনি সাজানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সে শিবেনকে খোঁজ নিতে বলে মতিলালের ডায়াবেটিস ছিল কিনা, আর রান্নাঘরে চিনির কৌটোয় কতটা চিনি আছে। শিবেন খোঁজ নিয়ে জানান, তাঁর ডায়াবেটিস ছিল না, এবং চিনির কৌটোয় কোনও চিনি নেই। এরপর খুনের জায়গায় না গিয়েও দময়ন্তী রহস্য সমাধান করে ফেলে। মতিলালের শরবত খাওয়ার অভ্যেস ছিল।

সেই সুযোগ নিয়ে প্রথম ভাইপো চাকর রাজুর সঙ্গে মিলে হত্যার ছক তৈরি করে। রাজু চিনিতে বিষ মিশিয়ে রাখে। মতিলাল নিজেই শরবত বানিয়ে খেতেন। সেই শরবত খাওয়ার পর বিষক্রিয়া শুরু হলে তিনি রান্না ঘর থেকে বসার ঘরে যাওয়ার সময় মেঝেতে পড়ে যান। চৌকাঠে মাথা ঠুকে মাথা ফেটে যায়। দেখে মনে হয়, ধারালো কিছুর আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যেহেতু পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বিষ পাওয়া যেতে পারে, তাই ঘরে সিরিঞ্জ রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় ভাইপোকে খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে কাকার সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্য প্রথম ভাইপো এই ষড়যন্ত্র করে। বলাবাহুল্য দময়ন্তী এখানে একেবারেই গোয়েন্দার ভূমিকায় নেই, এ সবই তার অনুমান। আর গোয়েন্দা কাহিনির ছক অনুযায়ী এই অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। এরপর থেকে দময়ন্তী রীতিমত গোয়েন্দার ভূমিকায় নেমে রহস্য সমাধানের পথে হাঁটে।

'প্রথম পাপ' গল্পটিতেও দময়ন্তীকে আর্মচেয়ার ডিটেকটিভে ভূমিকায় দেখা যায়। প্রথম গল্পের সঙ্গে এই কাহিনির মূল পার্থক্য হল --- এখানে দময়ন্তী গোয়েন্দা হিসেবে বেশ নাম করেছে। তাই মালবিকা হালদার বিপদে পড়ে তার কাছে ছুটে আসে। মালবিকা জানান, তিনি ব্ল্যাক মেলিংয়ের শিকার হচ্ছেন। কিন্তু কী কারণে তা তাঁর পক্ষে বলা অসম্ভব। এমনটা খুবই অবাস্তব বলে মনে হয়। ডাক্তারের কাছে সুস্থ হতে গিয়ে কী রোগ হয়েছে না বলার মতো ব্যাপার। কিন্তু গল্পে দময়ন্তীর বুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক এমন কাহিনি নির্মাণ করেছেন। তবে সব ঘটনা পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করার পরও পাঠক বুঝে নিতে পারেননা মালবিকা আসলে কোন চারটি মিথ্যে কথা বলেছেন। আর দময়ন্তী সেই মিথ্যের জট ছাড়িয়ে ফেলে শুধু রহস্যের সমাধান করে ফেলে তাই নয়, তার অতীত জীবনের কাহিনিও সম্পূর্ণ ধরে ফেলে। পুরোপুরি অনুমান নির্ভর হলেও ঘটনাকে এমন যৌক্তিক পরম্পরায় লেখক সাজিয়েছেন যে তা পাঠকের কাছে একেবারে বিশ্বাসযোগ্য ওয়ে ওঠে। এখানে লেখকের মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

মালবিকা জানান --- মালবিকার বাবা তালতলার বিখ্যাত মিত্র বংশের সন্তান। কিন্তু পুনার কাছে পুরন্দরপুর বলে ছোট শহরের মিউনিসিপ্যাল কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। মালবিকার যখন ছ-বছর বয়স তখন তাঁরা পুরন্দরে যান। আবার মালবিকার যখন ষোল বছর বয়স তখন কলকাতার একটি বেসরকারি কলেজে চাকরি পেয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। এরপর শ্রীকণ্ঠ ঘোষের নাতির সঙ্গে মালবিকার দিদি শ্রীলেখার বিয়ে হয়। কিছুদিন পর মালবিকার বাবার অনুরোধে শ্রীলেখার বর মালবিকাদের তালতলার বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। দিদি শ্রীলেখা সন্তানসম্ভবা হলে মালবিকার বাবা বাড়ির

সবাইকে নিয়ে বোম্বেতে চলে যান। বোম্বের বিখ্যাত ডাক্তার ই.কে.ভাচুরার ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁর নার্সিং হোমে শ্রীলেখার ছেলের জন্ম হয়। প্রায় আট ন মাস বাদে সবাই কলকাতায় ফিরে আসেন। তিন-চার মাস পরে শ্রীলেখার বর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তারপরদিন থেকে শোকে শ্রীলেখা উন্মাদ হয়ে যান।

প্রায় আট বছর আগে বিভাস হালদারের সঙ্গে মালবিকার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের মাস ছয়েকের মধ্যে শ্রীলেখা মারা যায়। মালবিকার বাবা মা শ্রীলেখার সন্তান প্রবীরকে বড় করে তুলছিলেন। একদিন প্রবীরকে স্কুল থেকে আনার পথে মালবিকার মা ট্রাম থেকে পড়ে মারা যান। প্রবীরের বয়স তখন আট বা নয়। মালবিকার বাবা একদিন প্রবীরকে জামাই বিভাসের হাতে দিয়ে পুরন্দরপুরে যাচ্ছি বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। বিয়ের অনেকদিন পরও সন্তান না হওয়ায় মালবিকা ও বিভাস দুজনে ডাক্তার দেখান। জানা যায় মালবিকা সন্তান ধারণ করতে অক্ষম। এরপর বিভাস প্রবীরকে দত্তক নিতে চান, মালবিকা তাতে অনন্দিত হয়। কিন্তু তারপর থেকেই ব্ল্যাকমেলিংয়ের চিঠি আসতে থাকে। মালবিকার মনে হয়, বাচ্চাটিকে দত্তক নিতে চাওয়ার জন্য ব্ল্যাকমালিংয়ের সূত্রপাত। তাই দত্তক নেওয়া স্থগিত রাখেন। প্রায় একবছর ধরে ইলেকট্রিক টাইপ রাইটারে টাইপ করা ব্ল্যাক মেলিংয়ের চিঠি আসতে থাকে। প্রতি মাসে টাকা দাবি করে চিঠি পাঠান কেউ। তারপর মালবিকা একটি কফির দোকানে কাউন্টারের ওপর টিফিন বক্সের মধ্যে করে ১০ হাজার টাকা রেখে দিয়ে আসেন। অনেক টিফিন বাক্সের সাথে তা মিশে যায়। তারপর কে কী ভাবে তা নেয় মালবিকা জানেন না। মালবিকা সন্দেহ করেন বিভাসের মৃত বড়দাদা প্রভাসের ছেলে প্রকাশকে। সে মালবিকাকে একেবারেই সহ্য করতে পারেনা। সম্ভবত মালবিকা কাকার সম্পত্তির ভাগীদার বলে মালবিকার প্রতি তার এই বিদ্বেষ। সে কাকার সম্পত্তির কথা ভেবে কাকার সন্তান দত্তক নেওয়া থেকে বিরত করতে চায়।

মালবিকার বলা পুরো কাহিনি শোনার পর দময়ন্তীর মনে হয় মালবিকার শোনানো গল্পের মধ্যে বেশ ফাঁক রয়েছে, এবং সে কিছু মিথ্যে ও কিছু অর্ধসত্য বলেছে। দময়ন্তী সেই ফাঁকগুলো পূরণ করতে শুরু করে। আর এই ফাঁক পূরণ করতেই সব রহস্যের জট খুলে যায়। প্রথমত, শুধুমাত্র বন্ধু ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য মেয়েকে সন্তান সম্ভবা অবস্থায় কেউ এতো পথ নিয়ে যাবেনা। তার ওপর ডাক্তার ভারুচা পার্শি, খাস বম্বের বিখ্যাত ডাক্তার। তাঁর সঙ্গে পুনা থেকেও অনেকটা দূরে একটি ছোট কলেজের ইংরেজির এক অধ্যাপকের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার কাহিনি খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে শ্রীলেখা নয়, সন্তান সম্ভবা ছিলেন অবিবাহিতা মেয়ে মালবিকা। তাই পরিচিত গণ্ডির

বাইরে গিয়ে সন্তানের জন্ম হওয়ানোর উদ্দেশ্যে তাঁরা বম্বে চলে যান। দ্বিতীয়ত, ডঃ বি কে হালদার দত্তক নেওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন না। মালবিকার ভয় ছিল যদি তাঁর আর বিভাসের কোনও সন্তান হয়, সেক্ষেত্রে প্রবীরকে আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে পারবেন না। কিন্তু প্রতাপের জন্ম দিতে পারার অক্ষমতার কারণে সে সম্ভাবনা আর নেই। আর এই তথ্য জানতে পারার ফল স্বরূপ মালবিকাকে ব্ল্যাকমেলিংয়ের শিকার হতে হচ্ছে। তৃতীয়ত, মালবিকা বলেছিলেন তাঁরা বর বউ দুজনে আলাদা ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন। মালবিকার কথা অনুযায়ী পুরুষ ডাক্তারকে এইসব বিষয়ে দেখানোর ক্ষেত্রে তিনি লজ্জা পেয়েছিলেন। অথচ, একবছর আগে তাঁর ইউটরাসে সমস্যা হওয়ায় তিনি ডাক্তার কেশবনকে দেখিয়েছিলেন। অর্থাৎ, সন্তান ধারণ সংক্রান্ত পরীক্ষা তাঁর কাছে না করানোর কারণ, সেক্ষেত্রে তাঁর পূর্বজীবনের তথ্য সবার সামনে চলে আসতে পারে। ডাক্তার মৃণালিনী কর তাঁর গর্ভবতী হওয়ার খবর জানত তাই মালবিকা তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদেকেটে পড়ে।

দময়ন্তীর বিশ্লেষণ শুনে শিবেন ডাক্তার মৃণালিনী করকেই ব্ল্যাকমেলার হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু দময়ন্তী জানায়, ব্ল্যাকমেলার ডাক্তার কেশবনও হতে পারেন। এক বছর আগে যখন মালবিকার ইউটরাসে সমস্যা দেখা দেয়, তখন কেশবন তাঁকে পরীক্ষা করার সময় বুঝতে পারেন যে এক সময়ে তিনি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু এই পরিবার সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহাল না হওয়ায় তিনি ভেবেছিলেন, হতে পারে সে মারা গেছে কিংবা হস্টেলে আছে। কিন্তু যখন পরীক্ষা করে দেখলেন বিভাস হালদার সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম তখন তাঁর মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। এরপর যখন জানতে পারেন শালীর ছেলেকে দত্তক নিতে চলেছেন, তখন তিনি সবটা আন্দাজ করতে পারেন। আন্দাজের ভিত্তিতে চিঠি পাঠান, যদি লেগে যায় !

ডাক্তার মৃণালিনী করকে সন্দেহ না করে কেশবনকে কেন সন্দেহ করছে, জানতে চাইলে দময়ন্তী জানায়, কফির দোকান আর তার কাউন্টারের ওপরে টিফিনবক্স রাখা ---- কলকাতায় এমন দোকানগুলি মূলত দক্ষিণ ভারতীয় রেস্টুরেন্ট। এরপর শিবেন আর সমরেশ ডাক্তার কেশবনের চেম্বারে হানা দিয়ে দেখতে পায় তিনি একটি টাইপ রাইটারে টাইপ করছেন, আর সেটি সমরেশের পূর্ব অনুমান অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্সটন। শিবেন অপরাধীকে ধরে ফেলে।

এই দুটো ক্ষেত্রেই কাহিনির প্রেক্ষাপট কলকাতা আরও যে কাহিনিগুলি কলকাতা বা বর্ধিত কলকাতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সেগুলো হল --- ১। নকল হিরে ২। ইজ্জত ৩। ভগ্ন অংশ ভাগ। এই কাহিনিগুলোর মধ্যে নাগরিক মানুষদের মনস্তাত্ত্বিক

জটিলতার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আর অপরাধীর অপরাধের পিছনে সেই সম্পর্কের জটিল সমীকরণ ভীষণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই কাহিনিগুলির সব চরিত্রই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে ওপরের দিকে তো বটেই শিক্ষা-দীক্ষা, পেশাগত জীবনের ক্ষেত্রেও বেশ উঁচুতে এঁদের অবস্থান। সমস্যাগুলোও সাদামাটা চুরি, খুন, মূল্যবান বস্তুপাচার ইত্যাদি নয়, উচ্চবিত্ত সমাজের আধুনিক নাগরিক সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে এই কাহিনিগুলিতে। 'নকল হিরে' কাহিনিতে দেখা যায়, সোনারপুরের বিখ্যাত ব্যাবসায়ী সুশীল মৈত্রের জামাই প্রতাপ চৌধুরী খুন হয়। সোনারপুরে সুশীল মৈত্রের একটি ফ্যাব্রিকেশন শপ আর ফাউন্ড্রি আছে। অন্যদিকে প্রতাপ চৌধুরী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কাজে যোগ দেয়। ক্রমে সে উল্লেখযোগ্য পদে নিজেকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সুশীল মৈত্রের আরেক জামাই রামানুজ লাহিড়ী বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়র। বার্নপুর ইস্পাত কারখানায় কাজ করত। অর্থাৎ, সবমিলিয়ে শিক্ষিত প্রায় উচ্চবিত্ত সমাজের একটি ছবি ফুটে উঠেছে 'নকল হিরে'তে। এই কাহিনিতে খুনিকে খুঁজে বের করার কোনও প্রয়োজন নেই। সুশীল মৈত্রের ছোটমেয়ে দীপান্বিতা নিজেই নিজের স্বামীকে হত্যা করে। এই কাহিনিতে সুশীল মৈত্র দময়ন্তীর কাছে আসে মূলত দুটি কারণে, প্রথমত, তিনি জানতে চান কেন দীপান্বিতা এমন কাণ্ড করল; দ্বিতীয়ত, যদি কোনও ভাবে দীপান্বিতার শাস্তি কম হয়। তিনি জানান, প্রতাপকে খুন করার পর দীপু মানে দীপান্বিতা তাঁকে জানায়, সে প্রতাপকে গুলি করে মেরেছে, নাহলে সে দিপুকে এবং তার বাবাকে খুন করত। প্রতাপ রিভলবার বের করার জন্য যেই পকেটে হাত ঢুকিয়েছে অমনি সে প্রতাপকে গুলি করেছে। পুলিশকেও সে জানায় আত্মরক্ষার্থেই সে প্রতাপকে হত্যা করেছে। কিন্তু প্রতাপের পকেট থেকে কোনও অস্ত্র পাওয়া যায়নি, বরং একটি নকল হিরের আংটি পাওয়া গেছে। আসলে রামানুজের ষড়যন্ত্রের ফলে প্রতাপ – দীপান্বিতার জীবনে এমন মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে। রহস্য উদ্ঘাটনের পিছনে এই নকল আংটি খুব বড় ভূমিকা পালন করেছে। বাড়ির পরিচারিকা বৃন্দা হাতে হিরে কেনার টাকা পেয়ে লোভ সামলাতে না পেরে সেই টাকা আত্মসাৎ করে , আর আসলের বদলে একটা নকল হিরের ব্যাবস্থা করে। যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে কাহিনিটি গঠিত, সেখানে আসল হিরে থাকলে সমস্যার মূলে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে দময়ন্তীকে বেশ সমস্যার মুখে পড়তে হত। কিন্তু হিরেটা নকল হওয়ায় তার বেশ সুবিধা হয়েছে ।

'ইজ্জত' কাহিনিতে দেখা যায় অরবিন্দ আচার্য সমরেশের বড় দাদার সহপাঠী ছিলেন। ভবানীপুরের বিখ্যাত আচার্য বাড়ির ছেলে অরবিন্দ এক সময়ে চেহারা, কথাবার্তা, লেখাপড়া

, খেলাধুলো সবকিছুতেই সামনের সারির মানুষ ছিলেন কিন্তু বর্তমানে প্রৌঢ়ত্ব গ্রাস করেছে। তিনি জানান সেরিব্রাল থ্রমবোসিস হওয়ার পর তিনি এমন বুড়িয়ে যান। তিনি দময়ন্তীর কাছে এসে জানান তাঁর বাড়ির পাশের পুরনো বাড়িতে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর কেউ থাকেনা, হানাবাড়ি বলে সেটির বদনামও রয়েছে। সেখানে মাস খানেক আগে কেউ এসে রোজ দরজা জানলা খুলত, তারপর আবার আগের মতো সব বন্ধ থাকতে শুরু করল। তার সাতদিন পর তাঁর বাড়িতে চোর এসেছিল, তাঁর ঘুম পাতলা বলে জেগে উঠতে চিৎকার করতেই পালিয়ে যায়। তারপরও তিনবার চোর ঢোকার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিবারই অসফল হয়। অরবিন্দ আচার্য চান দময়ন্তী এই চোরের সন্ধান করুক। দময়ন্তী চোরের সন্ধানে নামে, কিন্তু তারপর তাকে রেবেকা ও বকুলের হত্যার রহস্য সমাধান করতে হয়। জানা যায় হত্যার পিছনে অরবিন্দ আচার্যের ভগ্নিপতি অবসর প্রাপ্ত মিলেটারি অফিসার বিনয়ভূষণ রয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দময়ন্তী সবকিছু বুঝতে পারলেও তার হাতে কোনও প্রমাণ নেই। তাই দময়ন্তী বলে --- "বিনয়ভূষণ স্বাভাবিক বা সাধারণ অপরাধী নন --- উনি শিক্ষিত, রুচিশীল ভদ্রলোক। ...... আমি নিশ্চিত উনি নিজেই সবকথা স্বীকার করবেন।"[৭]

'ভগ্ন অংশ ভাগ' একেবারেই উচ্চবিত্ত সমাজের কাহিনি। অশোকনাথ ঘোষাল 'প্রগ্রেসিভ ফার্মাসিউটিক্যাল'- এর চেয়ারম্যান পাশাপাশি অনেকগুলো কোম্পানির ডিরেক্টর। এখানে শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষদেরকেই লেখক নিয়ে আসেননি, কাহিনির মূল রহস্যও একেবারে এই সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অশোকনাথের ছেলে অলোকনাথ হোয়াইট স্টার ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ওই কোম্পানির জোকা ফ্যাক্টরিতে দু-বার আগুন লাগে। বালিটিকুরির ফাউন্ড্রি শপে টাইম বোমা বিস্ফোরণ হয়। 'সুপ্রিম সেরামিক্স', 'ডায়মন্ড গ্লাস', 'গ্লোব ইনসুলেটারস'--- 'হোয়াইট স্টার'কে মাল সাপ্লাই করে। তাদের ফ্যাক্টরিতেও নাশকতা মূলক ঘটনা ঘটে। কাহিনির তদন্তের পর দময়ন্তী জানতে পারে অলোকনাথ তাঁর ছেলে অতীনকে পছন্দ করেন না, তিনি তাঁর স্ত্রীর মাসতুতো বোনের ছেলে পবিত্র চক্রবর্তীকে পছন্দ করেন। পবিত্র মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, খুব মেধাবী ছাত্র। প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে। অলোক তাঁর শেয়ার তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে দিয়ে দিলে অশোকনাথ তাঁর শেয়ারগুলো সব নাতি অতীনকে দিয়ে দেন। দময়ন্তী যখন অলোকনাথের কাছে যান, তখন তিনি স্ত্রী তপতীকে দেওয়া শেয়ারগুলো নিয়ে আসতে বললে তিনি জানান তিনি তা তাঁর ছেলে অতীনকে লিখে দিয়েছেন। পবিত্র অগোছালো অতীন্দ্রের শেয়ারগুলো নিয়ে অফিসের এক কর্মচারীকে দিয়ে শর্ট সেলিং করায়। সে চারটে কোম্পানিতে সাবোটাজ করায়। তার উদ্দেশ্য ছিল, অতীন্দ্রকে ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানো আর

পিশেমশাইয়ের সংসারে নিজের জায়গা পাকা করা। এই কাহিনির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল অশোকনাথ তাঁর পুত্রবধূ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে সে বস্তিতে বড় হয়েছে, তাই তাদের বিয়ের পর নিজের বাড়িতে ঢুকতে দেননি। যদিও আসলে তিনি বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রশিল্পীর কন্যা ছিলেন। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতির বিচারে অশোকনাথের কাছে তাঁর অবস্থান খুব ঘৃণ্য ও নিম্নস্তরের।

পূর্বোক্ত পাঁচটি কাহিনি বাদ দিলে যে ছ'টি কাহিনি বাকি থাকে সেগুলো আসলে ছুটি কাটাতে যাওয়ার কাহিনি। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে ভ্রমণের পাশাপাশি গোয়েন্দাগিরি করার কাহিনি অগুনতি। কাহিনিতে একদিকে যেমন থাকে ভ্রমণের বর্ণনা, অন্যদিকে তার মাঝে অপরাধীর পিছনে ধাওয়া করার রোমাঞ্চ। বিশেষত কিশোর গোয়েন্দা কাহিনির ক্ষেত্রে এই ছক অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু দময়ন্তীর কাহিনিগুলোর ক্ষেত্রে মনোজ সেন বেড়াতে যাওয়ার উল্লেখ করলেও পাঠকের সামনে ভ্রমণের বর্ণনা তুলে ধরেননি। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মনে হয় আসলে কাহিনির প্রেক্ষাপট কলকাতা হলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা খানিকটা হ্রাস পেত।

'রাজমহিষীর রহস্য'তে বহুবছর ধরে জলার মধ্যে পড়ে থাকা মৃতদেহের রহস্য কলকাতার প্রেক্ষাপটে রচনা করা সম্ভব নয়। পাশাপাশি ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে সেই জলা জমির জলসেচ আটকানো, মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে তলে তলে ড্রাগ পাচার চক্র চালানো --- এই বিষয়গুলো বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য একটা গ্রাম্য পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। ইলেকট্রিক বোর্ডের কাজ নিয়ে সমরেশ রাজমহিষী গ্রামে যায়। সেখানে স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে বাধা আসতে থাকে। মহীপালের দীঘি ভরাট করে ওই জায়গা প্রজেক্টের জন্য ব্যাবহার করার কথা হয়। কিন্তু স্থানীয়দের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন তাতে পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। কারোর মত ওই জায়গা একটি ঐতিহাসিক জায়গা, খনন করলে এখনও বিভিন্ন ঐতিহাসিক জিনিস পাওয়া যাবে। আবার কেউ মনে করেন জায়গাটি খুবই পবিত্র জায়গা, ওখানে কিছু করলে দেবতা রুষ্ট হবেন। দময়ন্তী অনুসন্ধান করার পর বোঝা যায় বিভিন্ন মানুষ আসলে তাদের ব্যাক্তিগত স্বার্থের জন্য বাধা দিচ্ছে। আর সেই ব্যাক্তিগত স্বার্থের মধ্যে একটি হত্যার রহস্যও লুকিয়ে আছে। ফাঁসির আসামী গগন মণ্ডল দশ বছর আগে জেল থেকে পালিয়ে এসেছিল। তখন তার মা দীনেশ বিশ্বাসের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। সে সময়ে দীনেশ বিশ্বাসের বাড়িতে অনেক সন্ন্যাসীর আনাগোনা, দীনেশ তাকে আশ্রয় দেয়। তার মনে তখন নিজের প্রথম স্ত্রী

মায়ারানীকে সরিয়ে টগরকে বিয়ে করে আনার ষড়যন্ত্র চলছে। গগন মণ্ডলের সাহায্যে মায়ারানীকে হত্যা করে তার শব মহীপালের দিঘিতে ফেলে দেয়। এবং রটিয়ে দেয় মায়ারানী যোগিনী হয়ে ঘরছাড়া হয়েছে। মহীপালের দিঘিতে চাপা পড়ে যাওয়া এই পুরনো পাপকর্ম যাতে মানুষের সামনে না আসে তার জন্য দীনেশ বিশ্বাসের কথায় গগন মণ্ডল নিত্যগোপালের ওপর বিরোধিতা করার জন্য চাপ দিতে থাকে। ড্রাগ আসক্ত নিত্যগোপাল অপরাধ কর্মের কথা না জেনেই দিঘির সেচের ব্যাপারে বাধা দেন। মহীপালের দীঘি পাম্প করে শুকনো করা হলে এক নারীর কঙ্কাল পাওয়া যায়। যদিও সেই অবস্থায় সেটি কার দেহ শনাক্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু দময়ন্তী সব কাহিনি সাজিয়ে বলার পর দীনেশ নিজের অপরাধ স্বীকার করে।

'পর্বতো বহ্নমান' কাহিনিতে সমস্যা খানিকটা অন্য রকমের। এখানে দময়ন্তীর সামনে হত্যাকারি পরিচয় নিয়ে হাজির হয় তিনজন, তারমধ্যে থেকে তাকে আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হয়। দময়ন্তী ও সমরেশ সমরেশের বন্ধু ইন্সপেক্টর শিবেন সেনের কাছে বেড়াতে যান। বিজ্ঞানী ব্রতীশেখর রায় এবং তাঁর বন্ধুর পুত্র বীরচক্র পাওয়া মিলেটারি অফিসার উজ্জ্বল মজুমদারের সঙ্গে এখানে তাঁদের আলাপ হয়। কিছুদিনের মধ্যে ব্রতীশেখরের স্ত্রী মুনিয়া খুন হয়। দময়ন্তী অনুসন্ধান করে জানতে পারে, ব্রতীশেখর রায়ের প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার বেশ অনেক বছর পর, মেয়ে শর্মিষ্ঠা যখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে, তখন তিনি মুম্বাইয়ের অধিবাসী মুনিয়াকে বিয়ে করেন। মুনিয়া মূলত টাকার জন্য নিজের চেয়ে অনেক বেশি বয়েসের মানুষটিকে বিয়ে করে, পাশাপাশি অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত থাকে। ডক্টর রায়ের উইল অনুযায়ী তিনি মারা যাওয়ার পর সম্পত্তির সিংহ ভাগ পাবেন তাঁর মেয়ে শর্মিষ্ঠা। আর মুনিয়ার জন্য থাকবে বাড়ির অংশ ও প্রতি মাসে হাজার টাকা হাত খরচ। তাই শর্মিষ্ঠাকে কুক্ষিগত করে রাখতে তার সঙ্গে সমকামিতার সম্পর্ক তৈরি করে মুনিয়া। এর ফলে ছেলেবেলার প্রেম উজ্জ্বল তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে সরাসরি সম্মতি জানাতে পারেনা, আবার পুরপুরি অসম্মতও হতে পারেনা। মুনিয়া শর্মিষ্ঠার দোলাচলটা বুঝতে পেরে উজ্জ্বলকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে, কিন্তু উজ্জ্বল সে যাত্রায় বেঁচে যায়। এরপর শর্মিষ্ঠা তার বাবার গবেষণাগার থেকে প্রুসিক অ্যাসিড এনে মুনিয়ার ইনহেলারে মিশিয়ে দেয়। প্রবল ঠাণ্ডায় শ্বাসকষ্ট বাড়ায় মুনিয়া সেটি ব্যাবহার করে এবং মারা যায়। মুনিয়ার মৃত্যুর পর উজ্জ্বল শর্মিষ্ঠাকে বাঁচানোর জন্য মুনিয়ার মৃতদেহের হাত থেকে সেই ইনহেলার উদ্ধার করে। মৃত্যুর পর রিগার মর্টিসের কারণে আঙুল শক্ত হয়ে যায়। তাই তার আঙুল ভেঙ্গে সেটি বের করতে হয়। গল্পটি এমন ভাবে সাজানো, যে

মুনিয়ার হত্যার মোটিফ খুঁজতে গেলে ডক্টর রায় , উজ্জ্বল, শর্মিষ্ঠা তিন জনেরই খুন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এবং তিনজনের সবাই পুলিশের কাছে বয়ান দেন যে তিনি নিজে খুন করেছেন। অন্যান্য কাহিনিতে সবাই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চান, আর গোয়েন্দার কাজ হয় আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করা। এখানে সবাই নিজেকে হত্যাকারী হিসেবে দাবি করেন। তার মধ্যে কে খুন করেনি, তার দাবি কিভাবে খারিজ করা সম্ভব সেই নিয়ে দময়ন্তীকে মাথা ঘামাতে হয়।

'সূর্যগ্রহণ' কাহিনিতে সমরেশের বন্ধু রঞ্জিত রায়চৌধুরী কুন্তিপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে জার্মান ফার্মের হয়ে সুইচ গিয়ার বসানোর কাজে নিযুক্ত হয়েছে। সমরেশ ও দময়ন্তী পুজোর ছুটিতে সেখানে বেড়াতে যায়। সেখানের একটি ছোট-খাটো মিউজিয়ামে গুপ্ত যুগের একটি সূর্যমূর্তি রাখা আছে। এই সূর্য মূর্তি চুরির উদ্দেশ্যে কুখ্যাত মূর্তিচোর সাধন গুহ সেখানে আসে। এরপর মূর্তিচুরির জন্য সিভিল কন্ট্রাক্টর ইন্দার সিংয়ের মেয়ের প্রমীলার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় শুরু করে। ইন্দার সিং রাজীব ও প্রমীলার মূর্তি চুরির পরিকল্পনা শুনে প্রমীলাকে বকাবকি করেন। এরপর রাজীব ইন্দার সিংকে হত্যা করে পরিস্থিতি এমন ভাবে সাজায়, যাতে মনে হয় এটি একটি সড়ক দুর্ঘটনা। প্রমীলা মূর্তিচুরি করে রাজীবের হাতে দেওয়ার পর রাজীব তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। সে জানায়, মূর্তি বিক্রির টাকায় ঘর সাজিয়ে তারপর প্রমীলাকে নিয়ে যাবে। প্রমীলার মনে সন্দেহ জাগে, সে চাপ দিতে থাকে। ফল স্বরূপ রাজীব তাকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়। এই কাহিনিতে যে কেন্দ্রীয় অপরাধ মূর্তিচুরির ঘটনাকে লেখক যেভাবে সাজিয়েছেন, তা একটি কোলিয়ারি জায়গা ছাড়া দেখানো সম্ভব হত না। দময়ন্তী বুঝতে পারে মূর্তিচুরির পর সেটি হুইল ব্যারোর ওপর চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কোল বাঙ্কারে। সেখানে রোপওয়ের বাকেটগুলো ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে, বাঙ্কারের ওপর কয়লা ফেলে দিয়ে উল্টে গিয়ে আবার সোজা হয়ে এগিয়ে যায়। সেই সময়ে মূর্তিটা বাকেটের মধ্যে দিয়ে তার গায়ে একটি চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়। বাকেটটা কুন্তিপুর কোল মাইনসের লোডিং পয়েন্টে পৌঁছলে রাজীবের ঠিক করা চ্যালারা সেটি নামিয়ে নেয়।

'চরৈবেতি'তে দময়ন্তী সমরেশের সঙ্গে ছোটবেলার বন্ধু রত্নাবলীর কাছে বেড়াতে যায়। রত্নাবলীর বর কর্নেল নিরঞ্জন ঘোষ অন্ধ্রপ্রদেশে একটি মিলেটারি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সংস্থার দায়িত্বে রয়েছেন। যেহেতু, অন্ধ্রপ্রদশে অনেক জায়গাই নৌসেনার অন্তর্গত, তাই সেনাবাহিনীর তথ্য পাচার কেন্দ্রিক এই কাহিনির প্রেক্ষাপট হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশ খুব মানানসই নির্বাচন। কর্নেল ঘোষ জানতে পারেন সম্প্রতি গবেষণার কিছু

নথিপত্র দেশের বাইরে চালান হয়ে গেছে। এ-জিরো সাইজের কাগজ কি করে বাইরে চালান হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে দময়ন্তী বুঝতে পারে চিফ ডিজাইন ইঞ্জিনিয়র কৃষ্ণ আইয়ার কলার থোড়ের মাঝের অংশ পরিষ্কার করে তার মধ্যে কাগজ ভরে মোম দিয়ে আটকে সেটিকে ড্রেনে ফেলে দিতেন। বয়েস খুব বেশি না হলেও তিনি লাঠি নিয়ে চলেন, এবং কোথাও যদি তাঁর ফেলে দেওয়া মোচার থোড় আটকে যায়, তাহলে সেই লাঠি দিয়ে সহজেই তিনি তা এগিয়ে দিতে পারেন। এতে কারোর কোনও সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। এরপর সেটা যখন নদীতে গিয়ে পড়ে, তখন মানি নামের জেলে সেই সেই কাগজ উদ্ধার করে নির্দেশিত জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। ড্রয়িং অফিস কিপার দর্শন দাসের স্ত্রী সাহানা জানিয়েছিলেন, কৃষ্ণ আইয়ার মাছ খেতে ভালবাসেন। তিনি মাঝে মধ্যেই মানি নামের জেলেকে ডেকে পাঠান। তার কাছ থেকে মাছ কিনে সাহানাকে রান্না করতে বলেন, নিজে দু টুকরো মাছ নেন। বাকি মাছ সবাইকে বিলিয়ে দিতে বলেন। সাহানার ধারণা আসলে তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে আইয়ার এমনটা করে থাকেন। অন্যদিকে আইয়ারের সঙ্গে কথা বলার সময় দময়ন্তী জানতে পারে যে তিনি রোজ বাড়ি ফিরে পুজো করে বীণা নিয়ে বসেন। একজন ধর্ম নিষ্ঠ দক্ষিণ ভারতীয় মাছ খান, এই বিষয়ে দময়ন্তীর খটকা লাগে। পাশাপাশি মিসেস ডিসুজা জানান তাঁদের বাড়ির সামনেই কলাগাছ লাগানো, কিন্তু বাকি সবাই তাঁদের কাছ থেকে কলাগাছ নিয়ে গিয়ে বাড়ির পিছনে লাগিয়েছেন। এরপরেই দময়ন্তী কৃষ্ণ আইয়ারকে সন্দেহ করে।

ফুলডিহিতে বেড়াতে যাওয়ার পর দময়ন্তী তার বন্ধু জয়ন্তর কাছে তেজপাল আগরওয়ালের হত্যার কথা জানায়। হত্যাটি হয় সন্ধ্যেবেলা লোডশেডিংয়ের সময়। ওই জায়গায় রোজ রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত লোডশেডিং চলে। প্রায় ছ-মাস আগে অবসর প্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (ব্যালেস্টিক এক্সপার্ট) রমানাথ সরফের বাড়ির সামনে মাঝ রাতে তাঁর অসমবয়সী বন্ধু তেজপাল আগরওয়াল খুন হন। সামনে থেকে ফুট দশেক দূরে নিচু হয়ে বসে নিচ থেকে ওপরের দিকে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে। দময়ন্তীকে নিয়ে জয়ন্ত যখন রমানাথের বাড়িতে যায় তখন রমানাথ এবং তাঁর নাতনি দময়ন্তীকে জিজ্ঞেস করে এই হত্যার সমাধান করে দময়ন্তীর কী লাভ। কিন্তু দময়ন্তীকে নিরুৎসাহিত করলেও শেষ পর্যন্ত দময়ন্তী বুঝতে পারে আসলে তেজপালের হত্যার পিছনে তার নোংরা মানসিকতাই দায়ি। তেজপাল নিজের নাতনির বন্ধু নম্রতার দিকে হাত বাড়ালে দেওরাজ আর গিরিজা মিলে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। দেওরাজ তেজপালকে জানায় লোডসেডিংয়ের মধ্যে নম্রতা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে। তেজপাল উৎফুল্ল হয়ে রামনাথের বাড়ির দিকে যান।

পরিকল্পনা মাফিক দেওরাজ তাদের বাড়ির সামনে লুকিয়ে ছিলেন। তেজপাল গেট খুলতেই নম্রতা তাকে গুলি করে। তেজপাল পড়ে গেলে দেওরাজ সঙ্কেত হিসেবে তার টর্চ ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। নম্রতা কাজ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে বন্দুকটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে যায়। নম্রতা যেহেতু অন্ধ তাই লোডশেডিংয়ের জন্য আলাদা করে তার কোনও অসুবিধে হয়না।

'নীলকান্তপুরের হত্যাকাণ্ড'র শুরু হয় ডাক্তার বীথিকা মিত্রের মৃত্যু রহস্য দিয়ে। ডাক্তার অরিজিৎ বোসের স্ত্রী বীথিকার হত্যার দায় তাঁর ওপরেই পড়ে। বীথিকার লিপস্টিকে পটাসিয়াম সায়ানাইড লাগানো ছিল। তদন্তে নেমে প্রথমেই দময়ন্তী যে তথ্যগুলো পায়, তা হল --- অরিজিৎ অন্নদা মিত্রের মেয়ে বীথিকাকে বিয়ে করেছিল টাকার জন্য। তিনি নীলকান্তপুরে কয়েক বিঘা জমি কিনে মেন্টাল হসপিটাল ও গবেষণা কেন্দ্র খোলেন। অরিজিৎ ও বীথিকার জয়েন্ট একাউন্ট চেক করে দেখা যায় কিছুদিন আগে তাদের হাসপাতালের দুই রোগী তাদের সম্পত্তি এই দুই ডাক্তারের নামে করে দিয়েছিল। তাঁরা বলেছেন বাড়ির লোকেরা অসদুদ্দেশ্যে তাদেরকে পাগল বানিয়েছিল, এঁদের সেবায় তাঁরা ভালো হয়ে উঠেছেন, এঁরাই আসল আপনজন। দুজনেরই মৃত্যুর কারণ এক বিশেষ ধরণের জন্ডিস। ছাড়া পাওয়ার ছ-মাসের মধ্যে মারা যান। এঁরা মৃত্যুর আগে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেতে শুরু করেছিল। ওষুধ খাওয়ার পর শিশি ভেঙে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতেন। এঁরা ১৪ নম্বর রহিম ওসমান লেনে সাহেব হোমিওপ্যাথি ডাক্তার রজার ওয়ালটনের কাছে যেতেন। অনুসন্ধান করে দময়ন্তী জানতে পারে, আসলে বীথিকার প্রেমিক সোমনাথ রায় হোমিওপ্যাথী ওষুধের নামে রোগীদের শরীরে এক ধরণের জন্ডিসের জীবাণু ঢুকিয়ে দিত। তার ফলেই রোগীদের মৃত্যু হয়। আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগে বীথিকা তাদেরকে ভালো করে মগজ ধোলাই করে বুঝিয়ে দেয়, বাড়ির লোকেরা আসলে তাদের সঙ্গে অন্যায় করেছে, হাসপাতালের ডাক্তাররাই তাদের আসল শুভানুধ্যায়ী। এর ফলে তাঁরা সম্পত্তির অনেকটা হাসপাতালকে দান করেন। সেই টাকা বীথিকা অরিজিতের অজান্তে সোমনাথের হাতে তুলে দেয়। অরিজিৎ বুঝতে পারার পর তার ভগ্নিপতি বিকাশকে নিয়ে আসলেন, বিকাশ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বীথিকা তাকে তাড়িয়ে দিয়ে সোমনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে। সোমনাথ ভয় পেল, তদন্ত হলে তার ঘাড়ে তিনটে মৃত্যুর দায় পড়তে পারে। তাই সে বীথিকাকে তার অপরাধের সাক্ষী বীথিকাকে সে খুন করে।

দময়ন্তী গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বিপদের মুখোমুখি হয়েছে মাত্র একবার। 'সূর্য গ্রহণ' কাহিনিতে প্রমীলা তাকে হত্যা করার জন্য গুলি চালায়, যদিও তা তার গায়ে লাগে

না। এছাড়া অপরাধীদের হাতে বন্দী হওয়া, কিংবা অপরাধীর রিভলভারের সামনে দাঁড়ানোর মতো পরিস্থিতি তার জীবনে আসেনি। এমনকি হুমকি চিঠি বা ফোনের সম্মুখিনও তাকে হতে হয়নি। আবার অন্যদিকে সমরেশ ও দময়ন্তী দুজনের পুলিশ বন্ধু শিবেন ও জয়ন্ত থাকার ফলে অনেকের অনিচ্ছা থাকালেও দময়ন্তীর অনুসন্ধানের পথে বিশেষ বাধা আসেনি। কিন্তু এতো মসৃণ পথ ধরে গোয়েন্দাগিরি করলেও দময়ন্তীর কাহিনি পাঠককে কাহিনির প্রতি আকৃষ্ট করে রহস্য জালের অভিনবত্বের জন্য। সব শেষে যে রহস্যের অন্তরালে থাকা কাহিনিটুকু যখন দময়ন্তী বিশ্লেষণ করে তখন সেই ঘটনা পাঠককে চমকে উঠতে বাধ্য করে। কে অপরাধী এই অনুসন্ধানের পাশাপাশি পাঠক দময়ন্তীর কাহিনি পাঠের সময় ভাবতে থাকেন কিভাবে এই অপরাধ সংঘটিত হল। আর তার পিছনে অপরাধীর মনে জমে থাকা অন্ধকারের হদিশ পাওয়ার জন্যও পাঠক দময়ন্তীর বিশ্লেষণের জন্য ধৈর্য ধরে বসে থাকে।

কাহিনি	অপরাধী	অপরাধ	হত্যা প্রণালী
সরল অঙ্কের ব্যাপার	মতিলালা জাজোড়িয়ার এক নম্বর ভাইপো গল্পে তার নাম পাওয়া যায় না। সে অর্থনীতি নিয়ে স্নাতক পর্যায়ে পড়াশুনো করে। কিন্তু তার বইয়ের মলাটের নিচে অনেক পর্নগ্রাফির বই পাওয়া যায়।	সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য কাকাকে খুনের ষড়যন্ত্র করে। পাশাপাশি সেই খুনের দায়ে দ্বিতীয় ভাইপো রামেশ্বরকে ফাঁসানোর জন্য সম্পূর্ণ পরিস্থিতি সেভাবে সাজায়।	
	বাড়ির চাকর রাজু। তার ঘর থেকে পর্নগ্রাফির বইয়ের পাশাপাশি কয়েক	এক নম্বর ভাইপোর ষড়যন্ত্র অনুযায়ী বাড়ির	এক নম্বর ভাইপোর কথা মতো রান্না ঘরের

	বাক্স কনট্রাসেপটিভ পিল পাওয়া যায়। তবে এইসব ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে লেখক ঠিক কী বোঝাতে চান তা পরিষ্কার বোঝা যায়না।	মালিক মতিলালকে হত্যা করে।	চিনিতে বিষ মিশিয়ে দেয়। ওই চিনি সরবতে মিশিয়ে খাওয়ার ফলে মতিলালের মৃত্যু হয়।
নকল হিরে	রামানুজ লাহিড়ী বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনিয়র। যেমন সুদর্শন তেমন পাণ্ডিত্য , তবে খুব দাম্ভিক। বার্নপুর ইস্পাত কারখানায় কাজ করত। হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় দুটো পা কাটা যায়। তারপর থেকে খুব অন্য রকম হয়ে যায়। সবসময় গম্ভীর ও অন্যমনস্ক থাকে।	নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং খঞ্জত্ব থেকে তৈরি হওয়া ঈর্ষার কারণে শ্যালিকা দীপান্বিতার জীবন নষ্ট করে দেয়। দীপান্বিতাকে বোঝায় যে মাসির সঙ্গে তার বর প্রতাপের অবৈধ সম্পর্ক আছে। অন্যদিকে বেনামে দীপান্বিতাকে প্রেমপত্র, উপহার ইত্যাদি পাঠিয়ে প্রতাপের মনও বিষিয়ে তোলে।	

		দীপান্বিতার মগজ ধোলাই করে তাকে বোঝায় প্রতাপ তাকে ও তার বাবাকে হত্যা করবে।	
	বৃন্দা প্রতাপ ও দীপান্বিতার বাড়িতে কাজ করত। উদ্বাস্তু। খুব চালাক চতুর, বয়স বত্রিশের কাছাকাছি।	টাকার বিনিময়ে রামানুজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করত।	
	দীপান্বিতা বড়লোক বাবার আদুরে মেয়ে। খুব উশৃঙ্খল জীবন যাপন করত।	দিদির বর রামানুজের ষড়যন্ত্রের ফলে সে এই ভেবে ভয় পায় যে, প্রতাপ তাকে ও তার বাবাকে হত্যা করবে। তাই সে প্রতাপকে হত্যা করে।	স্বামী প্রতাপ রায় চৌধুরীকে গুলি করে হত্যা করে।

রাজমহিষীর রহস্য	দীনেশ বিশ্বাস বয়স ৪৫-এর কাছাকাছি। পুজোপাঠ, তন্ত্র সাধনা নিয়ে মেতে থাকা মানুষ। বাড়িতে মন্দির আছে। সন্ন্যাসীরা সেখানে এসে আস্তানা গেড়ে বসে।	স্ত্রীকে হত্যা করার পর রটিয়ে দেন স্ত্রী আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য তাঁকে ত্যাগ করেছে। এরপর পাড়ার সুন্দরী টগরকে বিয়ে করেন। তাকে বিয়ে করার জন্যই এই চক্রান্ত।	স্ত্রী মায়ারানিকে গগন মণ্ডলের সাহায্য নিয়ে খুন করে মহীপালের দীঘিতে ফেলে দেন।
	গগন মণ্ডল ডাকাত দলের সর্দার। ডাকাতি ও খুনের দায়ে যাবজ্জীবন জেল হয়। কিন্তু জেল থেকে পালায়।	সাধুর ভেক ধরে দীনেশ মণ্ডলের বাড়িতে আস্তানা গাড়ে। সেখান থেকেই সে ড্রাগের কারবার চালাতে থাকে। দীনেশ মণ্ডলের বাড়িতে তন্ত্রসাধনার জায়গায় পাতা বাঘছালের নিচে লুকিয়ে রাখত ড্রাগ।	

	নিত্যগোপাল পণ্ডিত ব্যাক্তি কিন্তু নেশা-ভাঙ করেন। সম্প্রতি ড্রাগের নেশা ধরেছেন।	ধনঞ্জয় মাঝিকে ব্ল্যাকমেল করে তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করেন।	
পর্বতো বহ্নিমান	শর্মিষ্ঠা বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবতী। সহজ সরল খানিকটা ছেলেমানুষ টাইপের। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পড়াশুনো শেষ করার পর স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা করে। বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মেয়ে। কম বয়সে মাকে হারায়। সুন্দরী ও কম বয়সী বিমাতার সঙ্গে সমকামী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।	সৎমা মুনিয়াকে খুন করে।	মুনিয়ার হাঁপানি ছিল। শর্মিষ্ঠা শ্বাসকষ্টের জন্য ব্যাবহার করা স্প্রের মধ্যে প্রুসিক অ্যাসিড মিশিয়ে দেয়।
সূর্যগ্রহণ	রাজীব / সাধন গুহ কুখ্যাত মূর্তি পাচারকারী। বিখ্যাত ইতিহাসের	১। প্রমীলার বাবা ইন্দার সিং রাজীবের	১। ড্র হিচ ফাঁসের সাহায্যে ইন্দার সিংকে হত্যা করে

	গবেষক ডক্টর ঝায়ের সহকারী সেজে গুপ্ত যুগের প্রাপ্ত মূর্তি কাছেই একটি রত্ন-খচিত রথের সন্ধান শুরু করে দেয়। পাশাপাশি স্থানীয় মেয়ে অ্যাথলিট প্রমীলার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে থাকে। তাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে তাকে দিয়ে মূর্তি চুরি করানোর পরিকল্পনা করে। তার জন্য তাকে ড্র হিচ ফাঁস শেখায়।	পরিকল্পনার কথা শুনে প্রমলাকে বকাবকি করেন। তারপর রাজীব তাঁকে হত্যা করে। এবং পরিস্থিতি এমন ভাবে সাজায় যা দেখে মনে হয় মদ্যপ ড্রাইভারের গাড়ির সামনে এসে পড়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ২। প্রমীলা সূর্য মূর্তি চুরি করে রাজীবের হাতে তুলে দেওয়ার পর রাজীব তাকে জানায় মূর্তি বিক্রি করে ঘর সাজিয়ে প্রমীলাকে নিয়ে যাবে। সেই সময়ে প্রমীলার মনে সন্দেহ জাগে। সে রাজীবকে চাপ দিতে থাকে, ফল স্বরূপ রাজীব তাকেও হত্যা করে।	তাঁর মৃত দেহ রোলারের সামনে ফেলে দেয় । ২। প্রমীলাকে হত্যা করে পুকুরে ফেলে দেয়।

	প্রমীলা সাধাসিধে মাঝারি দর্শনের অ্যাথলিট মেয়ে।	১। সূর্যমূর্তি চুরি করে রাজীবের হাতে তুলে দেয়। ২। দময়ন্তীকে গুলি করে হত্যা করার চেষ্টা করে।	
চরৈবেতি	কৃষ্ণ আইয়ার অন্ধ্রপ্রদেশে একটি মিলেটারি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সংস্থায় সেনাবাহিনীর পরিচালনাধীনে যুদ্ধসংক্রান্ত কোনো কোনো ব্যাপারে গবেষণার চিফ ডিজাইন ইঞ্জিনিয়র। বয়স ৪৫ বছর। অবিবাহিত। কম বয়সে একটি বাঙালী মেয়ের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তিনি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। বিজ্ঞানের পাশাপাশি ভারতীয় রাগ	যুদ্ধসংক্রান্ত গবেষণার গোপন কাগজপত্র দেশের বাইরে পাচার করার প্রাথমিক স্তরের কাজ করেন তিনি। কলার থোড়ের মধ্যে এ-জিরো সাইজের প্রিন্ট ভরে মোমের সাহায্যে তার দুদিক আটকে ড্রেনে ফেলে দেন। পরে মানি নামের জেলে সেটি উদ্ধার করে সেটাকে কথাও পোঁছে দেয়।	

	সঙ্গীতের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা রয়েছে।		
প্রথম পাপ	ডাক্তার কেশবন দক্ষিণ ভারতীয় নিরামিষাশী মানুষ। তিনি অনেকদিন ধরে ডক্টর বি কে হালদারের বাড়ির মানুষদের চিকিৎসা করেন।	মালবিকার ইউটেরাসে সমস্যা হওয়ার সময় তার চিকিৎসা করতে গিয়ে বুঝতে পারেন কোনও সময়ে সে সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। তার বর বি কে হালদারের টেস্ট করে যখন বুঝতে পারেন তিনি সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম, তখন মালবিকা হালদারকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেন।	
	মালবিকা তালতলার বিখ্যাত মিত্র বংশের সন্তান। দিদির	দিদিকে বিষ দিয়ে পাগল বানানোর চেষ্টা	কোনও গাছের বীজ থেকে বানানো বিষ, যা

	বরের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কারণে সে কম বয়সে সন্তানের জন্ম দিয়েছিল।	করছে জানতে পারার পর দিদির বরকে সে হত্যা করে।	অল্প মাত্রায় খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। তা বেশি মাত্রায় প্রয়োগ করে হত্যা করে।
অন্ধ তামস	নম্রতা রমানাথের বিধবা মেয়ে মণীষার সন্তান। সে অন্ধ। সারাদিন মা আর দাদুর সেবা করে।	দাদামশাইয়ের আসমবয়সী বন্ধু দেওরাজ তেজপালকে হত্যা করে।	রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে।
	দেওরাজ তেজপাল অত্যন্ত দুশ্চরিত্র লোক। নিজের নাতনির বন্ধু নম্রতার দিকে লালসার হাত বাড়ায়। এক সময়ে রমানাথের পুত্রবধূ লতার সঙ্গেও শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেছিল।	তথাকথিত ভাবে কোনও ক্রাইম না করলেও অপরাধ মনস্তত্ত্ব সম্বলিত মানুষ। এক সময়ে দ্বারকানাথের আর্থিক দুরবস্থায় পাশে দাঁড়ানোর নামে লতার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছিল।	

ইজ্জত	বিনয়ভূষণ রায়চৌধুরী এক্স মিলেটারি। ভালো সেতার বাদক। সেতার সেখানোর সুবাদে রেবেকা ও বকুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্ত্রী অমৃতপ্রভা বরাবর তাঁর সঙ্গে ভৃত্যের মতো আচরণ করেছেন।	রেবেকা ও বকুল সাঁতরা সিনেমায় কাজ পাওয়ার জন্য প্রযোজক স্মাগলার হীরালালের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে যায়। বিনয়ভূষণ দুজনকেই হত্যার পরিকল্পনা করেন।	বকুলকে ছুরির আঘাতে হত্যা করেন।
	নাগেশ্বর বিনয়ভূষণের সাগরেদ। চুরির অপরাধে সেনাবাহিনী থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। বিনয়ভূষণ হীরালালকে বলে তাকে বাড়ি তদারকের চাকরি করে দেন।	রেবেকাকে হত্যা করে। হত্যার দায় অরবিন্দ আচার্যর ঘাড়ে চাপানোর জন্য খুনের আগেই বারবার তাঁর ঘরে ঢুকে রিভলভার, গ্লাভস ইত্যাদি সন্দেহজনক জিনিস রেখে আসত।	রিভলভার থেকে গুলি করে রেবেকাকে হত্যা করে।

নীলকান্তপুরের হত্যা কাণ্ড	সোমনাথ রায় ওষুধের ব্যাবসা করে। ছদ্মবশ ধরে হোমিওপ্যাথী ডাক্তার রজার ওয়ালটন সাজে। বীথিকার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।	১। শ্যমল রায় কামতাপ্রসাদ সেজে নীলকান্তপুরের রোগীদেরকে তার কাছে পাঠানোর পর তাদের মৃত্যুর ব্যাবস্থা করত। ২। ডাক্তার বীথিকা বোসকে হত্যা করে।	১। হোমিওপ্যাথী ডাক্তার সেজে তিনজন রোগী --- ভোলানাথ চক্রবর্তী, নির্ঝরিণী দেবী, শম্ভূচরণ ধাড়াকে ওষুধের নামে হেপাটাইটিসের জীবাণু দেয়। ২। বীথিকার লিপস্টিকে পটাসিয়াম সায়ানাইড লাগিয়ে রাখে।
	ডাক্তার বীথিকা মিত্র বড়লোক বাড়ির স্বেচ্ছাচারি মেয়ে। বর অরিজিতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো নয়। অন্য কারোর সঙ্গেও বিশেষ ভালো সম্পর্ক নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।	১। প্রজ্ঞা মনোবিশ্লেষণ কেন্দ্রের টাকা তছরুপ করে। সেই টাকা প্রেমিক সোমনা থকে দেয়। ২। রোগীদের মগজ ধোলাই করে তাদের সম্পত্তি হাসপাতালের	

		নামে লিখিয়ে নেয়।	
ভগ্ন অংশ ভাগ	পবিত্র চক্রবর্তী মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার। খুব মেধাবী ছাত্র। 'হোয়াইট স্টার'-এ প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে। পিশেমশাইয়ের কাছে মানুষ। তপতী দেবীর মাসতুতো বোনের ছেলে।	অতীন্দ্রর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া শেয়ারগুলো নিয়ে শর্ট সেলিং করতে থাকে। চারটে কোম্পানিতে নাশকতার পরিকল্পানা করে তা বাস্তবায়িত করে।	

দুই খণ্ডে সঙ্কলিত ১১ টি কাহনির দিকে তাকালে দেখা যাবে, 'চরৈবেতি' ও 'ভগ্ন অংশ ভাগ' এই দুটি কাহিনি বাদে সবগুলিতেই হত্যা প্রসঙ্গ রয়েছে। 'প্রথম পাপ' কাহিনিতে মূল অপরাধ হত্যা নয়, ব্ল্যাকমেলিং। কিন্তু সেই ব্ল্যাকমেলিংয়ের জট ছাড়াতে গিয়ে দময়ন্তী পৌঁছে যায় অতীতের একটি হত্যা কাহিনিতে। কাহিনিগুলিতে গুলি করে কিংবা ছুরি দিয়ে হত্যা করার প্রসঙ্গ যেমন রয়েছে পাশাপাশি বিষের প্রসঙ্গও বারবার এসেছে। শরবতের মধ্যে বিষ মেশানো, ইনহেলারের মধ্যে বিষ মেশানো, সরাসরি বিষ খাইয়ে হত্যা, ওষুধের নামে শরীরে জীবাণুর প্রবেশ ঘটিয়ে হত্যা করার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এছাড়া 'ড্র হিচ' ফাঁসের মাধ্যমে হত্যা করার দৃশ্যও দেখা যায়।

অপরাধীদের দিকে তাকালে দেখা যায়, লেখক বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের মানুষের মধ্যে জমে থাকা অপরাধ প্রবণতার কথা তুলে ধরেছেন। 'সরল অঙ্কের ব্যাপার'-এ চাকর রাজুকে যেমন শরবতের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে দেখা যায়, তেমনই ওষুধের ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত সোমনাথ রায়, এক্স মিলেটারি বিনয়ভূষণের মতো মানুষকেও হত্যাকারী

হিসেবে পাওয়া যায়। উচ্চ আর্থ-সামাজিক অবস্থানে থাকা মানুষ ছাড়া অপরাধী খোঁজার জন্য গোয়েন্দাকে কেউ আমন্ত্রণ জানায় না, কাজেই গোয়েন্দা কাহিনি এলিট সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলে তাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না। কিন্তু তারপরও লেখক মনোজ সেন অপরাধ চিত্র তুলে ধরার সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরের ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। 'ভগ্ন অংশ ভাগ' কাহিনিতে যেমন সুশিক্ষিত উচ্চবিত্ত নাগরিক জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে 'রাজ মহিষীর রহস্য'তে গ্রামের স্কুল মাস্টার, ব্যাবসাদার, ডাকাতদের জীবনের ছবিও ধরা পড়েছে।

❖ রচনা বৈশিষ্ট্য

'সরল অঙ্কের ব্যাপার' কাহিনি দিয়ে লেখক সাহিত্য জগতে পা রাখেন। এখানে ঘটনা স্থলে না পৌঁছেই দময়ন্তী রহস্যের কিনারা করে ফেলে। বলাবাহুল্য দময়ন্তী এখানে একেবারেই গোয়েন্দার ভূমিকায় নেই। তদন্তের দায়িত্বে থাকা অফিসার সমরেশের বন্ধু হাওয়ার দরুন দময়ন্তী তার সঙ্গে কথা বলে ঘরে বসে রহস্যের সমাধান করে ফেলে। প্রথম গল্পে সে ঘরে বসেই রহস্যের সমাধান করে ফেললেও পরের কাহিনিগুলিতে অপরাধের প্রেক্ষাপটে সে উপস্থিত থেকেছে। পেশাদার গোয়েন্দা না হয়েও বিভিন্ন অপরাধ মূলক রহস্যের সমাধান করেছে। দ্বিতীয় কাহিনি 'নকল হীরে' থেকে লেখক মনোজ সেনের লেখায় তাঁর নিজস্ব রচনা বৈশিষ্ট্যের ছাপ লক্ষ করা যায়।

দময়ন্তীর কাহিনিগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, এখানে ইঞ্জিনিয়র চরিত্রের ছড়াছড়ি। শুধুমাত্র দময়ন্তীর স্বামী সমরেশ বা তার বন্ধু নিরঞ্জন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধী ইঞ্জিনিয়র কিংবা অপরাধ কর্ম সংঘটনের সঙ্গে বা অপরাধ প্রকাশের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়রিং মেটেরিয়াল বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'নকল হিরে' কাহিনিতে দেখা যায়, সোনারপুরের বিখ্যাত ব্যাবসায়ী সুশীল মৈত্রের জামাই প্রতাপ চৌধুরী স্ত্রী দীপান্বিতার হাতে খুন হয়। দীপান্বিতা জানায়, সে প্রতাপকে গুলি করে মেরেছে। নাহলে সে তাকে এবং তার বাবাকে খুন করত। পুলিশকেও সে জানায় আত্মরক্ষার্থেই সে প্রতাপকে হত্যা করেছে। কিন্তু প্রতাপের পকেট থেকে কোনও অস্ত্র পাওয়া যায়নি, বরং একটি হীরের আংটি পাওয়া গেছে। আসলে দীপান্বিতা এবং প্রতাপের দাম্পত্য জীবনে সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে তাদের জীবনের এমন করুণ পরিণতি ঘটানোর পিছনে সুশীলবাবুর বড় জামাই রামানুজ লাহিড়ীর হাত রয়েছে। রামানুজ বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনিয়র। বার্নপুর ইস্পাত

কারখানায় কাজ করত। হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় দুটো পা কাটা যায়। নিজের জীবনের চরম দুর্দশার সঙ্গে প্রতাপের সুস্থ্য স্বাভাবিক জীবনের তুলনা করে সে পরশ্রীকাতর হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে প্রতাপের জীবন বিষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। অন্যদিকে সুশীলবাবুর দূরসম্পর্কের ভাগনে সাত্যকি সান্যাল গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়র। কোম্পানির ম্যানেজার পদে ছিল অনেকদিন। কিন্তু প্রতাপ সুশীলবাবুর কোম্পানিতে আসার পর সুশীলবাবু প্রতাপকে ম্যানেজার পদে বসান। পেশাগত ঈর্ষা থেকে সে নিজের অজান্তেই রামানুজের পরিকল্পনাতে সহায়তা করতে শুরু করে। যার ফল স্বরূপ দীপান্বিতা প্রতাপকে হত্যা করে। ‘চরৈবেতি’ গল্পে দেখা যায়, দময়ন্তী সমরেশের সঙ্গে ছোটবেলার বন্ধু রত্নাবলীর কাছে বেড়াতে যায়। রত্নাবলীর বর কর্নেল নিরঞ্জন ঘোষ অন্ধ্রপ্রদেশে একটি মিলেটারি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সংস্থার দায়িত্বে রয়েছেন। এই সংস্থা সেনাবাহিনীর পরিচালনাধীনে যুদ্ধসংক্রান্ত কিছু ব্যাপারে গবেষণা করে। কর্নেল ঘোষ জানতে পারেন সম্প্রতি গবেষণার কিছু নথিপত্র দেশের বাইরে চালান হয়ে গেছে। এ-জিরো সাইজের কাগজ কি করে বাইরে চালান হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করে দময়ন্তী। বুঝতে পারে চিফ ডিজাইন ইঞ্জিনিয়র কৃষ্ণ আইয়ার কলার থোড়ের মাঝের অংশ পরিষ্কার করে তার মধ্যে কাগজ ভরে মোম দিয়ে আটকে সেটিকে ড্রেনে ফেলে দেন। এরপর সেটা যখন নদীতে গিয়ে পড়ে, তখন মানি নামের জেলে সেই কাগজ উদ্ধার করে নির্দেশিত জায়গায় পাঠিয়ে দেয়।

অন্যদিকে ‘রাজমহিষীর রহস্য’ কাহিনিতে পুজো-পাঠ নিয়ে মেতে থাকা স্ত্রীর হত্যাকারী দীনেশ বিশ্বাস, কিংবা ‘সূর্যগ্রহণ’ কাহিনির মূর্তিচোর সাধন গুহ কেউই ইঞ্জিনিয়ার নয়। ‘সূর্যগ্রহণ’ কাহিনিতে সূর্যমূর্তি চুরি করার পর সেই মূর্তি হুইল ব্যারোর ওপর চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কোল বাঙ্কারে। সেখানে রোপওয়ের বাকেটগুলো ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে, বাঙ্কারের ওপর কয়লা ফেলে দিয়ে উল্টে গিয়ে আবার সোজা হয়ে এগিয়ে যায়। সেই সময়ে মূর্তিটা বাকেটের মধ্যে দিয়ে তার গায়ে একটি চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়। বাকেটটা কুন্তিপুর কোল মাইনসের লোডিং পয়েন্টে চলে যায়। এরপর রাজীবের ঠিক করা চ্যালারা সেটি নামিয়ে নেয়। আবার ‘রাজমহিষীর রহস্য’তে স্টেট ইলেকট্রিক বোর্ডের প্রজেক্টের জন্য সমরেশ সার্ভে করতে যায় এবং প্রজেক্টের কাজের জন্য ‘মহীপালের দীঘি’ পরিষ্কার করার কারণে দীনেশ বিশ্বাসের অপরাধ ধরা পড়ে। অর্থাৎ, আমরা দেখতে পাই এই কাহিনিগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসঙ্গ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

প্রথম গল্প বাদ দিলে একমাত্র ‘পর্বতো বহ্নিমান’ কাহিনিতে অপরাধের সঙ্গে সরাসরি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের যোগ নেই। এখানে দেখা যায় শর্মিষ্ঠা তার বাবার গবেষণাগার থেকে প্রুসিক অ্যাসিড এনে মুনিয়ার ইনহেলারে মিশিয়ে দেয়। প্রবল ঠাণ্ডায় শ্বাসকষ্ট বাড়ায় মুনিয়া সেটি ব্যাবহার করে এবং মারা যায়। এই অ্যাসিড মারাত্মক বিষ মুখের কাছে স্প্রে কারার খানিকক্ষণ বাদে তার কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ডক্টর ব্রতীশেখর রায়ের কৃষি সংক্রান্ত গবেষণাগার থেকে শর্মিষ্ঠা সেটি নিয়ে আসে। এখানে লক্ষণীয় ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত প্রসঙ্গ না থাকলেও বিজ্ঞান ভিত্তিক কোনও না কোনও প্রসঙ্গ অপরাধ বা রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর এই রচনা বৈশিষ্ট্য অন্যান্য লেখকের রচনা শৈলীর থেকে তাঁর লেখাগুলিকে আলাদা ভাবে চিনে নিতে সাহায্য করে।

❖ পুলিশের ভূমিকা

দময়ন্তী পেশায় অধ্যাপক, গোয়েন্দাগিরি করা তার একটা শখ। পুলিশ ইনস্পেক্টর শিবেনের হাত ধরেই তার গোয়েন্দাগিরিতে প্রবেশ। ‘সরল অঙ্কের ব্যাপার’-এ দেখা যায় সমরেশের বন্ধু শিবেন সেন সি আই ডি। সে সমরেশদের পাড়ায় একটা খুনের তদন্ত করতে এসেছে, তার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জোগাড় করে দময়ন্তী রহস্য সমাধান করে ফেলে। শিবেন ‘নকল হিরে’ কাহিনিতে ব্যাবসায়ী সুশীল মৈত্রকে দময়ন্তীর কাছে নিয়ে আসে। ‘রাজমহিষীর রহস্য’তে সমরেশ নিজের পেশার কাজে গেলেও সেখানে শিবেনের বন্ধু চন্দ্রশেখর সাঁতরার বাড়িতে সমরেশ ও দময়ন্তী ওঠে। এখানে অনুসন্ধানের কাজে অনেকেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু চন্দ্রশেখর সাঁতরার পরিবার ওই অঞ্চলের খুব মান্যগণ্য পরিবার বলে দময়ন্তীকে কোনও অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়না। ‘নীলকান্তপুরের হত্যাকাণ্ড’র খবরও শিবেনই দময়ন্তীর কাছে উপস্থাপন করে। ‘ভগ্ন অংশ ভাগ’-এ অশোকনাথ ঘোষাল প্রাইভেট ডিটেকটিভ দিয়ে তদন্ত করাতে চান, সেই কারণে তিনি শিবেনকে বলেন দময়ন্তীকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে। ‘প্রথম পাপ’ কাহিনিতে ব্ল্যাকমেলের শিকার হওয়া মালবিকা হালদার দময়ন্তীর কাছে ছুটে আসে। আসলে সেও দময়ন্তীকে শিবেনের দৌলতে চেনে, শিবেন তাদের পারিবারিক বন্ধু। ‘পর্বতো বহ্নিমান’ কাহিনিতে শিবেনের সঙ্গে তার স্ত্রী রমলার উপস্থিতিও দেখা যায়। ‘ইজ্জত’ কাহিনিতে অরবিন্দ আচার্য দময়ন্তীর কাছে তাঁর সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হন। দময়ন্তী ও সমরেশ ছদ্ম পরিচয়ে অনুসন্ধানে নামার সময় শিবেন ও তাঁর স্ত্রী রমলাকে সঙ্গে নেয়।

শুধু সমরেশের বন্ধু শিবেন সেনই নয়, দময়ন্তীর ইউনিভার্সিটির সহপাঠী জয়ন্ত চতুর্বেদীও আই পি এস অফিসার। 'সূর্যগ্রহণ' কাহিনিতে সমরেশের বন্ধু রঞ্জিত রায়চৌধুরীর কাছে মধুপুরে বেড়াতে গেলে সেখানে জয়ন্তর সঙ্গে আবার দময়ন্তীর দেখা হয়। সহপাঠী হলেও দময়ন্তী গোয়েন্দাগিরি করছে জানতে পেরে জয়ন্ত উপহাস করে বলে, এসব লাইন মেয়েদের জন্য নয়। তবে প্রথমে উপহাস করলেও জয়ন্ত পরবর্তী সময়ে দময়ন্তীকে সাহায্য করে। দময়ন্তীর ওপর তার আস্থাও আসে। তাই 'অন্ধ তামস' কাহিনিতে দেখা যায় দময়ন্তীরা ফুলডিহিতে গেলে জয়ন্ত ছ-মাস আগে ঘটে যাওয়া একটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে আলোচনায় বসে।

একমাত্র 'চরৈবেতি'তে শিবেন বা জয়ন্ত নেই। দময়ন্তী সমরেশের সঙ্গে ছোটবেলার বন্ধু রত্নাবলীর কাছে বেড়াতে যায়। রত্নাবলীর বর কর্নেল নিরঞ্জন ঘোষ অন্ধ্রপ্রদেশে একটি মিলেটারি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সংস্থার দায়িত্বে রয়েছেন। এখানেও দময়ন্তীর অপরাধী চিহ্নিতকরণের সময় নিরঞ্জনের সহায়তা পায়।

এক কথায় বলতে গেলে ইনস্পেক্টর শিবেন সেন দময়ন্তীর গোয়েন্দা জীবনে একটা স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে যখন নেই তখন দময়ন্তীর আরেক বন্ধু জয়ন্ত চতুর্বেদী উপস্থিত হয়েছে। আর তাই গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে দময়ন্তীকে বিশেষ সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি। গুলি চালানো কিংবা ক্যারাটে জানার দরকার পড়েনি। শুধুমাত্র মাথা খাটিয়ে যুক্তি দিয়ে ঘটনা পরম্পরা সাজিয়ে দময়ন্তী গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পেরেছে। এই বিষয়ে মনোজ সেনের একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যায় ---

> একটা কথা। কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমার দময়ন্তীকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ কি মেয়েদের ক্ষমতায়নের ওকালতি করা ? সেটা ঠিক কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এক বা একাধিক পুরুষ সবসময় তাকে পেছন থেকে সাহায্য করে গেছে। আমি তখনও বিশ্বাস করতুম এবং এত পরিবর্তনের পরে আজও বিশ্বাস করি যে দু-পক্ষেরই পারস্পরিক সহযোগিতা কোনো ক্ষমতায়নই সম্পূর্ণ হতে পারে না।[৮]

❖ যৌন বিকৃতির প্রসঙ্গ

দময়ন্তীর কাহিনিগুলোতে নানা রকম অপরাধের কাহিনি তুলে ধরেছেন লেখক, একটি কাহিনির সঙ্গে আরেকটি কাহিনির অবস্থান বেশ দূরবর্তী। কিন্তু চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের মনস্তাত্ত্বিক গঠন বেশ অনেকটা কাছাকাছি। হার্ডবয়েল ক্রাইম কাহিনির ক্ষেত্রে অপরাধের বীভৎসতার পাশাপাশি যৌনতাও একটা বড় ভূমিকা পালন করে। মনোজ সেনের এই কাহিনিগুলি ঠিক হার্ডবয়েল ক্রাইম কাহিনির মধ্যে না পড়লেও এখানে যৌনপ্রসঙ্গ বা বলা ভালো যৌন বিকৃতি খুব বড় জায়গা দখল করে রেখেছে।

'সরল অঙ্কের ব্যাপার', 'সূর্যগ্রহণ', 'চরৈবেতি' এই কাহিনিগুলির অপরাধী মূলত অর্থলোভী, টাকার লোভেই তারা সম্পত্তির মালিককে হত্যার পরিকল্পনা, প্রাচীন মূর্তি ও সেনাবাহিনির তথ্য পাচার করে। 'সূর্যগ্রহণ' ও 'চরৈবেতি'তে যৌন বিকৃতির ছবি সেভাবে ফুটে ওঠেনি। কিন্তু 'সরল অঙ্কের ব্যাপার'-এ দেখা যায় অপরাধী প্রথম ভাইপোর ইকনমিক্সের বইয়ের মলাটের মধ্যে নানা রকম পর্ণগ্রাফির বই রয়েছে, তার সাগরেদ চাকর রাজুর ঘরেও নানা রকম পর্ণগ্রাফির বইয়ের সঙ্গে কয়েক বাক্স কন্ট্রাসেপটিভ পিলের খোঁজ পাওয়া গেছে। লেখক স্পষ্ট করে না বললেও তাঁর ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় এরা একদিকে যেমন খুনের অপরাধী অন্যদিকে যৌনতা নির্ভর অপরাধের সঙ্গেও এদের যোগ রয়েছে।

'নীলকান্তপুরের হত্যাকাণ্ড' কাহিনির ক্ষেত্রে দেখা যায়, অপরাধীদের মূল উদ্দেশ্য রোগীদের সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে তাদের শরীরে জীবাণুর ঢুকিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলা। কিন্তু তাদের খুনের পাশাপাশি ডাক্তার বীথিকা মিত্রের খুনের চিত্র রয়েছে। আসলে এই খুনের সূত্র ধরেই বাকি অপরাধের খোঁজ পাওয়া যায়। বীথিকার চরিত্র চিত্রণের সময় জানান, সে নিম্ফোম্যানিয়াক। কম বয়স থেকেই বহুপুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। বর অরিজিতের সঙ্গে তার সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাই বিয়ের পরও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত অবৈধ প্রেমিকের হাতে খুন হয় বীথিকা মিত্র। যদিও এখানে অবৈধ সম্পর্ক না থাকলেও শুধুমাত্র অপরাধের সাক্ষী না রাখার জন্যও সোমনাথ বীথিকাকে খুন করতে পারত।

উপরোক্ত চারটি কাহিনি বাদ দিলে দেখা যায় বাকি কাহিনিগুলোর মূল অপরাধের পিছনে যৌনতা খুব বড় ভূমিকা পালন করেছে। 'ভগ্ন অংশ ভাগ' কাহিনিতে দেখা যায়, পবিত্র অতীন্দ্রকে কোম্পানিতে নাশকতার দায়ে ফাঁসাতে চাইছে। এর পিছনে পেশাগত ঈর্ষা নেই, অলোকনাথের পরিবারে নিজের জায়গা পাকা করার তাগিদ খানিকটা থাকলেও

আসলে যৌন ঈর্ষাই এখানে মূল চালিকা শক্তি। পবিত্রর সঙ্গে বৈদেহীর বিয়ের বিষয় নিয়ে অলোকনাথ বৈদেহীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু বৈদেহী আসলে অতীনকে ভালোবাসে। সেই কারণে নিজের পথের কাঁটা অতীনকে সরানোর জন্য পবিত্র ষড়যন্ত্র করে। 'ইজ্জত' কাহিনির বিনয়ভূষণকে লেখক ঠিক মানসিক বিকারগ্রস্থ মানুষ হিসেবে নির্মাণ করতে চাননি। কিন্তু তিনি রেবেকা ও বকুলকে মূলত যৌন ঈর্ষার কারণেই হত্যা করেছেন। সেতার শেখাতে গিয়ে এই দুজনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। বলা বাহুল্য এই সম্পর্কও অবৈধ সম্পর্ক। তবে বিনয়ভূষণ তাঁর স্ত্রী অমৃতপ্রভার স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন না থাকার কারণে এই অবৈধ সম্পর্ককে বিকৃতি বলে মনে হয়না। কিন্তু এই দুই নারী যখন নিজেদের কেরিয়ারে উন্নতির জন্য প্রযোজক হীরালালের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে যায় বিনয়ভূষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে রেবেকা ও বকুলকে হত্যা করেন। 'নকল হিরে'তে দীপান্বিতার ভগ্নীপতি দীপান্বিতাকে বারবার বোঝাতে থাকে প্রতাপের সঙ্গে তার মাসির যৌন সম্পর্ক আছে। আর তার প্রণাম স্বরূপ প্রতাপের মাসি পঞ্চালী ভট্টাচার্যের আঁকা নগ্ন ছবির কথা উল্লেখ করে বারবার। এরফলে প্রতাপ ও দীপান্বিতার স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন নষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত দীপান্বিতা ভুল বুঝে প্রতাপকে হত্যা করে। 'রাজমহিষীর রহস্য'তেও দেখা যায় গগন মণ্ডলের সাহায্যে দীনেশ বিশ্বাস তার স্ত্রীকে হত্যা করে মহীপালের দিঘিতে ফেলে দেয়। এই অপরাধের পিছনে দীনেশের রূপসী টগরের প্রতি যৌন আকর্ষণ মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। 'প্রথম পাপ' কাহিনিতে দময়ন্তী মালবিকার ব্ল্যাকমেলার কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বুঝতে পারে, এই ব্ল্যাকমেলিংয়ের পিছনে রয়েছে একটি অবৈধ সম্পর্কের কাহিনি। কম বয়সে মালবিকা নিজের দিদির বরের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তার ফল স্বরূপ তাকে একটি সন্তানের জন্ম দিতে হয়। এই সন্তান তার দিদির সন্তান হিসেবেই পরিচিতি পায়। কিন্তু বিয়ের কয়েক বছর পর তার জরায়ুতে একটি সমস্যা দেখা দেওয়ায় ডাক্তার কেশবনেকে দেখাতে হয়। তিনি বুঝতে পারেন মালবিকা একবার সন্তানের জন্ম দিয়েছে। তারপর যখন পরীক্ষা করে জানতে পারেন তার বরের শারীরিক সমস্যার জন্য তিনি সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম, তখন মালবিকাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেন।

'অন্ধ তামস' ও 'পার্বতো বহ্নিমান' কাহিনিতে যৌন বিকৃতির ছবি সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। এই দুই কাহিনির ক্ষেত্রে যৌনতা একেবারে অপরাধের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। 'অন্ধ তামস' কাহিনিতে তেজপাল আগরয়াল চরিত্রটি সম্পূর্ণ ভাবে যৌন বিকৃতিতে আচ্ছন্ন, অত্যন্ত দুশ্চরিত্র মানুষ। দ্বারকাদাসকে তার বাবা ত্যাজ্যপুত্র করে দেওয়ার

পর সে মুম্বাইয়ে সিনেমার ব্যাবসা শুরু করেছিল, কিন্তু সাফল্য পায়নি। এমন অবস্থায় তেজপাল দ্বারকানাথের কাছ থেকে তার স্ত্রী লতাকে নিজের কব্জায় নিয়ে আসেন। দ্বারকানাথ লতাকে নিজের করে আর পায় না , তাকে শিখণ্ডী করে তেজপাল লতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়। তেজপালের হত্যার পিছনে তার এই নোংরা মানসিকতাই দায়ি। তেজপাল নিজের নাতনির বন্ধু নম্রতার দিকে হাত বাড়াতেও দ্বিধা করেননি। এরফলে দেওরাজ আর তেজপালের নাতনি গিরিজা মিলে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। দেওরাজ তেজপালকে জানায় লোডসেডিংয়ের মধ্যে নম্রতা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে, শোনা মাত্র তাঁর মনের মধ্যে লালসা জেগে ওঠে। তিনি উৎফুল্ল হয়ে রামনাথের বাড়ির দিকে যান। তারপর পরিকল্পনা মাফিক নম্রতা তাঁকে হত্যা করে। 'পর্বতো বহ্নিমান' কাহিনিতে ভালোবাসা ও যৌনতার পরস্পর বিরোধী অবস্থানের জন্য মূল সমস্যা তৈরি হয়। ব্রতীশেখর রায়ের প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার বেশ অনেক বছর পর, মেয়ে শর্মিষ্ঠা যখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে, তখন তিনি মুম্বাইয়ের অধিবাসী মুনিয়াকে বিয়ে করেন। মুনিয়া মূলত টাকার জন্য নিজের চেয়ে অনেক বেশি বয়েসের মানুষটিকে বিয়ে করে, পাশাপাশি অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত থাকে। মুনিয়া যখন দেখে ডক্টর রায়ের উইল অনুযায়ী তিনি মারা যাওয়ার পর সম্পত্তির সিংহ ভাগ পাবেন তাঁর মেয়ে শর্মিষ্ঠা, তখন শর্মিষ্ঠাকে কুক্ষিগত করে রাখতে তার সঙ্গে সমকামিতার সম্পর্ক তৈরি করে মুনিয়া। ফলে ছেলেবেলার প্রেম উজ্জ্বল তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে সরাসরি সম্মতি জানাতে পারেনা, আবার পুরপুরি অসম্মতও হতে পারেনা। মুনিয়া শর্মিষ্ঠার দোলাচলটা বুঝতে পেরে উজ্জ্বলকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এরপর শর্মিষ্ঠা মুনিয়াকে হত্যা করে।

❖ মূল্যায়ন

বইয়ের পাতার মিতিন মাসি থেকে শুরু করে টিভির পর্দার গয়ন্দা গিন্নি পর্যন্ত একুশ শতকের জনপ্রিয় মেয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকালে দেখা যাবে আসলে তারা বিবাহিত গোয়েন্দা। মিতিন গার্গীর এই যে ধরণ আসলে তার সূত্রপাত মনোজ সেনের হাত ধরে। পাঠক মূলত স্কুল পড়ুয়া কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের গোয়েন্দাগিরি দেখতে অভ্যস্ত ছিল, মনোজ সেন দময়ন্তীকে নির্মাণ করে সেই প্রচলিত ধারনায় খানিক বদল আনতে চেয়েছিলেন। যে সময়ে বাংলা সাহিত্যের পাঠক অন্যান্য বিবাহিত মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে মেতে ছিল, সেই সময়ে দময়ন্তীর বইগুলি সহজ লভ্য ছিলনা। তাই গুণগত মানের বিচারে কাহিনিগুলি

অনেকটা এগিয়ে থাকলেও জনপ্রিয়তার নিরিখে তা বেশ পিছিয়ে ছিল। ২০১৯ সালে ‘বুকফার্ম’ দময়ন্তী সমগ্র ১ প্রকাশ করে। একুশ শতকের পাঠকের কাছে দময়ন্তী নতুন করে পরিচিতি পায়। ‘হইচই’ দময়ন্তীর কাহিনি নিয়ে ওয়েব সিরিজ তৈরি করে। সবমিলিয়ে পাঠক নতুন করে গোয়েন্দা দময়ন্তীর নাম জানতে পারে। আশা করা যায় পরবর্তী সময়ে পাঠকের মনে নিজের প্রাপ্য স্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হবে।

নির্দেশিকা

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতার কচড়া, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, সোমবার

২। মনোজ সেন, ‘ভূমিকা’, রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র ১, বুকফার্ম, কলকাতা, ২০১৯

৩। তদেব

৪। মনোজ সেন, ‘নকল হিরে’, রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র ১, বুকফার্ম, কলকাতা, ২০১৯ পৃ. ৬৬

৫। তদেব, পৃ. ৩০

৬। মনোজ সেন, ‘সূর্যগ্রহণ’, রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র ১, বুকফার্ম, কলকাতা, ২০১৯ পৃ. ২০২

৭। মনোজ সেন, ‘ইজ্জত’, রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র ২ , বুকফার্ম, কলকাতা, ২০২০ পৃ. ২৬১

৮। মনোজ সেন, ‘ভূমিকা’, রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র ২ , বুকফার্ম, কলকাতা, ২০২০

ষষ্ঠ অধ্যায়

গোয়েন্দা কাহিনির প্রেক্ষাপটে নারীর জীবনের বিবর্তন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গার্গী সিরিজ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ শতকের শেষাংশ এবং একুশ শতকের বাঙালি পাঠকের কাছে খুব পরিচিত একটি নাম। ৭ জুন, ১৯৪৭-এ বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়ায় তাঁর জন্ম। জন্মের দুই মাস আটদিন পর দেশ স্বাধীন হলে তাঁর ঠাকুরদা পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। আরও দুটি উদ্বাস্তু পরিবারের সঙ্গে ইছামতীর তীরে একটি পতিত জমিতে তাঁরা বসবাস শুরু করেন। উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহাকুমার বাদুড়িয়া গ্রামে তাঁর শৈশব ও কৈশোর জীবন কাটে। বাদুড়িয়া এল এম এস স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে কলেজের পড়াশুনোর জন্য কলকাতায় আসেন। পিয়র ম্যাথামেটিক্স নিয়ে আশুতোষ কলেজ থেকে পড়াশুনো করেন। পড়াশুনো শেষ করার পর সাত মাস একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাকতা করেন। এরপর ব্যাঙ্কের কেরানী হিসেবে দুবছর চাকরি করার পর ১৯৭২ সালে তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের আধিকারিক হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। ২০০৭ সালে অবসর নেওয়ার পর শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির সভাপতি পদও সামলান। প্রথমে কবি হিসেবে সাহিত্য জগতে পা রাখলেও পরবর্তী সময়ে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রকে নিজের বর্ণময় জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। ‘নদী মাটি অরণ্য’, ‘শঙ্খচিলের ডানা’, ‘মালব কৌশিক’ ‘দ্বৈরথ’, ‘লাল ফিতে’, ‘একটি জরুটি ফাইল’-এর মতো ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

সাহিত্য জীবনে প্রবেশের সময় তিনি ভাবেননি যে কখনও গোয়েন্দা সাহিত্য রচনা করবেন। কিন্তু রমাপদ চৌধুরীর অনুরোধে তিনি গোয়েন্দা কাহিনি লেখায় হাত দেন। ‘১৯৯০ সালের অক্টোবর মাস থেকে তিনি ‘ঈর্ষার সবুজ চোখ’ উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, ‘রবিবাসরীয়’তে তা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারিতে তাঁর গার্গী কেন্দ্রিক এই কাহিনি বই আকারে প্রকাশিত হয়।

বিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দা আগমনের ক্ষেত্রে যে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ছিল, বিশ শতক ও একুশ শতকের সন্ধিকালে দাঁড়িয়ে সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই বদলেছে। সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে মেয়েরা অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন পেশা বেছে নিয়েছে। পেশাগত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করেছে। তাই গার্গী চরিত্র নির্মাণের নেপথ্যে 'নারীও পারে' এই মানসিকতা ক্রিয়াশীল থাকেনি। সবচেয়ে বড় কথা, কোনও লেখিকার হাতে নয়, এক লেখকের হাতে গোয়েন্দা গার্গীর জন্ম হয়েছে। সাফল্যের শীর্ষে থাকার পরও অনেক সময়েই লিঙ্গগত পরিচয়ের কারণে অনেককেই বাঁকা নজরের শিকার হতে হয়, অনেক সময়ই লেখিকাদের কলমে তা ধরা পড়ে। প্রভবতী দেবী সরস্বতীর কৃষ্ণা; শিখা, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা মিতিনদের ক্ষেত্রে বারবার সেই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এমনকি লেখক মনোজ সেনের কাহিনিতেও দেখা যায় দময়ন্তীর গোয়েন্দাগিরি নিয়ে অনেকেই বিদ্রূপ করছেন। কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় গার্গীর কাহিনিতে এই দৃষ্টিকোণ বর্জন করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গোয়েন্দা হিসেবে কটাক্ষের শিকার হলেও, আলাদা করে মেয়ে গোয়েন্দা হিসেবে তাকে কেউ অপদস্ত করেনি। গার্গী চরিত্রটি নির্মাণের নেপথ্য কাহিনিতে লেখক বলেছেন --- "আমার যা পর্যবেক্ষণ তাতে বাঙালি মেয়েরা খুব তীক্ষ্ণধী হন, মানুষের চোখ দেখলে ধরতে পারেন মানুষটি কেমন। তাছাড়া মেয়েরা একটু বেশি কথা বলেন বলে তাঁদের বিশ্লেষণী শক্তিও অসাধারণ।"[১]

সেই কারণে তিনি গোয়েন্দা চরিত্র হিসেবে একটি নারী চরিত্র নির্মাণ করেছেন। তাই পিতৃতন্ত্রের বিরোধী প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে কৃষ্ণা শিখার মতো করে গার্গীর উত্থান নয়। লিঙ্গগত পরিচয় নয়, তার মেধাই তার যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে উঠছে।

❖ গার্গীর ব্যাক্তিগত পরিচয় :

গার্গী খুব সাধারণ দেখতে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির শ্যামলা রঙের একটি মেয়ে। অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাদের ব্যাক্তিগত জীবনের বিবর্তন নিয়ে লেখকরা বিশেষ মাথা ঘামাননি। কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় গার্গীর কিশোরীবেলা থেকে শুরু করে একটি সন্তানের মায়ের ভূমিকায় উত্তরণের ধারাবাহিক ছবি দেখিয়েছেন। পাশাপাশি বিবর্তিত হয়েছে তার পেশাগত জীবন। গার্গীর ব্যাক্তিগত ও পেশাগত জীবন একে ওপরের সঙ্গে এমন ভাবে সংযুক্ত যে তাদেরকে আলাদা করে আলোচনা করা মুশকিল। গার্গীকে লেখক যখন নির্মাণ করেন তখন গার্গী

‘বিংশতিবর্ষীয়া তরুণী’। গার্গী গণিত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করে। মেধাবী ছাত্রী হওয়ার পাশাপাশি সে ভালো তার্কিক। ‘বহে বিষ বাতাস’ কাহিনিতে জানা যায়, ‘ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র’ বিষয়ের ওপর বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সে জয়ী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত মুখ হয়ে ওঠে। গার্গীর পারিবারিক জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানান ---

> তার বাবা নেই ছোটবেলা থেকেই মা কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাকতা করে মানুষ করেছিলেন দুই ছেলে-মেয়েকে। সুশোভন লেখাপড়ায় মোটামুটি মেধাবীই ছিলেন, নিজের অধ্যাবসায়ের জোরে তিনি এখন ভালো কোম্পানির এক্সিকিউটিভ পোস্টে। জুনিয়র এক্সিকিউটিভ বলেও মাইনে পান ভালই। জুবিলি পার্কের এই ভাড়া বাড়িতে আছেন বহুকাল। কোম্পানি থেকে লোন নিয়ে নতুন ফ্ল্যাট কিনে চলে যাবেন খুব শিগগির। গার্গীর মা যখন মারা যান, তখন গার্গী কলেজ ছেড়ে বিশ্বাবিদ্যালয়ে[২]

গার্গী তাদের জুবিলি পার্কের ভাড়া বাড়িতে গার্গী, দাদা সুশোভন ও বউদি অনামিত্রা একসঙ্গে বাস করে। সুশোভন সংসারের কর্তা। গার্গী কলেজ জীবন থেকে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা শুরু করে। ‘ঈর্ষার সবুজ চোখ’ কাহিনিতে জানা যায়, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার জানার আগ্রহ থেকে সে নিজের মতো করে একটা একটা বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করে, তারপর সেই বিষয়ে একটি লেখা তৈরি করে কোনও পত্রিকার অফিসে পৌঁছে যায়। এই লেখার ফলে সে বেশ খানিকটা পরিচিতি অর্জন করেছে। এছাড়া ‘সোসিও ইকনমিক রিসার্চ আকাদেমি’র সঙ্গে সে যুক্ত। এখান থেকে প্রতিমাসে ষোলশো টাকা পায়, তার থেকে ছ’শো টাকা সে বউদি অনামিত্রার হাতে তুলে দেয়। গার্গীর জীবনে ইচ্ছে ছিল সে স্কুল বা কলেজে শিক্ষকতা করবে, তারপর ভেবেছিল সাংবাদিক হবে আবার এক সময়ে মনে হয়েছিল সমাজকর্মী হয়ে জীবন অতিবাহিত করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গার্গী হয়ে ওঠে ‘প্যারাডাইস প্রোডাক্টস’-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এই পেশা গার্গীর নিজের বেছে নেওয়া নয়। কিন্তু এই পেশাতে এসে সে সাফল্যের সঙ্গে নিজের পদ সামলেছে। পাশাপাশি গার্গী সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করেছে। একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তারপরও সে পারিবারিক চৌহদ্দির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে না ফেলে পেশাগত জীবন ও সখের গোয়েন্দাগিরিতে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে।

❖ গোয়েন্দা গার্গীর বিবর্তন :

'ঈর্ষার সবুজ চোখ' গার্গী কেন্দ্রিক প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হলেও, গোয়েন্দা গার্গীর জীবন কাহিনির সূত্রপাত এখান থেকে নয়। লেখক পরবর্তী সময়ে গার্গীর ছাত্রজীবনের কাহিনি তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন কাহিনিতে। 'বহে বিষ বাতাস' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখা রয়েছে --- "'ঈর্ষার সবুজ চোখ' যারা পড়েছেন, তরুণী গোয়েন্দা গার্গী মুখার্জির নাম একেবারে অপরিচিত নয় তাঁদের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন গার্গী তার জীবনের প্রথম যে জটিল রহস্যটি উন্মোচন করেছিল, সেই কাহিনীই 'বহে বিষ বাতাস'।"[৩]

উপন্যাসের দিক থেকে দেখতে গেলে গার্গীর কলেজ জীবনের রহস্য উন্মোচনের ছবি পাওয়া যায় 'বহে বিষ বাতাস' কাহিনিতে। তবে গার্গী কেন্দ্রিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'বহে বিষ বাতাস'-এ গার্গীর জীবনের সূচনা হলেও গার্গীর কিশোর উপযোগী গল্পগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় লেখক একটু একটু করে গার্গীর গোয়েন্দা হয়ে ওঠার পটভূমি রচনা করেছেন। বিশেষত, গার্গীর কিশোর কাহিনিগুলির দিকে তাকালে সেই ছবি পরিস্ফুট হয়। 'গোয়েন্দা গার্গী কিশোর সমগ্র'র বেশ কয়েকটি গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায় গার্গী গোয়েন্দা হওয়ার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে। আস্তে আস্তে নিজের রহস্য সমাধানের ক্ষমতার প্রতি সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে।

কালিক বিবর্তনের নিরিখে গার্গীর কাহিনিগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায় – ১। ছাত্রজীবনে রহস্য উদ্ঘাটন ২। বিবাহিত জীবনে প্রবেশের পর গোয়েন্দাগিরি ৩। মা হওয়ার পর গোয়েন্দাগিরি । আসলে বিবাহিত জীবন ও পেশাগত জীবনে গার্গীর প্রবেশ প্রায় একই সময়ে। বিবাহিত জীবনে একদিকে যেমন সে সায়নকে পাশে পেয়েছে, অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হওয়ার সুবিধাও পেয়েছে। আবার লুনা জন্মানোর ফলে যেমন তার জীবনে একটা বড় পরিবর্তন এসেছে, তেমনই সোনালিচাঁপা আসার ফলেও তার তদন্তের ধরণ অনেকটা বদলে গেছে। তার জীবনে এই দুজনের আগমনও প্রায় একই সময়ে ঘটেছে।

- <u>ছাত্র জীবনে গোয়েন্দা গার্গী</u>

রচনাকালের দিক থেকে দেখতে গেলে 'বহে বিষ বাতাস' উপন্যাসটি গার্গী কেন্দ্রিক কিশোর কাহিনিগুলির আগে নির্মিত। এখানে গার্গী বেশ দক্ষতার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি

করেছে। বেশিরভাগ গোয়েন্দার ক্ষেত্রেই তাদের গোয়েন্দা হয়ে ওঠার পরের চিত্রই বর্ণিত হয়। কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কিভাবে একটু একটু করে তার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গার্গী গোয়েন্দা হয়ে উঠল। গার্গীর কাহিনিগুলির মধ্যে যে ক্রমে তার গোয়েন্দাগিরির বিবর্তন ধরা পড়েছে, তা হল ---

১। হিরের আংটি

২। গ্রহান্তরের প্রানী

৩। দন্ত অন্তর্ধান রহস্য

৪। ধূমকেতু–রহস্য

৫। অপরাধী শনাক্তকরণ

৬। ম্যাকবেথ অন্তর্ধান রহস্য

৭। নেপথ্যে এক আততায়ী

৮। কিঙ্কর হত্যা রহস্য

৯। পাহাড়খনির হিরে রহস্য

১০। বহে বিষ বাতাস

'হিরের আংটি' গল্পে গার্গীর রহস্য উদ্ঘাটন করার বিষয়ে লেখক লেখেন ---"তার অনুমান সত্যে পরিণত হওয়ায় গার্গীও খুবই বিস্মিত !"[৪]

তার বিস্মিত হওয়া দেখে বোঝা যাচ্ছে সে তখনও গোয়েন্দা হয়ে ওঠেনি। গার্গীর অন্যান্য কাহিনি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এই গল্পটিতেই গার্গী প্রথমবারের জন্য রহস্য উন্মোচন করল। অর্থাৎ, হীরের আংটি গল্পেই গার্গীর গোয়েন্দাগিরির সূত্রপাত বলা যেতে পারে। পরিণত পাঠকের জন্য লেখা কাহিনিতে গার্গীকে খুব একটা অপদস্ত হতে হয়না, কিন্তু কিশোর কাহিনিতে যেহেতু সে গোয়েন্দা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেনি, তাই অনেক গল্পেই গার্গীর ধারনাকে সবাই মান্যতা দিতে পারেননা --- "নীলাম্বর রাউত সন্দিগ্ধ ভাবে তাকালেন কলেজে পড়া পুঁচকে মেয়েটার দিকে, তুমি বলছ ? তারপর যদি তোমার ধারণা ঠিক প্রমাণিত না হয়, তাহলে কিন্তু বেইজ্জত হয়ে যাব"[৫]

দেখা যাচ্ছে, গার্গীর প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তার প্রতিভার কথা জানলেও আগের প্রজন্মের মানুষরা তখনও পর্যন্ত গার্গীর এই ক্ষমতার কথা জানেন না। অর্থাৎ, সে তখনও ঠিকঠাক সখের গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পারেনি। আর সেই কারণে এই পর্যায়ের কাহিনিতে তার নিজের মধ্যেও সংশয় কাজ করে। কিঙ্করের হত্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তার মনে হয় --- "গোয়েন্দা কাহিনি পড়ে পড়ে নেহাত মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে বলেই এরকম একটা জটিল ব্যাপার তার মাথার মধ্যে ঘরাফেরা করছে। নইলে তার তো মাথা ঘামানোর কথাই নয় এসব ঘটনায়।"[৬]

কিশোর পাঠকের জন্য লেখা গল্পগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় সব কাহিনি মিলিয়ে সেখানে দুটি হত্যার ছবি ফুটে উঠেছে। 'কিঙ্কর হত্যা রহস্য' আর 'পাহাড়খনির রহস্য' বাদে অন্য কিশোরপাঠ্য কাহিনিতে হত্যার দৃশ্য চোখে পড়েনা। অন্যদিকে সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা উপন্যাস 'বহে বিষ বাতাস'-এ চারটি হত্যার দৃশ্য রয়েছে। আসলে সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা কাহিনিতে লেখকরা যতটা মনস্তাত্বিক জটিলতা ও বীভৎস পরিণতির চিত্র উপস্থাপিত করতে পারেন, কিশোর পাঠকের সামনে ততটা তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই লেখকরা কিশোর গোয়েন্দা কাহিনিতে হত্যা ছাড়া অন্য ধরণের অপরাধ চিত্র নির্মাণ করার চেষ্টা করেন। আর হত্যা চিত্র থাকলেও তার নেপথ্যে থাকা কারণগুলোও অনেক সরলীকৃত ভাবে চিত্রণ করে থাকেন, গার্গীর ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য।

- **পেশাগত ও বিবাহিত জীবনে প্রবেশের পর গোয়েন্দা গার্গী :**

কলেজ জীবনের পড়াশুনো শেষ করার পর 'সোসিও রিসার্চ একাডেমি' নামের এন.জি.ও-র কাজ ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে থাকা গার্গীর জীবনে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। তার প্রানের বন্ধু, মামাতো বোন ঐন্দ্রিলা খুন হয়। খুনের দায়ে পুলিশ ঐন্দ্রিলার বর সায়নকে আটক করে। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতার সূত্রে সায়নের সঙ্গে গার্গীর আলাপ হয়েছিল। গার্গী যখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্টোরি বানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশ করছে, তখন তার চোখে পড়ে এক তরুণ বাঙালি ব্যাবসায়ী খুব দ্রুত নিজের কোম্পানিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্টোরি বানানোর সূত্রে সায়নের সঙ্গে পরিচয় হলেও সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এরপর গার্গী নিজেই সায়ন ও তার মামাতো বোন ঐন্দ্রিলার বিয়ের ঘটকালি করে। দু'বছর সুখি দাম্পত্য জীবন কাটানোর পর ঐন্দ্রিলা খুন হয়। সায়নকে সবাই খুনি বলে মেনে নিলেও গার্গী তা পারেনা। সে দুঃসময়ে সায়নের পাশে দাঁড়ায়। সায়ন শহরের খুব

পরিচিত ব্যাবসায়ী, তার সম্পর্কে মুখরোচক খবর বানানোর সুযোগ পেয়ে সংবাদপত্র কোনও ভাবেই সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। দেখা যায় :

> সায়ন চৌধুরীর জীবনে আরও এক নতুন নারী এমন একটি টাইটেল দিয়ে বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছেন, ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর দশ-বারো দিনও যায়নি, এর মধ্যে সায়ন চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে বিলাসবহুল রেস্তরাঁয়, দামি হোটেলে, এমনকি কোনও দিন ফলতা, কোনও দিন কল্যাণী, কোনও দিন কাকদ্বীপে। সঙ্গে ঐন্দ্রিলারই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী গার্গী মুখার্জি, যার সঙ্গে বিয়ের অনেক আগে থেকেই একটা মাখামাখি ছিল সায়নের। ঘটনাটি পুলিশমহলে আলোড়ন তুলেছে। ঐন্দ্রিলা-হত্যার ব্যাপারে যে অনুসন্ধান চলছে, তাতে এই ঘটনাটি এক নতুন আলোকপাত করবে বলে বিশেষজ্ঞমহল মনে করছেন।[৭]

এই খবর প্রকাশের পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই গার্গীর বাড়িতে অশান্তি শুরু হয়, কিন্তু গার্গী সায়নের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেনা। এর ফল স্বরূপ তাকে বাড়ি ছাড়তে হয়। থাকার অন্যকোনও জায়গা না থাকায় সে সায়নের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সমাজের বাঁকা নজর থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়ে সায়ন ও গার্গী বিয়ে করে। সচারাচর মেয়ে গোয়েন্দাদের আমরা প্রায় ‘সুপার হিরো’র মতো কল্পকাহিনির নায়িকা হিসেবে দেখতে পাই। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির চাপে মাথা নত করে জীবনে বিয়ের মতো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া মেয়ে গোয়েন্দা অন্তত বাংলা সাহিত্যে আর একটিও নেই।

বিয়ের পর সায়ন তার হাতে ‘প্যারাডাইস প্রোডাক্টস’-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব তুলে দেয়। বাড়িতে সায়নের পাশে থাকার পাশাপাশি সে অফিসেও সে সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য লেখক শুধুমাত্র তার পেশার উল্লেখ করে তার ছুটি বা আবসর সময়ে গোয়েন্দাগিরির ছবি তুলে ধরেন নি। বরং তার পেশাগত জীবনের পরিচয় খুব স্পষ্ট ভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন, যা শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্রের ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিক ভাবে বাংলা উপন্যাসের মেয়ে চরিত্রদের ক্ষেত্রে বিরল। গার্গীর প্রায় সব উপন্যাসেই তার অফিস জীবনের ছবিকে লেখক নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন : “অফিসে গিয়ে যা কিছু ফাইল ছিল ক্লিয়ার করে, মার্কেটিং ম্যানেজারকে কয়েকটা জায়গায় প্রোডাক্ট পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে, অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারকে ডেকে কিছু নতুন অ্যাড-এর লে আউট করতে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল নতুন এক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে।”[৮]

সমাজের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, বিবাহিত জীবনে প্রবেশের পর একটি নারীর পেশাগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু গার্গীর ক্ষেত্রে বিষয়টা একেবারেই উল্টো। বিয়ের পর সায়নের হাত ধরেই সে 'প্যারাডাইস প্রোডাক্ট'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে ওঠে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্রটির ঘাড়ে সাংসার সামলানোর দায় চাপিয়ে দেন নি। বরং বিবাহ পরবর্তী জীবনের বর্ণনায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর গার্গীর পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন কাহিনিতে কোম্পানির বিভিন্ন বিভাগের সমস্যার সমাধান, কর্মচারীদের সঙ্গে মিটিং করে নতুন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নতুন ধরণের বিজ্ঞাপন এনে গ্রাহককে চমকে দেওয়ার মতো চিত্রও লেখক বিস্তারিত বর্ণনার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

পেশাগত জীবন ও বিবাহিত জীবনে প্রবেশের পরবর্তী সময় যে কাহিনিগুলিতে ফুটে উঠেছে, সেগুলি হল –

১। নীল রক্ত নীল বিষ

২। ধূসর মৃত্যুর মুখ

৩। হলুদ খামের রহস্য

৪। সোনালি সুতোর ফাঁস

৫। পুরস্কার হরণ রহস্য

৬। ক্যামেরা হরণ রহস্য

৭। ব্রাহ্মীলিপির রহস্য

৮। রুমকির হত্যারহস্য

৯। অষ্টধাতুর অষ্টমূর্তি রহস্য

'অন্তরালে একজন' কাহিনিতে সোনালিচাঁপা কিংবা লুনার প্রসঙ্গ না থাকলেও ডিমনিটাইজেশনের প্রসঙ্গ থাকার ফলে বোঝা যায় তা লুনার জন্মের অনেক পরের কাহিনি। ভারতে নোটবন্দী হয় ৮নভেম্বর, ২০১৬-তে, আর গার্গীকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত '৭৭ সবুজ সরণী'তে গর্ভবতী অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হতে দেখা যায়।

বলা বাহুল্য লেখক গার্গীকে কখনও প্রচলিত সুন্দরী, সুশীলা নারী হিসেবে গড়ে তোলেন নি। তাই তিনি বারবার পাঠককে মনে করিয়ে দেন, গার্গী সুন্দরী রমণী নয়,

শ্যামলা গায়ের রঙের, মাঝারি উচ্চতার, এক বুদ্ধিদীপ্ত সবলা নারী। যদিও গোয়েন্দাগিরিতে নেমে মারামারি করতে দেখা যায় না। তবে সে যে ক্যারাটে জানে লেখক পাঠককে এ কথা জানাতে ভোলেননি।

> ... গার্গী তার হতভম্ব অবস্থাটা কেটে যাওয়ার সময় দিল না, মুহূর্তে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির কলারের কাছে জামাটা খামচে ধরল, চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার খোকা? ফলো করছিলে কেন আমাকে?
>
> ...ছেলেটাকে ছেড়ে দেওয়ার পর তাকে আবার হুমকি দিল গার্গী, ক্যারাটে জানো !
>
> ছেলেটি তখনও হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে, ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়ল, না---
>
> --- আমার ও বিদ্যেটি ভালই জানা আছে, এরপর ফের যদি কাউকে ফলো করতে দেখি তাহলে কিন্তু একটা এসপার ওসপার হয়ে যাবে। বুঝলে ? এখন যাও---[৯]

এহেন গার্গীর জীবনকে লেখক কৃত্রিম ভাবে অতি রোমান্টিক করে তোলার কোনও চেষ্টা করেননি। বরং গার্গী ও সায়নের জীবনে সায়নের প্রথম স্ত্রী ঐন্দ্রিলার স্মৃতি বারবার ফিরে এসেছে। বিয়ের কয়েক মাস পর সায়ন পাহাড়ে যাওয়ার কথা বললে গার্গী আপত্তি করে। কারণ ঐন্দ্রিলা পাহাড়ে ঘুরতে যেতে চাইত, গার্গীকেও তাদের সঙ্গে যেতে বলত। "ঐন্দ্রিলার ফেলে যাওয়া সংসারের হাল ধরতে সে ইতিমধ্যে নিজেকে উজাড় করে দিলেও একটা চোরকাঁটা খচখচ করে কখনও ফোটেও তার বুকের গহনে। সে যন্ত্রণা খুবই অস্বস্তিকর, যথেষ্ট পীড়ার কারণ, তা সে অনুভব করে কোনও অবসরের মুহূর্তে।"[১০]

সায়ন ও গার্গীর জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই কাটে 'প্যারাডাইস প্রোডাক্ট'-এর অফিসে। সেখানে মূলত ব্যাবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুজনের বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা চলে। আর বাড়িতে থাকলে গার্গীর কেস নিয়ে আলোচনা হতে দেখা যায়। ঐন্দ্রিলার স্মৃতি বিভিন্ন কাহিনিতে বারবার করে সায়ন ও গার্গীর মনে আসে। আবার সেই স্মৃতিকে সরিয়ে রেখে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দাম্পত্য জীবন এগিয়ে চলে। 'ক্যামেরা হরণ রহস্য'তে দেখা যায় একটা বহুজাতিক কোম্পানির আমন্ত্রণে বিশাখাপত্তনমে সিমিনারে যোগ দিতে যাওয়ার আগে সায়ন গার্গীকে একটা ক্যামেরা উপহার দিয়েছে। আবার তাদের দাম্পত্য জীবনের টানাপড়েনের ছবিও পাঠকের সামনে উঠে আসে। গার্গী অপরাধীকে ধরার জন্য একটি সিরিয়ালে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করতে শুরু করে। কিন্তু সায়নকে সে পুরো সত্যিটা জানাতে পারে না।

সায়ন বিষয়টা জানতে পারার পর গার্গীর ওপর বিরক্ত হয়ে তাকে বলে --- "আজও কি নায়কের ঘরে দরজা লক করে দিয়ে ড্রিঙ্ক করতে গিয়েছিলে ?

...... প্যারাডাইস প্রডাক্টের মতো একটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে তুমি একটা সিরিয়ালে বাইজির ভূমিকায় অভিনয় করছ, এটা আমি ভাবতেই পারছি না।"[১১]

সায়নের আর্থিক ও সামাজিক কৌলীন্যের কারণে সে বাইজির চরিত্রে গার্গীর অভিনয়ের ঘটনা মেনে নিতে পারে না। পাশাপাশি অন্য পুরুষের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য সায়নের মধ্যে খানিকটা বিদ্বেষও জেগে ওঠে। গার্গী বিষয়টাকে খুব সহজে নিতে পারেনা। তার মনের মধ্যে তোলপাড় চলতে থাকে। কিন্তু এরপরও গার্গী সেই ভূমিকায় অভিনয় করে। আসলে গার্গী বরাবর একরোখা। তাই নিজের সিদ্ধান্তের ওপর অন্যের মত চাপিয়ে দেওয়াকে মেনে নিয়ে সে রহস্য সমাধানের পথ থেকে সরে আসেনা।

লেখক মূলত গার্গীর পেশাগত জীবনের চিত্রই আঁকতে চেয়েছেন। গোয়েন্দাগিরির ছাড়া তার জীবনের বাকি যে অংশের বর্ণনা পাওয়া যায় তা মূলত 'প্যারাডাইস প্রোডাক্ট'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের জীবনের ছবি। দাম্পত্য জীবনের খণ্ডচিত্র থাকলেও লেখক তাকে খুব বেশি উচ্চকিত করতে চাননি। সায়নের কসবার ফ্ল্যাটের যতটুকু বর্ণনা পাওয়া যায়, দেখা যায় সেখানে সকালে গার্গী ও সায়ন একসঙ্গে বসে একজন বাংলা ও আরেকজন ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ছে, কিংবা সায়ন কফি আর গার্গী চা খেতে খেতে কোনও তদন্তের বিষয় নিয়ে কথা বলছে। লেখক গার্গীকে মিতিন মাসির মতো সর্বগুণ সম্পন্ন সুনিপুণ রাঁধুনি করে নির্মাণ করতে চান নি। তাই জুবিলি পার্কের বাড়ির মতো কসবার ফ্ল্যাটেও গার্গীকে রান্না করতে দেখা যায় না। রান্নাঘরের সঙ্গে তার যোগাযোগ চা বা কফি বানানো অবধি সীমাবদ্ধ।

গার্গী কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার পরে সে বেশ সাফল্যের সঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব সামলায়। ক্রমাগত কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। তার গোয়েন্দাগিরিতেও এর পরোক্ষ প্রভাব পড়তে দেখা যায়। লেখক অনেক কাহিনিতেই বারবার উল্লেখ করেন যে, পুলিশের লোক সবসময় উচ্চপদকে সম্মান করে। তাই সখের গোয়েন্দাগিরি ছাড়াও তার যে পরিচয় রয়েছে, সেই পরিচয়ের কারণে গার্গী পুলিশ মহলের অচেনা কর্মচারীদের কাছেও সম্মানীয় ব্যাক্তি হিসেবে গণ্য হয়। আর এর ফলে রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে তার অনেকটাই সুবিধা হতে দেখা যায়।

• সহকারী সহ গোয়েন্দা গার্গী

'৭৭, সবুজ সরণি' উপন্যাসে গার্গীকে গর্ভবতী অবস্থায় দেখা যায়, আর এই কাহিনিতেই সোনালিচাঁপা প্রথমবারের জন্য উপস্থিত হয় । অর্থাৎ, মা হওয়ার পর গোয়েন্দা গার্গীর কাহিনির তালিকার সঙ্গে '৭৭, সবুজ সরণি' যোগ করে নিলে সহকারীসহ গার্গীর গোয়েন্দাগিরির কাহিনি তালিকা তৈরি হয়ে যায়।

লুনা জন্মানোর ঠিক আগের মুহূর্ত থেকে গার্গীর গোয়েন্দা জীবনে একটা নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। সে একজন যোগ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট খুঁজে পেয়েছে। শিশু অবস্থায় লুনা গার্গীর জীবনকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে না পারলেও সোনালিচাঁপা তার গোয়েন্দাগিরি অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। গর্ভবতী অবস্থায় গার্গী দক্ষিণ কলকাতার 'গ্রিন ভিউ' নার্সিংহোমে ভর্তি হয়। সোনালিচাঁপা 'গ্রীন ভিউ' নার্সিং হোমের রিসেপশনিস্ট ছিল। গার্গী হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় নার্সিংহোমের রিসেপনে থাকা সোনালিচাঁপার কাছ থেকে নার্সিং হোম সংক্রান্ত কিছু তথ্য জোগাড় করে। নার্সিংহোমের অন্যান্য কর্মীরা সেই দৃশ্য দেখে ফেলে, যার ফলে নার্সিংহোম থেকে সোনালিকে বরখাস্ত করা হয়। সোনালি একদিন গার্গীর সঙ্গে নার্সিংহোমের অনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করেতে আসে। গার্গীর কারণে তার চাকরি চলে যাওয়ার ফলে গার্গী সায়নের সঙ্গে আলোচনা করে তাকে 'প্যারাডাইস প্রোডাক্ট'-এর অফিসে একটা চাকরি দেয়। তাকে খুন হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য গার্গী তাকে তাদের ফ্ল্যাটের গেস্টরুমে থাকতে দেয়। আস্তে আস্তে সেও পরিবারের একজন হয়ে ওঠে। পাশাপাশি সে গার্গীর গোয়েন্দাগিরির সহকারি হয়ে ওঠে। আর মূলত তার জন্যই লুনা গার্গীর জীবনে প্রতিবন্ধকতার মতো হয়ে ওঠে না। যে কোনও রকম জরুরি কাজ থাকলে সে খুব সহজে লুনার ভার সোনালির ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। বেশিরভাগ সময় যখন গার্গী ও সায়ন কোথাও ঘুরতে যায়, তখন সে লুনাকে আগলে রাখে। এর ফলে গার্গী ও সায়নের ব্যাক্তিগত জীবন অনেকটাই নির্ঝঞ্ঝাট থাকে।

গার্গী সায়ন কলকাতায় না থাকলে কোম্পানির বিভিন্ন কর্মচারীদের ওপর তাদের অজান্তেই সে নজরদারি চালায়। পাশাপাশি কোনও রহস্যের সন্ধান পেলে গার্গীর জায়গায় সোনালিচাঁপা অনেকটা কাজ এগিয়ে রেখে দেয়। 'সবুজ কোমরবন্ধনী' রহস্যের শেষ জটটুকু গার্গী ছাড়ালেও এই কেসের সম্পূর্ণ অনুসন্ধান সোনালিই করেছে। 'ভূতুড়ে মুঠোফোন রহস্য এবং গার্গী'তে নামকরণের ক্ষেত্রে গার্গীর নাম থাকলেও পুরো রহস্যের সমাধান সোনালিচাঁপা করে। তারপর সে সবকিছু গার্গীকে জানানোর পর গার্গী বিষয়টা বিদীপ্তাকে জানায়। এছাড়া

সোনালিচাঁপার জন্য গার্গী ও সায়ন ঘুরতে গিয়ে একান্তে সময় কাটাতে পেরেছে। বিবাহিত জীবনের শুরুতে তাদের সম্পর্কের কোনও রোমান্টিক ছবি সেভাবে পাওয়া যায় না, কিন্তু এই পর্যায়ে এসে তাদের সুখি দাম্পত্যের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সোনালি লুনাকে আগলে রাখার ফলে গার্গী ও সায়ন যখন একে অপরকে সময় দেওয়ার অবকাশ পেয়েছে।

কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার মারা যাওয়ার পর বেআইনি ভাবে অ্যাবর্সান করা নার্সিংহোমের চক্রকে ধরার জন্য গার্গী ফাঁদ পাতে। সেখানে সোনালিকে গর্ভবতী মহিলা সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে অপরেশন থিয়েটারে তাকে পাঠায়, এর ফলে পুলিশ এই বেআইনি চক্রকে হাতেনাতে ধরতে পারে। সোনালিচাঁপা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই অভিনয় না করলে গার্গীর পক্ষে অপরাধীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হত না। সোনালিচাঁপা শুধুমাত্র গোয়েন্দাগিরিতে গার্গীর যোগ্য সহকারী হিসেবেই কাজ করেনি, 'নিষিদ্ধ নগরী'তে গার্গীরা যখন বিপদে পড়েছে। ভাষাগত সমস্যার জন্য সেই বিপদ থেকে বের হতে পারছে না, তখন সোনালি রূপবানের সাহায্যে তাদেরকে সেই বিপদ থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে এই সোনালিচাঁপা গার্গীর গোয়েন্দাগিরির সহকারী হয়ে গার্গীর গোয়েন্দাগিরির ভারই লাঘব করেনি তার বিভিন্ন ভাবে তার জীবনের জটিলতা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে।

- **<u>মা হওয়ার পর গোয়েন্দা গার্গী :</u>**

পেশাগত জীবনের পাশাপাশি গার্গীর দাম্পত্য জীবনও এগোতে থাকে। সায়নের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আস্তে আস্তে আর পাঁচটা দাম্পত্য সম্পর্কের মতো স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ঐন্দ্রিলার স্মৃতিকে মনে রেখেও তাদের জীবনে তাদের একমাত্র সন্তান লুনা আসে। লেখক নিজে গার্গীকে মা হিসেবে উপস্থিত করতে যতটা আগ্রহী ছিলেন, তার থেকেও বেশি আগ্রহ দেখা যায় পাঠকদের মধ্যে। 'গার্গী সমগ্র ৩'-এর ভূমিকায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন ---

> গার্গীর রহস্য কাহিনিগুলি বহু পাঠক যে খুব নিবিষ্ট ভাবে অনুসরণ করেন তার প্রমাণ পেয়েছি নানা সময়ে। তবে যে-পাঠক আমাকে এক সময়ে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, 'গার্গী আর সায়নের বিয়ে হয়েছে অনেক বছর, তাদের কেন এখনও সন্তান হয়নি, লেখক কি বিষয়টি ভুলে গেছেন,' তাঁকে খুবই ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিলাম, যথাসময়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করা হবে। লুনার জন্ম হয়েছিল তার পরের বছর।[১২]

‘৭৭ সবুজ সরণী’ উপন্যাসে দেখা যায় গার্গী গর্ভবতী অবস্থায় ‘গ্রীন ভিউ’ নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছে। উপন্যাসটি ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, বাংলা সাহিত্যে গার্গীর পদার্পণের এবং তার বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই সে সন্তানের জন্ম দেয়। তাই গার্গীর বেশির ভাগ কাহিনিতেই তার মা হওয়ার পরের জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। যদিও লেখক গার্গীকে নির্মাণ কারার পরে তার পূর্বজীবনের কাহিনি কিছু গল্পে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে সংখ্যার দিক থেকে তা খুব বেশি নয়।

গার্গীর মা হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা যে কাহিনিগুলিতে বর্ণিত হয়েছে ---

১। ইহুদি কন্যা রহস্য

২। ক্যাপসুল রহস্য

৩। কফিন রঙের রুমাল

৪। একটি ইমন সন্ধ্যা

৫। সোনার কেল্লায় গার্গী

৬। গোয়ায় গার্গী

৭। সবুজ দুপাট্টা রহস্য

৮। গড় চক্রায়ণে গার্গী

৯। পুরস্কার অপহরণ রহস্য

১০। চিনা ডাক্তারের হত্যা রহস্য

১১। পূর্বা অ্যাপার্টমেন্টে গার্গী

১২। রজনি হত্যারহস্য

১৩। গার্গীর এ বি সি ডি রহস্য

১৪। গার্গীর পিছু-পিছু রহস্য

১৫। হস্টেলে হত্যা

১৬। ড. ঋতম্ভর মিত্রর হত্যারহস্য

১৭। বিকানিরে এক রহস্যময়ী

১৮। মেরিন ড্রাইভ হোটেল রহস্য

১৯। পিঙ্কি হত্যা রহস্য

২০। টপস্পিন রহস্য

২১। পুরনো ইতিহাসের সন্ধানে গার্গী

২২। মুঘলযুগের যুগের হিরে রহস্য

২৩। অন্তরালে একজন

২৪। ফ্ল্যাটবাড়িতে জোড়া খুন

২৫। সবুজ স্কার্ফ

২৬। সবুজ কোমরবন্ধনী রহস্য

২৭। রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য

২৮। স্মৃতি বর্ধক ট্যাবলেট রহস্য

২৯। সাইবার রহস্য

৩০। ১ রঙের রহস্য

৩১। নিষিদ্ধ নগরীতে গার্গী

৩২। রঙের রহস্য

৩৩। অলিন্দে অশরীরী

৩৪। ধাঁধা রহস্য

৩৫। ভুতুতে মুঠোফোন রহস্য এবং গার্গী

৩৬। মুন্নারে মসলিন রহস্য

৩৭। ডি এন এ যখন ক্লু

৩৮। দি ভেনাস অন্তর্ধান রহস্য

৩৯। যখন কোথাও কোনও ক্লু নেই

৪০। হ্যাকিং রহস্য

৪১। ন্যুড পোর্ট্রেট রহস্য

৪২। স্মার্টফোন বনাম ট্যাব

৪৩। বান্টিহত্যা রহস্য

মা হওয়ার ফলে গার্গীর জীবনে বিশেষ কিছু পরিবর্তন আসেনি। শুধু লুনার উপস্থিতি জানান দেওয়ার জন্য কাহিনিগুলিতে কয়েকটি বাক্য অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে লুনা আর সব কর্মরতা মায়ের সন্তানের মতোই নিজের মতো করে বেড়ে উঠেছে। বাড়ির পরিচারিকার কাছেই মূলত বেড়ে উঠেছে, কখনওবা 'সোনালি মাসি'র সান্নিধ্যে আনন্দে কেটেছে। তার ফলে গার্গীর কর্মজীবন আলাদা করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এমনকি গার্গী ও সায়নের সঙ্গে বেড়াতে গেলে যদি সঙ্গে সোনালিচাঁপা থাকে, তাহলে সে বেশির ভাগ সময় তার কাছেই থাকতে চেয়েছে। আসলে লেখক একটি বুদ্ধিদীপ্ত নারীর কাঁধে আদর্শ মা হয়ে ওঠার খাঁড়া ঝোলাতে চাননি, যা বাস্তব চিত্র তাই-ই তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

'অলিন্দে অশরীরী' কাহিনিতে দেখা যায়, প্রথমবারের জন্য লুনাকে সোনালিচাঁপার কাছে রেখে সায়ন ও গার্গী দুজনে 'আলতাপুর রাজবাড়ি'র রহস্য উদ্ঘাটনে বেরিয়ে পড়েছে। বাবা-মা তাকে ছেড়ে বেড়াতে যাচ্ছে দেখে লুনা খুব অবাক হয়েছে, কিন্তু তাকে অসুবিধার কথা বোঝানোর পর সে বিষয়টাকে সহজ ভাবেই মেনে নিয়েছে। যে কাহিনিগুলোতে শিশু লুনা বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুরতে গেছে, সেখানেও লুনার উল্লেখযোগ্য কোনও ভূমিকা চোখে পড়ে না। সে মাঝে মধ্যে অবাক হয়ে নানা রকম প্রশ্ন করে, নাহলে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। শুধুমাত্র 'সোনার কেল্লায় গার্গী' কাহিনিতে দেখা যায় লুনা তার বাবা মায়ের সঙ্গে রাজস্থানে ঘুরতে গেছে। একদিন লুনা গার্গীকে বলে অনেকদিন ধরে পড়াশুনো হচ্ছে না, গার্গী তখন তাকে 'অঙ্কের ম্যাজিক' শেখাতে থাকে। সেই সময় তাদের ঘরে তাদের সহযাত্রী ধৃতিমান জয়সয়াল প্রবেশ করে। লুনা অঙ্কের ম্যাজিক নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে হেসে এড়িয়ে যায়, বলে তার মাথায় অঙ্ক খুব বেশি ঢোকে না। অথচ, প্লেনে করে একসঙ্গে আসার সময় সে গার্গী ও সায়নকে জানিয়েছিল সে একটি কলেজে গণিতের অধ্যাপক। ফলত গার্গীর খটকা লাগে, সে তার ওপর নজর রাখতে শুরু করে।

লুনার ছোটবেলার কাহিনিগুলিতে তার বিশেষ কোনও ভূমিকা না থাকলেও বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লুনা রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে গার্গীকে বেশ সাহায্য করতে শুরু করেছে। 'মুন্নারে মসলিন রহস্য' উপন্যাসে দেখা যায় লুনা নবম শ্রেণিতে পড়ে। বেড়াতে গিয়ে তার মোবাইলে ভিডিও রেকর্ড করতে করতে মিস্টার তলাপাত্রের বোটে মিস্টার পাকড়াশির ধাক্কা দিতে যাওয়ার দৃশ্য রেকর্ড করে ফেলে। অন্যদিকে লুনার তোলা ভিডিও দেখেই জানা যায় মিস্টার তলাপাত্রের ঘরে পাওয়া যাওয়া লাইটারটি আসলে মিস্টার গোস্বামীর। এই ভিডিও দুটোর জন্যই গার্গী খুব সহজে পুলিশের সামনে নিজের অনুমান সঠিক বলে প্রমাণ করতে পারে। 'ন্যুড পোর্ট্রের্ট রহস্য'তে দেখা যায়, লুনা একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। বয়সে সে বড় হয়ে উঠেছে, পাশাপাশি তার নিজস্ব জীবন দর্শন গড়ে উঠছে, যা গার্গীর চেয়ে বেশ অনেকটাই আলাদা। এই কাহিনিতে লুনার ভূমিকা বেশ অনেকটাই। গার্গীর সঙ্গে তার পরবর্তী প্রজন্মের মতামতের পার্থক্যকে লেখক তুলে ধরেছেন। গার্গীর যখন মনে হয়েছে একটি নারীর ন্যুড ছবি আঁকা ঠিক নয়, লুনা বলেছে একজন তাঁর ঘরে কার কেমন ধরণের আঁকা ছবি রেখে দেবেন, তা নিতান্তই তাঁর ব্যাক্তিগত বিষয়। বয়সের সঙ্গে গার্গীর মানসিকতায় খানিক পরিবর্তন এসেছে। 'বহে বিষ বাতাস' উপন্যাসে কলেজের সহপাঠী ডোনার বাড়িতে গিয়ে তার বাবার আঁকা ন্যুড ছবি দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখানে নিজের মেয়ের সঙ্গে সেই ছবি দেখতে বা তা নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তার মধ্যে তেমন অস্বস্তি দেখা যায় না। লুনা গার্গীর পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে এই কাহিনিতে খুব বলিষ্ঠ ভাবে উপস্থিত। তবে 'ন্যুড পোর্ট্রের্ট রহস্য'তে লুনাকে একটু বেশি উচ্চকিত করতে গিয়ে লেখক গার্গীকে খাটো করে ফেলেছেন। গার্গী তার মোবাইলে যে ছবিটি তুলেছে সেটা দেখে নিজেই মডেলকে শনাক্ত করতে পারত, কিন্তু লেখক এই জায়গায় লুনাকে দিয়ে মডেল শনাক্ত করিয়েছেন। এটা করার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না।

❖ কাহিনি বিশ্লেষণ :

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গার্গীর কাহিনিগুলি নিয়ে দে'জ পাবলিশিং হাউস থেকে যে বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি হল:

১। গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ১ (জানুয়ারি ২০১১) – তিনটি কাহিনি

২। গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ২ (এপ্রিল ২০১২) – তিনটি কাহিনি

৩। গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৩ (জানুয়ারি ২০১৩) – তিনটি কাহিনি

৪। গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৪ (জানুয়ারি ২০১৪) – দুটি কাহিনি

৫। গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৫ (জানুয়ারি ২০১৫) – ছয়টি কাহিনি

৬। গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৬ (জানুয়ারি ২০১৬) – সাতটি কাহিনি

৭। গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৭ (জানুয়ারি ২০১৯) – নয়টি কাহিনি

৮। গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৮ (এপ্রিল ২০২২) – তেরটি কাহিনি

৯। গোয়েন্দা গার্গী কিশোর সমগ্র (জানুয়ারি ২০১৭) – সতেরটি গল্প

১০। রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য (এপ্রিল ২০১৭) – একটি উপন্যাস

কাহিনি	রচনাকাল	প্রকাশকাল
ঈর্ষার সবুজ চোখ	অক্টোবর ১৯৯০ – সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	জানুয়ারি ১৯৯৫
বহে বিষ বাতাস	মার্চ ১৯৯২ - নভেম্বর ১৯৯৪	জানুয়ারি ১৯৯৬
হলুদ খামের রহস্য	জুলাই ১৯৯৭ – অক্টোবর ১৯৯৮	জানুয়ারি ১৯৯৯
ধূসর মৃত্যুর মুখ	জুন ১৯৯৬ – ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭	অক্টোবর ১৯৯৭
সোনালি সুতোর ফাঁস	জুলাই ২০০০ – নভেম্বর ২০০০ পরিমার্জন : অক্টোবর ২০০৩	বইমেলা ২০০৮

ইহুদি কন্যা রহস্য	আগস্ট ২০০৩ /পরিমার্জনা : জানুয়ারি ২০০৪	জানুয়ারি ২০০৪
নীল রক্ত নীল বিষ	এপ্রিল ১৯৯৯ – জানুয়ারি ২০০০	অক্টোবর ২০০০
ক্যাপসুল রহস্য	--	জানুয়ারি ২০১১
কফিন রঙের রুমাল	--	জানুয়ারি ২০০৮
৭৭, সবুজ সরণী	--	২০০৩
একটি ইমন সন্ধ্যা	--	--
সোনার কেল্লায় গার্গী	--	--
গোয়ায় গার্গী	--	--
সবুজ দুপাট্টা রহস্য	--	--
গড় চক্রায়ণে গার্গী	--	--
পুরস্কার অপহরণ রহস্য	--	--
চিনা ডাক্তারের হত্যা রহস্য	--	--
পূর্বা অ্যাপার্টমেন্টে গার্গী	--	--
রজনি হত্যারহস্য	--	--
গার্গীর এ বি সি ডি রহস্য	--	--
গার্গীর পিছু-পিছু রহস্য	--	--
হস্টেলে হত্যা	--	--
ড. ঋতম্ভর মিত্রর হত্যারহস্য	--	--
বিকানিরে এক রহস্যময়ী	--	--
মেরিন ড্রাইভ হোটেল রহস্য	--	--
পিঙ্কি হত্যা রহস্য	--	--
টপস্পিন রহস্য	--	--
পুরনো ইতিহাসের সন্ধানে গার্গী	--	--

মুঘলযুগের যুগের হিরে রহস্য	--	--
অন্তরালে একজন	--	--
ফ্ল্যাটবাড়িতে জোড়া খুন	--	--
সবুজ স্কার্ফ	--	--
সবুজ কোমরবন্ধনী রহস্য	--	--
নিষিদ্ধ নগরীতে গার্গী	--	--
রঙের রহস্য	--	--
অলিন্দে অশরীরী	--	--
ধাঁধা রহস্য	--	--
ভূতুড়ে মুঠোফোন রহস্য এবং গার্গী	--	--
মুন্নারে মসলিন রহস্য	--	--
ডি এন এ যখন ক্লু	--	--
দি ভেনাস অন্তর্ধান রহস্য	--	--
যখন কোনও ক্লু নেই	--	--
হ্যাকিং রহস্য	--	--
ন্যুড পোর্ট্রেট রহস্য	--	--
স্মার্টফোন বনাম ট্যাব	--	--
বান্টি হত্যা রহস্য	--	--
রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য	--	--

গার্গী সমগ্রের প্রথম দুটি খণ্ডে কাহিনিগুলির রচনাকাল ও প্রকাশ কালের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৃতীয় খণ্ডে কাহিনিগুলির প্রকাশকালের উল্লেখ থাকলেও রচনাকালের উল্লেখ নেই। চতুর্থ খণ্ড থেকে রচনাকাল ও প্রকাশকালগত তথ্য সম্পূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত। সেই কারণে এই ছকটি রচনাকাল বা প্রকাশকাল অনুযায়ী সাজানো সম্ভব হল না। প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ডের সূচিপত্রের ক্রম অনুযায়ী কাহিনিগুলি সাজানো হল। এছাড়া গোয়েন্দা গার্গী কিশোর সমগ্রতে যে কাহিনিগুলি রয়েছে, সেগুলি হল ---

১। ক্যামেরা হরণ রহস্য

২। বাক্ষীলিপির রহস্য

৩। রুমকির হত্যারহস্য

৪। অষ্টধাতুর অশ্বমূর্তি রহস্য

৫। স্মৃতিবর্ধক ট্যাবলেট রহস্য

৬। সাইবার রহস্য

৭। ১রঙের রহস্য

৮। মুক্তোর মালায় দুটো হীরের টুকরো

৯। কিঙ্কর হত্যা রহস্য

১০। ধুমকেতু - রহস্য

১১। গ্রহান্তরের প্রানী

১২। অপরাধী শনাক্তকরণ

১৩। হিরের আংটি

১৪। দন্ত অন্তর্ধান রহস্য

১৫। ম্যাকবেথ অন্তর্ধান রহস্য

১৬। নেপথ্যে এক আততায়ী

১৭। পাহাড়খনির হিরে রহস্য

- **গার্গী কেন্দ্রিক উপন্যাস :**

গার্গীকে নিয়ে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাসগুলিকে নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির ধারায় এগুলো আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। ‘গোয়েন্দা গার্গী কিশোর সমগ্র’র মলাটে লেখা রয়েছে ‘এ পর্যন্ত তিরিশটি গোয়েন্দা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে লেখকের’। তাছাড়া ‘গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৭’এর ভূমিকায় লেখক বলেন,

‘আড়াই দশকে গার্গীকে নিয়ে লেখা হয়ে গেল পঁয়ত্রিশটি উপন্যাস’। বোঝা যায় তিনি গার্গী সমগ্রের সাতটি খণ্ডে থাকা চৌত্রিশটি কাহিনি ও ‘রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য’ উপন্যাসকে তাঁর এই হিসেবের মধ্যে রেখেছেন। কিন্তু সাতটি খণ্ডে থাকা সবকটি কাহিনিকে উপন্যাস বলা চলে না। যদিও প্রায় সবকটি কাহিনিই আকৃতিগত দিক থেকে গোয়েন্দা কাহিনির তুলনায় অনেকটা বেশি, কিন্তু লেখক যেহেতু রহস্য কাহিনির তকমার বাইরে নিয়ে গিয়ে গার্গীকে নিয়ে কয়েকটি যথাযথ উপন্যাস লিখেছেন, তাই সেগুলিকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র আকৃতিগত দিক থেকে নয়, কাহিনির চরিত্র নির্মাণ ও প্রেক্ষাপট রচনার কথা মাথায় রেখে আলোচনা করলে দেখা যায়, গার্গীর কাহিনিগুলির মধ্যে যথাযথ উপন্যাস বলা যেতে পারে যেগুলিকে, সেগুলি হল ---

১। বহে বিষ বাতাস

২। ঈর্ষার সবুজ চোখ

৩। ধূসর মৃত্যুর মুখ

৪। হলুদ খামের রহস্য

৫। ৭৭, সবুজ সরণী

৬। সোনালি সুতোর ফাঁস

৭। ইহুদি কন্যা রহস্য

৮। নীল রক্ত নীল বিষ

৯। রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য

১০। নিষিদ্ধ নগরীতে গার্গী

১১। মুন্নারে মসলিন রহস্য

এই কাহিনিগুলি শুধুমাত্র রহস্য কাহিনিতেই আবদ্ধ থাকেনি। কিংবা ‘রহস্য উপন্যাস’ হিসেবেই এগুলিকে দেগে দেওয়া যায় না। এই উপন্যাসগুলি প্রকৃত অর্থেই উপন্যাস। অর্থাৎ, শুধুমাত্র রহস্য সন্ধানী পাঠক নয়, উপন্যাস প্রেমী পাঠকও এগুলি থেকে রসাস্বাদন করতে পারে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনারা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, তিনি সবকিছু খুব নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেন। এস এস ভ্যানডাইনের 'টোয়েন্টি রুলস ফর রাইটিং ডিটেকটিভ স্টোরিজ'-এর ১৬ নম্বর নিয়মে বিশদ বিবরণ, লম্বা ব্যাখ্যা, প্রাকৃতিক বর্ণনা ইত্যাদি বর্জন করার কথা বলেন। কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিগুলিকে সেই নিয়মের একদম বিপরীতে রাখেন। তাঁর সব কাহিনিতেই বর্ণনার আধিক্য চোখে পড়ে। তিনি পাঠকের সামনে একটি স্পষ্ট চিত্র নির্মাণ করতে চান। সেই কারণে প্রাকৃতিক বর্ণনা থেকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা তাঁর প্রায় সব কাহিনিতেই লক্ষ করা যায়। একমাত্র কিশোর কাহিনিগুলি তার ব্যাতক্রম। সেগুলিকে তিনি একেবারেই একমুখী সরল গতিতে এগোনো গল্প হিসেবেই নির্মাণ করেন। বাকি গল্পগুলোতেও আমরা সবকিছুর নিখুঁত বিবরণ পাই। আর উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই প্রবণতা আরও বেশি করে চোখে পড়ে। উপরোক্ত নয়টি উপন্যাস উপন্যাস পদবাচ্য হওয়ার সব উপাদান সহ পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেই তা সহজে বোঝা যায়।

বীরভঙ্গপুরের রানিমা হত্যা কাহিনির মধ্য দিয়ে 'বহে বিষ বাতাস' উপন্যাসের শুরু হয়। কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সেই প্রসঙ্গ আস্তে আস্তে কাহিনি থেকে উধাও হয়ে যায়। বরং রানিমার সম্পত্তি পাওয়া অলর্ক বোস, ডোনা, মন্দার, শিহরণ রায় চৌধুরী, মনীশ রায়, রণজয় দত্ত উপন্যাসের কেন্দ্রে চলে আসে। এক কথায় ডোনার পারিবারিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের চরিত্রগুলিকে নিয়ে কাহিনি আবর্তিত হতে থাকে। লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্রী ডোনা চ্যাটার্জির জীবনের ছবি দেখাতে গিয়ে তৎকালীন আধুনিক মেয়ের জীবন যাপন চিত্র তুলে ধরেন। শুধু একজনের নয়, বিভিন্ন ধরণের ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ফুটয়ে তোলেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ চিত্রও খুব নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলেন। একটি বিভাগের প্রফেসরদের মধ্যে কিরকম পেশাগত রেষারেষি থাকে, একজনের জনপ্রিয়তার ফলে আরেকজন কতটা ক্রূর হয়ে উঠতে পারেন, কিভাবে উচ্চপদে আসীন হওয়ার জন্য তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে --- এই সবকিছুকে তিনি এই উপন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন। জনপ্রিয় অধ্যাপক মনীশ রায় রিডার পদে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রবল চেষ্টা করতে থাকেন। এমনকি তার জন্য তাঁর বিবাহিত জীবনেও সমস্যা তৈরি হয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি শুধুমাত্র নিজের কেরিয়ারের দিকেই মনোযোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনার আয়োজিত হওয়ার কথা হলে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে থাকেন ।

> টেনশনে থাকার অন্যতম কারণ হল সেমিনারের দিন সারাক্ষণ উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং ভাইস চ্যান্সেলর। যে সব অধ্যাপকেরা পেপার পড়বেন তাঁদের প্রত্যেকের বিষয়বস্তু, তার গভীরতা, লেখার বিশ্লেষণ, এসবকিছুই নাকি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন উনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব শিগগির রিডারের একটি পোস্ট খালি হচ্ছে। রিডারের পদ মনোনয়নের আগে এই সেমিনারটিকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন ভাইস চ্যান্সেলর। স্বাভাবতই একে সমীহ করছে সব অংশগ্রহণকারী অধ্যাপকও। মনীশ তো গত পনের কুড়িদিন যাবৎ পাগলের মতো পড়াশুনো করছেন, নোট নিচ্ছেন, অবশেষে গত দিন তিনেক ধরে প্রবন্ধটি একটি শেপে আনার চেষ্টা করছেন। কমদিন হল না তাঁর চাকরি, এখন রিডার হবার সব যোগ্যতাই তাঁর হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে সেমিনারটির গুরুত্ব তাঁর কাছে খুবই বেশি।[১৩]

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছাড়াও উপন্যাসে উঠে আসে অলর্ক বোসের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের পরিকল্পনা, আর উঠে আসে নাম না করতে পারা আর্টিস্ট চিত্রদীপ চ্যাটার্জির জীবন, যিনি টাকা রোজগারের জন্য পত্রিকায় কমিক স্ট্রিপ আঁকেন। কিন্তু অলর্ক বোস যখন তাঁকে তার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর সাজিয়ে দেওয়ার কথা বললে তিনি সেই কাজ করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু টাকার অঙ্কের কাছে তাঁর শিল্পী সুলভ গর্ববোধ মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। তাছাড়া অলর্ক নিজের খরচে তাঁর ছবির প্রদর্শনীর করার কথা বললে তিনি আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।

এই উপন্যাসে চারটি খুন হতে দেখা যায়। মন্দার রানিমা লাবণ্যপ্রভাকে হত্যা করে রাগের মাথায়, সে তাঁর মেয়ের সন্তান হওয়ার পরও তিনি তাকে সম্পত্তি দিতে রাজি হননি। বীরভঙ্গপুরে সে ছদ্মবেশে ছিল, কিন্তু রাজবাড়ির আশ্রিত হরিশঙ্কর চৌধুরী কলকাতায় তাকে আসল রূপে দেখেও চিনে ফেলে। তাই তাকে হত্যা করে মন্দার অলর্কর বাড়ির কাছে শবদেহ ফেলে আসে। মন্দার সম্পত্তি কোনও ভাবেই আদায় করতে পারবে না বুঝতে পারার পর অলর্কর কোম্পানির টেন্ডারটা পেতে চায়। সে কাজে বাধ সাধে শিহরণ, তাই মন্দার তাকেও খুন করে। অডিটোরিয়ামে ছদ্মবেশে গিয়ে হত্যা করে আসলেও তাকে ডোনাদের বাড়িতে দেখে প্রায় চিনতে পেরে যায় অধ্যাপক মনীশ রায়, তাই তাঁকেও খুন করে মন্দার। কিন্তু কোনও খুনের দৃশ্যই কৃত্রিম ভাবে আরোপিত বলে মনে হয়না। লেখক তাঁর উপন্যাসে যে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটকে ধরতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে মূল ক্রাইম

কাহিনি একেবারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আর এমন ভাবে লেখক উপন্যাসের কাহিনি বুনেছেন, যেখানে পাঠক বারবার করে বিভ্রান্ত হতে বাধ্য হয়েছে।

'ঈর্ষার সবুজ চোখ' উপন্যাসে ঘটনা শুরু হয় সায়ন জেল থেকে জামিনে ছাড়া পাওয়ার দিন। ৬এপ্রিল সায়নের স্ত্রী ঐন্দ্রিলা খুন হয়। ওইদিন সকালে বিলাসপুরের ট্যুর থেকে যখন বাড়ি ফেরে তখনই পুলিশ তার সঙ্গে তার মা ও ভাই হিমনকে গ্রেফতার করে। খবরের কাগজে তার ও তার মায়ের বিষয়ে নানা রকম কুরুচিকর লেখা বের হতে থাকে। সরকারি উকিলও ঘটনা সাজিয়ে খুব কদর্য ভাবে উপস্থাপন করে। এখানে সাংবাদিকতার নিকৃষ্ট দিককে লেখক চোখে আঙুল দিয়ে দেখান। প্রতিদিন সংবাদপত্রে সায়নের বিষয়ে নানা রকম মশলাদার খবর প্রকাশিত হতে থাকে। এমনকি তার পারিবারিক ইতিহাস, তার মা চন্দ্রাদেবীর সঙ্গে নীল ও ব্রায়েনের সম্পর্ক, তার বাবার আত্মহত্যা করে মারা যাওয়ার ঘটনা নিয়েও লেখালেখি হতে থাকে। গার্গী সায়নকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে থাকলে তার নাম জড়িয়েও মুখরোচক খবর উপস্থাপিত হয়। যার জেরে সে দাদা-বউদির সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। লেখক সায়নের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে ঐন্দ্রিলা ও সায়নের সংসার জীবনের ছবিও খুব স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাশাপাশি চন্দ্রাদেবী হিমন দীয়া নীল ও ব্রায়েন চরিত্রগুলিকে তিনি খুব নিপুণ ভাবে নির্মাণ করেছেন। কিন্তু এই উপন্যাসের সবচেয়ে উল্লেখ্য অংশ হল 'প্যারাডাইস প্রোডাক্ট' আর 'লাইম ইণ্ডিয়া' কোম্পানির রেষারেষির চিত্র।

সায়ন আমেরিকা থেকে পড়াশুনো করে এসে নিজের সাবান কোম্পানি 'প্যারাডাইস প্রডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড' তৈরি করে। বাজারে গোলাপের গন্ধযুক্ত 'রোজবেরি' নামের সাবান বের করে। তা প্রডাক্টের গুনে এবং ভালো বিজ্ঞাপনের ফলে খুব জনপ্রিয় হয়। সায়ন নিজের ফ্ল্যাটের পিছনে একটি ল্যাবরেটরি রুম বানিয়ে নেয়। সেখানে নানা রকম গবেষণা করে গায়ে মাখা সাবান বানাতে থাকে। ইতিমধ্যে বাজারে থাকা সবচেয়ে বড় সাবান কোম্পানি 'লাইম ইণ্ডিয়া'কে পিছনে ফেলে এগোতে থাকে। দেখা যায়, "বছরে কোম্পানির টার্নওভার প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে। প্রতি বছরই দশ-পনের লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে, ব্যাঙ্কের ক্রেডিট লিমিট ছাড়িয়ে আরও বারো কোটি টাকা ওভার-ড্রাফট চলছে।"[১৪]

সায়নের ব্যাক্তিগত জীবন নিয়ে খবরের পাতায় নেতিবাচক খবর ছাপা হচ্ছে দেখে লাইম ইণ্ডিয়া তাদের প্রডাক্টের বিজ্ঞাপনে আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ করতে থাকে। দেবাশিষ মজুমদার 'লাইম ইণ্ডিয়া'র অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার রৌণক মুখার্জির কাছে বিজ্ঞাপন চাইতে গিয়ে তাঁর ব্যাক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার যে গল্প শোনান, তা খানিকটা হলেও

পাঠকের মনে বিজ্ঞাপন জগত সম্পর্কে ধারণা জোগাতে সক্ষম। সায়নের ব্যাক্তিগত জীবনের আলোচনা ও 'লাইম ইণ্ডিয়া'র আক্রমণাত্মক বিজ্ঞাপনের ফলে 'প্যারাডাইস প্রোডাক্ট' যখন লোকসানের মুখে চলে যাচ্ছে তখন গার্গীকে সায়ন তার কোম্পানিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করার কথা বলে। গার্গী চাকরিতে বহাল হওয়ার পরই সায়নের বানানো নতুন সাবানের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বেশ অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। সে কোম্পানির নাম উল্লেখ না করে সাবানের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কয়েকদিন ধরে একটু একটু করে গোটা বিজ্ঞাপন আস্তে আস্তে উন্মোচিত হতে থাকে ---

> আপনার বয়স যদি হঠাৎ পাঁচ, দশ কিংবা পনের বছর কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আপনি কী করবেন ?
>
> ...... সেই একই বিজ্ঞাপন, শুধু তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও কয়েকটি লাইন : যদি আপনার ত্বক আরও মোলায়েম আরও মসৃণ হয়, যদি আপনার স্নানের পর সারাদিন ধরে গায়ে ফুরফুর করে জুঁইফুলের গন্ধ ......
>
> ...... কাল এই বিজ্ঞাপনটাই আবার রিপিট হবে। আমাদের কোম্পানির নাম না দিয়েই। কেবল পরশু বেরোবে এর সঙ্গে আর এক লাইন : মসৃণ ত্বকের জন্য নতুন সাবান : জেসমিন ফ্লেভার সোপ।[১৫]

এই কাহিনির বেশির ভাগ অংশ জুড়ে 'লাইম ইণ্ডিয়া' ও 'প্যারাডাইস প্রোডাক্ট'-এর অফিসের ছবি রয়েছে। আর তা শুধুমাত্র ব্যাক্তি মানুষের সমস্যার কথা বর্ণনার জন্য নেই, লেখক দুটি কোম্পানির বিভিন্ন কাজকর্ম, বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের অবস্থান, অফিসের সমস্যা সবকিছু খুব নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন।

এই কাহিনিতে হত্যাকারী দীয়া সরাসরি এই দুই সাবান কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত নয়। সে সায়নের ভাই হিমনকে বিয়ে করার পর দুই ভাইয়ের আর্থিক অবস্থা দেখে সায়নের স্ত্রী ঐন্দ্রিলার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় ঠিকই, কিন্তু শুধুমাত্র সেই কারণেই সে ঐন্দ্রিলাকে হত্যা করেনা। হিমনের হাত থেকে বেরিয়ে সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও সম্মান অর্জন করতে পারেনা। তাই এমন একজন পুরুষকে সে চায় যার হাত ধরে সে নিজেকে হাই সোসাইটির একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। 'লাইম ইণ্ডিয়া'র রাহুল রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে তার স্বপ্নের পথে এগোতে চায়। আর সেই কারণেই সে রাহুলের কথা মতো সায়নের গবেষণার কাগজপত্র চুরি করে আনতে যায়। ঐন্দ্রিলা তাকে বাধা দিলে, সে তাকে হত্যা করে।

'ধূসর মৃত্যুর মুখ' উপন্যাসে 'সোনালি ঘুঙুর' সিরিয়ালের নায়িকার হত্যার জট ছাড়াতে গিয়ে গার্গী 'সিনেমুভি' প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। নায়িকা বর্ণনা সেনগুপ্ত খুন হওয়ার ফলে 'সিনেমুভি'র পরিচালক ঋষভের অনুরোধে গার্গী রেশম বাইয়ের ভূমিকায় অভনয় করতে রাজি হয়। এই উপন্যাসে একটি সিরিয়াল গড়ে ওঠার পিছনে প্রযোজকের টাকা নিয়োগ, নায়িকা নির্বাচন, অভিনেতাদের মধ্যে অবনিবনা, সিরিয়ালের স্যুটিং প্রসেস সবকিছুর অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। আর চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নিপুণতার কথা বলাই বাহুল্য। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে 'সোনালি ঘুঙুর' সিরিয়ালের গোটা স্ক্রিপ্টকে লেখক তুলে ধরেছেন। এমনকি সিরিয়ালে ব্যবহৃত গানগুলির কথাও রয়েছে, পাশাপাশি তিনি রেশম বাই চরিত্রটিকে যথাযথ ভাবে উপস্থাপনের জন্য তাঁর গাওয়া রাগের সময়, ঠাট সবকিছুর উল্লেখ করেছেন।

> তখনও রাত্রির তৃতীয় প্রহরের দেরি আছে দেখে প্রথমে বাগেশ্রী শোনাল রেশম বাই।
>
> ...... আবারও কিছু বিশ্রাম নিয়ে রেশমবাই শুরু করল তার নতুন মেহমানের ফরমায়েশ করা যা তার নিজেরও প্রিয় সেই মালকোষ। ভৈরবী ঠাটের এই খেয়ালটি গাওয়ার আগে রেশম নিজেও তাই তন্ময় হয়ে সেধতে লাগল নিজের গভীরে।...... স্থায়ীতে শুরু করল, 'পগ লাগন দে মহারাজকুবার'।[১৬]

এই কাহিনির গতিপথ একমুখী। আগের উপন্যাসগুলোয় যেমন উপকাহিনি এসে কাহিনির মূল স্রোতে মেশে, এক্ষেত্রে তা হয়নি। উপকাহিনির জায়গায় এখানে রয়েছে 'সোনালি ঘুঙুর'-এর স্ক্রিপ্ট। সুস্নাত তালুকদার, বর্ণনা ও লোচ্চা তিনজনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই সিরিয়ালের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যই খুন হন। আর অপরাধী ঋষভ নাটকীয় ভাবে সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে।

'হলুদ খামের রহস্য'তে সমাজের উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়িত মূল্যবোধের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। নীলধ্বজের অসৎ পথে উপার্জন করা টাকার ওপর পুলিশ অফিসার সত্যব্রতর চোখ পড়ে। সে সরাসরি তার ভাগ চায়, নাহলে তাকে আইনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। নীলধ্বজ তার সঙ্গে বন্ধুত্বপুর্ণ ব্যবহার করে, তাকে বাড়িতে নিয়ে যায়, স্ত্রী বৃন্দার সঙ্গে আলাপ করায়। সত্যব্রত এরপর বৃন্দাকে পেতে চায়। একথা তার স্ত্রী বিনীতাকে জানায়। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়না। বৃন্দা তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তার নাটকের দলের অপরূপার সঙ্গে সত্যব্রতর আলাপ করিয়ে দেয়। কিন্তু

নানা রকম সম্পর্কের জটিলতার ফলে সত্যব্রত নিজের স্ত্রী বিনীতাকে হত্যা করে। এখানে সম্পর্কের জটিলতার ছবি যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল লেখক পুলিশের মধ্যে থাকা অসৎ, খারাপ চরিত্রের ক্রূর মানুষের চিত্রও পাঠকের সামনে হাজির করেছেন।

অনেক গোয়েন্দা কাহিনিতেই দেখা যায় গোয়েন্দা ড্রাগ পাচারকারী দলকে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু এই তথ্যের পাশাপাশি সেই ড্রাগ পাচার চক্রের আভ্যন্তরীণ জগতের পরিচয় খুব বেশি পাওয়া যায় না। ‘সোনালি সুতোর ফাঁস’ উপন্যাসে লেখক এই জায়গাটাকে খুব মুন্সিয়ানার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

কলকাতার তিনটি সম্ভ্রান্ত বাড়ির স্কুল পড়ুয়া কিশোর --- টিটো, জোজো ও টপ্পা, ঘুরতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরোয়। কিন্তু নির্দিষ্ট টিটো ও টপ্পা ফিরে আসেনা। জোজো একবারের জন্য বাড়ি ফেরে কিন্তু তারপর দিনই সে একটু বেরচ্ছে বলে বাড়ি থেকে চলে যায়। টিটো বাড়িতে ফোন করে জানায়, সে কলকাতায় ফিরেছে, কিন্তু তখনি বাড়ি ফিরতে পারছে না কয়েকদিন বাদে বাড়ি ফিরবে। কয়েকদিনের মধ্যেই বাঘাজতীন স্টেশনের কাছে টপ্পার লাশ পাওয়া যায়। একটি সোনালি সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। জোজোর বাড়িতে গিয়ে বর্ণালী এবং গার্গী পুলিশি জেরা শুনে জানতে পারে যে জোজো বাড়ি থেকে মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল, আর টপ্পা টাকা গয়না ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল। অন্যদিকে টিটো ষাট হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়েছে। পুলিশ সন্দেহ করে যে টপ্পাকে জোজো খুন করেছে, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই জোজোর মৃতদেহ পাওয়া যায়। সন্দেহের তির টিটোর দিকে ঘুরে যায়। গার্গী টিটোর পড়ার ঘরে তল্লাশি করে একটি টেক্সটবুক লাইব্রেরির কার্ডের সন্ধান পায়। টিটোর পাঠ তালিকাতে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয়ের বই দেখে অবাক হয়, নিজেও সেই ধরনের বই পড়তে থাকে লাইব্রেরিতে। কয়েকদিন যাওয়ার পর এই আশ্রম চালিত গ্রন্থাগারের এক সন্ন্যাসী এসে গার্গীর সঙ্গে কথা বলে এবং তাকে আধ্যাত্মিক সমাবেশে যোগদানের জন্য একটি কার্ড দেয়। গার্গী সেই সমাবেশে যায়। স্বামীজি তাকে আশ্রমের সদস্য হওয়ার জন্য নির্বাচিত করেন।

গার্গী আশ্রমের সদস্য হতে রাজি হয়। কোথায় যাওয়া হবে সে কথা তাকে আগে থেকে জানানো হয়না। নির্দিষ্ট দিনে তাকে গাড়ি করে আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গিয়ে সে সব মস্তক মুণ্ডিত সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদের দেখতে পায়। আর বুঝতে পারে এই আশ্রম আসলে অবাধ যৌনতার মুক্ত ক্ষেত্র। পাশাপাশি এই আশ্রমের নামে আসলে ড্রাগের কারবার চালানো হয়। টিটোর কাছ থেকে জানতে পারে কিছুদিন আগে গায়েত্রী নামের

একটি মেয়ে এসে ফিরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু মঠে একবার এলে আর ফেরা যায়না। মেয়েটি ফেরার জন্য নাছোড়বান্দা ছিল, এমনকি পুলিশে সবকিছু জানিয়ে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল। সেই কারণে তাকে খুন করা হয়। আর তার জায়গায় গার্গীকে আনা হয়েছে। বিভিন্ন আশ্রমে কিভাবে এই ধরণের অনৈতিক কাজ চলে তার একটি বিশ্বাসযোগ্য ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি সাধু সেজে থাকা মানুষরা কিভাবে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মানুষকে বোকা বানায় তার ছবিও লেখক তুলে ধরেছেন --- "উনি ঘরের মধ্যে আমাকে একা পেয়ে বিভ্রান্ত করতে চাইলেন তাঁর ম্যাজিক দেখিয়ে। সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ব্রোমাইড ক্লোরাইড মিশিয়ে বোরিয়াম সালফেটের প্রেসিপিপেট দেখিয়ে দুধ তৈরি করেছেন বললেন।"[১৭]

অনৈতিকতার আখড়া বিভিন্ন আশ্রমের বিভিন্ন খরাখবর খবরের কাগজে আমরা পড়েছি। কিন্তু এই বিষয়ের ওপর উপন্যাস বোধয় খুব কমই লেখা হয়েছে।

'৭৭ সবুজ সরণী' উপন্যাসে দেখা যায় দক্ষিণ কলকাতার নামকরা 'গ্রিন ভিউ' নার্সিংহোমে গর্ভবতী অবস্থায় গার্গী ভর্তি হওয়ার পর সেখানে একটার পর একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে থাকে। গার্গী তার স্বভাব অনুযায়ী তদন্তে নেমে পড়ে। প্রথমে মিলিতা বিশ্বাস নামের একটি মেয়ে ডাক্তার মল্লিকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মামলা করে, তারপর ছন্দাবলী নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে বাচ্চা বদলের অভিযোগ করে।

এই উপন্যাসের একদিকে যেমন নার্সিংহোমের মধ্যেকার দুর্নীতির ছবি উঠে এসেছে, পাশাপাশি সিরিয়াল ও নাটক জগতের ছবিও ফুটে উঠেছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই উপন্যাসে কোর্টের সওয়াল- জবাবের দীর্ঘ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। গোয়েন্দা কাহিনির একটি স্বল্প প্রচলিত ধারা 'কোর্টরুম ড্রামা'র খানিক পরিচয় পাওয়া যায়।

গোটা কাহিনিতে একটি সিরিয়ালের কাহিনিও ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, একে অপরকে ঠকিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা এসবকিছুকে তিনি উপন্যাসের আওতায় নিয়ে আসেন। রূপসী মুখার্জ্জি নামের এক সুন্দরী সে সিরিয়ালের পরিচালক দ্যুতিপ্রভকে একটি সিরিয়াল বানানোর প্রস্তাব দেয়। পাশাপাশি সে জানায় ডাক্তার মল্লিককে নায়কের ভূমিকায় নিলে তিনিও সিরিয়ালের প্রযোজনার জন্য টাকা দিতে রাজি। তিনি প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেন। সিরিয়ালের স্যুটিং শুরু হলে প্রথমে মিলিতা বিশ্বাসকে নেওয়া হয়। যে ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তা ঐ স্যুটিংয়ের অংশ। নার্সিংহোমের আরেক কর্মী অন্যমন খাস্তগির মিলিতাকে অভনয়ের বড়

সুযোগ দেওয়ার নাম করে তাকে নার্সিংহোমে শ্লীলতাহানির নাটক করতে বলে। মিলিতা তা সফলতার সঙ্গে করার পর অন্যমন তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। তারপর সিরিয়ালে তার জায়গায় অভিনয় করে রূপসী। কিন্তু অন্যমন তখন নায়ক হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সে তাই ডাক্তার মল্লিকের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নানা রকম নেতিবাচক রটনার চেষ্টা করতে শুরু করে। এই কাজে তার সঙ্গ দেয় তার নাটকের অভিনেত্রী ও নার্সিংহোমের রিসেপসনিস্ট মেরেলিন। অন্যমন খাস্তগির গার্গীকে বারবার ওসকাতে থাকে যাতে গার্গী ডাক্তার মল্লিককে অপরাধী মনে করে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু গার্গী যখন থেকে জানতে পেরেছিল মিলিতা যৌনরোগে আক্রান্ত ছিল, তখন থেকে তার মনে হয়েছিল গাইনকলজিস্ট ডাক্তার মল্লিক তাকে শ্লীলতাহানি করবে না কোনও ভাবে।

অন্যমন দু'লক্ষ টাকার বিনিময়ে ছন্দাবলীর বাচ্চার সঙ্গে লক্ষ্মীপ্রিয়া খেমকার বাচ্চা বদলে দেওয়ার ব্যাবস্থা করে। কোর্টের অর্ডারের ফলে নার্সিংহোমে পড়ে থাকা কন্যাসন্তানটির ডি এন এ টেস্ট করা হয়। হেড অফ ফরেনসিক এন্ড স্টেট মেডিসিন ডাক্তার বিতোষ সেনগুপ্ত জানান ব্লাড গ্রুপ এবং ডি এন এ প্রোফাইল থেকে বোঝা যায় ঐ বাচ্চা সাগ্নিক বা ছন্দাবলীর নয়। কিন্তু কোর্টে সওয়াল জবাব করার সময় সহেলি পোড়-খওয়া ব্যারিস্টার রণজয়ের সামনে পেরে ওঠে না। সোনালিচাঁপা ফ্লপিতে করে যে তথ্য নিয়ে এসেছিল, তাতে লেখা ছিল ছন্দাবলীর ছেলে হয়েছে। কিন্তু পরে হাসপাতালে সেই তথ্য পরিবর্তন করে সেখানে উল্লেখ করা হয় তার মেয়ে হয়েছে। পাশাপাশি লক্ষ্মীপ্রিয়া খেমকা নামের রোগীর ভর্তির তথ্য সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়। সেই কম্পিউটার আদালতের নির্দেশে সিজ করা হয়। কিন্তু সওয়াল জবাবের সময় রণজয় কৌশলে প্রমাণ করে দেয় ফ্লপিতে তুলে আনা তথ্য পরে কোনও মেশিনে ভরে তা এডিট করে ফেলা সম্ভব। পাশাপাশি সহেলি ডি এন এ রিপোর্ট দাখিল করে যখন প্রমাণ করতে চায় যে, ছন্দাবলীর অভিযোগ সঠিক, তখন রণজয় নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করে। সে জানায়, ঐ রিপোর্টে শুধু এটুকুই প্রমাণিত হয় যে ঐ কন্যাসন্তান ছন্দাবলীর নয়। কিন্তু তার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করা যায় না যে ছন্দাবলীর ছেলে হয়েছিল। কোর্টরুম ড্রামার মতো করে সাজানো এই দৃশ্য ও তার পরিণতি পাঠককে বিস্মিত করে।

আসলে লক্ষ্মীপ্রিয়ার আসল নাম বিষ্ণুপ্রিয়া আর তার স্বামীর আসল নাম কেশব খেমকা। তারা নকল নাম এবং নকল ঠিকানা দিয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিল বলে তাদেরকে সহজে পুলিশ খুঁজে পায়নি। গার্গী অনুসন্ধান করে তাদের আসল নাম ঠিকানা জোগাড় করলেও সে যখন পুলিশকে তা জানায়, ততদিনে তারা বাসা বদল করে ফেলেছে।

কেশব খেমকা নিজের দোকান বিক্রি করে দেশে ফিরে যেতে চায়। শুধুমাত্র একটি পুত্রসন্তানের জন্য তারা তাদের জীবনটাকে অদ্ভুত জটিলতায় জড়িয়ে ফেলে। অন্যদিকে ছন্দাবলীর জীবন চিত্রও খুব বেদনাদায়ক। তার প্রথম সন্তান মেয়ে হয়েছে বলে শ্বশুরবাড়িতে তার সঙ্গে খারাপ ব্যাবহার করা হয়। তার স্বপ্ন এবার তার ছেলে হবে। সিজারের পর সে জানতে পারে তার ছেলে হয়েছে। কিন্তু তারপর যখন তাকে বলা হয় তার মেয়ে হয়েছে সে বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার বর ছেলে হয়েছে শুনে তাকে নিতে এসেছিল। কিন্তু মেয়ে হয়েছে শুনে চলে যায়, শ্বশুরবাড়ির কেউ তার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনা। শেষে তার বাবা এসে তাকে নিজের কাছে নিয়ে যায়। সমাজে পুত্র সন্তানের চাহিদার খুব ভয়াবহ দিককে লেখক তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি এও দেখিয়েছেন মানুষের এই মানসিকতার সুযোগ নিয়ে অন্যমন খাস্তগিরের মতো হাসপাতালের কর্মীরা কিভাবে অসৎ ব্যাবসায় নেমে পড়েছে।

'ইহুদি কন্যার রহস্য'তে দুটি চিত্র খুব নিপুণ ভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, প্রথমত, এদেশে খুব ধুমধাম করে এন আর আই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়া মেয়েদের জীবনের পরিণতি কতটা করুণ হতে পারে। দ্বিতীয় যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তা হল কলকাতার পুরনো পারিবারিক মিউজিয়ামের সঙ্গে জুড়ে থাকা মানুষদের জীবন। অজয় দেশাই বিয়ে করে সরমাকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার পর তার ওপর উৎপীড়ন চালাতে থাকে। পরে তাকে হত্যা করে। সরমার ভাই দিদির খোঁজে লন্ডনে গেলে তাকেও জেলে গিয়ে জীবন কাটাতে হয়। এক সময় অজয়ের সঙ্গে এক বিদেশিনী মেয়ে আসে কলকাতায়, রেগিনা নামের এই মেয়েটি জিতেন্দ্রর স্ত্রী হিসেবে নিজেকে দাবি করে দিওতিমাদের মিউজিয়ামের সম্পত্তির ভাগ আদায় করতে চায়। আসলে রেগিনা জিতেন্দ্রকে বিয়ে করেছিল তার সম্পত্তি পাবে বলে। একদিকে অজয় তার স্ত্রীকে হত্যা করে অন্যদিকে রেগিনা তার বরকে হত্যা করে। তারপর দুজনে কলকাতায় ফিরে বিপুল পরিমাণ অর্থ হস্তগত করার চেষ্টা করতে থাকে।

'নীল রক্ত নীল বিষ' উপন্যাসে লেখক অপরাধ জগতের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিককে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বম্বের নায়িকা শ্রীরাধার মুম্বাই বিস্ফোরণের সঙ্গে যোগ, 'সোসিও ইকনমিক সেন্টার'-এর মালিকের লন্ডনে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি করে দেশে এসে সমাজ সেবার নামে গা ঢাকা দেওয়ার পাশাপাশি নারী পাচার চক্রের ব্যাবসার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'আশ্রয়' নামের একটি অনাথ আশ্রম। এর আগের কাহিনিগুলিতে দেখা যায়, স্নাতকোত্তর পর্বের পড়াশুনো শেষ করার পর ফ্রিল্যান্সিং সাংবাদিকতার পাশাপাশি গার্গী 'সোসিও ইকনমিক রিসার্চ অ্যাকাডেমি'তে চাকরি করত। এর থেকে বেশি কিছু অন্য

কাহিনিগুলোতে পাওয়া যায় না। এই উপন্যাসে দেখা যায় সেই অর্গানিজেশন নাম বদলে 'আশ্রয়' করে নিয়েছে। গার্গীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে হত দরিদ্র পরিবারের শিশুদের নিয়ে আসত। এখানে এসে তারা পড়াশুনো করে বড় হবে এই আশায় বাবা-মায়েরা বাচ্চাদেরকে এখানে পাঠাত। ১০০ জন শিশুকে নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান চার বছর ধরে চলছে। শ্রীরাধা সেখানকার একটি মেয়ের দায়িত্ব নিতে চান, পাশাপাশি ফাদারের বন্ধু আলফ্রেড ডিসুজা একটি মেয়ের ভার নিতে চান। ফাদার ইন্দ্রনীল বটব্যাল কিছু মেয়েকে এভাবে সরাসরি পাচার করে দেন। তারপর এক এক করে মেয়ে উধাও হয়ে যেতে থাকে।

আসলে মেয়েদেরকে পাচার করেছিল তুলিকা এবং তা ফাদারের নির্দেশেই। ডিসুজা ও বিলাস সান্যালের চাপে পড়ে ফাদার তুলিকাকে মেয়েদের কাছে পরোক্ষ ভাবে মুম্বাইয়ের টোপ দিতে বলতেন। প্রথমে অতসী টোপ গেলে, তাকে রিয়ার সঙ্গে একই প্লেনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর শেফালি ও বীথিকে পাঠানো হয়। যেদিন ফাদার প্লেনে করে অন্য রাজ্যে চলে যেতেন সেদিন মেয়েরা নিখোঁজ হচ্ছিল, ফলত মনে হচ্ছিল ফাদারের অনুপস্থিতিতে মেয়েরা উধাও হচ্ছে। আসলে ফাদার অন্য রাজ্যে না গিয়ে রাতে এয়ারপোর্ট হোটেলে থাকতেন। রাতের বেলায় তুলিকা মেয়েদের নীল অ্যাম্বাসাডারে চাপিয়ে ওই হোটেলে পাঠিয়ে দিতেন, পরের দিন ফাদার সেই মেয়েদের প্লেনে তুলে দিয়ে ফিরতেন।

কিন্তু এতকিছু তথ্য আবিষ্কার করে ফেললেও গার্গী হারানো মেয়েদের খুঁজে বের করতে পারেনা। সম্ভবত তাদেরকে বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়েছে। গার্গী অনুমান করে রিয়াকে দুবাইয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। গার্গী নিজেও প্রায় চালান হয়ে যাচ্ছিল। বিলাস সান্যাল ওরফে আর. গুপ্তার কোম্পানি 'রেনেসাঁ এয়ারলাইনস'-এ বিমান সেবিকা হওয়ার ইন্টারভিউ দিয়ে সে আরও উনচল্লিশ জন মেয়ের মত তাদের বিমানে চড়ে বসে। কিন্তু ছদ্মবেশ ধারণ করে বিশেষ লাভ হয়না, তারা তাকে চিনে ফেলে। বিমানে বসে থাকাকালীন ত্রিস্তা রায় ন্যাপকিনে লিখে তাকে জানায়, সে যতই চাতুরি করে থাকুক, তার আর বাঁচার পথ নেই। কারণ রেনেসাঁর বিমান মুম্বাই নয় সোজা দুবাই যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উড়ান শুরু হওয়ার আগেই পুলিশ এয়ারপোর্টে পৌঁছে পাইলটকে আটক করে, তারপর বিমানে থাকা বাকি সদস্যদের আটক করে। যে মেয়েগুলো বিমান সেবিকা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বিমানে উঠেছিল তাদেরকে পাচার হওয়ার হাত থেকে গার্গী বাঁচায়। গোটা পাচার চক্র ধরা পড়ে। কিন্তু আগেই পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এই পরাজয় টুকু গার্গী মেনে নেয়। আগের মেয়েদেরকে ফিরিয়ে এনে গোয়েন্দাকে বড় মাপের প্রমাণ করার কোনও কৃত্রিম প্রয়াস নেই এই উপন্যাসে।

'রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য' উপন্যাসে একটি জড়োয়া সেট চুরি হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও আসলে এই উপন্যাসে তিনি মানুষের ভিতরে জমে থাকা লোভ লালসা, মানসিক বিকৃতির কথাকে উপন্যাসের মূল উপজীব্য করে তুলেছেন। এই উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রকে তিনি নিপুণ ভাবে তৈরি করে তুলেছেন। এর ফলে উপন্যাসের কলেবরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এত বৃহৎ আকৃতির উপন্যাস বোধয় আর নেই। চন্দ্রিমা চরিত্রটির রূপমগ্নটার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক লিখেছেন ----

> সাজতে খুব ভালোবাসে চন্দ্রিমা। ... কাল পূর্ণ হয়েছে তার জীবনের একচল্লিশটি বছর। ... নিজেকে দেখছিল আর ভাবছিল চল্লিশ মোটেই ছুঁতে পারেনি তাকে। শুধু গায়ের রংটাই যা ---
>
> ...
>
> আয়না বলল, আর একটু বেশি করে ঘষো ক্লেনজারটা।
>
> --- ঘোষছি তো ! ঘোষতে ঘোষতে চামড়া ছড়ে যাচ্ছে যে !
>
> বেশ কিচ্ছুক্ষণ ক্লেনজার ঘষা শেষ হলে হাতে নিল ময়েশ্চারাইজার। এটা ইভনিং টাইম লোশন, লোশনটা ভালো করে মুখে মাখিয়ে আপওয়ার্ড মেসেজ করতে থাকে। এভাবে ম্যাসেজ করলে স্কিনটা ভালো থাকে খুব। তারপর চোখ ফেলল চোখের নিচের দিকে। সামান্য কালচে দাগ পড়েছে কিছুদিন হল ! ...
>
> ফাউণ্ডেশনটা একটু লাগিয়ে নিল চোখের নিচেও, বেশ নিখুঁত করে লাগাল, তাতে জমে থাকা কালো দাগটা ঢাকা পড়ল আপাতত।
>
> ... ব্রায়ের স্ট্র্যাপ দেখানোটা এখনকার নতুন ফ্যাশান। চন্দ্রিমা সর্বদাই নতুন ফ্যাশানের পন্থী।[১৮]

উপন্যাসে চন্দ্রিমা চরিত্রটিকে বেশি গুরুত্ব দিলেও বাকি চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে লেখক কোনও খামতি রাখেননি। আর উপন্যাসে জটিল চরিত্রের মধ্যে কলকাতা শহরও একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। দেবপ্রিয়, কেকাবতী ও সৌম্যজিৎ তিনজন মিলে পুরনো কলকাতার ওপর একটি ছবির বই প্রকাশ করার কাজে নেমেছিল। এক একটি জায়গার ছবি তুলত দেবপ্রিয়, কেকাবতী গবেষণা করে সেই জায়গার ইতিহাস বের করত আর সেই সূত্র ধরে সৌম্যজিৎ সেই জায়গার কয়েক শতাব্দী আগে কেমন ছিল তার ছবি আঁকত। এই উপন্যাসের মধ্যে আসল বটতলা কোথায় ছিল তা নিয়ে প্রায় গবেষণা মূলক লেখা রয়েছে। ইনস্পেক্টর মিত্র মনে করেন, কেকাবতী ও প্রিয়জিৎ টাকা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে

তাদের বন্ধু সৌম্যজিতকে পরিকল্পনা করে হত্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ইন্দ্রজিৎ বাবুর নার্স চুরি ও হত্যা দুইই করেছে। অর্কজিতের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আর তার জেরে জন্ম নেওয়া তার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে সে এই বাড়ির অংশীদারদের একে একে সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করে। চন্দ্রিমার স্নেহের পাত্রী হওয়ার সুবাদে সে প্রায় সময়েই চন্দ্রিমার ঘরে আসত সুযোগ বুঝে চন্দ্রিমার ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সে বিভিন্ন গয়না হাতিয়ে নিতে থাকে। এইভাবে একটা একটা করে সে প্রায় সব গয়না সরিয়ে ফেলে। জিনিয়া অর্কজিৎ ও চন্দ্রিমা দুইজনকেই নিজের কব্জায় আনতে সক্ষম হয়েছিল। চন্দ্রিমা সাজতে ভালোবাসে, তাকে সাজের কাজে সাহায্য করে ঘনিষ্ঠ হয়। অন্যদিকে অর্কজিতের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখে। চন্দ্রিমা ও অর্কজিতের সম্পর্কের দূরত্বের সুযোগ নিয়ে উভয়ের যৌনতৃষ্ণা মেটাতে থাকে।

এখানে একদিকে জিনিয়া-অর্কজিৎ-চন্দ্রিমার এক অদ্ভুত সম্পর্কের ছবি লেখক পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। জিনিয়ার সঙ্গে চন্দ্রিমার সমকামী সম্পর্কের প্রত্যক্ষ ছবি তুলে না ধরলেও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন তাদের মধ্যে এই সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে চন্দ্রিমার বর অর্কজিতের সঙ্গেও তার শারীরিক সম্বন্ধ রয়েছে, যার ফল স্বরূপ হাজির তাদের সন্তান। কিন্তু তার ফলে চন্দ্রিমার বিশেষ হেলদোল নেই। সে নিজের যৌবন ধরে রাখতে আর নিজেকে সুন্দরী করে সাজিয়ে রাখতেই ব্যাস্ত। রুদ্রমৌলীর পাশাপাশি আরও অনেক পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। এই বাড়িতে থাকা আসলে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দে থাকার জন্য। উল্টোদিকে কেবাবতী-সৌম্যজিৎ-দেবপ্রিয়র সম্পর্কও খুব জটিল। কেকাবতী দুজনকেই ভালোবাসে, তারা তিনজন মিলে ঠিক করে দেবপ্রিয় কেকাবতীর শরীর পাবে, আর মন পাবে সৌম্যজিত। এমন জটিল সম্পর্ক এমনিতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও লেখকের মুন্সিয়ানাতে তা পুরোপুরি বিশ্বাস যোগ্য হয়ে উঠেছে।

'নিষিদ্ধ নগরীতে গার্গী' উপন্যাসটি আগের উল্লেখিত উপন্যাসের মতো খুব বড় সামাজিক পরিসরকে ধরতে না পারলেও এই কাহিনি শুধুমাত্র রহস্য উদ্ঘাটনের কাহিনি হয়ে থাকেনি। সায়ন নিজের কোম্পানি থেকে পারফিউম তৈরি করবে বলে চিন থেকে একটি বিশেষ ধরণের অ্যালোভেরা আনার জন্য সেখানে যায়। এই বিষয়ে তাদের সাহায্য করে সায়নের বন্ধু বীতশোক মিত্রের বোন ত্রস্তা। তাদের কথোপকথনের ইমেল হ্যাক হয়। আর চিনে যাওয়ার পর তারা নানা রকম সমস্যার সম্মুখিন হতে থাকে। ত্রস্তার ছুটি থাকা সত্ত্বেও ত্রস্তার অফিসের বস তাকে কাজ দিয়ে সাংহাই পাঠিয়ে দেয়। গার্গীরা বেজিংয়ে ঘুরতে থাকে। ত্রস্তার বসের নির্দেশেই তাদের গাইড ড্রাইভার সব পাল্টে দেওয়া হয়।

তাদেরকে বিপদে ফেলে ত্রস্তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করার জন্য ত্রস্তার বস এমন করেছিলেন। তবে এমন সময়ে গার্গীরা অন্য এক প্রতারকের পাল্লায় পড়ে, তারা তাদের হোটেলে না জানিয়েই মা লিহুয়ার সঙ্গে রুয়ান ডানের আশ্রমে চলে যায়। কিন্তু এখানে আসল রুয়ান ডানের আশ্রমের বদলে নকল একটি জায়গায় উপস্থিত হয়। কথা হয় শুধুমাত্র একজনই ভিতরে গিয়ে রুয়ান ডানের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। সায়ন ভেতরে গেলে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয় যে সে অ্যালোভেরা নেওয়ার জন্য তক্ষুনিই চল্লিশ হাজার ডলার টাকা দিতে চায় কিনা। সায়ন ভাবে ঐ কারণেই চিনে আসা, তাই সেটা পাওয়ার জন্য সে টাকা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার করে দেয়। কিন্তু গার্গীর সন্দেহ হাওয়ায় সে ঐ টাকা আটকে দেয়। একথা বুঝতে পারার পর মা লিহুয়া আর তাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনা। তারা বেজিংয়ে ফেরার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখিন হয়। যেহেতু চিনের বেশির ভাগ মানুষ ইংরেজি জানেনা, তাই তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রেও বেশ অসুবিধে হয়, এক্ষেত্রে সোনালিচাঁপা রূপবানের সঙ্গে কথা বলে তাদের ফেরার টিকিট সংগ্রহ করে। কাহিনির শেষে রূপবান ও গার্গীদের সঙ্গে ভারতে ফিরে আসে।

কাহিনির মধ্যে দুটি খুনের দৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে গার্গীকে খুনের তদন্তে নামতে দেখা যায় না। কাহিনির শেষে বোঝা যায় ত্রস্তার বসই এসবের মূলে ছিল। কিন্তু কাহিনির মূল ভিত্তিটাই খুব নড়বড়ে মনে হয়। কারণ, ত্রস্তার বস তাকে বিয়ে করার জন্য চাপে ফেলতে চাইলে আগেই অন্যভাবে নিজের কাজ উদ্ধার করতে পারতেন, তার জন্য গার্গীদের আসার অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কাহিনিটি রহস্য উপন্যাসের চেয়ে বেশি অ্যাডভেঞ্চার হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে সবচেয়ে বড় জায়গা দখল করে রয়েছে চিনের ভ্রমণ বর্ণনা। চিনের বিভিন্ন এলাকার বর্ণনার পাশাপাশি লেখক চিনের মানুষজন, তাদের পেশাগত জীবন, ব্যাক্তিগত সঙ্কট, চিনের সংস্কৃতি, সেখানকার অপরাধ জগতের ছবি বেশ খানিকটা ধরার চেষ্টা করেছেন।

'মুন্নারে মসলিন রহস্য'ও মূলত ভ্রমণকেন্দ্রিক কাহিনি। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে কেরলের বিভিন্ন জায়গার চিত্রকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি এই উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রের মস্তাত্ত্বিক দিককে লেখক খুব গুরুত্ব দিয়ে উপথাপন করেছেন। কলকাতা থেকে সাতটা ফ্যামিলি ও একজন মহিলা ট্যুরিস্ট পার্টির সঙ্গে কেরলে বেড়াতে যান। সেখানে মিসেস পাকড়াশি বিভিন্ন দামি শাড়ি পরে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন।

একদিন পাঁচ লাখ টাকার একটি পারস্যের মসলিন শাড়ি পরেন, তারপর হোটেলে ফিরে রাতের খাবার খাওয়ার পর ঘরে ফিরে বলেন তিনি বিছানায় শাড়িটা রেখে গেছিলেন, ঘরে ফিরে আর সেটা পাচ্ছেন না। এরপর ঘোরা নিয়ে তুমুল ঝামেলা চলতে থাকে। মিস্টার পাকড়াশি তলাপাত্র দম্পতির ওপর দোষ চাপাতে চান। বোটিং-এর সময় পাকড়াশিদের বোট তলাপাত্রদের বোটকে ধাক্কা দিতে এগিয়ে যায়। উভয়েই পুলিশে রিপোর্ট করেন। কিন্তু পুলিশকে তেমন তৎপর হতে দেখা যায় না। এই সময়ে মোমো রায় বেপাত্তা হয়ে যান। পরিস্থিতি এমন ভাবে সাজানো হয়, যাতে মনে হয় মোমো রায়কে হত্যা করা হয়েছে। এরপর রেনবো গেস্ট হাউসে পুলিশ আসে।

শেষ পর্যন্ত গার্গী রহস্য উদ্ঘাটন করে জানায়, এই রহস্যের সূত্রপাত কলকাতাতে। মিস্টার পাকড়াশি ও মিস্টার তলাপাত্র কলকাতার কন্সট্রাকশন কোম্পানি 'ভার্টিকাল কন্সট্রাকশন'-এ চাকরি করেন। মিস্টার তলাপাত্র এখানে চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার। তিনি খুব সৎ মানুষ, তাই যখন কারচুপিতে ভরা একটি নির্মাণের বিল তাঁর কাছে আসে তিনি বিলটি আটকে দিয়ে নতুন করে মাপজোক করার নির্দেশ দেন। কন্সট্রাকশনের দায়িত্বে থাকা অফিসার মিস্টার পাকড়াশি ফাঁপরে পরেন। এই অবস্থায় মিস্টার তলাপাত্র যখন কেরল ভ্রমণে যাচ্ছেন তখন পাকড়াশিও খবরাখবর নিয়ে এই ট্যুরে নিজেও আসেন আর কন্ট্রাক্টর মিস্টার গোস্বামীকে নিয়ে আসেন। তাঁর ঘাড়ে শাড়ি চুরির দায় চাপিয়ে অফিসে তাঁকে বদনাম করার চেষ্টা করেন। বোট চালানোর সময় ধাক্কা দিয়ে ডোবানোর চেষ্টাও করেন। তাঁরা ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার সময় ঘরে জ্বলন্ত লাইটার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টাও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হন না। গার্গী তদন্তকারী অফিসার টমাসকে জানায়, মিসেস পাকড়াশির শাড়ি চুরি যায়নি। চুরির খবর রটানোর পর দিন থেকে তিনি যে একটি মাত্র শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেটিই আসলে ঐ মসলিন শাড়ি, শাড়িটাকে তিনি উল্টো করে পরায় সহজে বোঝা যায়নি। পেশাগত জীবনে অসৎ একটি মানুষ নিজের পথের কাঁটাকে সরানোর জন্য যে কতটা ক্রূড় হয়ে উঠতে পারে, মিস্টার পাকড়াশি চরিত্রটি তার দৃষ্টান্ত।

সচারাচর গোয়েন্দা কাহিনির শেষে পাঠকের জন্য একটি চমক থাকে। এখানে ঘটনাগত চমক থাকলেও চরত্র নির্মাণগত দিক থেকে দেখলে কোনও চমক নেই। শুরু থেকেই পাকড়াশি ভিলেনের ভূমিকায় রয়েছেন, আর শেষ পর্যন্ত তাঁকেই লেখক অপরাধী হিসেবে পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, তিনি শুধুমাত্র রহস্যের জট ছাড়িয়ে ক্ষান্ত হন না। প্রতিটি রহস্যের যে কটি সাম্ভাব্য সমাধান হতে পারে, প্রায় সবগুলিকে তিনি পাঠকের সামনে হাজির করার চেষ্টা করেন। সচারাচার গোয়েন্দা কাহিনির লেখকরা পাঠকের সামনে যে বিভ্রম হাজির করেন, তারফলে পাঠক সাম্ভাব্য অপরাধী কে -- তা নিয়ে ভাবতে থাকে। সে ক্ষেত্রে এক একজন পাঠক একেক রকম ভাবে ঘটনা বিন্যাস সাজানোর চেষ্টা করে। গার্গীর ক্ষেত্রে সেই ভাবনার পর পাঠক আরও কিছু সাম্ভাব্য কাহিনি বিন্যাসের ছবি দেখতে পায়, যা হয়ত সে ভেবে দেখেনি। কোনও সময় সেই সব সাম্ভাব্য ঘটনার বিবরণ গার্গীর মুখ থেকে শুনতে পাই, আবার কখনো কোনও পুলিশ অফিসারের মুখ থেকেও তা শোনা যায়। 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' উপন্যাসের শেষে গার্গী যখন বাড়িতে ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল সহ অন্যান্য অনেককে ডেকে রহস্য উন্মোচন করে তখন দেখা যায় গার্গী বেশ কিছু সাম্ভাব্য ঘটনার বর্ণনা দেয়। গার্গী জানায়, প্রথমত, তার মনে হয়েছিল, সায়নের মা চন্দ্রাদেবী ঐন্দ্রিলাকে খুন করতে পারেন। তিনি যে ধরণের ক্রূর স্বাভাবের মহিলা, আর যেভাবে ছোটছেলের বউ দীয়াকে বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা মেরে বের করে দিয়েছিলেন--- তা দেখে মনে হয় ঐন্দ্রিলাকে বাগে আনতে না পারার রাগ থেকে তিনি তাকে হত্যাও করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, ঐন্দ্রিলার ডায়েরি পড়ে মনে হয় --- রবার্ট ও নীল ঐন্দ্রিলার কাছে আসত, তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঐন্দ্রিলা তার কাছে ধরা না দেওয়ায় এই হত্যা। তৃতীয়ত, গার্গী যখন জানতে পারে ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর দিন সায়নের ল্যাবরেটরি রুমে কেউ ঢুকেছিল, তখন কৌশিককে তার সন্দেহ হয়। সায়ন নিজেই নিজের ফর্মুলা থেকে সাবান তৈরি করে। প্রডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্ত অনেকবার নিজে দায়িত্ব নিতে চেয়েছে, নিজের ফর্মুলা সায়নকে দেখাতে চেয়েছে, কিন্তু সায়ন তাতে আগ্রহ দেখায় নি। তাই নতুন মাইক্রো সিস্টেম ডিটারজেণ্ট পাউডার বাজারে আসা আটকাতে সে ল্যাবরেটরিতে হানা দেয়। গবেষণার কাগজপত্র ওলট পালট করে। পরে সে-ই প্ল্যান্ট বার্স্ট করিয়ে দিতে পারে। আর তার সহযোগী হিসেবে মধুমন্তী রায়ও ঐন্দ্রিলাকে হত্যা করতে পারে। চতুর্থত, 'লাইম ইণ্ডিয়া'র বিজ্ঞাপন দপ্তরের দায়িত্বে থাকা রৌণক মুখার্জি একসময়ে ঐন্দ্রিলাকে ফরাসি শেখাত। ঐন্দ্রিলা তাকে ভালবাসত, এমনকি বিয়ের পরও সম্পর্ক রেখে চলেছিল। সম্পর্কের এই টানাপড়েন থেকে সে ঐন্দ্রিলাকে হত্যা করতে পারে। পঞ্চমত, সায়নও হত্যাকারী হতে পারে। ঐন্দ্রিলার অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পেরে সে ঐন্দ্রিলাকে হত্যা করতে পারে। এতগুলো সাম্ভাব্য ঘটনাকে কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ করে বিশদে গার্গীর মুখ দিয়ে বলান লেখক। সব শেষে আসে আসল ঘটনার বর্ণনা। যা থেকে জানা যায়, সায়নের ভাই হিমনের

স্ত্রী দীয়া 'লাইম ইণ্ডিয়া'র প্রডাকশন ম্যানেজার রাহুল রায়ের সঙ্গে হাত মেলায়। তারা পরিকল্পনা করে রাহুল নিজের একটি কোম্পানি খুলবে, পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা জমিও কিনে ফেলে। কিন্তু রাহুল রায় তার সীমাবদ্ধতা বুঝে গেছিল, তার তৈরি 'লাইম ইণ্ডিয়া'র প্রোডাক্ট আর তেমন বিক্রি হচ্ছিল না। তাই সায়নের মাইক্রোসিস্টেম ডিটার্জেণ্ট পাউডারের ফর্মুলা চুরি করার জন্য দীয়া সায়নের অনুপস্থিতিতে ওদের ফ্ল্যাটে যায়। তারপর সুযোগ বুঝে সায়নের ল্যাবরেটরি থেকে ফর্মুলা চুরির চেষ্টা করে। ঐন্দ্রিলা বাধা দিতে গেলে দীয়া তাকে হত্যা করে।

'রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য' উপন্যাসে দেখা যায়, প্রথমে ইনস্পেক্টর মিত্র যেভাবে কেস সাজান, সেই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্ছিদ্র। কিন্তু তারপর যখন গার্গী পুরো রহস্যের জট ছাড়ায় তখন দেখা যায় ইনস্পেক্টর মিত্রের ব্যাখ্যার কোনও পয়েন্টই মিলছে না। ইনস্পেক্টর মিত্র কেস সাজান : দেবপ্রিয়, কেকাবতী ও সৌম্যজিৎ তিনজন মিলে পুরনো কলকাতার ওপর একটি ছবির বই প্রকাশ করার কাজে নেমেছিল। তাই প্রচুর টাকার দরকার ছিল। সেই কারণে সৌম্যজিৎ জড়োয়া নেকলেস চুরি করে। সেই টাকা যায় ঐ তিনজনের জয়েন্ট একাউন্টে, যে একাউন্টের নাম প্রিয়বতীজিৎ । সেখানে এক্সেস করার মোড হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল এনি টু অফ থ্রি। সৌম্যজিতের কাছ থেকে সব খরচের টাকা পাওয়ার পর দেবপ্রিয় নিজের স্ত্রী কেকাবতীকে ব্যাবহার করে। তার অনুপস্থিতিতে কেকাবতী সৌম্যজিতকে নিজেদের ফ্ল্যাটে ডাকে, সৌম্যজিৎ যায়। তারপর দেবপ্রিয় ফিরে এসে রায়মল্লিক বাড়িতে গিয়ে সৌম্যজিতের রাতে খাওয়ার দুধে বিষ মিশিয়ে দিয়ে আসে। যাতে মনে হয়, সে অপমানে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু ইনস্পেক্টর মিত্রর সন্দেহ হাওয়ার তিনি বিষের ধরণ জানার জন্য পরীক্ষা করান। সেখানে জানা যায় যে, বিষটি সাপের বিষ জাতীয়। তাতে মৃত্যু হলে একজন মানুষ ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মারা যাবে। কেউ আত্মহত্যা করতে চাইলে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করবে, এমন বিষ খাবে না। আসলে দেবপ্রিয়র পরিকল্পনা ছিল বই ছাপা হলে তার পুরো লভ্যাংশ সে আর কেকাবতী পাবে। পাশাপাশি ব্যাক একাউন্ট থেকে যে কোনও দুজনের সইয়ে টাকা তুলে নেওয়ার অপশন থাকায় সে আর কেকাবতী সেই টাকাও আত্মসাৎ করতে পারবে। এমন ভাবে কেস সাজিয়ে দেওয়ার জন্য দেবপ্রিয় জামিন পায়না। গার্গীর মনে চলতে থাকে আইন বলে যদি হাজার অপরাধীও ছাড়া পেয়ে যায় তাও মানা যায়, কিন্তু একজন নিরপরাধ মানুষের যেন শাস্তি না হয়। তাই সে নিজের মতো করে তদন্ত চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গার্গীর তদন্তে যা উঠে আসে তা হল, চন্দ্রিমার জন্মদিনের দিন অন্য অনেকের মতো ইন্দ্রজিৎ বাবুর নার্স জিনিয়াও

এসেছিল চন্দ্রিমার ঘরে, জড়োয়া নেকলেস সেই সরায়। শুধু তাই নয়, চন্দ্রিমার স্নেহের পাত্রী হওয়ার সুবাদে সে প্রায় সময়েই চন্দ্রিমার ঘরে আসত সুযোগ বুঝে চন্দ্রিমার ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সে বিভিন্ন গয়না হাতিয়ে নিতে থাকে। এইভাবে একটা সময়ে সে প্রায় সব গয়না সরিয়ে ফেলে। সবকিছুর বাক্স থাকে কিন্তু গয়না উধাও। একদিন সে অজ্ঞান হওয়ার নাটক করে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গার্গী জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায়, আগেরদিন রাতে সে ভূত দেখেছে। জড়োয়া নেকলেসের প্রকৃত মালকিন যিনি ছিলেন, তার ছবি ছিল বাড়ির একঘরে। সবাইই সেই ছবি দেখেছে। জিনিয়া যানায় তাঁর ভূত সব গয়না পরে বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জিনিয়া অর্কজিৎ ও চন্দ্রিমা দুইজনকেই নিজের কব্জায় আনতে সক্ষম হয়েছিল। চন্দ্রিমা সাজতে ভালোবাসে, তাকে সাজের কাজে সাহায্য করে ঘনিষ্ঠ হয়। অন্যদিকে অর্কজিতের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখে। চন্দ্রিমা ও অর্কজিতের সম্পর্কের দূরত্বের সুযোগ নিয়ে উভয়ের যৌনতৃষ্ণা মেটাতে থাকে। সৌম্যজিতের সঙ্গে দেবপ্রিয়র ঝগড়ার দিন দেবপ্রিয়কে ছাড়ার জন্য সৌম্যজিৎ তার সঙ্গে নিচে নামে। সেই সুযোগে জিনিয়া তার দুধের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দেয়। ইন্দ্রজিৎ বাবুর প্রথম ফিজিওথেরাপিস্ট চন্দ্রমৌলী ও তার পরের থেরাপিস্টের চায়েও ঘুমের ওষুধ সেই মিশিয়েছিল। এমনকি চন্দ্রিমাকে সে জানিয়েছিল, সে ফিজিওথেরাপিস্টের কাজও জানে। আসলে সে চাইছিল না ইন্দ্রিজিৎ বাবু সুস্থ হয়ে উঠুক। সে ঐ সময়ে রায়মল্লিক বাড়ির সম্পদ দখলের জন্য এক এক করে সবাইকে সরাতে চাইছিল। ইন্দ্রজিৎবাবুকে দিনের পর দিন ঠিক মতো ওষুধ না দেওয়ার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। বাকি থাকে তানিয়া। তানিয়াকে সে রাতে ভূতের ভয় দেখাতে শুরু করে। একরাতে সব গয়না পরে হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকতে থাকে। তানিয়া তাতে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু তার আগে ভয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, সেই চিৎকারে তার মা চন্দ্রিমা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাবস্থা করে। নাহলে হয়ত অজ্ঞান অবস্থায় তাকে হত্যা করত।

সবচেয়ে বড় কথা গোয়েন্দা উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখক শুধুমাত্র রহস্যকেন্দ্রিক বিষয় বস্তুগুলোকেই পাঠকের সামনে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। কাহিনির জাল বোনার দিকেই গোয়েন্দা কাহিনির লেখকদের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য রহস্য উপন্যাস গুলির সঙ্গে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গার্গীকেন্দ্রিক উপন্যাস গুলোর প্রধান পার্থক্য হল গার্গীর উপন্যাসগুলো রহস্য উপন্যাসের ছকের বাইরে বেরিয়ে এক একটি পরিপূর্ণ উপন্যাস হয়ে উঠেছে। কাহিনির পাশাপাশি লেখক সময় নিয়ে যত্ন করে এক

একটি চরিত্রকে নিখুঁত ভাবে চিত্রিত করেছেন। যার ফলে গার্গী কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে সবকিছুর নেপথ্যে এক একটি চরিত্রের মনস্তাত্বিক গঠন কিভবে ক্রিয়াশীল থাকে তা খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে । পাশাপাশি প্রতিটি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট এতো নিখুঁত ভাবে নির্মিত, উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে পাঠক সেই জগতের গলিঘুঁজি থেকেও মানস ভ্রমণ করে আসতে পারে।

- **গার্গী কেন্দ্রিক কিশোর কাহিনি :**

'গোয়েন্দা গার্গী কিশোর সমগ্র'তে যে সতেরটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে তার সবগুলিকে ঠিক কিশোর কাহিনি বলা চলেনা। 'ধূমকেতু রহস্য' ও 'দন্ত অন্তর্ধান রহস্য'কে শিশু সাহিত্যের অন্তর্গত করা যেতে পারে।

'ধূমকেতু – রহস্য'তে দেখা যায়, গার্গীদের কলেজ থেকে বিভাগীয় পিকনিকের জন্য সবাই খুব খোশমেজাজে আছে। এমন সময়ে সেই পিকনিক স্থগিত হয়ে যায়। বিভাগীয় প্রধান ললিতমোহন নন্দী জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে তোলা একটি বই হারিয়ে ফেলেছেন। সবাই গার্গীকে ধরে, সে হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে দিতে মাস্টার। বোঝা যাচ্ছে বন্ধুরা তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে বেশ পরিচিত। গার্গী বন্ধুদের সঙ্গে অধ্যাপকের বাড়িতে যায়। তাঁর ব্যাক্তিগত সংগ্রহ খুঁজে দেখে, সারা ঘর খুঁজে প্রথমে বইটি পাওয়া যায়না। দু'একজন অধ্যাপকের ওপর সন্দেহ হয়, কয়েকজন ছাত্রের ওপরও সন্দেহ হতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গার্গী আবিষ্কার করে বেয়ারা লছমন খাটের মচমচানি বন্ধ করার জন্য বইটাকে খাটের একটা পায়ার তলায় ইটের মতো করে ব্যবহার করেছে। কাহিনিটি একেবারেই শিশুসুলভ, মজাদার সমাধান। শিশুদের রহস্য কাহিনি হিসেবে এধরনের গল্প পাওয়া যায়। তবে তপন বন্দপাধ্যায়ের গোয়েন্দা কাহিনির মধ্যে এটি একেবারেই অপরিণত বলে মনে হয়।

'দন্ত অন্তর্ধান রহস্য'র গার্গীর থেকে এক বছরের জুনিয়র রাখি বিখ্যাত উকিল নবীনবরণ নিয়গীর নাতনি। সে গার্গীকে জানায় যে তার দাদুর দাঁত পাওয়া যাচ্ছেনা। দাঁত ছাড়া কথা বললে তাঁর সব কথা ভালো বোঝা যায়না। আর একদিনের মধ্যে দাঁত বানিয়ে ফেলাও সম্ভব নয়। তাই দাঁত পাওয়া না গেলে তিনি কোর্টে যেতে পারবেন না, আর না গেলে প্রভূত ক্ষতি। এক পুরনো ক্লায়েন্টের কেসের ডেট সেদিন, জজ বলেছেন ওই দিনই তিনি ফয়সালা করে দেবেন আর কোনও ডেট দেবেন না। দাদু নাতনিকে জজকোর্টে গিয়ে

তাঁর ক্লায়েন্টকে একটা দরখাস্ত দিয়ে আসার ভার দেন। রাখি গার্গীকে সঙ্গে যেতে অনুরোধ করে। অর্থাৎ, রাখির কাছে গার্গী বেশ নির্ভরতার জায়গা হয়ে উঠেছে। গার্গী রাখির কাছ থেকে জমজ ভাইদের কেস সম্পর্কে জানে। সেখানে গিয়ে তার ছোটদার সঙ্গে বিপক্ষ দলের শুভজিৎ বাবুকে দেখতে পায়। রাখি বলে যে, শুভজিৎ চশমা পরেন, ছোটদাদার সঙ্গে রয়েছে দাদুর ক্লায়েন্ট দেবজিৎ। কিন্তু নাকের কাছে চশমার দাগ দেখে গার্গী নিশ্চিত হয় ওই লোকটি শুভজিৎ। গার্গী রাখিকে বাড়ি গিয়ে তার ছোটদার ঘর সার্চ করতে বলে। রাখি সেখানে দাদুর দাঁত খুঁজে পায়। আসলে বিপক্ষ দলের শুভজিৎ রাখির ছোটদাকে বলেছিল, যদি ওইদিন নবীনবরনের কোর্টে আসা আটকাতে পারে তাহলে তাকে বেশকিছু টাকা ঘুষ দেবে। এই কাহিনিতে গার্গী শুধুমাত্র নাকে চশমার দাগ দেখে গোটা বিষয়টা অনুমান করেছে। শিশুপাঠ্য রহস্য কাহিনি হিসেবে বেশ মজাদার। তবে ঠিক গোয়েন্দা কাহিনি কিংবা অপরাধ কাহিনি হয়ে ওঠেনি। কারণ, দাদুর দাঁত লুকিয়ে রাখা ভারতীয় দণ্ডবিধির কোনও ধারাতে ক্রাইম হিসেবে বিবেচিত হয় না।

‘ধূমকেতু রহস্য’তে অধ্যাপক ললিত মোহন নন্দীর হারিয়ে যাওয়া বই শেষ পর্যন্ত খাটের পায়ার নিচ থেকে আবিষ্কার করা হয়। আর প্রফেসরের চাকর লছমন সেটা কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে করেন নি। অন্যদিকে ‘দন্ত অন্তর্ধান রহস্য’তে শুভজিৎ বাবু তাঁর দাদু নবীনবরণের দাঁত লুকিয়ে রেখে তাঁর কোর্টে যাওয়া আটকান। এই দাঁত লুকিয়ে রাখাকেও ঠিক ক্রাইম বলা চলে না। যদিও কাহিনিগুলি কিশোর কাহিনি হিসেবে সঙ্কলিত হয়েছে, কিন্তু এই কাহিনিগুলি আসলে কিশোর সাহিত্য নয়, বরং এগুলিকে শিশুসাহিত্য বলা যেতে পারে। ‘ধূমকেতু রহস্য’ ও ‘দন্ত অন্তর্ধান রহস্য’তে রহস্য সমাধানের মধ্যে অপরাধের চেয়ে কৌতুকের পরিমাণ বেশি বলে মনে হয়।

বাকি পনেরটা কাহিনির মধ্যে চুরির কাহিনি রয়েছে পাঁচটি – ১। ক্যামেরা হরণ রহস্য ২। মুক্তোর মালায় দুটো হিরের টুকরো ৩। হীরের আংটি ৪। অপরাধী সনাক্তকরণ ৫। ব্রাহ্মীলিপি রহস্য

‘ক্যামেরা হরণ রহস্য’, ‘মুক্তোর মালায় দুটো হিরের টুকরো’, ‘হীরের আংটি’ কাহিনি গুলিতে গার্গীর উপস্থিতিতেই চুরি হয়, আর গার্গী সঙ্গে সঙ্গে চোরকে ধরে ফেলে।

‘হিরের আংটি’ গল্পে দেখা যায় --- হিরণ্য তরফদারের উদ্যোগে পাড়ায় একটি নাটক হবে। নাটকটির ঘটনা লিখেছেন হিরণ্য তরফদার নিজেই । মূল চরিত্রে থাকবেন পাড়ার নামকরা অভিনেতা অর্জুন মিত্র আর পেশায় শিক্ষিকা তোড়া বউদি। নাটকটির শেষ দৃশ্যে

আছে দূর সম্পর্কের বউদি তাঁর হিরের আংটি বরের হাতে তুলে দিয়ে সেটি বিক্রি করে দিতে বলছেন, যাতে টাকার অভাবে দেওরের গবেষণা করার রাস্তা বন্ধ না হয়ে যায়। হিরণ্যের আক্ষেপ নাটকের সময় বউদির হাতে আসল হীরের আংটি পরাতে পারবেন না। সেই আক্ষেপ পাড়ার এক আভিজাত মানুষ সুস্মিত চ্যাটার্জির কানে পৌঁছয়। তিনি অভিনয়ের জন্য তাঁর স্ত্রীর একটি হিরের আংটি দেন হিরণ্য তরফদারকে। আভিনয়ের পর দেখা যায় যে তোড়ার হাতের আসল আংটিটি বদলে গেছে, তরফদার যে আংটি ফেরত দিচ্ছে তা নকল। নানা রকম বাগবিতণ্ডার পর গার্গীর অনুরোধে পুলিশ ইনস্পেক্টর অভিনেতা অর্জুন মিত্রের চুলের মধ্যে সার্চ করে আসল আংটি উদ্ধার করেন। গল্পটি খুবই অপরিণত। মঞ্চের দৃশ্যের মধ্যে যখন অর্জুন মিত্র তোড়া বউদির হাত ধরেন পাঠক তখনই বুঝে যান যে সেই আংটিটা নিয়েছে। গার্গী শুধু খেয়াল করেছে যে তার সদা পরিপাটি চুলগুলো অবিন্যাস্ত। তাছাড়া পাড়ার নাটক অভিনয়ের জন্য কেউ ন'লক্ষ টাকার আংটি দেবেন বলে মনে হয়না।

'ক্যামেরা হরণ রহস্য'তে বিজয়েন্দ্র পেশাদার ফটোগ্রাফার সেজে গার্গীদের সঙ্গে ভাব জমায়। পরের দিন গার্গীর ক্যামেরা চুরি করে পালাতে যায়। কিন্তু এমন ভাবে অভিনয় করে যাতে মনে হয়, রিটায়ার্ড কর্নেল রণদুর্জয় লাহিড়ী গার্গীর ক্যামেরা চুরি করেছেন। কিন্তু গার্গীর সন্দেহ হয় এই কথা ভেবে, যে ফটোগ্রাফার প্রধানমন্ত্রীর সফরের ছবি তুলতে যাচ্ছিল সে হঠাৎ অন্য স্টেশনে নেমে পড়তে পারেনা।

'মুক্তোর মালায় দুটো হিরের টুকরো' গল্পে দেখা যায় রিমার জন্মদিনে রিমা গার্গীসহ দেবলীনা, অবন্তিকা, ইন্দ্রাণী নিমন্ত্রিত। জন্মদিনে রিমার পিসি সুচরিতা বাগচী ইতালী থেকে আনা একটা মুক্তোর মালা উপহার দিয়েছে তাকে। মুক্তোর মালাটির মাঝে দুটো হিরেও রয়েছে, সেগুলো অন্ধকারেও ঝকমক করে। উপস্থিত অনেকেই মালাটা গলায় পরে দেখছিলেন। শেষ পর্যন্ত রিমার গলাতেই ছিল নেকলেসটা। খাওয়ার সময় হঠাৎ ডাইনিং হলের আলো নিভে যায়, হুড়োহুড়ি বেধে যায়। তারপর যখন আলো জ্বলে ওঠে তখন দেখা যায় রিমার গলায় মালাটা নেই। প্রাথমিক ভাবে অনেকের উপরেই সন্দেহ হয়। সবার ব্যাগপত্র সার্চ করে কিছু পাওয়া যায়না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গার্গী কর্নেল তলাপাত্রের লাঠির রুপো বাঁধানো মাথা খুলে লাঠি উপুড় করতেই মালা বেরিয়ে আসে। গার্গী দেখেছিল মিসেস তলাপাত্র চোখে মোটা করে কাজল পরেছিলেন এবং এক সময়ে চোখ ডলছিলেন। রিমার মালা চুরি হওয়ার পর গার্গী তার গলায় কাজলের দেখতে পায় । পাশাপাশি কর্নেলের লাঠির নিচের নাগরা জুতোর মুখ আর হাতের কাছে থাকা হাতির শুঁড়ের মুখ একদিকে ছিল, কিন্তু চুরির পরে তা উল্টো দিকে হয়ে যায়।

'অপরাধী শনাক্তকরণ' গল্পটি যথার্থ কিশোর গোয়েন্দা কাহিনি। এখানে ১০জন সহপাঠী পুরীতে বেড়াতে যায়। সেখানে একটি গেস্ট হাউসের দুটি ঘরে পাঁচজন করে থাকে। এরমধ্যে কয়েকজনের টাকা চুরি হতে থাকে। এবং চুরি হয়ে যাওয়া টাকার ব্যাগ পরে এঘরে ওঘরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত গার্গী চোরকে ধরে ফেলে দেবলীনার বদ আভ্যেস সে মাঝেমাঝে ঠোঁটের মাঝে টাকা চেপে ধরে। কেনাকাটার সময় গার্গী লক্ষ করে যে মিত্রা যে টাকা দিয়ে জিনিস কিনছে তাতে লিপস্টিকের দাগ রয়েছে, তখন সন্দেহ হয় এবং সে নিজের পার্সের টাকাগুলোর মধ্যে জি লিখে রেখে পার্সটা ইচ্ছে করে টেবিলে ফেলে রেখে যায়। মিত্রা সেখান থেকেও কিছু টাকা সরায়। গল্পটির মধ্যে কোনও সাঙ্ঘাতিক অপরাধের কাহিনি না থাকলেও গল্প বুনন পাঠককে মুগ্ধ করে। আর রহস্যের পাশাপাশি সমাজ মনস্তত্ত্বের দিকটিও এখানে ফুটে উঠেছে। ১০জনের মধ্যে তিনজন খুব বড়লোক হলেও, বাকি ৭জন মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে । কিন্তু অনামিকা গ্রামের মেয়ে (একবার বজবজ একবার ক্যানিং বলে উল্লেখ রয়েছে গল্পে), প্রথমেই তাকে সন্দেহ করে সবাই এবং ভাবভঙ্গিতে তা বুঝিয়েও দেয়। অনিমাও গাঁইয়া বলে তাকে সন্দেহের তালিকায় রাখে সবাই। যদি মিত্রা নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে , কিন্তু সে মেধাবী। গত বছর সে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য তাকে সহজে কেউ সন্দেহ করছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গার্গীর হাতে সে ধরা পড়ে যায়।

'ব্রাহ্মীলিপি রহস্য'ও মূলত চুরির কাহিনি, তবে এর প্রেক্ষাপট অনেক বিস্তৃত। গার্গীর সহপাঠী রিয়া মল্লিক, মল্লিক পরিবার খুব ধনী পরিবার। রিয়ার প্রপিতামহ তাদের বাড়ির একটি বড় অংশ জুড়ে একটা মিউজিয়াম বানিয়েছিলেন, তাতে প্রচুর অ্যান্টিকের কালেকশন রয়েছে। বহু মানুষ আসেন তাদের এই মিউজিয়াম দেখার জন্য। বর্তমানে সেই মিউজিয়ামের এবং বাকি সম্পত্তির দেখাশুনো করে রিয়া এবং তার ছোটদাদা সুদর্শন মল্লিক। রিয়ারা পাঁচ ভাইবোন। বড়দাদার বিদেশে গিয়ে অ্যান্টিক সংগ্রহ নিয়ে পড়াশুনো করার কথা ছিল, কিন্তু ময়দানে ঘোড়া ছোটাতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে কমর ভেঙে যায়, তারপর থেকে পঙ্গু হয়ে যায়। বাবা মারা যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে বড়দা আত্মহত্যা করে। দিদি বাবার অমতে বিয়ে করার জন্য রিয়ার বাবা আর তার মুখদর্শন করেনি। মেজদা বিদেশে পড়াশুনো করতে গিয়েছিল, ইতালিতে থাকার সময় এক ইটালিয়ানকে বিয়ে করে, সে বিয়ে টেঁকেনি। তারপর প্যারিস ঘুরে ফেরার সময় এক ইহুদি মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। বিয়ার বাবা বিয়েটা মেনে নিতে পারেননি। সেই কারণে তাদের পৈতৃক বাড়িতে মেজদাদাকে থাকতে দেননি, তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিরাটির

বাগানবাড়িতে। বড়দা আত্মহত্যা করার কিছুদিন পর মেজদাও হঠাৎ কোনও এক আজানা রোগে মারা যায়। ছোটদাদা জ্যোতিষচর্চা নিয়ে থাকে, ৪০বছর বয়সে তার ফাঁড়া আছে জানতে পেরে সে বিয়ে করেনি। বর্তমানে মল্লিক বাড়ির সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার রিয়ার কাঁধে। রিয়ার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে রিয়ার মেজবউদি বিয়ের আইনি কাগজপত্র দেখিয়ে মল্লিক বাড়িতে আসার অধিকার আদায় করে নেয়। মাঝে মাঝেই সে মিউজিয়ামে আসে এবং রিয়ার বাবার আনা ব্রাহ্মীলিপির ওপর বিশেষ নজর রাখতে থাকে। ব্রাহ্মীলিপি বদলে যাওয়ার পর তাদের সন্দেহ গিয়ে পড়ে মেজবউদি ইরিনার ওপর। কিন্তু গার্গী তদন্ত শেষে বুঝতে পারে আসলে আসল লিপি চুরি করে সেটার বদলে সেখানে নকল লিপিটি রিয়ার দিদি পিয়া বসিয়েছে। তার কারণ, আসল লিপি অনুযায়ী ইরিনার ভাগে অনেক সম্পত্তি চলে যেত, আর পিয়া খুব নগণ্য অংশ পেত। তাই সে ঐ লিপির বদলে অন্য বয়ানের লিপি সেখানে স্থাপন করে। এখানে চুরির ঘটনার থেকেও বড় হয়ে উঠেছে সম্পত্তি দখলের কাহিনি পাশাপাশি মানুষের জটিল মনস্তত্বের দিকটিও লেখক তুলে ধরেছেন।

গোয়েন্দা কাহিনির ক্ষেত্রে একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে হত্যা রহস্য। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিণত পাঠকদের জন্য যে কাহিনিগুলি রচনা করেছেন তার বেশির ভাগের মধ্যেই রয়েছে এক বা একাধিক হত্যা প্রসঙ্গ। কিন্তু কিশোর কাহিনিগুলির ক্ষেত্রে মৃত্যু রহস্যের পরিমাণ তুলনায় কম। কিশোর কাহিনিতে হত্যা রহস্য উঠে আসে পাঁচটি গল্পে --- ১। রুমকির হত্যা রহস্য ২। অষ্টধাতুর অশ্বমূর্তি রহস্য ৩। ১রঙের রহস্য ৪। কিঙ্কর হত্যা রহস্য ৫। পাহাড় খনির হিরে রহস্য।

রুমকি একটি স্কুলের ছাত্রী সে তাদের ফ্ল্যাটের মধ্যে খুন হয়। রুমকিকে নওয়াল কিশোর নামের এক সিকিউরিটি গার্ড উত্যক্ত করত। নিজের পরিচয় না জানিয়ে সিকিউরিটি অফিসে ফোন করে জানায় যে এই সিকিউরিটি গার্ডটি বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। সিকিউরিটির কর্তৃপক্ষ নওয়াল কিশরকে টালিগঞ্জ থেকে বদলি করে তাদের গড়িয়ার আবাসনে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তারপর আবাসনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে, এবং তাকে খুন করে। তারপর পাঁচিল টপকে পালায়। কাহিনিটি এক স্কুলছাত্রীকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও এটিকে শ্রেনিগত ভাবে কিশোর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন রয়েছে। কারণ কিশোর সাহিত্য কিশোর পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত হয়, আর সেখানে সমাজের এই ধরণের বিকৃত মানসিকতার ছবি সচারাচর তুলে ধরা হয়না।

'অষ্টধাতুর অশ্বমূর্তি' কাহিনিতে দেখা যায় ডাক্তার হরিপ্রসন্ন মালাকারের একটি 'অলৌকিক' অশ্বমূর্তি কেনার জন্য বহু মানুষ তাঁর কাছে আসেন, খুব লভনীয় অর্থ পরিমাণ দিতে চাইলেও তিনি তা বিক্রি করতে চান না। কিন্তু তাঁর চাকর আর ড্রাইভার সেই লোভ সম্বরণ করতে না পেরে তাঁকে মেরে ফেলে ঐ মূর্তি হস্তগত করে। কাহিনির মধ্যে মৃতদেহকে নাড়াচাড়া করার বর্ণনাতে বেশ খানিকটা বীভৎসরসের ব্যাবহার লক্ষ করা যায়। এই কাহিনিতে ডাক্তারকে যেমন তাঁর পরিচিত কাছের মানুষরা পরিকল্পনা করে হত্যা করে '১রঙের রহস্য'-এর ক্ষেত্রেও সফল চিত্রশিল্পী রাকেশ সিনহাকে তাঁর বন্ধু বিশাল বর্গী হত্যা করে। রাকেশ সিনহার আপনজন কেউ ছিলেন না, তাই অনুজপ্রতিম শিল্পী বিশাল বর্গীকে তিনি ভাইয়ের মতো দেখতেন। তার কাছে তাঁর দুটি ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবিও ছিল। এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বিশাল বর্গী একটি ফ্ল্যাটে ঢুকে লুকিয়ে থাকেন দুদিন ধরে। তারপর একদিন ভোরে রাকেশের ফ্ল্যাটে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাস রোধ করে তাঁকে খুন করে। সন্দেহ অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য আলমারি খুলে ওলটপালট করে রাখে। তারপর জানলা খুলে তার গারদ বেঁকিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে ইন্টারলক দরজা চাবি দিয়ে আটকে ওপরের ফ্ল্যাটে চলে যায়। শিল্পী হিসেবে সাফল্য বা অর্থ কোনটাই অর্জন করতে পারেনি বিশাল। তাই রাকেশের সম্পত্তি এবং তার আঁকা ছবিগুলো হাতানোর জন্য খুনের রাস্তা বেছে নেয়। কিশোর কাহিনিগুলির মধ্যে এই কাহিনিতে ইন্টারোগেশনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

'কিঙ্কর হত্যা রহস্য'তে কিঙ্করের দুই বন্ধু সুনীল ও প্রমিত তাকে হত্যা করে। তবে আগের দুই কাহিনির মতো নির্ভরতা ও বিশ্বাসভঙ্গের ছবি পাওয়া যায় না। আগের দুই কাহিনির সঙ্গে এই কাহিনির মূলগত পার্থক্য হল এখানে কিঙ্কর নিজেও অপরাধী। তিন বন্ধু মিলে জাল নোটের কারবার চালাচ্ছিল। কিঙ্কর পঞ্চাশ টাকা ও একশ টাকার জাল নোট এঁকে দিয়েছিল, তারপর তারা কম্পিউটারে তার কপি বানিয়ে নেয়। কিন্তু কিঙ্কর তার যথাযথ প্রাপ্য না পাওয়ায় সব খবর ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেয়। তার ফলে বাকি দুই সাগরেদ মিলে তাকে হত্যা করে। আকৃতিগত দিক থেকে এই কাহিনি অন্যান্য গল্পগুলির চেয়ে অনেকটা বড়, প্রায় নভলেট আকারের। কাহিনি এবং আবহকে বেশ যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

'পাহাড় খনির হিরে'র মূল বিষয় হলো অমরকণ্টকে ভূতের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তদন্ত করে গার্গী জানতে পারে বিনোদ পুনেরা দীনেশের বন্ধু ছিলেন, তিনি বর্তমানে সোনা ব্যাবসায়ী হলেও আগে কয়লাখনির ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। তাই দীনেশ যখন হিরের খনির সন্ধান পায়

তখন বিনোদকে নিয়ে এসেছিল। এরপর বিনোদ একটি মূল্যবান হিরে নিলাম হবে জানিয়ে দীনেশকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তারপর শস্তা হোটেলের ঘরে ওঠে এবং সেখানে দীনেশকে খুন করে। হিরেখনি খোঁড়ার যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেই কারণে বিনোদ তার সাগরেদদের দিয়ে ইলেকট্রিক আলোর সাহায্যে মানুষের মনে ভূতের ভয় ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু আরেক ব্যাবসায়ী যখন ভয় না পেয়ে সত্যিটা উদ্ধারের জন্য জঙ্গলে ঢোকে বিনদের লোক তাকে খুন করে। শেষবারে দীনেশের বন্ধু রণজিৎ প্যাটেল সন্যাসীর ছদ্মবেশে অমরকণ্টকে আসেন। এবং ভূতের ভয় ছড়িয়ে যাওয়ার পর যেদিন খনির জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানো হয় সেইদিন তিনি জঙ্গলে ঢোকেন। বিনোদের লোকেরা তাকেও খুন করে ফেলে। গার্গী সবটা পুলিশের কাছে বলার পর প্রমাণ স্বরূপ বিনোদ পুনেরার ফেলে দেওয়া পুরনো কাগজের মধ্যে থেকে খুঁজে পাওয়া রায়পুরের সেই হোটেলের বিল বের করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এবং জানায় বিনোদের মালপত্রের মধ্যে সেই ভয় দেখানো চোখের উপকরণ ও বিস্ফোরণের সব উপকরণও মজুত রয়েছে। এই কাহিনিতে একাধিক হত্যা কাহিনি রয়েছে, লেখক তার পিছনের কারণকে খুব যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে ভূতের ভয় দেখানোর যে পদ্ধতি তার মধ্যে কোনও মৌলিকত্ব নেই। লেখকের আগে বহু কিশোর গোয়েন্দা কাহিনিতে, এমনকি লেখকের ‘গ্রহান্তরের প্রাণী’ গল্পেও এই একই পদ্ধতি ব্যাবহারের কথা পাওয়া যায়।

অন্যান্য কাহিনিগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সমস্যাকে লেখক তুলে ধরেছেন। এরমধ্যে ‘স্মৃতি বর্ধক ট্যাবলেট কাহিনি’টির প্লট আলাদাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘নেচারকিওর’ নামের একটি হারবাল ওষুধ কোম্পানিতে স্টোর কিপারের চাকরি করে অমলেশ। তার অবসর নেওয়ার আর কিছুদিন বাকি। এই কোম্পানির একটি স্মৃতিবর্ধক ওষুধ বাজারে খুব চলছে। একদিন সেই ওষুধের একটি ‘ডিফেকটিভ’ প্যাকেট পাওয়া যায়, সেটাতে ট্যাবলেটের স্ট্রিপগুলো একটু কুঁচকে গেছে। অমলেশ বলেন যে একটা ওষুধ খেয়ে স্মৃতিশক্তি এভাবে বাড়ানো সম্ভব নয়, বাকিরা বলেন তাহলে এতো বিক্রি হচ্ছে কেন। তখন তিনি বলেন যে তিনি আজকাল সব ভুলে যাচ্ছেন, তাহলে ওই ওষুধ খেয়ে দেখা যাক। একটি ফাইলের সব ট্যাবলেট খেয়ে ফেলন। তারপর থেকে তিনি শুধু কলেজ জীবনের কথা বলছেন, আর পরিচিত সব মানুষকে কলেজ জীবনের বন্ধুদের নামে ডাকছেন। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার গার্গীকে জানান যে অমলেশ দুদিনের জন্য ছুটি নিয়েছিল, তখন দায়িত্বে ছিলেন বিপ্লব সেন। ছুটির পর যখন তিনি যোগ দিতে আসেন তখন তিনি মনসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। তাই তাঁকে আর চার্জ দেওয়া যাচ্ছেনা। সামনের

সপ্তাহ থেকে অডিট শুরু হবে, বিপ্লব সেন জানিয়েছেন স্টোরের খাতাপত্রের সঙ্গে স্টক মিলছেনা। অমলেশ যখন ছুটিতে গেছিল, তখন 'চার্জ টেকেন ওভার' বলে বিপ্লব সই করেন। কিন্তু যেহেতু দুদিনের ব্যাপার তাই তখন তিনি স্টক মিলিয়ে নেননি। স্টকে প্রচুর ঘাটতি। এবং হিসেব মতো সব দায়িত্ব বিপ্লব সেনের। গার্গী অমলেশের পাগলামি দেখার পর জানায় যে প্রচুর মাল কম পড়ায় কোম্পানি এফ. আই. আর করবে আর একটা মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রের খোঁজও করবে। তবে তাতে অমলেশের কিছু হবেনা ফেঁসে যাবেন বিপ্লব। বলার পর অমলেশের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ করে গার্গী। বুঝতে পারে যে অমলেশের পাগল সাজা আসলে অভিনয়। তাঁর নিকট বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে যে একটি সাট্টা দলের পাল্লায় পড়ে অমলেশ অনেক টাকা খুইয়েছে, এবং তার জন্য সে স্টোর থেকে মাল পাচার করে সেই ঋণ মেটাচ্ছে। এই উপন্যাসের সমস্যাটি এমন যে গার্গী সবটা বুঝতে পারলেও অপরাধীকে ধরিয়ে দেওয়া তার সামর্থের বাইরে।

সাইবার ক্রাইম এখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে খুব চলতি একটি সমস্যা। এই সমস্যার ওপর ভিত্তি করে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাইবার রহস্য' কাহিনিটি রচনা করেন। 'টে-শ্যাকস' নামের এক জিন ঘটিত বিরল রোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছিলেন ডক্টর রুদ্রাংশু ব্রহ্মচারী। তাঁর সহকারী ছিলেন অখিলেশ তরফদার ও মানবেন্দু মিত্র। গবেষণায় সাফল্য পাওয়ার পর ব্রহ্মচারী সেটা আমেরিকার 'নেচার ও সায়েন্স' পত্রিকায় পাঠাতে চান। কম্পিউটার কর্মী রাজীবকে ব্রহ্মচারী ই-মেল করার নির্দেশ দেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন ব্যারিংটন কোনও মেল পাননি। তিনি রাতে গবেষণাগারে ঢুকে আবার মেল পাঠান। পরেরদিন ব্যারিংটন জানান যে সেই মেলের কোনও অর্থ উদ্ধার করতে পারেননি। এরপর দেখা যায় যে গবেষণাপত্রটি হ্যাক করে নষ্ট করা হয়েছে। প্রথমে সন্দেহ করা হয় যে অনলাইনে হ্যাক করে ভাইরাস ছড়িয়ে গবেষণা পত্রটি শুধুমাত্র বদলে ফেলাই হয়নি। হার্ডডিস্কে থাকা কপিটাও নষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু গার্গী তদন্ত করে জানতে পারে যে তরফদার রাজীবের সাহায্যে গবেষণাপত্রটি নষ্ট করে দিয়েছে। কারণ , তার মনে হয়েছিল ব্রহ্মচারী তাদের কৃতিত্ব স্বীকার না করে একাই স্বীকৃতি পেতে চাইছেন। এই কাহিনিতে সমকালের একটি ছবি ধরা পড়েছে ---" ড. তরফদার বললেন, পুলিশে খবর দিয়ে কী হবে ? পুলিশ তো কম্পিউটার কী টা জানেই না। হ্যাকিংয়ের নামই শোনেনি হয়ত।"[১৯]

লেখক যে সময়ে কাহিনিটি রচনা করেন সে সময় অনুযায়ী এটি একটি অতি আধুনিক সমস্যা। তবে বর্তমান সময়ে সাইবার ক্রাইম বহুল প্রচলিত একটি বিষয়। আর পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখাও যথেষ্ট তৎপর, তাই উপরের উদ্ধৃতিটি বর্তমানে অচল।

‘গ্রহান্তরের প্রানী’ কাহিনিতে দেখা যায় অনন্তমোহন সান্যালের নাতনি গার্গীকে খবর দেয় যে তাদের বাড়িতে একটা অন্যগ্রহের প্রানীর উৎপাত শুরু হয়েছে। রাতের বেলা অনন্ত সান্যালের উত্তর দিকের ঘরের সামনের আম গাছে দুটো চোখ জ্বলা নেভা করে। কিন্তু গার্গী তখনও গোয়েন্দা হয়ে ওঠেনি, তাই থানার বড় দারোগা গার্গীর ওপর তখনও বিশেষ ভরসা করতে পারেন না। গার্গীর প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তার প্রতিভার কথা জানলেও আগের প্রজন্মের মানুষরা তখনও পর্যন্ত গার্গীর এই ক্ষমতার কথা জানেন না। অর্থাৎ, সে তখনও ঠিকঠাক সখের গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পারেনি। বলা বাহুল্য তার সন্দেহ ঠিক প্রমাণিত হয় । অনন্তমোহনের নাতি তীর্থঙ্কর খারাপ সঙ্গে পড়ে টাকা ওড়াচ্ছিল। সেজন্য সে দাদুর অ্যান্টিকের কালেকশন থেকে রুপোর কলমদানি, একটা পিলসুজ চুরি করে বিক্রি করেছিল। তারপর দাদু সতর্ক হয়ে যাওয়ায় আর কিছু সরাতে পারছিল না বলে দাদুকে ভয় দেখানো শুরু করে। গাছের ডালে চোখের মতো আকৃতি করে তার জড়িয়ে সেগুলোকে রিমোটের মাধ্যমে জ্বলাত নেভাত। ভেবেছিল দাদু ভয় পেয়ে অন্যদিকের ঘরে চলে যাবে, আর সে আরও অ্যান্টিক বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু গার্গীর উদ্যোগে পুলিশ এসে তার ঘর সার্চ করতেই সব রহস্য সমাধান হয়ে যায়। বাংলার কিশোর গোয়েন্দা কাহিনিতে নানা রকম ভাবে বিভিন্ন পোশাক পরে কিংবা আলোর ব্যাবহার করে ভূতের ভয় দেখানোর কাহিনির সংখ্যা প্রচুর। বিশেষত নলিনী দাশের ‘গণ্ডালু’ সিরিজের অনেক কাহিনিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। তাই ‘গ্রহান্তরের প্রাণী’ কাহিনিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাহিনি বলা যায়না।

‘ম্যাকবেথ অন্তর্ধান রহস্য’ কাহিনিতে কিশোর মনস্তত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ম্যাকবেথ ওরফে ডোডো সপ্তম শ্রেনির ছাত্র, তার অপহরণকে কেন্দ্র করে এই কাহিনি। গোটা গল্পের বুনন খুবই ভালো। পাঠক অপরাধী ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত অনুমান করতে পারেনা আসল রহস্যটি কী। গল্পের শেষে জানা যায় তিন সহপাঠী বন্ধু ডোডো, তুতুর, আর জলি মিলে বাড়ি থেকে টাকা জোগাড় করে অ্যাডভেঞ্চারে বেরবে ঠিক করেছিল। সেই কারণে তারা ডোডোর অপহরণের গল্প ফাঁদে। আসলে সে ওই দু’দিন জলির বাড়িতে গিয়ে ছিল, জলির বাবা মাকে বলেছিল তার বাবা-মা শান্তিনিকেতনে গেছে বলে সে কিছুদিন জলিদের বাড়িতে থাকবে। আর তুতুরই সব কাজগুলো করছিল, প্রথমে বাসের চালককে এবং পরে বাড়ির লোককে জানায় যে ডোডো এক চমৎকার মামার সঙ্গে ক্লাস শেষ হওয়ার আগে চলে গেছে। তারপর হুমকি চিঠি লিখে তাদের লেটারবক্সে ফেলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত টাকাটা নিতে গিয়ে গার্গীর কাছে ধরা পড়ে যায়। আগাগোড়া গল্পটি খুবই উপভোগ্য। তবে দুটো জিনিসে খটকা লাগে, প্রথমত, জলিদের বাড়িতে যখন থাকতে গেল জলির

বাবা-মা কেউ ডোডোর বাড়িতে ফোন করে কথা বলল না ! দ্বিতীয়ত, ডোডো যে ধরনের এলিট স্কুলে পড়ে সেখানে একাএকা স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু স্কুলের সিকিউরিটি গার্ড তাকে যেতে দিল!

'নেপথ্যে এক আততায়ী' গল্পে এক কিশোরীর ব্যাক্তিগত সমস্যার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। যদিও এখানে উল্লেখিত ক্রাইম খুব বড় ধরণের নয়। গার্গীর সহপাঠী মনমিতাকে খুব মনমরা থাকতে দেখে গার্গী তার কারণ জানতে চায়। মনমিতা জানায় যে সে সরশুনায় যখন টিউশন পড়তে যায়, তখন বাস থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে গিয়ে একটি পোড়োবাড়ি থেকে একটা লোক বেরোয়। লোকটা হাতে ছুরি সাঁইসাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে তার পিছু নেয়। মনমিতার বাবা উকিল, কিন্তু তিনি কিছুদিন ধরে কোনও বিষয় নিয়ে এতো বিব্রত হয়ে রয়েছেন যে মনমিতা তাঁকে বলতে পারছেনা। গার্গী মনমিতার সঙ্গে গিয়ে কৌশলে মনমিতার পিছু নেওয়া লোকটার পরিচয় জেনে আসে। লোকটার নাম কালীপদ পুততুণ্ড, সে ক্রিমিনাল লইয়ার বি. এন. ঘোষের কাছে চাকরি করে। গার্গী প্রথমে সেখানে যায়, তারপর যায় মনমিতার বাড়িতে। তার বাবা পি.কে। দত্তর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে কিছুদিন ধরে উড়ো ফোন আসছে, তাকে নানা রকম ভবিষ্যৎবাণী করে ভয় দেখানো হচ্ছে। ওইদিন সকালে ফোন করে জানিয়েছে যে তিনি যে গাড়িতে যাবেন সেটা নির্ঘাত অ্যাক্সিডেন্ট করবে তিনি ভয়ে বাড়িতে রয়ে গেছেন। এবং এও জানে যে বিশু হালদার নামের খুনির পক্ষে দাঁড়িয়েছে বি. এন. ঘোষ আর স্টেটের পক্ষের উকিল হলেন দত্তবাবু। তিনি যদি না যেতে পরের কয়েকদিনও কোর্টে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে বিশু হালদার কেস জিতে যাবে। গার্গী যা শুনে এসেছে বিশ্লেষণ করে জানায় যে, বিশু হালদারের সঙ্গে কালীপদর একটা পরিচিতি আছে, সে উকিল নয় যে কেস জিতিয়ে দেবে, কিন্তু এভাবে সে অন্যপক্ষের উকিলের উপস্থিতি আটকাতে চাইছে।

তবে অবাক লাগে এতো নামকরা একজন উকিল এমন ফোন কলে ভয় পেয়ে গেলেন ! আর তাঁদের গাড়ি আছে মনমিতা যদি তার সমস্যার কথা জানাত তাহলে নিজেদের গাড়ি করেই সে টিউশন পড়তে যেতে পারত। কিন্তু তারপরও বাবার ওপর মানসিক চাপ পড়বে ভেবে সে জানায়নি। সবটা মিলিয়ে এই গল্পের যুক্তিগ্রাহ্যতা খানিকটা কম বলেই মনে হয়।

'গোয়েন্দা গার্গী কিশোর সমগ্র'র কাহিনিগুলির মধ্যে কিছু গার্গীর ছাত্রজীবনের কাহিনি রয়েছে, আবার কিছু গার্গীর পরিণত বয়সের কাহিনিও রয়েছে। ছাত্রীজীবনের কাহিনিগুলির মধ্যে খুনের কাহিনি দুটি 'কিঙ্কর হত্যা রহস্য' এবং 'পাহাড়খনির হিরে রহস্য'। বাকি গল্পগুলি

অন্যান্য রহস্য নিয়ে। অনেক ক্ষেত্রেই তা ঠিক গোয়েন্দা কাহিনি হয়ে ওঠেনি। তবে গার্গীর চরিত্রটি কিভাবে একটু একটু করে গোয়েন্দা হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করল, তা বিশ্লেষণ করতে গেলে এই কাহিনিগুলিকে একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। গার্গীর বিবাহিত জীবনের এবং গোয়েন্দা হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার পরবর্তী সময়ের বেশির ভাগ কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে হত্যা রহস্য। এই পর্যায়ের কাহিনিগুলোতে গার্গী যেমন বয়সের দিক থেকে পরিণত, তেমনই কাহিনিগুলোও অনেক বেশি পরিণত। তবে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কিশোর কাহিনিগুলি সম্ভবত 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' লেখার পরেই লিখেছেন। রমাপদ চৌধুরীর অনুরোধে 'রবিবাসরীয়-র জন্য তিনি 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' উপন্যাসটি লেখা শুরু করেন। অর্থাৎ, প্রথমে তিনি গার্গীকে পরিণত গোয়েন্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পর তার অতীতের ছোট খাটো রহস্য সমাধানের কাহিনিগুলি রচনা করেন। সম্ভবত কিশোর পাঠকের কথা মাথায় রেখে তিনি গার্গীকে তার ফেলে আসা ছাত্রজীবনের প্রেক্ষাপটে নিয়ে এসে এই কাহিনিগুলি রচনা করেছেন।

❖ অপরাধ ও অপরাধী

গার্গী কেন্দ্রিক উপন্যাস ও কিশোর কাহিনির আলোচনা আলাদা ভাবে করার কারণ এই দুই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তার অর্থ এই নয় যে বাকি কাহিনিগুলির বেশির ভাগই হেলাফালা করা যায়। লেখক গার্গীর বেশিরভাগ কাহিনির মধ্যেই অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম বিশেষণ ও নিখুঁত বর্ণনা কাহিনিগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি এক একটা কাহিনিতে এক একটা জগতের মানস ভ্রমণ করিয়ে আনেন। গোয়েন্দা কাহিনির কেন্দ্রীয় বিষয় যেহেতু অপরাধ তাই কাহিনিতে উপস্থিত অপরাধ ও অপরাধীর পরিচয় দেওয়া হল। আর বেশির ভাগ কাহিনিতে যেহেতু হত্যার প্রসঙ্গ রয়েছে তাই অস্ত্র ব্যাবহারের প্রসঙ্গও তুলে ধরা হল :

কাহিনি	অপরাধী	অপরাধ	হত্যা প্রণালী/অস্ত্রের ব্যবহার
ঈর্ষার সবুজ চোখ	দীয়া সুন্দরী উচ্চাকাঙ্ক্ষী আধুনিকা একটি মেয়ে। সায়নের ভাই হিমনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু হিমন মা চন্দ্রাদেবীর শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনা। সে নিজে রোজগারের পথ খুঁজে নেয়, বারে নাচ-গান করতে শুরু করে।	তার পুরনো বন্ধু ও 'লাইম ইণ্ডিয়া'র প্রোডাকশন ম্যানেজার রাহুল রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে সায়নের নতুন ডিটারজেন্টের ফর্মুলা চুরি করতে যায়। ঐন্দ্রিলা তাকে বাধা দেওয়ায় সে তাকে হত্যা করে।	ঐন্দ্রিলাকে গলা টিপে হত্যা করে। তারপর ফিঙ্গার প্রিন্ট যাতে না থাকে, তার জন্য তাকে পুড়িয়ে ফেলে।
	রাহুল রায় লাইম ইণ্ডিয়ার প্রোডাকশন ম্যানেজার।	লোটনকে খুন করে।	
	লোটন কালিজীবনবাবুর পাড়ায় বাস করে। টাকার বিনিময়ে অপরাধ কর্ম করে বেড়ায়।	প্যারাডাইস প্রডাক্টের ফ্যাক্টরিতে ব্লাস্ট করায়।	

বহে বিষ বাতাস	মন্দার ‘ইনডেক’ নামের একটি ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন কোম্পানি চালায়। তার বাবা ছিল এক মদ্যপ, খারাপ চরিত্রের মানুষ। মা বীরভঙ্গপুরের রাজকুমারী, ঐ রাজকর্মচারীর প্রেমে পড়ে পালিয়ে বিয়ে করে।	বীরভঙ্গপুরের রানিমা লাবণ্যপ্রভা, অধ্যাপক মনিশ রায়, হরিশঙ্কর চৌধুরী ও শিহরণ রায় চৌধুরীকে হত্যা করে ।	রানিমাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নলি কেটে, বাকিদেরকে গুলি করে হত্যা করে।
হলুদ খামের রহস্য	ইনস্পেক্টর সত্যব্রত রায় চরিত্রহীন অর্থলোলুপ মানুষ। বৃন্দা, অপরূপা দুই নারীর প্রতিই প্রলুব্ধ হন।	তাঁর স্ত্রী বিনীতাকে হত্যা করেন ।	মাথার পিছন দিকে ও গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়।
ধূসর মৃত্যুর মুখ	ঋষভ মুখার্জি বুখ্যাত চিত্র পরিচালক। ‘সোনালি ঘুঙুর’ সিরিয়ালের পরিচালনা করছেন।	ডাক্তার সুস্নত তালুকদার, অভিনেত্রী বর্ণনা সেনগুপ্ত, ও হোটেলের ফায়ফমাস খাটা লোচ্চাকে খুন করেন ।	বর্ণনাকে মাথায় হাতুড়ি মেরে ও লোচ্চাকে শ্বাস রোধ করে মেরে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

সোনালি সুতোর ফাঁস	ইয়েতি একটি আশ্রম চালান। আশ্রমটি আসলে অবাধ যৌনতার ক্ষেত্র। আশ্রমের মেয়েদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন।	ড্রাগের চোরা চালান করে। টপ্পা জোজো ও আরও অনেককে হত্যা করে।	গলায় সোনালি সুতো জড়িয়ে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে।
ইহুদি কন্যা রহস্য	অজয় দেশাই এন আর আই যুবক। বিভিন্ন ভাবে মানুষের টাকা হাতিয়ে নেওয়া তার নেশা।	যৌতুকের জন্য বিয়ে করার পর নিজের স্ত্রী সরমার ওপর অত্যাচার করে তারপর তাকে হত্যা করে। রেগিনার অনৈতিক কাজে তাকে সহায়তা করে।	
	রেগিনা ইউরোপীয় মহিলা । বিভিন্ন ভাবে ফ্রড করে অর্থ উপার্জন তার জীবিকা। জিতেন্দ্রর পারিবারিক সম্পত্তি পাওয়ার জন্য ভারতে আসে।	প্রথমে জিতেন্দ্রর প্রথম স্ত্রীকে হত্যা করে, তারপর জিতেন্দ্রকে হত্যা করে।	

নীল রক্ত নীল বিষ	ফাদার ইন্দ্রনীল বটব্যাল 'আশ্রয়' নামের একটি প্রতিষ্ঠান চালান। এখানে গরীব পরিবারের বাচ্চাদের রেখে পড়াশুনো শেখানো হয় ।	ইউরোপে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির সঙ্গে জড়িয়ে পরেছিলেন। ব্ল্যাকমেলের শিকার হয়ে নারী পাচার করতে থাকেন। আশ্রয়ের কর্মচারী তুলিকাকে হত্যা করেন।	
	অভিনেত্রী শ্রীরাধা বম্বের নামকরা অভিনেত্রী। আন্ডারওয়ার্লডের সঙ্গে যোগ আছে।	রিয়াকে দুবাইয়ে পাচার করে দেয়। মুম্বাই বিস্ফোরণেও তার হাত আছে জানা যায়।	
কফিন রঙের রুমাল	বিবেক দ্বিবেদী তিতিক্ষার বর। প্রথমে সে একটি চাকরি করত। কিন্তু বড়লোক শ্বশুর অলীকশেখর তাকে নতুন কারখানা করে দেন। কিন্তু বিবেক	ড্রাইভার রোহণকে হত্যা করে তার পোশাক বদলে নিজের পোশাক পরিয়ে তার	পিছন থেকে চেপে ধরে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে।

	কিছুতেই নিজের ব্যাবসা দাঁড় করাতে পারেনা। উপরন্তু বিভিন্ন ধার দেনায় জড়িয়ে পড়ে।	শরীরের উর্ধাংশ জ্বালিয়ে দেয়। ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর টাকা ওভার ড্রাফট নিয়ে পালানোর পরিকল্পনা করে।	
ক্যাপসুল রহস্য	ভোলানাথ মণ্ডল একটি মাল্টিন্যাশনাল মেডিসিন কোম্পানির স্টোরে চাকরি করে।	স্টোরকিপার বিমলেন্দুবাবুকে হত্যা করে।	দুই নিরাপত্তারক্ষীর সাহায্যে গলা টিপে হত্যা করে। তারপর সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলিয়ে দেয়।
৭৭, সবুজ সরণী	অন্যমন খাস্তগীর ‘গ্রীন ভিউ’ নার্সিংহোমের কর্মচারী। নাটকে অভিনয় করে। নাকে কাটা দাগ থাকার জন্য নায়কের রোল পায়না বলে খুব আফসোস আছে।	দু’লক্ষ টাকা নিয়ে ছন্দাবলীর পুত্র সন্তানকে খেমকা পরিবারের হাতে তুলে দেয়। পাশাপাশি বারবার ফোন করে গার্গী সায়নকে হুমকি দেন।	প্রথমে ট্রাক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে মিলিতা বিশ্বাসের হত্যা, একই ভাবে টাটা সুমোর ড্রাইভারকে হত্যা, তারপর মদে বিষ মিশিয়ে ট্রাক ড্রাইভারকে

		অন্যান্যদের পাশাপাশি গার্গীকেও হুমকি চিঠি পাঠায়। অনেকগুলো খুনের পিছনে তার হাত রয়েছে। সোনালিচাঁপাকে অপহরণ করে।	হত্যা, কেশব খেমকাকে হত্যা করে।
একটি ইমন সন্ধ্যা	অরিজিৎ রায়গুপ্ত / গান্ধার নাম করা গায়ক ও সুরকার। কিন্তু মৌলিক সুর বানাতে পারেনা। বিভিন্ন গানের একটু একটু অংশ কেটে কেটে সেগুলো জুড়ে সুর তৈরি করে।	উপাসনার প্রকাশিতব্য এলবামের গান চুরি করে সেগুলো নিজের নামে বলে উপসনার আগেই এলবাম প্রকাশ করে দেয়।	
সোনার কেল্লায় গার্গী	ধৃতিমান জয়সয়াল দুজন পার্টনার নিয়ে একটি চিটফাণ্ড কোম্পানি খোলে। তারপর টাকা	কোম্পানির দুই পার্টনার রুবেন আড্ডি ও বিলাস রুদ্রকে হত্যা করে।	গুলি করে হত্যা করে।

	আত্মসাৎ করে রাজস্থানে পালিয়ে যায়। বৃতি জয়সয়াল ধৃতিমানের স্ত্রী ও অপরাধের সাগরেদ		
গোয়ায় গার্গী	মরিনেত্তি কুখ্যাত চোর। ফ্রন্সের জেল থেকে পালিয়ে ভারতে এসেছে চুরি করতে। বিভিন্ন এন্টিক জিনিস চুরি করা তার পেশা।	গার্গী আগে থেকে পুলিশকে সাবধান করার ফলে সে চার্চ থেকে কিছু চুরি করতে পারেনা।	
সবুজ দুপাট্টা রহস্য	অচ্যুত ভাণ্ডারী কলকাতার এক মস্ত মার্কান্টাইল কোম্পানির একজিকিউটিভ ডিরেক্টর। বলাকা এপার্টমেন্টে থাকেন। নীলকণ্ঠ উপাধ্যায়ের বন্ধু।	নীলকণ্ঠ উপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী বর্ণিনী উপাধ্যায় ও পাঞ্চালী বোসকে তিনি হত্যা করেন।	নীলকণ্ঠ উপাধ্যায় ও বর্ণিনী উপাধ্যায়ের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেন, তারপর হাতের শিরা কেটে দেন। পাঞ্চালী বোসকে অ্যালকোহলের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে

			দেন। তাতেও যখন মৃত্যু হয়না, তখন নিজের পরিচিত নার্সিংহোমে তাঁকে ভর্তি করেন, যাতে তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা যান।
গড় চক্রায়ণে গার্গী	প্রীতম সোম প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সম্মানীয় পদে চাকরি করেন। একটি প্রজেক্টের জন্য গড় চক্রায়ণে অনেকদিন ধরে আছেন।	মিথিলেশ রায়ের তত্ত্বাবধানে মাটি খুঁড়ে বের করা অতি প্রাচীন মূর্তিটি কেষ্টর সহযোগিতায় একটি সাধারণ মূর্তির সঙ্গে বদলে দেন । কেষ্টকে হত্যা করেন।	কেষ্টকে হুইস্কি খাইয়ে নদীর পাড়ে নিয়ে যান। প্রথমে মাথায় ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করেন, তারপর নদীতে ফেলে দেন।
	ডক্টর প্রান্তিক মজুমদার প্রত্নতাত্ত্বিক। মিথিলেশ রায়ের জায়গায় তিনি অনেকদিন ওই	তাঁর নির্দেশেই প্রীতম সোম মূর্তি বদল করে। আসলে প্রীতমকে	

	প্রজেক্টের দায়িত্বে ছিলেন।	কলকাতায় বদলির টোপ দিয়ে তিনি কাজটা করান।	
পুরস্কার অপহরণ রহস্য	লালকৃষ্ণ সাউথ কর্নার স্কুলের মালি। অনেকে মনে করে তার মাথায় ছিট আছে।	স্কুলের নতুন রেক্টর ইন্দ্রাজিৎ বাবুর নির্দেশে ফ্রান্স থেকে আসা পদক চুরি করে মাটির মধ্যে লুকিয়ে রাখে।	
	বিচিত্রশংকর বাবু তিনি ওই স্কুলের পুরনো রেক্টর ছিলেন।	তিনি কিছু ফরাসি চিটিংবাজদের কাছ থেকে কুড়ি হাজার ডলারের বিনিময়ে স্কুলের জন্য ঐ পদক কিনেছিলেন।	
চিনা ডাক্তারের হত্যা রহস্য	ডাক্তার মাও তুন চিনা ডেন্টিস্ট । রুক্ষ মেজাজের ডাক্তার। তার পসার কমে যাওয়ার জন্য নতুন ডেন্টিস্ট চ্যান চিউকে দায়ি করেন।	ডেন্টিস্ট চ্যান চিউকে হত্যা করেন।	দাঁতের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হওয়া হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করেন।

পূর্বা অ্যাপার্টমেন্টে গার্গী	রণব্রত রায় একটি অন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে চাকরি করে। সেই সূত্রে দিল্লিতে থাকে।	বন্ধুর সঙ্গে মিলে আর্থিক কেলেঙ্কারি ঘটায়। স্ত্রী দেবাঞ্জলিকে হত্যা করে।	শ্বাস রোধ করে হত্যা করে।
রজনি হত্যারহস্য	রাজ সিং ইলেক্ট্রিশিয়ান	রজনীকে হত্যা করে	দুহাতের শিরা কেটে হত্যা করে।
গার্গীর এ বি সি ডি রহস্য	পান্থ অধিকারী সিরিয়ালের পরিচালক। সিনেমা বানানোর পরিকল্পনা করে। চামেলি দে অমলেশ বসুর স্ত্রী। সিরিয়ালের অভিনেত্রী। ষড়যন্ত্রের সহযোগী।	অমলেশ বসু ও বিশ্বনাথ বসুকে হত্যা করে।	শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। তারপর অমলেশকে ঝুলিয়ে দেয়, যাতে মনে হয় বাবাকে খুন করে সে আত্মঘাতী হয়েছে।
গার্গীর পিছু-পিছু রহস্য	প্রফেসর রায়গুপ্ত তিনি অধ্যাপক। তাঁর পূর্ব পুরুষের বাড়ি শিমুলতলায় ছিল, তা খুঁজতে যান।	ভূত সেজে ভয় দেখান, যাতে হোটেলের বদনাম হলে কম টাকায় ঐ হোটেল বিক্রি হয়।	

	অভিজিৎ রায় শুভাশিস করের বন্ধু। দুজন মিলে একটা কোম্পানি খোলে, যা আসলে জালিয়াতির কারবার।	শুভাশিসের স্ত্রী সান্ত্বনা ও মেয়ে বল্লভিকে হত্যা করে।	ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে।
হস্টেলে হত্যা	ডাক্তার প্রাংশু দত্ত তিনি ব্যাস্ত সার্জেন্ট ছিলেন। স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ায় তাকে সঙ্গে করে এই হাসপাতালে সুপারের পদ নিয়ে চলে আসেন।	ঐ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র দিব্যসারথিকে হত্যা করেন।	প্রথমে ঘুমের ওষুধ ইঞ্জেক্ট করেন, তারপর দুহাতের শিরা কেটে দেন।
ড. ঋতম্ভর মিত্রর হত্যারহস্য	লঙ্কা বানেশ্বর মণ্ডলের ফায়ফরমাশ খাটে ।	ডাক্তার মিত্রকে খুন করে। এছাড়া তার আর অন্য কোনও অপরাধের বিবরণ পাওয়া যায় না।	

	বানেশ্বর মণ্ডল তাঁর নানা ধরণের ব্যাবসা আছে, পাশাপাশি একটি নার্সিংহোমের মালিক তিনি। ডাক্তার শেফালি রায়কে তিনি রক্ষিতা করে রাখেন। তাঁর নির্দেশেই লঙ্কা হত্যা করে ।	তাঁর নির্দেশেই লঙ্কা হত্যা করে।	
বিকানিরে এক রহস্যময়ী	ভৈরব জুনাগড় ফোর্টের একটি দোকানের মালিক।	অলীককে হত্যা করে।	সে ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করে।
	বিবেক দেশপাণ্ডে 'অর্কিড' টিভি কোম্পানির মালিক। তাছাড়া এন্টিকের পারিবারিক ব্যাবসা আছে। সেই সমগ্র ষড়যন্ত্রের মূল হোতা।	নারী স্বরের অধিকারী রমেশ বাপনাকে দিয়ে অলীককে নিজের কাজে লাগানোর প্ল্যান করে। তার নির্দেশে অলীক খুন হয়।	

মেরিন ড্রাইভ হোটেল রহস্য	শুভম সাইগল পেশায় গায়ক। রায়াকে বিয়ের আগে তাঁর দুটো বিয়ে টেঁকেনি। রায়াকে বিয়ে করার পর এক গায়িকার প্রেমে পড়ে।	স্ত্রী রায়া মুদ্গলকে হত্যা করে।	স্ত্রীর প্রিয় সিগারেটের ব্র্যান্ড কিনে তার মধ্যে একটিতে পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে দেন।
পিঙ্কি হত্যা রহস্য	বিল্ব সান্যাল স্কুলের ছাত্র, একটু অপ্রকৃতিস্থ ধরণের। পিঙ্কির প্রেমে পড়ে নানা ভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে ব্যার্থ হয়।	পিঙ্কিকে হত্যা করে।	ছুরি দিয়ে বারবার আঘাত করে তাকে হত্যা করে।
টপস্পিন রহস্য	অনুলোক চন্দ্র টেবিল টেনিস খেলা দেখতে মর্নিং স্টার ক্লাবে যেত। খেলোয়াড় বর্ণার ফ্যান হয়ে যায়।	টেবিল টেনিস প্লেয়ার বনশ্রীকে হত্যা করে।	ঘাড়ের কাছে গুলি করে হত্যা করে।
পুরনো ইতিহাসের সন্ধানে গার্গী	বিশ্বরাজ বাবু একজন বড় ব্যাবসায়ী, অনেক ধরণের ব্যাবসা আছে। তিনি প্রমোটারিতে নামতে চান। সেই কারণে নানা ভাবে ঈশিতার	ঈশিতা চ্যাটার্জিকে হত্যা করেন। তারপর তার টাকা, দলিল চুরি করে নিয়ে যান।	প্রথমে মাথায় ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করেন, তারপর বালিশ চাপা দিয়ে

	জমি নেওয়ার চেষ্টা করেন।		শ্বাসরোধ করেন।
মুঘলযুগের যুগের হিরে রহস্য	অশোক শাস্ত্রী জ্যোতিষী হিসেবে একটি গহনা ও গ্রহরত্নের দোকানে বসতেন, যার মালিক ছিল বিলাস দত্ত।	বিলাস দত্তকে হত্যা করে টাকা আত্মসাৎ করেন।	হাত দেখার লেন্স দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যা করেন।
অন্তরালে একজন	সুরম্য পুততুণ্ড / বিট্টু বন্দর এলাকার নামকরা গুণ্ডা। বিভিন্ন সময়ে নাম ভাঁড়িয়ে নানা অপরাধ করে। জেলে বসে মোবাইলে অর্ডার দিয়ে অপরাধ জগতের কাজ চালায়।	জেলে থেকে সুপারি দিয়ে অনেকের হত্যা করায়। শেষ পর্যন্ত টাকার বিনিময়ে তাকে সাহায্য করা সেপাই, ফটিকেরও হত্যা করায়।	
	ফটিক একজন সেপাই।	সে বিট্টুকে মোবাইলের সিম তুলে এনে দেয়।	
ফ্ল্যাটবাড়িতে জোড়া খুন	পলাশবন্ধু রায় রাহুল মহান্তির বন্ধু, একই বিল্ডিংয়ে থাকেন।	ফটোগ্রাফার রাহুল মহান্তি ও তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেন।	খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেন। ঘুমিয়ে পড়লে

			হাতের শিরা কেটে দেন।
সবুজ স্কার্ফ ('সবুজ দুপাট্টা রহস্য'র নাট্যরূপ)	অচ্যুত ভাণ্ডারী নীলকণ্ঠ উপাধ্যায়ের বন্ধু। উঠতি মডেল চামেলির বর। নীলকণ্ঠ ও তিনি একই বিল্ডিংয়ে থাকেন।	নীলকণ্ঠ উপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেন।	খাবার জলের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেন। ঘুমিয়ে পড়লে ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা কেটে দেন।
সবুজ কোমরবন্ধনী রহস্য	নেহা শর্মা পেশায় ফ্যাশান ডিজাইনার। টুম্পার বন্ধু	টুম্পা শরখেলকে হত্যা করে।	নিজের কোমরের বেল্ট টুম্পার গলায় জড়িয়ে তার শ্বাস রোধ করে হত্যা করে।
রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য	জিনিয়া রায়মল্লিক বাড়ির মালিক অসুস্থ্য ইন্দ্রজিৎ বাবুর নার্স। তাঁর বড় ছেলে অর্কজিতের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি তার স্ত্রী চন্দ্রিমাকে খুশি করার জন্য তার সঙ্গেও	ইন্দ্রজিৎ বাবু ও সৌম্যজিতকে হত্যা করে। অর্কজিতের মেয়ে তানিয়াকে ভূত সেজে ভয় দেখায়। রায়মল্লিক বাড়ির সব	ইন্দ্রজিৎ বাবুকে ঠিক মতো ওষুধ না খাওয়ানোর জন্য ধীরে ধীরে তাঁর মৃত্যু হয়। সৌম্যজিতের খাওয়ার দুধের মধ্যে সাপের

	যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে।	গহনা চুরি করে।	বিষ মিশিয়ে দেয়।
নিষিদ্ধ নগরীতে গার্গী	জুবিং কাগজের চিফ নিউজ এডিটর। চু সিই মিং, গাও ঝিংশে এই দুই ছদ্মনামেও সে বিয়ে করেছে এবং প্রতিটি স্ত্রীর সঙ্গে একটি করে সন্তানের জন্ম দিয়েছে। ত্রস্তার প্রতিও তাঁর নজর আছে। সেই কারণে সায়ন ও গার্গীকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেন।	নিজে হাতে কোনও খুন না করলেও কাহিনিতে যে দুটি খুনের ঘটনা পাওয়া যায় তা তার নির্দেশেই ঘটেছে।	১। গ্যান ঝেংগোয়ানকে একটি গাড়ি পিষে দিয়ে চলে যায়। ২। শাওগঙকে কেউ খুন করে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়।
রঙের রহস্য	বিশাল বর্গী অসফল শিল্পী। রাকেশ সিনহা তাকে নিজের খুব বিশ্বাস করত।	রাকেশকে হত্যা করে তার যাবতীয় ছবির মালিক হতে চান।	ঘুমন্ত অবস্থায় বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়।
অলিন্দে অশরীরী	রণবীর সিংহরায় কলকাতায় থাকেন, গান-বাজনা নিয়ে থাকেন। পৈতৃক রাজবাড়ির কাছে তিনি শপিংমল বানাতে চান।	রণবীর বসন্তের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। যাতে ভয়ে আলতাপুর রাজবাড়িতে ট্যুরিস্ট না	

	বসন্ত দিগার রাজবাড়ির চৌকিদার।	আসে তার জন্য বসন্ত রাজবাড়িতে ভৌতিক আবহ তৈরি করে রাখত।	
ধাঁধা রহস্য	বনলক্ষী দেবী শুভলক্ষ্মী দেবীর প্রৌঢ়া বোন। বারুইপুরে থাকেন। বিনয় ও ডালিম 'আকাশদীপ' আবাসনের সিকিউরিটি স্টাফ।	বনলক্ষী দিদি শুভলক্ষ্মীকে হত্যা করার জন্য এই দুই সিউকিউরিটি গার্ডকে কাজে লাগান। এরা দুজন মিলে শুভলক্ষ্মীকে হত্যা করে ও তাঁর আলমারি থেকে প্রচুর গয়না চুরি করে।	শুভলক্ষ্মী দেবীকে একটি চেয়ারে বসা অবস্থায় পিছনদিকে হাত বেঁধে গলা কেটে হত্যা করা হয়।
ভূতুড়ে মুঠোফোন রহস্য এবং গার্গী	রুদ্র সান্যাল একটি কেন্দ্রীয় সংস্থায় কাজ করেন, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে অবসর নিতে হবে।	বিভিন্ন নম্বর থেকে ফোন করে স্ত্রীকে ভয় দেখাতে থাকেন, যাতে তিনি চাকরি	

		ছেড়ে তাঁকে সঙ্গ দিতে বাধ্য হন।	
মুন্নারে মসলিন রহস্য	সুশীতল পাকড়াশি একটি নির্মাণ কোম্পানির কন্সট্রাকশন অফিসার। অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করে বিলাস বহুল জীবন কাটাতে ভালোবাসেন।	তলাপাত্র দম্পতির ওপর শাড়ি চুরির দায় চাপিয়ে তাঁদেরকে বদনাম করতে চান। তাতে সফল না হলে তাঁদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন।	মিস্টার তলাপাত্রদের বোটে ধাক্কা মেরে তাদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। তারপর তাঁদের বিছানার ওপর জ্বলন্ত লাইটার ছুঁড়ে দিয়ে জ্যন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেন। তবে সফল হননি।
ডি এন এ যখন ক্লু	সুদাম গায়েন গ্রামের মাঝ বয়সী পুরুষ। কাজের সন্ধানে কলকাতায় এসেছিল।	নম্রতাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে।	মুখে কাপড় বেঁধে তাকে ধর্ষণ করার পর মাথায় প্লাস দিয়ে বারবার আঘাত করে হত্যা করে।
'দি ভেনাস' অন্তর্ধান রহস্য	মনোজ শর্মা অনতি চল্লিশ যুবক।		

	‘বেঙ্গল আর্ট গ্যালারি’তে অনেকদিন ধরে চাকরি করে।	গ্যালারি থেকে আসল ছবি বের করে নিয়ে সেগুলির নকল বানিয়ে নকল ছবি দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিয়ে আসল ছবি চড়া দামে বিক্রি করে দিত। ভেনাসের ছবির ক্ষেত্রে এমনটা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়।	
যখন কোথাও কোনও ক্লু নেই	অতুল শর্মা বন্ধুর সঙ্গে মিলে একটি ইলেক্ট্রনিক্সের শোরুম চলায়।	বন্ধু রতন সুব্বাকে হত্যা করে।	প্রথমে খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে তাকে ঘুম পাড়ায়। তারপর সারা গায়ে তার জড়িয়ে ইলেকট্রিক শক দিয়ে তাকে হত্যা করে। যাতে তার মুখ চেনা না যায়, তার জন্য মুখের

			ওপর একটি থালা বসিয়ে রেখে শক দেয়।
হ্যাকিং রহস্য	অলোকমণি ভড় একটি স্টুডিও চালায়। সমর্পিতাকে টোপ দিয়ে তাকে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলে। সমর্পিতা একটি খামখেয়ালি মেয়ে। বাড়িতে বাংলা পড়ায়, মাঝে মাঝে পাড়ার দোকানে জেরক্স করে, আবার স্টুডিওতে গিয়েও কাজ শেখে।	সমর্পিতার হ্যাক করা অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা আত্মসাৎ করে ও সমর্পিতাকে হত্যা করে। তিনটি ব্যাঙ্কের পাঁচটি অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ষাট লক্ষ টাকা সরিয়ে ফেলে।	গলা টিপে শ্বাস রোধ করে হত্যা করা হয় ।
ন্যুড পোর্ট্রেট রহস্য	রাঘব মালাকার প্রিয়ংবদার বর। চাকরির দরুন বেশিরভাগ সময় ব্যাঙ্গালোরে থাকে।	ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে শিল্পী আরণ্যক সিনহাকে হত্যা করান।	বাইকে যেতে যেতে দুষ্কৃতি আরণ্যকের পিঠে গুলি করে।
স্মার্টফোন বনাম ট্যাব	ডক্টর ভীষ্মদেব শর্মা ও রণদেব সিং		

	গার্গীদের ট্রেনের সহযাত্রী।	একে অপরের মোবাইল ফোন ও ট্যাব চুরি করে।	
বান্টি হত্যা রহস্য	কুশধ্বজ ‘অপরাজিতা’ আবাসনের সিকিউরিটি গার্ড	বান্টিকে উত্যক্ত করত, পরে তার অভিযোগের ভিত্তিতে অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গেলে তাকে হত্যা করে।	ছুরি দিয়ে বারবার আঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়।

কিশোর কাহিনিগুলির অপরাধ নিয়ে যেহেতু আলাদা ভাবে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, তাই এই ছকে সেগুলোকে রাখা হয়নি।

❖ পুলিশের ভূমিকা :

গোয়েন্দা কাহিনির নির্মাণই হয় পুলিশি গাফিলতির ধারণা থেকে। বেসরকারি গোয়েন্দা কাহিনির প্রতি মানুষ তখনই বেশি আকৃষ্ট হয়, যখন পুলিশি ব্যাবস্থার কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা পায়না। তবে লেখক নিজে একজন সরকারি আমলা হওয়ার ফলে পুলিশি ব্যাবস্থাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সেক্ষেত্রে একজন গোয়েন্দার ভূমিকাকে উচ্চকিত করতে গিয়ে তিনি পুলিশি ব্যাবস্থাকে কিভাবে দেখাবেন, তা বেশ কৌতূহল উদ্রেককারী বিষয়।

‘সোনালি সুতোর ফাঁস’ কাহিনিতে দেখা যায় । ইনস্পেক্টর দ্যুতিমান চ্যাটার্জি টিটোর ঘর অনুসন্ধান করে অনেক কিছু পান, যা গার্গী পায়নি । এরপর পুলিশ যখন নিষিদ্ধ পল্লী থেকে ইয়াসমিনকে ধরে আনে। তখন গার্গীর মনে হয় --- “পুলিশের হাত অনেক লম্বা। তাদের পরিকাঠামো যে কোনও জটিল তদন্তের পক্ষে অনেক মজবুত। গার্গী একেবারেই

সখের গোয়েন্দা। তার অনুসন্ধিৎসা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় রহস্যের পিছনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কি আছে দেখিই না, এই তার লোভ।'"[২০]

আর এই লোভের বশবর্তী হয়ে যখন সে আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করে বুঝতে পারে যে, সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে, তখন খবর পাঠানোর পর ঠিকঠাক সময়ে পুলিশ হয়ে তাকে উদ্ধার করে। 'ধূসর মৃত্যুর মুখ' উপন্যাসেও দেখা যায় কলকাতা থেকে ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল ডক্টর সুস্নাত তালুকদারের হত্যা রহস্যের তদন্ত করতে লখনউ এসে হাজির হন। লোচ্চা মারা গেলে সবাই ভাবে যেহেতু পাইপ চড়ে মেয়েদের শোবার ঘরে বাথরুমে উঁকি মারার অভ্যেস তার ছিল, এমন করতে গিয়ে পাইপ থেকে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু দেবাদ্রি প্রথম বুঝতে পারেন লোচ্চাকে শ্বাস রোধ করে মারা হয়েছে, তারপর ছুঁড়ে তাকে ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ, পুলিশকে একেবারে অপদার্থ মাথামোটা দেখানোর যে চল আছে, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তার থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়ান। 'ড. ঋতম্ভর মিত্র হত্যা রহস্য'তে ইনস্পেক্টর সুকোমল ঘোষ গার্গীর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বপুর্ণ ব্যাবহার করেন। গার্গীর সঙ্গে রসিকতা করে বলেন, "ম্যাডাম, আপনি এতো ফাস্ট হলে তো আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে!"[২১]

গার্গী সোনালিচাঁপাকে রোগী সাজিয়ে যশোদা নার্সিং হোমে ভর্তি করে তাঁকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে বললে এই ইনস্পেক্টর যথা সময়ে উপস্থিত হন। নাহলে সোনালিচাঁপা সাঙ্ঘাতিক বিপদে পড়তে পারত। আবার গার্গী যখন বানেশ্বর মণ্ডলকে তাঁর মোবাইল দেখাতে বলে, তিনি সহজেই অস্বীকার করেন। কিন্তু সুকোমল যখন জেরা করার পর তার মোবাইল হাস্তগত করে তখন তার কিছু করার থাকে না। ঐ মোবাইল থেকে এই কেস সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানা যায়।

গার্গীর আলাদা আলাদা কাহিনিতে বেশির ভাগ সময়ই আলাদা আলাদা পুলিশ ইন্সপেক্টরদের দেখা যায়। 'কফিন রঙের রুমাল' উপন্যাসে দেবজ্যোতি নাগ, পূর্বা এপার্টমেন্টে গার্গী ইনস্পেক্টর সাম্য জোয়ারদার, সাব ইনস্পেক্টর পূর্ণচন্দ্র ব্রহ্ম, 'গার্গীর এ বি সি ডি রহস্য'তে ইনস্পেক্টর অর্ণব বসু রায়, 'রজনী হত্যা রহস্য'তে ইন্সপেক্টর কোহলি, 'বিকানিরে এক রহস্যময়ী'তে নরেশ নাগোরি প্রমুখের দেখা মেলে। বেশির ভাগ গোয়েন্দা কাহিনিতেই দেখা যায় গোয়েন্দার সঙ্গে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের ভালো সম্পর্ক আর বেশিরভাগ কেসের ক্ষেত্রেই তিনি উপস্থিত। কিন্তু অপরাধ ঘটে বিভিন্ন জায়গায় আর সেই অঞ্চলগুলো আলাদা আলাদা থানার অন্তর্গত তাই পুলিস ইনস্পেক্টর আলাদা হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তবে দেবাদ্রি সান্যালকে শুরুর দিকের বেশ কয়েকটি কাহিনিতে দেখা যায়,

তিনিই দ্যুতিমান চ্যাটার্জির সঙ্গে গার্গীর আলাপ করিয়ে দেন। তাঁর সূত্রে পুলিশ মহলে গার্গীর বেশ খানিকটা পরিচিতি হয়। দেবাদ্রি, দ্যুতিমান, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনর অরিজিৎ পুরকায়স্থ এঁরা বেশ কিছু কাহিনিতে উপস্থিত। কিন্তু তারপরও বেশিরভাগ তদন্তকারী অফিসারই তার অপরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে গার্গী পুলিশের সাহায্য করে, যেমন, 'গার্গীর এ বি সি ডি রহস্য'তে গার্গী পান্থ অধিকারির আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ার জন্য তার স্ক্রিপ্ট নিজের কাছে রেখে নিয়ে রাখে, তারপর তা ফরেনসিক টেস্টের জন্য পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অন্যদিকে পুলিশও তার তদন্তের ক্ষেত্রে সাহায্য করে, 'বিকানিরে এক রহস্যময়ী'তে তদন্তকারী অফিসার গার্গীকে বলে --- "ম্যাডাম, আপনি কি সুভাষ ভার্গবকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ? আপনি বললেন আপনি একজন ডিটেকটিভ। আপনি নিজে জিজ্ঞাসা করলে বেশি স্যাটসফায়েড হবেন"।[২২]

আসলে গার্গীর পদমর্যাদার জন্য তাকে কেউ তাচ্ছিল্য করতে পারেনা। তপন বন্দপাধ্যায়ের অনেক কাহিনিতে, বিশেষত রাজ্যের বাইরের কাহিনিতে লেখক বলেন—পুলিশের লোক পদমর্যাদাকে খুব সম্মান করে।

তবে প্রত্যেক তদন্তকারী অফিসার যে গার্গীর সঙ্গে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে, তা নয়। '৭৭ সবুজ সরণী'তে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর মাসুম মিত্র খুব জাঁদরেল পুলিশ। তিনি মূলত খুনের কেস নিয়েই তদন্ত করেন। রাতে মদ খান, মাঝেমাঝে মুখ খারাপও করেন। প্রথম দিকে গার্গীকে বিশেষ পাত্তা দিতে চান না। গার্গী বারবার দেবাদ্রি সান্যালের কথা ভাবে। যদিও পরের দিকে মাসুম মিত্রও তাকে বেশ কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করে। আবার কাহিনির শেষে গার্গীর অনুরোধে তিনই পরিচালক দ্যুতিপ্রভ আর রূপসীকে নার্সিংহোমে নিয়ে আসেন। 'ডি এন এ যখন ক্লু' কাহিনিতে ইনস্পেক্টর ঋতব্রত রায় মজুমদারের সঙ্গে যখন তাঁর আলাপ হয়, তখন তিনি গার্গীকে বিশেষ পাত্তা দিতে চান না। বরং তাকে জানিয়ে দেন এখনকার পুলিশ অনেক বেশি কর্ম তৎপর, প্রাইভেট ডিটেকটিভদের কোনও প্রয়োজন আর নেই। কিন্তু গার্গীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়ার পর তিনি গার্গীকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেন। 'যখন কোথাও কোনও ক্লু নেই' কাহিনিতে দেখা যায় তিনিই গার্গীকে ফোন করে জানান তিনি একটা কেস সল্ভ করতে পারছেন না, গার্গীর সাহায্য চান।

অর্থাৎ, একটা জিনিস খুব স্পষ্ট, গার্গী মেয়ে গোয়েন্দা বলে আলাদা করে তাকে কোনও বিরূপ পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়নি, তাচ্ছিল্যের জাল কাটিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়নি। আর গার্গীকে বড় করে দেখানোর জন্য লেখককে আলাদা ভাবে পুলিশকে

ছোটো করার দরকার পড়েনি। 'রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য' কাহিনিতে ইনস্পেক্টর মিত্র যেভাবে কেস সাজান, সেই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্ছিদ্র। তাঁর যুক্তি পরম্পরা পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপর যখন গার্গী পুরো রহস্যের জট ছাড়ায় তখন দেখা যায় ইনস্পেক্টর মিত্রের ব্যাখ্যার কোনও পয়েন্টই মিলছে না। পাঠক চমৎকৃত হয় এবং বুঝতে পারে গার্গী যেহেতু গোয়েন্দা তাই তার ব্যাখ্যা সঠিক হতে বাধ্য, কিন্তু ইনস্পেক্টর মিত্রকেও বোকা পুলিশ বলা চলে না।

❖ সীমাবদ্ধতা

বাংলার অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দা সিরিজের সঙ্গে গার্গী সিরিজের তুলনা করলে একথা সহজেই বলা যায়, এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত মেয়ে গোয়েন্দাদের রচনা সম্ভারের মধ্যে এই সিরিজ আয়তন ও গুনগত মানের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে। কিন্তু তার পাশাপাশি একথাও স্বীকার করতে হয়, হয়ত অতিরিক্ত লেখার চাপের কারণেই লেখক একই কাহিনি ভিন্ন ভিন্ন মোড়কে হাজির করেছেন। 'ক্যাপসুল রহস্য' ও 'স্মৃতিবর্ধক ট্যাবলেট রহস্য'তে পৃথ্বীরাজ সান্যাল ও অমলেশ বসু উভয়েই অনেকগুলো স্মৃতিবর্ধক ট্যাবলেট খেয়ে ফেলে ভুল বকতে শুরু করেন। 'ব্রাহ্মীলিপি রহস্য' ও ' ইহুদি কন্যা রহস্য'তে দেখা যায় ব্যাক্তিগত মিউজিয়ামে একটি লিপির মাধ্যমে সেই পরিবারের উইল হাজির হয়েছে, সেই পরিবারের পুত্রবধূরা তাদের সম্পত্তি পাওয়ার চেষ্টায় বারবার সেই মিউজিয়ামে এসেছে। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে মূল অপরাধ ও কাহিনি বিন্যাস আলাদা। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় লেখক প্রায় একই লেখা সামান্য পরিবর্তন করে দুটো আলাদা কাহিনি বানিয়েছেন। যেমন, 'ক্যামেরা হরণ রহস্য' আর 'স্মার্টফোন বনাম ট্যাব' কাহিনিতে চরিত্রগুলির আচরণ পর্যন্ত একই রকম। 'ক্যামেরা হরণ রহস্য'তে শুধু বিজয়েন্দ্রই কর্নেলের ক্যামেরা চুরি করেছিল, আর 'স্মার্টফোন বনাম ট্যাব'-এ রণদীপ সিং ও ডক্টর ভীষ্মদেব শর্মা উভয়েই একে অপরের জিনিস চুরি করেছেন, এটুকুই যা পার্থক্য। 'রুমকির হত্যারহস্য' আর 'বান্টিহত্যা রহস্য'র কাহিনিও একই। দুটো কাহিনিতেই সিকিউরিটি গার্ড আবাসনের একটি মেয়েকে উত্যক্ত করে, সে অভিযোগ জানালে সিকিউরিটি গার্ডের বদলি হয়ে যায়। তারপর সেই সিকিউরিটি গার্ড এসে ঐ কিশোরীকে হত্যা করে। একই ঘটনাকে সামান্য বদলে আলাদা গল্প বানানোর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল, 'হস্টেলে মৃত্যু' ও 'রজনী হত্যা রহস্য'। পার্থক্য শুধু এইটুকু একটিতে একজন মেয়ের হত্যা হয়েছে, একটিতে এক ছেলের হত্যা হয়েছে। 'রজনী হত্যা

রহস্য’তে দেখা যায়, গার্গী সায়ন ঘুরতে গেলে কলকাতা থেকে শঙ্কর তলাপাত্র ফোনে জানান, তাঁর মেয়ে হস্টেলে খুন হয়েছে। রজনি তলাপাত্র ফ্যাশান ডিজাইনিং পড়তে এসেছিল। সেখানে রুমমেটের সঙ্গে তার বনিবনা ছিল না। ‘হস্টেলে মৃত্যু’তে দেখা যায় দিব্যসারথি মেডিক্যাল পড়তে গেছে, রুমমেট সঙ্গে চিরঞ্জয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। যদিও এখানে তার বদলে পাল্টে অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। খুনের ক্ষেত্রেও বেশ মিল রয়েছে। রজনিকেও দু’হাতের শিরা কেটে খুন করা হয়েছিল। আর দিব্যসারথিকেও সে ভাবেই হত্যা করা হয়। এমনকি দুই কাহিনির বেশকিছু অংশ হুবহু একই ---

> ১। “তোমার বাবা বেশ ঘ্যামা লোক, তাই না ?”[২৩] (পবন আগরওয়ালকে পুলিশ/ হস্টেলে হত্যা)
>
> ১ক। “তোমার বাবা বেশ ঘ্যামা লোক, তাই না ?”[২৪] (পুলিশ প্রীতি প্যাটেলকে / রজনি হত্যা রহস্য)
>
> ২। “গার্গী খুশি হয়ে বলল, ঠিক আছে, আপনি বরং আপনার ইন্টারোগেশন চালিয়ে যান। আমি মনে মনে নোট করে নিচ্ছি উত্তরগুলো।”[২৫] (ইনস্পেক্টর ভোঁসলেকে গার্গী/ হস্টেলে হত্যা)
>
> ২ক। “গার্গী খুশি হয়ে বলল, আপনি বরং ইন্টারোগেশন চালিয়ে যান। আমি ডায়রিতে নোট করে নিচ্ছি উত্তরগুলো।”[২৬] (রজনি হত্যা রহস্য)
>
> ৪। “বছর কুড়ির এক তরুণের মৃতদেহ দেখার মতো শাস্তি আর হয়না। গার্গী এক মুহূর্ত চোখ ফেলেই তুলে নিল অন্যদিকে।”[২৭] (হস্টেলে হত্যা)
>
> ৪ক। “ বছর একুশের এক তরুণীর মৃতদেহ দেখার মতো শাস্তি আর হয় না। গার্গী এক মুহূর্ত চোখ ফেলেই চোখ ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে।”[২৮] (রজনি হত্যা রহস্য)
>
> ৫। “গার্গী বুঝে ফেলল সায়নের আমন্ত্রকরা ঘটনার দ্রুততায় কোনও দিশে না পেয়ে একজন পেশাদার গাইডকেই জুড়ে দিয়েছেন গার্গীর ট্যুরের সঙ্গে।”[২৯] (হস্টেলে হত্যা)
>
> ৫ক। “গার্গী বুঝে ফেলল হোটেলের ঘটনার দ্রুততায় কোনও দিশে না পেয়ে একজন পেশাদার গাইডকেই জুড়ে দিয়েছেন গার্গীর ট্যুরের সঙ্গে।”[৩০] (রজনি হত্যা রহস্য)

❖ মূল্যায়ন

গার্গীকে লেখক যখন পাঠকের সামনে প্রথম হাজির করেন তখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তারপর নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে তার জীবন এগিয়েছে। গার্গী সায়নকে বিয়ে করেছে, 'প্যারাডাইস প্রোডাক্ট'-এর ম্যনেজিং ডিরেক্টরের পদ সামলেছে। তারপর মা হয়েছে, তার সন্তান লুনাও একটু একটু করে বড় হয়েছে। 'রায়মল্লিক বাড়ির জড়োয়া রহস্য' উপন্যাসে দেখা যায়, লুনা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। সেও বড় হয়ে মায়ের মতো গয়ন্দাগিরি করতে চায়। 'মুন্নারে মসলিন রহস্য'তে দেখা যায় লুনা গার্গীর সহকারী হয়ে উঠছে। 'ন্যুড পোট্রের্ট রহস্য'তে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত লুনার ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গার্গীর সমসাময়িক আরেক মেয়ে গোয়েন্দা হল প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। গার্গী আর প্রজ্ঞাপারমিতার ডাকনাম প্রায় কাছাকাছি, মিতুন আর মিতিন। দুই গোয়েন্দাই সংসার সামলে গোয়েন্দাগিরি করে, দুজনেই ক্যারাটে জানে। কিন্তু এই মিলের থেকে দুজনের পার্থক্যই বেশি। মিতিনকে বারবার সবার কাছে প্রমাণ করতে হয় যে সে নারী হলেও কারোর থেকে কম যায় না। কিন্তু গার্গীর ক্ষেত্রে তা প্রমাণের খুব একটা দরকার পড়েনি। বোধ হয় তপন বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠকের কাছে এই বার্তা দিতে চেয়েছেন, পদাধিকারের সামনে লিঙ্গগত পরিচয় খুবই নগণ্য বিষয়।

নির্দেশিকা

১। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার গোয়েন্দা উপন্যাস লেখার পশ্চাদপট', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪২০, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৫

২। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঈর্ষার সবুজ চোখ', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ১, দে'জ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৭৮-৭৯

৩। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, 'বহে বিষ বাতাস', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ১, দে'জ, কলকাতা, ২০১১

৪। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হিরের আংটি', গোয়েন্দা গার্গী কিশোর সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৮৩

৫। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রহান্তরের প্রাণী', গোয়েন্দা গার্গী কিশোর সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৫৭

৬। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কিঙ্কর হত্যা রহস্য', গোয়েন্দা গার্গী কিশোর সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৩৬

৭। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঈর্ষার সবুজ চোখ', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২১ পৃ. ৫৩

৮। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭ পৃ. ৩০

৯। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঈর্ষার সবুজ চোখ', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ১ , দে'জ, কলকাতা, ২০১১ পৃ. ৫৭

১০। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ধূসর মৃত্যুর মুখ', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ২ , দে'জ, কলকাতা, ২০১২ পৃ. ১৪

১১। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ধূসর মৃত্যুর মুখ', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ২ , দে'জ, কলকাতা, ২০১২ পৃ. ২০৮-২০৯

১২। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৩, দে'জ, কলকাতা, ২০১৩

১৩। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বয়ে বিষ বাতাস', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ১ , দে'জ, কলকাতা, ২০১১ পৃ. ২৬৫

১৪। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঈর্ষার সবুজ চোখ', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ১ , দে'জ, কলকাতা, ২০১১ পৃ. ২০

১৫। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঈর্ষার সবুজ চোখ', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ১ , দে'জ, কলকাতা, ২০১১ পৃ. ১৪৮

১৬। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ধূসর মৃত্যুর মুখ', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ২ , দে'জ, কলকাতা, ২০১২ পৃ. ১৩৩

১৭। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সোনালি সুতোর ফাঁস', গার্গী সমগ্র ২ , দে'জ, কলকাতা, ২০১২ পৃ. ৩৫৩

১৮। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য, এপ্রিল ২০১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১০-১১

১৯। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাইবার রহস্য', গোয়েন্দা গার্গী কিশোর সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৯০

২০। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সোনালি সুতোর ফাঁস', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ২, দে'জ, কলকাতা, ২০১২ পৃ. ৩১৫

২১। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ড. ঋতম্ভর মিত্রর হত্যারহস্য', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬ পৃ. ২৪৮

২২। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিকানিরে এক রহস্যময়ী', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬ পৃ. ২৮৮

২৩। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হোস্টেলে হত্যা', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৬, দে'জ, কলকাতা, ২০১৬ পৃ. ২০১

২৪। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রজনি হত্যারহস্য', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৬ , দে'জ, কলকাতা, ২০১৬ পৃ. ৮৪

২৫। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হোস্টেলে হত্যা', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৬ , দে'জ, কলকাতা, ২০১৬ পৃ. ১৯৮

২৬। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রজনি হত্যারহস্য', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৬ , দে'জ, কলকাতা, ২০১৬ পৃ.৭৭

২৭। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হোস্টেলে হত্যা', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৬ , দে'জ, কলকাতা, ২০১৬ পৃ. ১৯০

২৮। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রজনি হত্যারহস্য', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৬, দে'জ, কলকাতা, ২০১৬ পৃ. ৬৬

২৯। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হোস্টেলে হত্যা', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৬, দে'জ, কলকাতা, ২০১৬ পৃ. ১৮৭

৩০। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রজনি হত্যারহস্য', গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র ৬, দে'জ, কলকাতা, ২০১৬ পৃ. ৬৪

সপ্তম অধ্যায়

পেশাদার গোয়েন্দার ভূমিকায় নারী

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি ভাগলপুরে মামারবাড়িতে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। তাঁর পৈতৃক বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর জেলায় হলেও পড়াশুনো ও কর্মজীবনের তাগিদে জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটে কলকাতাতে। ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস হাই স্কুলের স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা 'চড়ুই' নামের একটি ছড়া প্রকাশিত হয়, এটিই তাঁর জীবনের প্রথম লেখা প্রকাশ। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বোনের মেয়ে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় সতের বছর বয়সে স্নাতক প্রথম বর্ষে পড়াকালীন পরিবারের অমতে সুচিত্রা ভট্টাচার্য বিয়ে করেন। এই কারণে তাঁকে বাড়ি ছাড়তে হয়। তিনি লেক প্লেস ছেড়ে ঢাকুরিয়ায় চলে যান। লেডি ব্রেবর্ন কলেজে কেমিস্ট্রি নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু মাতৃত্বের কারণে কলেজ ছাড়তে হয়। পরে যোগমায়া দেবী কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হন, সেখান থেকে স্নাতক হন।

চাকরি জীবনের শুরু পরপর কিছু ছোটখাটো কাজ দিয়ে। প্রথমে কিছুদিন টাইপিস্ট ও টেলিফোন অপরেটর হিসেবে কাজ করার পর সিনক্লেয়ার্স গ্রুপের 'ফ্রেট এন্ড কার্গো কোম্পানি'তে জুনিয়র অফিসার হিসেবে কাজ করেন। কিছুদিন পর বিদ্যুৎ বিভাগে চাকরি পান। তারপর 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষা দিয়ে গেজেটেড অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘদিন চাকরি করার পর ২০০৪ সালে স্বেচ্ছাবসর নেন। আসলে লেখালেখিতে সময় ব্যায় করার জন্য তাঁর এই সিদ্ধান্ত। মূলত ছোটগল্প দিয়ে সত্তরের দশকে বাংলা সাহিত্য জাগতে তাঁর আগমন ঘটে। আশির দশক থেকে তিনি উপন্যাস লেখায় হাত দেন। আর উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে গোয়েন্দা কাহিনি লেখায় হাত দেন।

২০০০ সালে প্রজ্ঞাপারমিতার প্রথম কাহিনি 'পালাবার পথ নেই' প্রকাশিত হয়। ২০০৩ সাল থেকে শুরু করে ২০১৪ সাল পর্যন্ত 'আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী'তে প্রকাশিত হতে থাকে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা গোয়েন্দা কাহিনি। তাঁর মৃত্যু পর ২০১৫ সালে 'আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী'তে প্রকাশ পায় তাঁর মিতিন কেন্দ্রিক শেষ কাহিনি

'স্যাণ্ডারসাহেবের পুঁথি'। মিতিনকে নিয়ে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ১৬টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'পাঁচ মিতিন' বইয়ে পাঁচটি কাহিনি রয়েছে, বাকি সবগুলিতে একটি কাহিনি। সব মিলিয়ে মিতিনের ২০টি কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে।

গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রকাশিত কাহিনিগুলির কালানুক্রমিক তালিকা :

১। পালাবার পথ নেই, আনন্দ, ২০০০

২। সারাণ্ডায় শয়তান, আনন্দ, ২০০৩

৩। জোনাথনের বাড়ির ভূত, আনন্দ, ২০০৪

৪। কেরালায় কিস্তিমাত, আনন্দ, ২০০৫

৫। সর্পরহস্য সুন্দরবনে, আনন্দ, ২০০৬

৬। ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য, আনন্দ, ২০০৭

৭। ছকটা সুডোকুর, আনন্দ, ২০০৮

৮। পাঁচ মিতিন, দে'জ, ২০১৫

৯। আরাকিয়েলের হীরে, আনন্দ, ২০০৯

১০। গুপ্তধনের গুজব, আনন্দ, ২০১০

১১। হাতে মাত্র তিনতে দিন, আনন্দ, ২০১১

১২। কুড়িয়ে পাওয়া পেন ড্রাইভ, পত্রভারতী, ২০১২

১৩। মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যু ফাঁদ, পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা ১৪১৯ (২০১২)

১৪। টিকরপাড়ায় ঘড়িয়াল, পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা ১৪২০ (২০১৩)

১৫। দুঃস্বপ্ন বারবার, পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা ১৪২১ (২০১৪)

১৬। স্যাণ্ডারসাহেবের পুঁথি, পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা ১৪২২ (২০১৫)

সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর লেখার মধ্যে নাগরিক মধ্যবিত্ত নারীর জীবনকে নিপুণ ভাবে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'গল্পপত্র' পত্রিকায় তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর বিমল কর তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁর কলমের জোর আছে, তিনি যেন তাঁর চেনা জগত নিয়ে লেখালেখিতে মন দেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মতে এটাই তাঁর জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। তিনি চব্বিশটি উপন্যাস ও দু'শোর ওপর ছোটগল্প লেখেন । 'কাঁচের দেওয়াল', 'কাছের মানুষ', 'আমি রাইকিশোরী', 'দহন', 'হেমন্তের পাখি' প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর সেই চেনা জগত, অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী জীবন বারবার করে উঠে আসে। মিতিন কেন্দ্রিক কাহিনিগুলিও তার ব্যাতিক্রম নয়।

❖ মিতিনের পরিচয়

প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জির ডাকনাম মিতিন। 'পালাবার পথ নেই' উপন্যাসে যখন সুচিত্রা ভট্টাচার্য এই মেয়ে গোয়েন্দাকে হাজির করেন, তখন তার পরিচয় গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। কিন্তু তারপর ২০০৩ সালে প্রকাশিত 'সারান্ডায় শয়তান' কাহিনি থেকে তার সেই আগের পরিচয় ঢাকা পড়ে গিয়ে পাঠক গোষ্ঠীর কাছে তার পরিচয় হয়ে ওঠে 'মিতিন মাসি'।

প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি ওরফে মিতিন মাসি পুরোপুরি পেশাদার গোয়েন্দা। অধিকাংশ সমালোচকের মতে বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা শাখার জন্ম ১৮৯৫ সাল থেকে। প্রায় পাঁচ শতক পরে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর হাত ধরে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে পা রাখে মেয়ে গোয়েন্দা কৃষ্ণা। কৃষ্ণা মূলত নিজের বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার তাগিদ থেকে অপরাধীদের পিছু ধাওয়া করে। এ থেকেই সে জড়িয়ে পড়তে থাকে অপরাধের ঘটনার সঙ্গে, এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে জিততে থাকে। তবে তাকে কোনও ভাবে পেশাদার গোয়েন্দা বলা যায় না। সমকালে বেশ জনপ্রিয়তা পায় এই সিরিজ। এর ফল স্বরূপ প্রভাবতী দেবী মেয়ে গোয়েন্দার আরও একটি সিরিজ বানান, 'কুমারিকা সিরিজ'। এখানে শিখা অন্য কোনও কিছুকে তার পেশা হিসেবে নেবেনা সেকথা জোর গলায় জানিয়ে দেয়। রহস্য অনুসন্ধান বা অপরাধীকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিভিন্ন বিখ্যাত প্রতিপত্তিশালী মানুষ, এমনকি সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পেলেও সে ঠিক মিতিনের সমগোত্রীয় নয়। হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার পর যে অর্থ পায়, তা সে নিজে না নিয়ে অন্য মানুষের হাতে তুলে দেয়। অর্থাৎ, অর্থ উপার্জনের জন্য গোয়েন্দাগিরিকে সে

পেশা হিসেবে বেছে নেয়নি। কিন্তু মিতিনকে আমরা খুব সহজে বলতে দেখি --- "পেটের ধান্দায় লোকে চাকরি করে, আমি করি গোয়েন্দাগিরি"[১]

১৯৬১ সালে কিশোর পাঠকের জন্য নতুন গোয়েন্দা সিরিজ নিয়ে উপস্থিত হন নলিনী দাশ। ফেমাস ফাইভের আদলে রচিত এই সিরিজ বর্তমান পাঠকের কাছে খুব বেশি পরিচিত না হলেও সমকালে কিশোর পাঠকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। বলাবাহুল্য স্কুল পড়ুয়া এই কিশোরীদের কাহিনি যতটা না গোয়েন্দা কাহিনি তার চেয়ে বেশি অ্যাডভেঞ্চার। সত্তরের দশকে মনোজ সেন নিয়ে আসেন গোয়েন্দা দময়ন্তীকে, সে পেশায় ইতিহাসের অধ্যাপক। বাংলা সাহিত্যে পেশাদার গোয়েন্দার সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায়, মিতিনের আগে বাংলা সাহিত্যে সঠিক অর্থে পেশাদার মেয়ে গোয়েন্দা আর নেই। পরবর্তী সময়ে পারমিতা ঘোষ দস্তিদার পেশাদার গোয়েন্দা রঞ্জাবতীকে নির্মাণ করলেও এখনও পর্যন্ত তা জনপ্রিয় হয়নি। বাঙালি পাঠক পেশাদার মেয়ে গোয়েন্দা হিসেবে এখনও শুধুমাত্র মিতিন মাসিকেই চেনে।

মিতিনকে লেখিকা খুব সাধারণ পাশের বাড়ির একজন বিবাহিত মহিলা হিসেবে নির্মাণ করেন। তার কাহিনিতে মিতিনের বিবাহপূর্ব ফেলে আসা জীবনের কোনও ছবি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই ছাত্রী হিসেবে সে অজিত কৃষ্ণ বসুর নন্দিনী সোমের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থানাধিকারী বা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গার্গীর মতো খুব উজ্জ্বল ছাত্রী, পড়াশুনোর পাশাপাশি বিতর্ক, আবৃত্তি সবেতেই প্রথম সারিতে থাকা মেয়ে ছিল কিনা, সেকথা জানার কোনও উপায় নেই। শুরু থেকেই সে বিবাহিত গৃহিণী। সংসার সামলানোর পাশাপাশি সে 'থার্ড আই' নামের একটি গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছে। 'সারাণ্ডায় শয়তান'-এ সুচিত্রা ভট্টাচার্য মিতিন সম্পর্কে লেখেন --- "মাত্র বত্রিশ বছর বয়স, কিন্তু এর মধ্যেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে মিতিনের খুব নামডাক। মিতিন ওরফে প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জির গোয়েন্দা সংস্থা থার্ড আইকে লালবাজারের তাবড় তাবড় পুলিশ অফিসাররা রীতিমতো সমীহ করে। বেশ কয়েকটা জব্বর কেস সলভ করেছে মিতিন।"[২]

এই জব্বর কেসের একটি কাহিনি পাঠক পেয়েছেন, সেটি হল 'পালাবার পথ নেই'। সেখানেও তার অবতারণ পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবেই। অর্থাৎ, কিভাবে আস্তে আস্তে সে গোয়েন্দা হয়ে উঠল সেই চিত্র লেখিকা পাঠকের সামনে হাজির করেননি। তবে তার গোয়েন্দা হয়ে ওঠার পটভূমি সেভাবে ব্যাখ্যা না করলেও সংসার সামলানোর পাশাপাশি কিভাবে মিতিন গোয়েন্দাগিরি সামলায় সে বিষয়ে লেখিকা বেশ সবিস্তার বর্ণনা করেছেন।

'জোনাথনের বাড়ির ভূত' কাহিনিতে জানা যায় ঢাকুরিয়ার ১৭/৩ বাবুবাগান লেনের একটি বাড়িতে তারা ভাড়া থাকে। এই ভাড়া বাড়িতে থাকার চিত্র দেখে অনুমান করা যায় স্বচ্ছলতা থাকলেও তাদের সংসারে অর্থের আধিক্য নেই । এই ভাড়া বাড়িতে থাকার জন্য মিতিনকে আফসোস করতে দেখা যায়নি। তবে 'মারণ বাতাস' গল্পে সৌম্যরূপ চৌধুরীর মৃত্যুর তদন্ত করতে তাকে আলিপুর অ্যাভিনিউয়ের 'আকাশলীনা'তে যেতে হয়। আটতলা বিশাল বাড়ি আকাশলীনার প্রতিটি তলায় ছটা করে ফ্ল্যাট একটি ফ্ল্যাটে সৌম্যদীপ মারা গেছে। ঐ ফ্ল্যাটে পৌঁছনোর আগ পর্যন্ত মিতিন ভাবতে থাকে --- "কি সুন্দর ঝকঝকে বাড়ি! একটা ধুলোর কণা পর্যন্ত নেই। আহা! কবে যে মিতিনদের নিজস্ব বাড়ি হবে !"[৩]

বাংলার মেয়ে গোয়েন্দাদের মধ্যে এমন অবস্থা কারোর নয়। সবাই আর্থিক দিক থেকে মোটামুটি উচ্চমধ্যবিত্ত আবহে বাস করা মানুষ। কিন্তু মিতিনকে লেখিকা একেবারে ছাপোষা মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ হিসেবেই উপস্থাপিত করেছেন। তাই তার স্বপ্নগুলো সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার মধ্যেই রয়ে গেছে। তবে নিজস্ব বাড়ি না থাকলেও মিতিন তাদের ঢাকুরিয়ার বাসাটা যথাসম্ভব পরিকল্পনামাফিক সাজিয়েছে --- "দু'-কামরার ভাড়া বাড়ির পিছনের চওড়া বারান্দায়। নিজেই বারান্দাটা ঘিরে নিয়েছে মিতিন। অফিস কাম ডিটেকশন চেম্বার। খুপরি জায়গাটুকুতে আছে চেয়ার-টেবিল, ক্ষুদে সোফা, একখানা ফাইল-কেবিনেট, বেঁটে একটা স্টিল আলমারি আর বই-টই। গোপন নথিপত্র থাকে আলমারিতে। নিজের পেশার প্রয়োজনীয় জিনিসও।"[৪]

এই ছোট খুপরি চেম্বার হল ডিটেকটিভ এজেন্সি 'থার্ড আই'-এর অফিস। আর এই সামান্য অফিসের কর্ত্রী মিতিন আরাকিয়েলের হিরে, ডেভিড যোশুয়ার চুনি, প্রাচীন চীনা শিল্পীর বানানো পৃথিবীর মানচিত্র উদ্ধারের পাশাপাশি সুধন্য সান্যাল, মিস্টার পি কে জি কুরুপ, গর্জন রায়-এর মতো অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। মিতিনের চেম্বারের বর্ণনার মাধ্যমে একদিকে তার পেশাগত জীবনের চিত্র দেখানো হয়েছে, অন্যদিকে সুগৃহিনী মিতিন সংসার সাজানোর কাজেও কত নিপুণ সে কথাও খুব সহজে বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। স্বল্প পরিসরের ভাড়া বাড়ির মধ্যে মিতিন একদিকে তার অফিস বানিয়ে নিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করছে, অন্যদিকে বাড়ির অভ্যন্তরে স্বামী-সন্তান নিয়ে পরিপাটি সংসার জীবন অতিবাহিত করছে। তবে পরবর্তী সময়ে মিতিনদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, তাদের নিজেরদের বাড়ি হয়, একটি মারুতি গাড়ি হয়, 'ছকটা সুডোকুর' কাহিনিতে তাদের বিদেশ ভ্রমণের চিত্রও পাওয়া যায়। পার্থর ব্যাবসার উন্নতির ছবি উপন্যাসগুলোতে দেখতে

পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বিভিন্ন কেসে মিতিনের উপার্জনের পরিমাণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। তাই অনুমান করা যায়, মিতিনদের পারিবারিক আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে মিতিনের উপার্জনই বড় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এর ফলে পারিবারিক জীবনের মূল সুর একটুও বদলায় না।

❖ মিতিনের জীবনে অন্যান্য চরিত্রের ভূমিকা

মিতিনকে শুরু থেকেই বিবাহিত নারী হিসেবে হাজির করা হয়েছে। তাই একদম প্রথমেই তার বর পার্থ মুখার্জির কথা উল্লেখ করতে হয়। পার্থপ্রতিম মুখার্জির অর্থাৎ টুপুরের পার্থ মেসোর প্রেসের ব্যবসা, বউবাজারে তার প্রেস রয়েছে। পার্থ চরিত্রটিকে সুচিত্রা ভট্টাচার্য খুব প্রাণোচ্ছল মানুষরূপে নির্মাণ করেছেন, যে সারাক্ষণই মিতিনমাসিকে নানা ভাবে খ্যাপানোর চেষ্টা করে। কখনো কখনো 'ম্যাডাম টিকটিকি' জাতীয় শব্দ ব্যাবহার করে খোঁচা দেয়। আবার কখনো কোনো বিশেষ ঘটনায় আগ্রহ দেখালে মন্তব্য করে, যে হাতে কাজ নেই বলে মিতিন বিভিন্ন খবরের মধ্যে রহস্যের গন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছে। 'মেঘের পরে মেঘ' কাহিনিতে দেখা যায় পার্থ তাকে বলছে একটা বিষয়ের পিছনে দৌড়ে কোনও রহস্য নেই বুঝতে পেরে মিতিন ভেঙে পড়েছে, সে কিছুতেই মানতে পারছে না আসলে কোনও রহস্যই নেই। তবে এসব ঠাট্টা করলেও পার্থ মিতিনকে নিয়ে বেশ গর্বিত। নিজের কাজের ক্ষেত্রে পার্থর বেশ খানিকটা আলসেমি আছে বলে মনে হয় । কিন্তু যে কোনও কেসের সময় মিতিন হাজির থাকতে বললে পার্থ সহজেই রাজি হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় নিজেই উৎসাহিত হয়ে সঙ্গী হতে চায় বলে প্রেস থেকে ফোন এলে টুপুরকে জানিয়ে দিতে বলে যে, সে বাড়িতে নেই। বিভিন্ন কাহিনির মধ্যে পরোক্ষভাবে জানা যায় যে পরিচিত মহলে সে স্ত্রীর পেশা সম্পর্কে অনেকের কাছে গর্ব প্রকাশ করে। মিতিনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালোবাসার চিত্র বিভিন্ন কাহিনিতে লেখিকা খুব সংক্ষেপে উপস্থিত করেছেন। মিতিনের প্রায় সব কাহিনিতে পার্থ উপস্থিত, একমাত্র 'মারণ বাতাস' কাহিনিতে তাকে পাওয়া যায় না। সে মিতিনকে নিজের সাধ্যমত সাহায্য করতে চায়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিতিনের তেমন কোনো সাহায্যের প্রয়োজন পড়েনি। তবে কয়েকটি কাহিনিতে --- যেমন, জোনাথনের বাড়ির ভূতের রহস্য সমাধানে মিতিন পার্থর সাহায্য নিয়েছে। পার্থ মিতিনের দেওয়া 'মন্ত্রপূতঃ টিউবলাইট' জোনাথনের বাড়িতে গিয়ে লাগিয়ে দিয়ে আসে আর বাড়ির লোকের অজান্তে কার্পেটের ওপর লাইকোপোডিয়াম পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে

আসে। তারপর ম্যাক গ্রেগরের সমাধি খুঁজে বের করে। এর সাহায্যে মিতিন সম্পূর্ণ রহস্যের সমাধান করে ফেলে।

পার্থ মিতিনমাসির পারিশ্রমিক সম্পর্কে উদাসীন থাকার ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারে না। অনেক কেস শুরুর আগেই সে মিতিনকে তার পারিশ্রমিক সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলে। এমনকি নিজের বন্ধু ক্রিস্টোফার উৎপল বিশ্বাস মিতিনের সঙ্গে দেখা করতে আসার আগে পার্থ মিতিনকে বলে দেয় তার বন্ধু ভেবে যেন মিতিন নিজের পারিশ্রমিক ছেড়ে না দেয়--- “আমার বন্ধু বলে ছাড়টাড় দিওনা কিন্তু ! পুরো পাওনা গণ্ডা বুঝে নেবে। ... মুফতে কোনও পরামর্শ দেবে না। তার জন্যও ফি চার্জ করবে।"[৫]

তবে পারিশ্রমিক সম্পর্কে সচেতন হতে বললেও সে অর্থলোভী বা কৃপণ চরিত্রের নয়। পার্থ সামগ্রিকভাবে খুব সরল প্রাণোচ্ছল মানুষ । মিতিন ও তার সুখী দাম্পত্যের একটি বড় কারণ পার্থর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আসলে স্ত্রীর পেশাগত দিক নিয়ে সে উচ্ছ্বসিত। তাই বারবার মিতিনের পেশাগত দিককে উৎসাহ দিতেই সে এমন করে।

তবে পারিশ্রমিক সম্পর্কে সচেতন হতে বললেও সে অর্থলোভী বা কৃপণ চরিত্রের নয়। পার্থ সামগ্রিকভাবে খুব সরল প্রাণোচ্ছল মানুষ । মিতিন ও তার সুখী দাম্পত্যের একটি বড় কারণ পার্থর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আসলে স্ত্রীর পেশাগত দিক নিয়ে সে উচ্ছ্বসিত। তাই বারবার মিতিনের পেশাগত দিককে উৎসাহ দিতেই সে এমন করে।

পার্থ মেসোর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো সে ভোজন রসিক । ফলে সব উপন্যাসে খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে । লক্ষ্য করা যায় টুপুরদের বাড়ি হাতিবাগানে এলে সে ‘অ্যালেন’স কিচেন’ জাতীয় নামকরা দোকান থেকে খাবার কিনে নিয়ে আসে। আবার বেড়াতে গিয়ে হিসেব করা ডিমের মধ্যে থেকে অপরিচিত লোককে খাওয়ালে মিতিনকে এরকম না করার পরামর্শ দেয় । ‘তৃষ্ণা মারা গেছে’ কাহিনির প্রথমদিকে মিতিনের রান্না করা এবং পার্থর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ার দৃশ্যে তাদের সুখী দাম্পত্যের ছবি প্রকাশিত হয় । শিশু-কিশোর পাঠ্য এই কাহিনিগুলোতে আলাদাভাবে পার্থ-মিতিনের দাম্পত্য জীবন নিয়ে বেশি কিছু বলার অবকাশ নেই। কিন্তু তার মধ্যেও লেখিকার কলমের মুন্সিয়ানায় তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনের আভাস ফুটে ওঠে। অর্থাৎ, লেখিকা দেখাতে চান, দাম্পত্য-জীবনের দিক থেকেও মিতিন সফল , সামগ্রিকভাবে সুগৃহিনী।

পার্থর বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনো রয়েছে, প্রায় সব কাহিনিতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে টুপুরকে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সবিস্তারে জানায়। এর ফলে শুধু টুপুর নয়, 'আনন্দমেলা' পত্রিকার পাঠকরাও সমৃদ্ধ হয়। কিশোর-কিশোরীদের আকর্ষণের জায়গা গোয়েন্দা কাহিনিতে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান বিষয়ক নানা তথ্য দিয়ে খুব সহজ ভাবে তাদের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে চান লেখিকা। যেমন, 'জোনাথনের বাড়ির ভূত' উপন্যাসে কলকাতার প্রাচীন নির্মাণগুলি সম্পর্কে জানা যায়। এখানে প্রাচীন কলকাতার ইতিহাস সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়, বিভিন্ন জায়গার নামকরণের ইতিহাসও জানায় পার্থ। আবার 'আরাকিয়েলের হিরে' উপন্যাসে সে কোহিনূর হীরে সংক্রান্ত তথ্যের পাশাপাশি আর্মেনিয়ানদের সম্পর্কে নানা তথ্য জানায়। পার্থ চরিত্রটিকে লেখিকা তার গোয়েন্দা কাহিনিগুলিকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছেন। একদিকে সে বিবাহিত গোয়েন্দা মিতিনের সুস্থ-স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনের চিত্রকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে বাক্যবাগীশ ভোজনরসিক পার্থ মেসোর উচ্ছলতা ছেলেমানুষি কাহিনি গুলোতে সরসতা এনেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে তার জ্ঞান পাঠক গোষ্ঠীকে বিশেষত কিশোর-কিশোরী পাঠকসমাজের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে ।

গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জির আরেক পরিচয় হলো সে বুমবুম এর মা। প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি ও পার্থপ্রতিম মুখার্জির একমাত্র সন্তান বুমবুমের অন্য কোনো পোশাকি নাম পাওয়া যায় না। প্রজ্ঞাপারমিতা, পার্থপ্রতিম, ঐন্দ্রিলা ইত্যাদি ভারি নামের পাশাপাশি বুমবুম নামটা একটু খাপছাড়া। বোঝা যায় তা নিতান্তই তার ডাকনাম। 'সারাণ্ডায় শয়তান'-এ দেখা যায় বুমবুম এর চার বছর বয়স। তাকে নিয়ে মিতিন জেরবার হয়। 'কেরালায় কিস্তিমাত' দেখা যায় তার সাত বছর বয়স হয়েছে। লেখিকা বুমবুমের মধ্য দিয়ে শিশু মনস্তত্ত্ব খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । যেমন -- তাকে খোকাবাবু বললে খুব রেগে যায় এবং টুপুরকে খুকি বলাতে সে খুব আনন্দিত হয়। বেশিরভাগ সময়েই বাড়ির পরিচারিকা ভারতী এবং পরে আরতির কাছে থাকে বুমবুম। কারণ উপার্জনশীল মায়ের পক্ষে সারাক্ষণ সন্তানকে সময় দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনা। দেখা যায়, ভারতীই তাকে ক্যারাটে ক্লাসে নিয়ে যায়, আবার খাবার-দাবারও বানায়। তবে মিতিন কর্মরত নারী হওয়ার পাশাপাশি মায়ের ভূমিকা ও যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করে। 'সর্পরহস্য সুন্দরবনে'র কাহিনিতে দেখা যায় সমস্ত অপরাধের জট খুলে ফেলে, অপরাধীকে শায়েস্তা করে পুলিশের

হাতে তুলে দেওয়ার পর --- "মোবাইলে বাড়িতে ফোন করল একবার। জেনে নিল বুমবুম কী করছে। পেট ভরে বুমবুমকে পান্তা খাইয়ে দিতে বলল ভারতীকে।"[৬]

তবে ছেলেকে আহ্লাদ দেওয়ার মতো মা মিতিন নয়। বুমবুমের মতো দুরন্ত বাচ্চাকে কড়া শাসনে রাখার প্রচেষ্টা দেখা যায়। তার বকাবকিতে স্নেহের ভাব থাকলেও শাসনের স্বরটাই বেশি প্রকটিত হয় --- " মিতিন লঘু ধমক দিল ছেলেকে, "গিয়ে স্কুলের বইখাতা ঠিকঠাক গুছিয়ে নাও। স্কুল বাস আসার আগের মুহূর্তে এটা পাচ্ছিনা, ওটা কোথায় গেল, এসব যেনো শুনতে না হয়।"[৭]

বুমবুম যে শুধু কিশোর কাহিনিগুলোতেই উপস্থিত তা নয়। বড়দের জন্য লেখা কাহিনিতেও তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। 'মেঘের পরে মেঘ' কাহিনিতে মিতিন ও বুমবুমের কথোপকথনের ছবি পাওয়া যায় ---

"--- এখন কি ড্রয়িং করছ ?

--- হ্যাঁ।

--- কী আঁকছিস আজ ?

--- পাহাড়ে সানরাইজ ।

মিতিন সামনে এসে ছেলের খাতাখানা দেখল একবার। ছেলের চুল অল্প ঘেঁটে দিয়ে বলল, তোর সানটা যে বড্ড লাল হয়ে গেছে রে, একটু হলুদ মেশা।"[৮]

এ থেকে বোঝা যায় শুধুমাত্র কম বয়সী পাঠকদের প্রতিনিধি হিসেবেই লেখিকা বুমবুমকে কাহিনিতে আনেননি। সামগ্রিক ভাবে মিতিনের মাতৃত্বের ছবি সব বয়সী পাঠকের সামনে হাজির করাই তাঁর লক্ষ। মিতিন গোয়েন্দাগিরি সামলানোর পাশাপাশি কিভাবে একটি সন্তানকে বড় করে তুলছে, তার মধ্যে ঠিক-ভুলের বোধ তৈরি করে একজন ভালোমানুষ বানানোর চেষ্টা করছে, সেই চিত্রও লেখিকা তাঁর বিভিন্ন কাহিনিতে তুলে ধরেছেন। 'জোনাথনের বাড়ির ভূত' উপন্যাসে দেখা যায় ক্যারাটে ক্লাসে বুমবুম তার সতীর্থকে বক্সিং শেখানোর আছিলায় ঘুষি মেরেছে। আর সেই কারণে সেদিন শাস্তি স্বরূপ তাকে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখিকা দেখাতে চান, গোয়েন্দা হলেও আর পাঁচটা মায়ের মতোই শিশু সন্তানের ডানপিটে স্বভাব নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হয়। বুমবুম তার অপরাধের শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু এই শাস্তিতে সে একটুও বিচলিত হয়নি। ক্লাস থেকে বের করে দেওয়াটা যে অপমানজনক বিষয় তা ওইটুকু শিশু উপলব্ধি করে উঠতে

পারেনি। মিতিন বিচলিত হয়, সে বিষয়টাকে লঘু করে দেখেনা। তার মনে হয় বুমবুম যে অপরাধ করেছে --এই বোধটা তার মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া দরকার। তাই মিতিন তাকে কান ধরে উঠবস করার শাস্তি দেয়। বুমবুম সহজে শাস্তির নির্দেশ পালন না করায় মিতিনমাসি কান ধরে রেখে তাকে উঠবস করায় এবং বলাবাহুল্য সঙ্গে নিজেও উঠবস করতে বাধ্য হয়। এই দৃশ্য দেখে পাঠক হাসলেও, এই শাস্তিতে দেখা যায় অপমানে বুমবুমের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। আবার 'কেরালায় কিস্তিমাত'-এ সে যখন অপরাধীদের শায়েস্তা করার জন্য অনেকক্ষণ দরজা আটকে রাখার পর হঠাৎ করে খুলে দিয়ে তাদের আছাড় খাওয়ার জোগাড় করে, তখন মিতিন সবার সামনে লজ্জিত হলেও বুমবুমের এই কাজের পিছনে দুষ্টুমি নয় বরং অসৎ লোকদের শাস্তি দেওয়ার প্রয়াস রয়েছে দেখে তাকে কোনো শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে না। অর্থাৎ, এক জায়গায় সন্তান শাস্তি পাওয়ার পরও সে আবার শাস্তি দেয়, অন্য জায়গায় সে সবাইকে অপ্রস্তুত পরিস্থিতির মধ্যে ফেললেও তাকে কোনও শাস্তি দেওয়া হয়না। আসলে শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে মিতিন এমন সিদ্ধান্ত নেয়। লেখিকা দেখাতে চান মিতিন পেশাগত ভাবে গোয়েন্দা হওয়ার পাশাপাশি মা হিসেবেও সাফল্যের সঙ্গে শিশুকে বড় করে তুলতে সক্ষম।

শুধুমাত্র ব্যাক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেই নয় মিতিনের পেশাদার জীবনেও বুমবুমের খানিক গুরুত্ব রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে বুমবুম কাহিনির জট খুলতেও সাহায্য করেছে । 'সারাণ্ডায় শয়তান'-এ দেখা যায় সে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দৌড়ে গিয়ে একটি ছোট্ট গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে, সেখানে লবণের বস্তা দেখতে পেয়ে মিতিনমাসি অপরাধীদের চক্রান্ত বুঝতে পারে এবং তাদের প্রয়াসকে ব্যর্থ করার চেষ্টা চালায়। 'টিকরপাড়ার ঘড়িয়াল'-এ বুমবুমই প্রথম বলে খাঁচার ঘড়িয়াল গুলো কেমন যেন মেশিনের চালানো খেলনা বলে তার মনে হয়। মিতিন মাসির ভাবনার জট ছাড়াতে এই ছোট ব্যাপারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ঐন্দ্রিলা চৌধুরী নামটা শুনে একটু থমাকাতে হলেও মিতিন মাসির পাঠকরা টুপুরকে খুব ভালো করে চেনে।

টুপুর মিতিন মাসির দিদি সহেলি চৌধুরী ও জামাইবাবু অবনী চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। টুপুর চার বছরের বুমবুমের থেকে পাক্কা দশ বছরের বড়। সে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, মাসির একনিষ্ঠ ভক্ত এবং পরবর্তী জীবনে মিতিনের মতো গোয়েন্দা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের উদ্দেশ্যে লিখিত কাহিনিগুলিতে টুপুর ও তার বাবা-মা অনুপস্থিত। 'পালাবার

পথ নেই’ উপন্যাসে টুপুরের উল্লেখ নেই। মিতিন মাসির দ্বিতীয় কাহিনি ‘সারান্ডায় শয়তান’-এ টুপুরের আগমন। আসলে টুপুর ‘আনন্দমেলা’র কিশোর পাঠক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। টুপুরের হাত ধরে পাঠক খুব সহজেই মিতিন মাসির কাছে পৌঁছে যেতে পারে। পাশাপাশি একজন গোয়েন্দার সঙ্গে থাকার যে অনুভূতি তা টুপুরের অনুভূতির বর্ণনা দিয়ে লেখিকা পাঠকের মনে ছড়িয়ে দিতে পারেন।

টুপুর ছাত্রী হিসেবে খুব একটা ভালো নয়। তার মা সহলি বলেন ---

> “স্কুলে গিয়ে সারাদিন গেছোমি করছেন। কে কার সঙ্গে মিসবিহেব করল, উনি চললেন শাসাতে। স্কুলের পেয়ারা গাছে কে পেয়ারা পাড়তে উঠবে ? কে আর? ঐন্দ্রিলা। ...... ওদিকে ক্লাসটেস্টের নম্বর দেখ ! কোনটায় ফর্টি পারসেন্ট , কোনটায় ফিফটি। সায়েন্সে কুড়িতে মাত্র তের পেয়েছে।"[৯]

বোঝাই যায় টুপুর ভালো ছাত্রী নয়, একেবারে মাঝারি ধরণের ছাত্রী। তবে মিতিনের বক্তব্য থেকে জানা যায় সে ক্লাস টেস্টে এতটা খারাপ ফল করলেও ফাইনাল পরীক্ষায় সে এতটা খারাপ ফল করেনা। অর্থাৎ, মিতিন একেবারে ক্লাসের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীর আদর্শ প্রতিনিধি। এরফলে উদ্দিষ্ট পাঠক খুব সহজেই টুপুরের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলতে পারে। ‘পালাবার পথ নেই’ আর ‘পাঁচ মিতিন’-এর কাহিনিগুলো বাদ দিয়ে বাকি সব কাহিনিতেই টুপুর উপস্থিত। ‘দুঃস্বপ্ন বারবার’ কাহিনিতে তার স্কুলের সহপাঠী শালিনীর মানসিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এছাড়া ‘সর্প রহস্য সুন্দরবনে’ কাহিনিতে সুধন্য সান্যালের কাজের লোককে কব্জায় আনার পর মিতিন টুপুরকে তার ব্যাগ থেকে ফোন বের করে সুমন্ত্র সান্যালকে ফোন করতে বলে। যে সময়ে মিতিন হাতে রিভলভার নিয়ে এক দুষ্কৃতিকে ঠেকিয়ে রেখেছে, সেই সময়ে তার নিজের পক্ষে ফোন করতে পারা প্রায় অসম্ভব, আর তাই টুপুরের উপস্থিতি এখানে বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর কিশোর পাঠক কিভাবে সেটার বিশ্লেষণ করতে পারে তা কাহিনির মধ্যে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও টুপুর সাহায্য করেছে। টুপুর সদাসর্বদা মাসির কেসের সঙ্গে লেগে থাকার চেষ্টা করে। মাসির সহকারী হয়ে ওঠার মধ্যেই তার যাবতীয় আনন্দ। মিতিন মাসি মাঝে মাঝে মজা করে তাকে ‘মিস ওয়াটসন’ বলে ডাকে। তা দেখে মনে হয় মিতিন মনে মনে নিজেকে শার্লক হোমসের সঙ্গে তুলনা করে। ‘ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য’তে দেখা যায় টুপুরের পাড়ার বন্ধু কুশল তার সহপাঠী লিয়াংয়ের কাকার মৃত্যুর তদন্তের জন্য মিতিনের কাছে হাজির হয়েছে। এই কম বয়সী কিশোরদের পক্ষে গোয়েন্দাকে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই টুপুরের সূত্র ধরে তার মাসি গোয়েন্দা

প্রজ্ঞাপারমিতার সাহায্য চায় তারা। সেই সময়ে মিতিন অন্য একটা কেস প্রায় সমাধান করে ফেলেছে, এই বিষয়টা নিয়ে ঐ মুহূর্তেই সে মাথা ঘামাতে চায় না। তাই টুপুরকে তদন্ত শুরু করে দিতে বলে। টুপুর তার বন্ধু কুশলের সঙ্গে প্রাথমিক তদন্তে নেমে পড়ে। তারপর মিতিন আগের কেস মিটিয়ে নিয়ে ঝাও ঝিয়েনের হত্যা রহস্যের দিকে নজর দেয়।

❖ মিতিন মাসির গোয়েন্দাগিরি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য মিতিনকে একদিকে যেমন আদর্শ মা, আদর্শ গৃহিণী হিসেবে নির্মাণ করেছেন, অন্যদিকে গোয়েন্দা হিসেবেও তাকে যথাযথ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মিতিন সংসার সামলে গোয়েন্দাগিরি করে, বাড়ির এক দিকে ছোট একটা ঘরে 'থার্ড আই'-এর চেম্বার খোলে। কিন্তু সংসার জীবন তার পেশাগত জীবনে কোনও রকম নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি। মিতিন সকালে উঠে শরীর চর্চা করে, ফিটনেস বজায় রাখার জন্য দৌড়তে বের হয়। মিতিন শুধুমাত্র মগজাস্ত্র ব্যাবহারকারী আর্মচেয়ার ডিটেকটিভ নয়। তাই শুধু বুদ্ধির জোর নয়, শারীরিক সক্ষমতার চিত্রও মিতিনের কাহিনিগুলোর মধ্যে ধরা পড়েছে --- "কাঁধের ওড়না ফেলে দিয়ে ভল্ট খেয়ে দাঁড়াল মিতিনমাসি। বিদ্যুৎ বেগে সরে গেল খানিক। তারপর বিকট চিৎকার হেনে এক লাফ। কী সাঙ্ঘাতিক জোর ওই পাদাঘাতের, বাপ্স! কাটা কলাগাছের মতো লোকটা ধরাশায়ী ! ত্বরিত গতিতে লোকটার বুকে হাঁটু চেপে মিতিনের রিভলবার এবার লোকটার রগে, "কী, ট্রিগার টিপব ?"[১০]
মিতিন ক্যারাটে জানে। রিভলভার চালাতেও সে সিদ্ধহস্ত। 'টিকরপাড়ায় ঘড়িয়াল'-এ অপরাধী ইন্দ্রজিৎ সেন যখন তার পরিবারের সদস্যদের দিকে রিভলভার তাক করে, তখন ইন্দ্রজিৎ গুলি চালানোর আগেই মিতিন তার হাতে গুলি করে। বোঝা যায় মিতিনের লক্ষ্য অব্যর্থ।

মিতিনের গোয়েন্দাগিরির পরিচয় দিতে গেলে মিতিনের কাহিনিগুলির দিকে তাকানো প্রয়োজন। আর কাহিনিগুলির দিকে তাকালে খুব সহজেই দুটো শ্রেণি চোখে পড়ে --- ১। পরিণত পাঠকের জন্য লেখা কাহিনি ২। কিশোর সাহিত্য

❖ পরিণত পাঠকের জন্য লেখা কাহিনি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রথমবারের জন্য যখন গোয়েন্দা উপন্যাস লিখতে বসেন, তখন তিনি পরিণত পাঠকের কথা ভেবেই কলম ধরেন। 'পালাবার পথ নেই' পুরোপুরিই পরিণত পাঠকের উদ্দেশে লেখা। এই উপন্যাস ছাড়া 'পাঁচ মিতিন'-এ সঙ্কলিত পাঁচটি কাহিনিই এই ধারার অন্তর্গত। সব মিলিয়ে যে ছয়টি কাহিনি এই ধারার অন্তর্গত, তা হল ---

১। পালাবার পথ নেই

২। বিষ

৩। তৃষ্ণা মারা গেছে

৪। মারণ বাতাস

৫। শুধু একটি রং নাম্বার

৬। মেঘের পরে মেঘ

'পালাবার পথ নেই' বেশ বড় আকারের উপন্যাস। উপন্যাসটি দুটি পর্বে বিন্যাস্ত। প্রথম পর্বের ১৪টি অধ্যায় জুড়ে উপন্যাসের অপরাধগুলি সঙ্ঘটিত হয়েছে, বিদিশার ব্ল্যাকমেলিং ও অর্কের আকস্মাৎ মৃত্যুর রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। আর দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতার আগমন ঘটেছে, তারপর ১৫টি অধ্যায় জুড়ে অপরাধের নেপথ্য কাহিনি উদ্ঘাটিত হয়েছে।

ভবানীপুরের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী মেয়ে বিদিশার ধনী ব্যবসায়ী অর্চিস্মান রুদ্রর সঙ্গে বিয়ে হয়। অর্চিস্মান পার্কস্ট্রীটের একটি নিলামঘর এবং একটি বার ও রেস্তরাঁর মালিক। বিয়ের পর বিদিশার জীবন রূপকথার মতো হয়ে ওঠে। ভবানীপুরের ১৭/২ মহিম হালদার লেনের জীবন ছেড়ে সে সল্টলেকের প্রাসাদপ্রতিম বাড়িতে জীবন কাটাতে থাকে। আর এই পরিবর্তনের ফলেই সে ব্ল্যাকমেলের শিকার হয়। বিয়ের আগে অনেক পুরুষের সঙ্গেই বিদিশার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তার শ্বশুরবাড়িতে তার বিগত জীবনের কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে প্রথমে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাওয়া হয়। বিদিশা প্রথমে তার প্রাক্তন প্রেমিক অর্ককে সন্দেহ করলেও অর্ক আসল অপরাধী নয়। সে বরং এই পরিস্থিতিতে বন্ধুর মতো বিদিশার পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু অপরাধীর পিছু করে তাকে চিনে ফেলার ফলে তাকে মরতে হয়। ব্ল্যাকমেলার তপন তাকে গাড়ির তলায় পিসে

মারে। এরপর বিদিশা নিরুপায় হয়ে অর্চিস্মানকে ব্ল্যাকমেলিংয়ের কথা জানাতে বাধ্য হয়। অর্চিস্মান এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য মিতিনের কাছে হাজির হয়।

মিতিন এখানে একেবারেই পেশাদার গোয়েন্দা, তাই অর্চিস্মানের সঙ্গে একেবারেই পেশাগত চুক্তি হতে দেখা যায়। অর্চিস্মান অপরাধীকে বের করে দেওয়ার জন্য মিতিনকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা বলে। মিতিন তদন্তে নেমে জানতে পারে বিয়ের আগে অর্ক ছাড়াও বিদিশার অনেক প্রেমিক ছিল। মিতিন একে একে সবাইকে জেরা করে। ভাস্করকে দেখে বুঝতে পারে সে অসৎ চরিত্রের মানুষ হলেও এই ব্ল্যাকমেলিংয়ে তার কোনও হাত নেই। কারণ, অর্চিস্মানের সঙ্গে তার ব্যাবসাকেন্দ্রিক একটা সম্পর্ক রয়েছে, বিদিশার জন্য সেই সম্পর্ক নষ্ট করার মতো বোকা সে নয়। আরেক প্রেমিক মিহির সরকারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারে বিদিশার বিয়ের আগে তার দাদা তার কাছে এসে বিদিশার চিঠি ও ছবি নিয়ে চলে গেছে। সেই সময়ে সে একটি সাদা এম্বাসাডারে করে এসেছিল। এই এম্বাসাডারের তলাতেই অর্ককে পিসে মারা হয়েছিল। বিদিশার দাদা চিত্রভাণুর কাছ থেকে খবর উদ্ধারের জন্য মিতিন ও পার্থ তাকে অভিনয়ে সুযোগ করে দেওয়ার লোভ দেখায়। তারপর তাকে মদ খাইয়ে বেহেড করে তার কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য উদ্ধার করে। দেখা যাচ্ছে এই কাহিনিতে পার্থ মিতিনের বর হিসেবে শুধু তার পাশেই থাকেনি বরং খানিকটা সহকারীর কাজও করেছে। চিত্রভাণুর কাছ থেকে অর্চিস্মানের ছাঁটাই করা কর্মীর সম্বন্ধে মিতিন জানতে পারে। তার ডাকনাম ‘সোনা’ কিন্তু আসল নাম কি, সেটুকু চিত্রভাণুর কাছ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

ইতিমধ্যে বিদিশার ড্রাইভার উধাও হয়ে যায়। এর ফলে পরিবারের লোকজনকে জেরা করার পথ সহজ হয়ে যায়। মিতিন বিদিশার ননদ অর্চনাকে জেরা করে তাঁদের পিতা দীননাথ রুদ্রের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারে। এরপর মিতিন সব সূত্রকে এক জায়গায় করে রহস্যের জট ছাড়ানোর চেষ্টা করে।

দীননাথ রুদ্রের ম্যানেজার ঊষাপতি নন্দীর স্ত্রীর সঙ্গে দীননাথের অবৈধ সম্পর্কের ফলে তপনের জন্ম হয়। এই তপন নিলামঘরে কাজ করত। তার চুরি করার প্রবণতা আছে জেনে অর্চিস্মান তাকে কাজ থেকে বের করে দেয়। দীননাথবাবু স্নেহবশত তাকে কাজে রাখতে চাইলেও, অর্চিস্মান তাঁর কথায় আমল দেয়না, বরং তাঁকে ব্যবসা থেকে অবসর নিতে বলে। এর জন্য দীননাথ বাবু অর্চিস্মানের ওপরেও খানিক ক্ষুব্ধ হন। এই সময়ে তপন তার বন্ধু চিত্রভাণুর বোন বিদিশার সঙ্গে অর্চিস্মানের বিয়ে দেওয়ার কথা বলে, আর জানায় বিয়ের পর সে ব্ল্যাকমেল করে টাকা উদ্ধার করে নেবে। দীননাথবাবু এই পরিকল্পনায়

রাজি হন। তিনি শুধু রাজিই হননি বিদিশাকে ভয় দেখানোর ক্ষেত্রে তিনি তপনকে সাহায্য করেছেন। আসলে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদিশার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেও বিয়ের পর তিনি বিদিশাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবেসে ফেলেছিলেন। কিন্তু তপনের চাপে এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য হন।

তপনের দাবি অনুযায়ী বিদিশা যখন মেট্রোর সিটের তলায় পাঁচলাখ টাকা সমেত ব্যাগ রেখে বেরিয়ে যায় তখন মিতিন পুলিশ সহ তপনকে ধরে ফেলে। অনেক গোয়েন্দা কাহিনিতেই সবার সামনে পুরো রহস্য মেলে ধরার একটা প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু এখানে এই প্রবণতা একেবারেই নেই। মিতিন তার তদন্তের প্রয়োজনে সত্য উদ্ঘাটন করেছে, আর চুক্তি অনুযায়ী অপরাধীকে ধরিয়ে দিয়েছে। এরচেয়ে বেশি কিছু করার কোনও প্রয়োজন অনুভব করেনি। মিতিন বিদিশাকে তপনের প্রকৃত পরিচয় জানায় না। আবার অর্চিস্মানকে বিদিশার বিবাহপূর্ব জীবন সম্বন্ধে কিছু জানায় না। তার ফলে পরিবারের মানুষদের মধ্যে নতুন করে কোনও জটিলতার সৃষ্টি হয়না।

‘পাঁচ মিতিন’ বইয়ের পাঁচটি গল্প একেবারে আলাদা সমস্যা নিয়ে রচিত হলেও ‘বিষ’, ‘তৃষ্ণা মারা গেছে’ ও ‘মেঘের পরে মেঘ’ এই তিনটি কাহিনির ক্ষেত্রেই ‘পালাবার পথ নেই’ উপন্যাসের মতো অবৈধ সম্পর্ক একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে।

‘বিষ’ গল্পে দেখা যায় রুমকি তার মা লাবণ্যপ্রভা দেবীকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। প্রথমে সে স্লো-পয়জন প্রয়োগ করতে শুরু করে। তারপর লাবণ্য যখন পত্রিকাতে স্লো-পয়জনের লক্ষণের সঙ্গে নিজের শরীরে ফুটে ওঠা লক্ষণের মিল দেখে অনুমান করেন যে তাঁকে স্লো-পয়জন করা হচ্ছে, তখন তিনি মিতিনের কাছে ছুটে আসেন। মিতিন প্রথমে তাঁকে রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দেয়। কিন্তু সেই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাথমিক ভাবে তিনি অনুমান করেছিলেন তাঁর স্বামী তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মিতিন তদন্ত করে বুঝতে পারে আসলে তাঁর মেয়ে রুমকি তাঁকে হত্যা করেছে। লাবণ্যপ্রভা বরাবরই বহুগামী। কিন্তু যখন নিজের জামাই রণজয়ের সঙ্গে তিনি যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন, তখন রুমকি তা মেনে নিতে পারেনা। তাই সে মাকে হত্যার পথ বেছে নেয়।

‘তৃষ্ণা মারা গেছে’ কাহিনিতে তৃষ্ণা মল্লিক আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার রহস্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে সচারাচর গোয়েন্দাদের উপস্থিতির প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু এক্ষেত্রে পার্থর বন্ধুর ফ্ল্যাটে ঘটনাটা ঘটেছে বলে তার অনুরোধে মিতিনকে সেখানে উপস্থিত হতে

হয়। তৃষ্ণার প্রানের বন্ধু সুকন্যা তার আত্মহত্যাটাকে হত্যার মতো করে সাজাতে চায় । তৃষ্ণার সঙ্গে তার প্রেমিক কৌশিকের বিয়ে ঠিক হলে প্রশান্ত সেন তাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। মামার বাড়িতে থাকাকালীন তৃষ্ণার সঙ্গে তার থার্ড কাজিন প্রশান্তর একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। বিবাহিত প্রশান্তের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কারণে তৃষ্ণা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ফল স্বরূপ মামার বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর কলসেন্টারে চাকরি জুটিয়ে নিয়ে সে নিজের জীবনের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয়। এক সময়ে কৌশিকের সঙ্গে আলাপ হয়, তারপর দুজনের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রশান্ত তার কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করে, কিন্তু তারপরও সে তৃষ্ণাকে রেহাই দেয় না। ক্রমাগত ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। তৃষ্ণা এই আবর্ত থেকে বের হতে পারেনা, কারণ কৌশিক দেখতে-শুনতে যতই আধুনিক হোক, সত্যিটা জানতে পারলে তাকে বিয়ে করবে না। এই মানসিক চাপের হাত থেকে মুক্তি পেতে সে আত্মহত্যা করে।

'বিষ' ও 'তৃষ্ণা মারা গেছে' দুই কাহিনিতেই অবৈধ সম্পর্কে থাকা নারীরা মারা গেছে। কিন্তু কাহিনি পড়লে দেখা যায় লেখিকা তাদের এই সম্পর্কে জন্য তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখেননি বা বলা ভালো পাঠকের সামনে তাদেরকে ঘৃণ্য ভাবে উপস্থাপিত করতে চাননি। তৃষ্ণার ক্ষেত্রে সেটা ছিল কম বয়সের ভুল, তার জন্য সে শাস্তিও পেয়েছে। তাকে কম বয়সে মামার বাড়ির আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে নিজের জীবনের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। তাই তার ভুলটাকে পাঠক ক্ষমার চোখে দেখেছে। বরং সুকন্যা যখন বলে কৌশিকও তৃষ্ণার মৃত্যুর জন্য দায়ি, পাঠক একেবারে তা অস্বীকার করতে পারে না। বরং মনে হয় কৌশিক যদি প্রেমিক হিসেবে তার সমস্যার সময়ে পাশে এসে দাঁড়াত, তাহলে তৃষ্ণাকে আত্মহত্যা করতে হত না। লাবণ্যপ্রভার ক্ষেত্রে বিষয়টা একেবারেই আলাদা। তিনি পৌঢ়া, তার চেয়েও বড় কথা তাঁর নিজের জামাইয়ের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ, একজন মা তার নিজের সন্তানের জীবন নিজের হাতে ছারখার করে দিচ্ছেন। তাই লাবণ্যপ্রভার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি জেগে ওঠেনা। কিন্তু কাহিনির শেষে লেখিকা যখন রুমকিকে বলেন, কম বয়সে স্বামীসঙ্গ না পেয়ে অবহেলিত হতে হতে তিনি এমন মানসিক বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন, তখন পাঠক তাঁকেও ক্ষমা করে দেন।

'মেঘের পরে মেঘ'-এ সায়ন পিনাকী বসুকে হত্যা করে। হত্যা করার কারণ তার প্রেমিকা রিনার সঙ্গে পিনাকীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, আর তারা বিয়ে করবে ভাবছিল। কিন্তু এই কাহিনির আরেকটা পরত আছে, যেখানে আসল রহস্য লুকিয়ে আছে। পিনাকীর স্ত্রী তমালিকা যখন জানতে পারে পিনাকী তাকে ডিভোর্স দিয়ে রিনাকে বিয়ে করতে চায়,

তখন সে শর্বরীর মাধ্যমে সায়নের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারপরে তারাই সায়নকে খেপিয়ে তোলে। এর ফল স্বরূপ পিনাকী খুন হয়, সায়ন রাগের মাথায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে হত্যা করে। এই কাহিনিতে মূল অপরাধী তমালিকা যথেষ্ট ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করে এগোলেও শেষ পর্যন্ত তাকে ঘৃণা করতে গিয়েও পাঠক থমকে যান। পিনাকী তমালিকাকে এক সময়ে নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছিল, আন্দাজ করা যায় তখন তমালিকা সুন্দরী ছিল। তমালিকা তার জন্য নিজের জীবন উজাড় করে দেয়। কিন্তু তাকে দেখতে খারাপ হয়ে যাওয়ার পর পিনাকী অন্য অনেক নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তমালিকা সেটাও মুখ বুজে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু তাকে ডিভোর্স দেওয়ার কথা বলায় সে আর নিজেকে সামলাতে পারেনা।

'মারণ বাতাস' কাহিনিতে সৌম্যদীপকে তার মা অপর্ণা দেবী এয়ার এম্বলিজম করে হত্যা করেন। সৌম্য অনেকদিন ধরে শয্যাশায়ী। চিত্রলেখা পঙ্গু বরকে ছেড়ে আলাদা থাকে। যেদিন সৌম্য খুন হয়, চিত্রলেখা তার কাছে ডিভোর্সের কাগজে সই করাতে গিয়েছিল, সৌম্য সই করে দিয়েছিল। তারপর সে চলে আসার পর অপর্ণা দেবী দেখেন তাঁর পঙ্গু ছেলে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রয়েছে। তিনি সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে তাকে হত্যা করেন। পাশাপাশি সৌম্যকে ছেড়ে যাওয়া চিত্রলেখা যাতে তার পছন্দের আরেকজনকে বিয়ে করে সুখে থাকতে না পারে, তার জন্য হত্যাটাকে এমন ভাবে সাজান যাতে মনে হয় চিত্রলেখাই এয়ার এম্বলিজম করেছে।

'শুধু একটি রং নাম্বার' গল্পটিতে এমন মানসিক জটিলতার কোনও ছবি নেই। একটা ভুল নম্বর থেকে পার্থর কাছে ফোন আসে, বলা হয় মেট্রোর ইভটিজিংয়ের খবরটা আবার টিভিতে দেখাচ্ছে। এই নম্বরের সূত্র ধরে মিতিন আর পার্থ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সত্যপ্রিয় চৌধুরীর কাছে পৌঁছে যায়। তারপর সেখান থেকে সুব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে যায়, সেখানে গিয়ে বুঝতে পারে সুব্রত ও তার স্ত্রী রিমা নাইট ক্লাবে ড্রাগ চালান করে। আর এই ড্রাগ চক্রের পাণ্ডা ডাক্তার সত্যপ্রিয় চৌধুরী। পরিণত পাঠকের জন্য লেখা কাহিনির মধ্যে এটিই সবচেয়ে সরল কাহিনি। এখানে সম্পর্কের জটিলতা, মানুষের জটিল মনস্তত্ত্বের কোনও আভাস নেই । এক কথায় বললে বড়দের জন্য লেখা কাহিনিগুলির মধ্যে এটা খানিকটা খেলো হয়ে গেছে।

❖ কিশোর কাহিনি

‘সারান্ডায় শয়তান’ কাহিনি প্রজ্ঞাপারমিতাকেন্দ্রিক প্রথম কিশোর কাহিনি। ২০০৩ সালে ‘আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী’তে প্রকাশিত হয় এই কাহিনি। এরপর থেকে প্রতি বছর ‘আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী’তে একটি করে মিতিনের কাহিনি প্রকাশিত হতে থাকে। কিশোর পাঠকের জন্য লেখা এই কাহিনিতে লেখিকা মিতিনের কিশোরী সহকারীকে উপস্থিত করেন, তার নাম ঐন্দ্রিলা চৌধুরী। তবে পাঠক তাকে টুপুর নামেই বেশি চেনে। মিতিনকে সে ‘মিতিন মাসি’ নামে ডাকে। সেই থেকে মিতিন পাঠকের কাছে ‘মিতিন মাসি’ হয়ে ওঠে। লেখিকা শুধু তাকে হাজির করেই থামেন না, তার বাবা অবনী চৌধুরী ও মা সহেলী চৌধুরীকে কাহিনির মধ্যে নিয়ে আসেন। কিশোর পাঠক গোয়েন্দা পায়, রহস্য পায়, তার পাশাপাশি পায় বেশ জমজমাট পারিবারিক আবহও পেয়ে যায়। সুচিত্রা ভট্টাচার্য কিশোর পাঠকদের জন্য চোদ্দটি কাহিনি রচনা করেন ---

১। সারাণ্ডায় শয়তান

২। জোনাথনের বাড়ির ভূত

৩। কেরালায় কিস্তিমাত

৪। সর্পরহস্য সুন্দরবনে

৫। ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য

৬। ছকটা সুডোকুর

৭। আরাকিয়েলের হিরে

৮। গুপ্তধনের গুজব

৯। হাতে মাত্র তিনতে দিন

১০। কুড়িয়ে পাওয়া পেন ড্রাইভ

১১। মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যু ফাঁদ

১২। টিকরপাড়ায় ঘড়িয়াল

১৩। দুঃস্বপ্ন বারবার

১৪। স্যাণ্ডারসাহেবের পুঁথি

‘স্যান্ডারসাহেবের পুঁথি’ তাঁর মৃত্যুর পর ২০১৫ সালে ‘আনন্দবাজার পূজাবার্ষিকী’তে প্রকাশিত হয়। কিশোর কাহিনিগুলির মধ্যে কিছু কাহিনি ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার গল্প আর কিছু কলকাতায় বসে রহস্য সমাধানের গল্প।

বাংলা কিশোর গোয়েন্দা কাহিনির ক্ষেত্রে ভ্রমণ কাহিনির উপস্থিতি খুব প্রচলিত একটি প্রবণতা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রথমে যে গোয়েন্দার নাম মনে আসে, সে হল ফেলুদা। ফেলুদার ‘গ্যাংটকে গণ্ডগোল’, ‘সোনার কেল্লা’, ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’, ‘বোম্বাইয়ের বোম্বেটে’, ‘ছিন্নমস্তার অভিশাপ’, ‘ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর’, প্রভৃতি কাহিনি গোয়েন্দা কাহিনির উত্তেজনার পাশাপাশি ভ্রমণের স্বাদ এনে দেয়। তবে কিশোর পাঠকদের সামনে রহস্যের পাশাপাশি ভ্রমণের ছবি তুলেধরার প্রবণতার সূত্রপাত সত্যজিৎ রায়ের হাতে নয়। বরং বলা চলে বাংলা কিশোর গোয়েন্দা কাহিনিতে ভ্রমণের স্বাদ যিনি নিয়ে এসেছিলেন তিনি নলিনী দাশ। তাঁর লেখা ‘গণ্ডালু সিরিজ’-এর কাহিনিগুলি মূলত অ্যাডভেঞ্চার। চরিত্রগুলিকে পরিচিত গণ্ডির মধ্যে রেখে অ্যাডভেঞ্চারের খুব বেশি কাহিনি লেখা সম্ভব নয়। তাই লেখিকা তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের জন্য পাঠিয়েছেন। ‘রাণী রূপমতির রহস্য’, ‘তিব্বতি গুহার ভূত’, ‘তপোবন রহস্য’, ‘মাউন্ট আবুর রহস্য’, ‘সিমলার মামলা’ প্রভৃতি কাহিনিতে ভ্রমণের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। তবে এখানে যেহেতু সমবয়সী চার বন্ধু মিলে বেড়াতে যায়, তাই আলাদা করে সেই জায়গার ইতহাস, ভূগোল বলে দেওয়ার কেউ থাকেনা। কিন্তু ফেলুদার কাহিনিতে পাঠক প্রতিনিধি তোপসেকে সেগুলো ফেলুদা বলে দিতে পারে। আর এখানে সেই ভূমিকায় দেখা যায় পার্থ মেসোকে, কিছু কিছু জায়গায় অবনীকেও কোনও কোনও স্থানের ইতিহাস বলতে দেখা যায়।

বেড়াতে গিয়ে গোয়েন্দাগিরির কাহিনি রয়েছে --- ১। সারান্ডায় শয়তান ২। কেরালায় কিস্তিমাৎ ৩। ছকটা সুডোকুর ৪। কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ ৫। টিকরপাড়ার ঘড়িয়াল ৬। স্যান্ডারসাহেবের পুঁথি –এই ছয়টি কাহিনিতে। বলাবাহুল্য এই কাহিনিগুলোতে মিতিনকে কেউ পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়নি। এক্ষেত্রে মিতিন নিজের উদ্যোগেই গোয়েন্দাগিরি করেছে। আর এই শ্রেণির কাহিনির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে উপস্থিত সমস্যাগুলো কারো ব্যাক্তিগত জীবনের সঙ্কট নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেহাত হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর কাহিনি। ‘সারান্ডায় শয়তান’- এ হাতির দাঁত পাচার চক্রকে ধরিয়ে দেওয়া, ‘টিকরপাড়ায় ঘড়িয়াল’-এ ঘড়িয়ালের চামড়া ও হাড়ের পাচার আটকানো, ‘কেরালায় কিস্তিমাৎ’-এ সিনাগগে থাকা বহু প্রাচীন হিব্রু লিপিতে লেখা ‘গ্রেট স্ক্রল’-এর চুরি আটকানো, ‘কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ’-এ বয়ারিখের আসল পেন্টিংয়ের চুরি

আটকানো, 'ছকটা সুডোকুর' কাহিনিতে ভারতীয় সেবাবাহিনীর খবর বিদেশে পাচার করা দলকে ধরিয়ে দেওয়া, 'স্যান্ডার সাহেবের পুঁথি'তে বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র গলুপাকে চুরির হাত থেকে রক্ষা করার কাজ মিতিন করেছে। এক কথায় বলা যেতে পারে এই কাহিনিগুলোতে মূলত চুরি ও পাচার ছাড়া অন্য কোনও ধরণের অপরাধের ছবি সেভাবে ফুটে ওঠেনি।

তবে সবগুলোই চুরি ও পাচারের কাহিনি হলেও মিতিনের গোয়েন্দাগিরির ধরণ সব কাহিনির ক্ষেত্রেই একেবারে একই রকম তা বলা চলে না। প্রতিটা ক্ষেত্রেই অপরাধী নানা রকম অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছে। তাই মিতিনের ডিটেকশনের ক্ষেত্রেও বেশ বৈচিত্র দেখা গেছে। 'সারাণ্ডায় শয়তান'-এ ঝাড়খণ্ডের মেঘতাবুরুতে যাওয়ার পর মিতিনরা জানতে পারে সিমলিপাল থেকে একদল হাতির পাল এসেছে, তারমধ্যে একটা হাতি আহত হয়েছে। একদিকে এমন পরিস্থিতি অন্যদিকে করমপয়দায় এক মধুবাবা গ্রামের সব মানুষকে বুজরুগি দিয়ে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। মিতিনরা সেই মধুবাবার সঙ্গে দেখা করতে যায়। তারপর আহত হাতি খুন হওয়ার পর যখন হাতির দাঁত প্যাক করে মধুবাবাবেশী গর্জন রায় ও মুকুল সিংহ নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে, মিতিন তাদেরকে আটকায়। পুলিশের হাতে তুলে দেয়। 'কেরালায় কিস্তিমাত'-এ অপরাধী সারাক্ষণ তাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, তাদের সঙ্গে আলাপ করে। মিতিন তার কথার অসঙ্গতি দেখে বুঝতে পারে, লোকটি সন্দেহজনক। নিজেকে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার বলে পরিচয় দেওয়া জে পি কুরুপের ছাতার মধ্যে থেকে ইহুদি সিনাগগের গ্রেট স্ক্রল উদ্ধার করে মিতিন। 'কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ'-এর ক্ষেত্রে দেখা যায় ইতালিয়ান ট্যুরিস্ট রবার্তো জোয়ান্নির ফটোগ্রাফির কাজে ব্যাবহার হওয়া তেপায়ার তিনটের মধ্যে থেকে বোয়ারিখের আঁকা তিনটি আসল ছবি বেরিয়ে আসে। এই কাহিনিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসঙ্গ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভের ছবিগুলোর কোয়ালিটি ও ছবির গায়ে থাকা ক্রস চিহ্ন দেখে মিতিনের সন্দেহ শুরু হয়। আর বিভব শর্মার কটেজে নবীন ও সুখদেবের বিল মেটানোর ক্রেডিট কার্ড নম্বর ও রবার্তো জোয়ান্নির ভাড়া মেটানোর ক্রেডিট কার্ডের নাম্বর এক হওয়ায় মিতিনের পক্ষে অপরাধী শনাক্ত করতে সুবিধে হয়েছে।

মিতিন বলে পেট চালানোর জন্য বিভিন্ন জন বিভিন্ন পেশা বেছে নেয়, সে গোয়েন্দাগিরিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। কিন্তু এই কাহিনিগুলোতে মিতিন নিজের গরজেই রহস্য সমাধানে নেমে পড়েছে। 'ছকটা সুডোকুর' কাহিনিতে মিতিনরা নিজেদের অজান্তেই অপরাধ কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছিল। তাই সেক্ষেত্রে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে তদন্তে

নামা খুবই স্বাভাবিক। বাকিগুলোর ক্ষেত্রে রহস্য সমাধানের প্রতি আকর্ষণ থেকেই মিতিন এগিয়ে গেছে।

পরিণত পাঠকদের জন্য লেখা ছয়টি কাহিনিরই প্রেক্ষাপট কলকাতা। তাছাড়া কলকাতা কেন্দ্রিক কিশোর কাহিনি রয়েছে ছয়টি --- ১। জোনাথনের বাড়ির ভূত ২। ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য ৩। আরাকিয়েলের হিরে ৪। হাতে মাত্র তিনটে দিন ৫। মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যু ফাঁদ ৬। দুঃস্বপ্ন বারবার। এই কাহিনিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলোতে মিতিন নিজের উদ্যোগে তদন্ত করতে নেমে পড়েনি। কলকাতা শহরে প্রতিদিন নানা রকমের অপরাধ ঘটে যাচ্ছে, সব অপরাধীর পিছনে দৌড়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। এই কাহিনিগুলোতে মিতিন একেবারেই পেশাদার গোয়েন্দা। তাকে কেউ নিয়োগ করলে তবেই সে তদন্তে নেমেছে। এর মধ্যে 'ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য' ও 'মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যু ফাঁদ'-এ মিতিন হত্যাকারী খুঁজে বের করার কাজ করেছে। পাশাপাশি 'আরাকিয়েলের হিরে' ও 'মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ' কাহিনিতে মূল্যবান হিরে ও চুনিও খুঁজে বের করে দিয়েছে। বেড়াতে যাওয়ার কাহিনিগুলোতে মিতিনকে অপরাধীর পিছু ধাওয়া করতে হয়। এরফলে বেড়ানোও হয়, অপরাধীকে ধরাও হয়। আর এই সুযোগে লেখিকা পাঠকের সামনে ভ্রমণের দৃশ্য উপস্থিত করার অবকাশ পান। কলকাতা কেন্দ্রিক কাহিনিগুলিতে মিতিন অবশ্যই আর্মচেয়ার ডিটেকটিভ নয়। তাকে তদন্তে নেমে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়, অনেক মানুষকে জেরা করে সত্য উদ্ঘাটন করতে হয়। কিন্তু এখানকার অপরাধীদের মধ্যে পলায়ন প্রবণতা নেই। তাই অপরাধীর পিছু ধাওয়া করার প্রয়োজন পড়ে না। অপরাধী তার নিজস্ব জায়গাতেই থাকে তাকে চিহ্নিত করে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়াটাই এখানে মিতিনের কাজ।

'সর্প রহস্য সুন্দরবনে' ও 'গুপ্তধনের গুজব' কাহিনি দুটিতে বেড়াতে যাওয়ার কাহিনি নেই, আবার এই সমস্যাগুলো কলকাতার মধ্যেও দানা বেঁধে ওঠেনি। কলকাতা থেকে সামান্য দূরত্বে অবস্থিত জায়গাকে প্রেক্ষাপট করে কাহিনিগুলি গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মল্লিকপুর ও বাসন্তীকে কেন্দ্রে রেখে 'সর্প রহস্য সুন্দরবনে' কাহিনিটি আবর্তিত হয়। অপরাধী শেষ পর্যন্ত মল্লিকপুর থেকে গ্রেফতার হয়। 'গুপ্তধনের গুজব' কাহিনির প্রেক্ষাপটও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। নুরপুরের একটি পর্তুগীজ আমলের বাড়ি থেকে অস্ত্রপাচারের রহস্য নিয়ে এই কাহিনিটি নির্মিত হয়েছে। জায়গা দুটোতে যেহেতু কলকাতা

থেকে দ্রুত পৌঁছনো সম্ভব, তাই এই কাহিনিগুলোতে মিতিন তদন্ত করতে যায়, আবার ফিরে এসে সংসারও সামলায়।

সব মিলিয়ে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাফল্যের পাশাপাশি মিতিন বিভিন্ন রাজ্যে গিয়েও গোয়েন্দাগিরি করে প্রশংসা কুড়িয়েছে। 'ছকটা সুডোকুর' কাহিনিতে মিতিন সিঙ্গাপুরে গিয়েও সাফল্যের সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি করেছে, ভারত থেকে সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য পাচারকারী দলকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। একদিকে পরিণত পাঠকদের কাহিনিতে জটিল মনস্তত্ব কেন্দ্রিক অপরাধের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে, অন্যদিকে কিশোর সাহিত্যে অপরাধীর পিছনে ধাওয়া করে তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছে, প্রয়োজনে রিভলভার চালিয়ে অপরাধীকে কাবু করেছে। সব মিলিয়ে পাঠকদের মনে মেয়ে গোয়েন্দা হিসেবে সে একটা পাকাপাকি জায়গা বানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে।

❖ পেশাদারি গোয়েন্দাগিরি ও সখের গোয়েন্দাগিরি

মিতিন পেশাগত দিক থেকে গোয়েন্দা , 'থার্ড আই' নামের ডিটেকটিভ এজেন্সির মালিক। বোনঝি টুপুর তার ঘোষিত সহকারি, আর পার্থ অঘোষিত সহকারি। মিতিন কারোর কাছ থেকে পেশা সংক্রান্ত প্রশস্তি বাক্য শুনলে তাকে জানায় যে টাকা রোজগারের জন্য সবাই কোনও না কোনও পেশা বেছে নেয়, সে গোয়েন্দাগিরি বেছে নিয়েছে। তবে মিতিন মুখে একথা বললেও অনেক কাহিনিতেই দেখা যায় উপার্জনের কোনও সম্ভাবনা না থাকলেও মিতিন রহস্য সমাধানে নেমে পড়েছে। বিশেষত, তাদের বেড়াতে যাওয়ার কাহিনিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে কেউ মিতিনকে নিয়োগ করেনি, মিতিন সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত উদ্যোগে অপরাধীর পিছনে ধাওয়া করেছে। অর্থ উপার্জনের নিরিখে দেখলে মিতিনের কাহিনিগুলিকে দুটি শ্রেণিতে বিন্যাস্ত করা যায় ---- ১। পেশাদারি গোয়েন্দাগিরি ২। সখের গোয়েন্দাগিরি।

পেশাদারি গোয়েন্দা হিসেবে মিতিনকে যে কাহিনিগুলিতে দেখা যায়, সেগুলি হল --- ১। পালাবার পথ নেই ২। বিষ ৩। তৃষ্ণা মারা গেছে ৪। মেঘের পরে মেঘ ৫। জনাথনের বাড়ির ভূত ৬। ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য ৭। আরাকিয়েলের হিরে ৮। গুপ্তধনের গুজব ৯। হাতে মাত্র তিনটে দিন ১০। মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ

‘পালাবার পথ নেই’ উপন্যাসে বিদিশার বর অর্চিস্মান মিতিনের কাছে রহস্য সমাধানের জন্য আসে, শুরুতেই সে জানায় এই কেসটায় তদন্ত করার জন্য সে মিতিনকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে। এই প্রথম কাহিনিতে উপার্জনের পরিমাণ বেশ অনেকটাই। মনে হয় লেখিকাও বিষয়টা খানিকটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, পরবর্তী কয়েকটি কাহিনিতে মিতিনের উপার্জনের পরিমাণ প্রথম কাহিনির থেকে বেশ অনেকটাই কমে যায়। তারপর আস্তে আস্তে মিতিনের উপার্জনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ‘বিষ’ গল্পে দেখা যায় লাবণ্য মজুমদার তাঁর শরীরে আর্সেনিক পয়জনিংয়ের লক্ষণ দেখতে পেয়ে মিতিনের কাছে ছুটে আসেন। তাঁর ধারণা তাঁর স্বামী তাঁকে মেরে ফেলতে চাইছেন। মিতিন প্রথমে তাঁকে বাতিকগ্রস্থ সন্দেহপ্রবণ মহিলা মনে করে। সে জানায় আগে তিনি রক্তপরীক্ষা করে রক্তে আর্সেনিকের পরিমাণ কত সেটা জেনে নিন। তিনি এই সমাধানে খুশি হন ও মিতিনকে জোর করে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যান। মিতিন বলে সে এখনও কেসটা নেবে কিনা নিশ্চিত নয়। কিন্তু লাবণ্য মজুমদার ঐ টাকাটা তার কন্সালটেশন ফি বলে জোর করে ধরিয়ে দেন। ‘জোনাথনের বাড়ির ভূত’ কাহিনিতে দেখা যায় পার্থর এক সময়ের সহপাঠী উৎপল ক্রিস্টোফার বিশ্বাস মিতিনের সঙ্গে দেখা করতে চায়। পার্থ প্রথমেই মিতিনকে সাবধান করে দেয়, তার বন্ধু বলে মিতিন যেন কম টাকা না নেয়। উৎপল কেসটা নেওয়ার জন্য অগ্রিম হিসেবে মিতিনকে সাড়ে সাত হাজার টাকা দেয়। এরপর বাড়ির ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানার রহস্য ও আগের দুটি বাড়ির বিক্রির ক্ষেত্রে জোনাথনের মেয়ে মির্না ও উৎপলের কারচুপির কথা জোনাথনকে জানানোর পর জোনাথন তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে পঁচিশ হাজার টাকা দেন। সব মিলিয়ে এই কাহিনিতে মিতিনের উপার্জন হয় সাড়ে বত্রিশ হাজার টাকা। ‘মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ’-এ অনিশ্চয় মজুমদারের অনুরোধে মিতিন ও পার্থ ডেভিড জেশুয়ার সঙ্গে কথা বলতে যায়। ফেরার সময় ডেভিড মিতিনকে পাঁচ হাজার টাকা দেয়। মিতিন প্রথমে টাকা নিতে অস্বীকার করলে ডেভিড বলে এটা মিতিনের কন্সাল্টেশন চার্জ, কিংবা সে এটা অগ্রিম হিসেবেও দেখতে পারে। ডেভিড মারা যাওয়ার পর তাকে তদন্তে নামতে হবে। জীবিত অবস্থায় নিজের মৃত্যুর তদন্তের জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়ার কথায় মিতিন বেশ অবাক হয়। শেষে রহস্য সমাধান ও দেড়শ ক্যারেটের চুনি খুঁজে দেওয়ার পর ডেভিড মিতিনকে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেন। ‘আরাকিয়েলের হিরে’তে জেসমিন মিতিনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই অগ্রিম টাকা দেওয়ার কথা বলে, মিতিন তখন তা নিতে অস্বীকার করে। সে জানায় রহস্য সমাধানের পর সে পারিশ্রমিক নেবে। পার্থ ও টুপুর প্রথমে তাকে বলে এডভান্স নেওয়া উচিত ছিল। পরে পার্থ মিতিনকে বলে রহস্য সমাধানের পর মিতিন যেন হিরের এক শতাংশ টাকা পারিশ্রমিক

হিসেবে দাবি করে। কিন্তু মিতিনকে নিজের পারিশ্রমিক নিয়ে কোনও কথা বলতে হয়না, হিরে উদ্ধার ও জেসমিনের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করার পর মিসেস ইসাবেল আরাকিয়েল মিতিনকে পারিশ্রমিক হিসেবে দু'লক্ষ টাকা দেন। 'গুপ্তধনের গুজব'-এ মীনধ্বজ জানান তিনি এই রহস্য সমাধানের জন্য যেকোনও অঙ্কের টাকা খরচ করতে রাজি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিতিন পারিশ্রমিক হিসেবে কত টাকা পায় তার পরিমাণ জানা যায় না। মীনধ্বজবাবু একটা খামের মধ্যে চেক ভরে দেন, আর মিতিন তা নিজের ব্যাগের মধ্যে ভরে নেয়। চেকটা আসলে কত টাকার তা পাঠক জানতে পারেনা। 'হাতে মাত্র তিনটে দিন' কাহিনিতে মিতিনের অর্থাগমের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ছেলের অপহরণকারীকে খুঁজে বের করা ও ছেলেকে উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য রুস্তমজি জরিওয়ালা মিতিনকে পারিশ্রমিক হিসেবে পাঁচ লক্ষ টাকা দেন।

'ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য'তে মিতিনের অর্থপ্রাপ্তি ঘটে না। কারণ, মিতিনের পাড়ার বন্ধু কুশল তার সহপাঠী ঝাও লিয়াংকে টুপুরের কাছে নিয়ে আসে। লিয়াং চায় তার কাকা ঝাও ঝিয়েনের মৃত্যুর তদন্ত হোক। কম বয়সী কিশোর, পেশাদার গোয়েন্দাকে নিয়োগ কারার সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু টুপুরের মাসির কথা সে জানে, তাই টুপুরের দ্বারস্থ হয়। টুপুর মিতিনকে এই কেসটার ব্যাপারে জানায় প্রথমে অন্য একটা কেস নিয়ে ব্যাস্ত থাকার জন্য মিতিন টুপুরকে প্রাথমিক তদন্তের ভার দেয়। তারপর নিজে নেমে পড়ে তদন্তে। অর্থাগম না হলেও এটাকে পেশাদার গোয়েন্দাগিরির অন্তর্গত করতে হয়, কারণ লিয়াংয়ের মতো একজন ছাত্রের পক্ষে পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব নয় বলেই মিতিনের অর্থাগম হয়নি। কিন্তু এখানে মিতিন ব্যাক্তিগত আগ্রহে রহস্য সমাধানে নামেনি। তার কাছে কেসটার সমাধানের অনুরোধ জানানো হয়েছে বলেই সে গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। 'তৃষ্ণা মারা গেছে' কাহিনির ক্ষেত্রেও পার্থর বন্ধু তমালের ফ্ল্যাটে ভাড়াটে তৃষ্ণা আত্মহত্যা করে। তাই তমালের অনুরোধে মিতিন তদন্তে নামে। বলাবাহুল্য যেহেতু বরের বন্ধুর বিপদ তাই তাকে বিনা পারিশ্রমিকে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়। 'মেঘের পরে মেঘ' কাহিনিতে তমালিকা বসু নকল কেস সাজিয়ে মিতিনের কাছে আসে। মিতিন যখন পুরো রহস্য সমাধান করে ফেলে তখন দেখা যায় তমালিকাই পুরো ষড়যন্ত্রের পাণ্ডা, তাই শেষ পর্যন্ত এই কাহিনিতেও তার অর্থাগম হয়না।

অনেক সময়েই অন্য কারোর অনুরোধে কিংবা পেশার টানে নয়, একেবারে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে মিতিন রহস্য সমাধানে নেমে পড়েছে। যে কাহিনিগুলোতে মিতিনকে একেবারেই

সখের গোয়েন্দাগিরি করতে দেখা যায়, সেগুলি হল --- ১। মারণ বাতাস ২। শুধু একটা রং নাম্বার ৩। সারান্ডায় শয়তান ৪। কেরালায় কিস্তিমাত ৫। সর্প রহস্য সুন্দরবনে ৬। ছকটা সুডোকুর ৭। কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ ৮। টিকরপাড়ায় ঘড়িয়াল ৯। দুঃস্বপ্ন বারবার ১০। স্যান্ডারসাহেবের পুঁথি

'মারণ বাতাস' কাহিনিতে অনিশ্চয় যতই বলুন চিত্রলেখা তার বরকে হত্যা করেছে, মিতিন তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা। তাই সে নিজের কৌতূহল মেটানোর জন্য চিত্রলেখার শাশুড়ি ও দেওরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে এবং সৌম্যরূপের আসল হত্যাকারী কে, বুঝতে পারে। 'শুধু একটা রং নাম্বার'-এ পার্থর কাছে আসা উড়ো ফোনের পিছনে লুকিয়ে থাকা রহস্য খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সেখান থেকে ড্রাগচক্রের সন্ধান পায়। 'ছকটা সুডোকুর' কাহিনিতে তারা নিজেদের অজান্তেই অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তাই এই ঘটনার তদন্তে নেমে পড়া খুবই স্বাভাবিক। 'সারান্ডায় শয়তান', 'কেরালায় কিস্তিমাত', 'কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ', 'টিকর পাড়ায় ঘড়িয়াল' ও 'স্যান্ডারসাহেবের পুঁথি' এই কাহিনিগুলি মূলত ভ্রমণ মূলক কাহিনি। গোটা পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ট্যুরিস্ট স্পটের মূল্যবান জিনিস চুরির হাত থেকে বাঁচিয়েছে এবং অপরাধীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে এই কাহিনিগুলোতে মিতিন জাতীয় সম্পদ রক্ষা করেছে। তাই পারিশ্রমিক না পেলেও এই রহস্যগুলো সমাধান করে ও অপরাধীদের ধরিয়ে দিতে পেরে মিতিন তৃপ্ত হয়েছে।

সব মিলিয়ে দেখলে পেশাদার গোয়েন্দা মিতিন রহস্যের পিছনে ছুটতে ভালোবাসে বলেই সে গোয়েন্দাগিরিকে পেশা হিসেবে বেছেছে। আর তার জন্য নিজের মগজের পাশাপাশি শরীরকেও মজবুত বানিয়েছে। ক্যারাটে শেখার পাশাপাশি রিভলভার চালানোও শিখেছে। আর সেই রিভলভারের গুলি সখের গোয়েন্দাগিরিতে খরচও করেছে। অর্থাৎ, সে কোনও কেসের সমাধান করতে নামুক বা বেড়াতে যাক, সবসময় সে অপরাধীর মোকাবিলা করার জন্য নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত রেখেছে। পার্থ বরাবর তাকে তার পারিশ্রমিকের ব্যাপারে সচেতন করতে চাইলেও, মিতিন বলে --- "ঠিকঠাক কেস হলে এই প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি কখনোই টাকার হিসেব করেনা স্যার।"[১১] আর সেই কারণে মিতিনের কুড়িটি কাহিনির মধ্যে মাত্র সাতটি কাহিনিতে অর্থাগমের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

❖ অপরাধ ও অপরাধী

লেখক লেখিকারা তাঁদের গোয়েন্দা সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন। আসলে গোয়েন্দা হিসেবে সেই চরিত্রের অবস্থান কোথায়, নির্ভর করে তার রহস্য সমাধানের ধরণের ওপর। তাই গোয়েন্দা কাহিনিতে উপস্থিত অপরাধ ও অপরাধীর দিকে একবার তাকানো খুব জরুরি ।

কাহিনী	অপরাধী	অপরাধের ধরণ	হত্যার প্রণালী/ অস্ত্রের ব্যাবহার
পালাবার পথ নেই	তপন নন্দী দীননাথ রুদ্রর একসময়ের ম্যানেজার ঊষাপতি নন্দীর সন্তান হিসেবে বড় হয়ে উঠলেও সে আসলে ঊষাপতি নন্দীর স্ত্রী ও দীননাথ রুদ্রর অবৈধ সন্তান।	বিদিশার শ্বশুরবাড়িতে তার বিবাহপূর্ব জীবনের কথা জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। বিদিশার প্রাক্তন প্রেমিক অর্ক তার পিছু করলে, তাকে হত্যা করে।	অর্ককে গাড়ির তলায় পিসে মেরে ফেলে।
	দীননাথ রুদ্র	পুত্রবধূ বিদিশাকে মেয়ের মতো ভালবাসলেও তাঁর অবৈধ সন্তান তপনের ষড়যন্ত্রে তাকে সহযোগিতা	

		করতে বাধ্য হন।	
বিষ	রুমকি একটি স্কুলের বায়োলজির শিক্ষিকা।	মা ও তার বর রণজয়ের অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে জানতে পেরে মা লাবণ্য মজুমদারকে হত্যা করে।	প্রথমে স্লো-পয়জন করে। তারপর ডিপ্রেশনের দুটি রিভার্স গ্রুপের ওষুধ মনো-অ্যামিনো অক্সিবেসড ইনহিবিটার্স ও অ্যামিট্রিপটিশিন পর পর খেতে দেয়।
তৃষ্ণা মারা গেছে	প্রশান্ত সেন তৃষ্ণা মল্লিকের থার্ড কাজিন। একসময়ে তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক থাকার ফলে তৃষ্ণা গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল।	তৃষ্ণার সঙ্গে কৌশিক রায়ের বিয়ে ঠিক হলে সে কৌশিককে সব জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে।	তৃষ্ণা সুকন্যার কাছে থাকা তার বাবার রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করে।
মারণ বাতাস	অপর্ণা দেবী সম্পন্ন পরিবারের কর্ত্রী।	নিজের পঙ্গু সন্তান সৌম্যরূপেরর যন্ত্রণা সহ্য	পঞ্চাশ সিসি সিরিঞ্জের সাহায্যে এয়ার

		করতে না পেরে তাকে হত্যা করে।	এম্বলিজম করে হত্যা করেন।
একটা শুধু রং নাম্বার	সত্যপ্রিয় চৌধুরী হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।	ড্রাগচক্র চালান।	
	সুব্রত বিশ্বাস পার্কস্ট্রীটের গোল্ডেন ঈগল নাইটক্লাবে গীটার বাজায়। রিমি সুব্রতর স্ত্রী, সে ঐ ক্লাবে গান গায়।	তারা নাইটক্লাবে সিগারেটের পেপারের মধ্যে করে ড্রাগ সাপ্লাই করে।	
মেঘের পরে মেঘ	তমালিকা বসু ‘মহিমা এন্টারপ্রাইজ’ নামক কস্মেটিক ও ফুড প্রোডাক্ট কোম্পানির মালিক পিনাকী বসুর স্ত্রী। গৃহবধূ , সুন্দরী নন।	চক্রান্ত করে পিনাকী বসুকে হত্যা করান।	
	সায়ন ভাবঘুরে যুবক। মেডিক্যাল থার্ড		মাথায় টেনিস র‍্যাকেট দিয়ে

	ইয়ারে থাকতে পড়াশুনো ছেড়ে দেয়। মাঝে জুয়ার নেশা ধরেছিল, তারপর একটা গানের ব্যান্ড বানিয়েছে।	পিনাকী বসুকে হত্যা করে।	আঘাত করে হত্যা করে।
সারাণ্ডায় শয়তান	মধুবাবা / গর্জন রায় খড়্গপুর আই আই টির ছাত্র ছিল। সাধুর ভেক ধরে মানুষকে ভেলকি দেখায়।	হাতির দাঁত পাচার করে।	
	মুকুল সিং প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যাসাদার পুরুষোত্তমের বড় ছেলে। তার জুয়া খেলার নেশা থাকার কারণে পৈতৃক ব্যাবসার ভার তার ভাই বিকাশের হাতে চলে যায়।	সারাণ্ডার জঙ্গল থেকে হাতির দাঁত পাচারের ষড়যন্ত্রে গর্জন রায়ের সহযোগিতা করে।	

জোনাথনের বাড়ির ভূত	মিসেস মারিয়া জোনস জোনাথনের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। বর ছবি বাঁধাইয়ের দোকানে কাজ করে।	প্রোমোটার সুরজমলের কাছ থেকে কমিশন পাওয়ার জন্য জোনাথনকে ভয় দেখাতে শুরু করে। সন্ধ্যেবেলা কাজ সেরে চলে যাওয়ার পর রাতে গুপ্তপথ ধরে বাড়ির মধ্যে এসে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে ভৌতিক আবহ তৈরি করতেন। কাঁচকাটার বিশেষ ধরণের কাঠি দিয়ে কাঁচের ওপর দাগ দিয়ে রাখতেন, পরে কেউ তাতে হাত দিলে ভেঙে যেত। বাল্ব, টিউব লাইটের গায়ে মিউরেটিক	

		অ্যাসিড লাগিয়ে রাখতেন, সেগুলো জ্বলে উত্তপ্ত হলেই ভেঙে ফেটে যেত।	
	মির্না জোনাথনের মেয়ে ও উৎপল তাঁর জামাই।	দুজনে মিলে ২৬ লক্ষ টাকায় জোনাথনের দুটো বাড়ি বিক্রি করলেও তাঁকে ১৪ লক্ষ টাকা দেন। বাকি টাকা আত্মসাৎ করে তারা একটি জিম খোলে।	
কেরালায় কিস্তিমাত	পি কে জি কুরুপ কুখ্যাত অপরাধী । ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার সেজে ঘুরে বেড়ায়।	ইহুদি সিনাগগ থেকে ছাগলের চামড়ার ওপর হিব্রু লিপিতে লেখা গ্রেটস্ক্রল চুরি করে। সিনাগগের টিকিট কাউন্টারের	

		ছেলেটিকে হত্যা করে।	
সর্পরহস্য সুন্দরবনে	সুধন্য সান্যাল সুমন্ত্র সান্যালের যমজ ভাই। মেডিক্যালের থার্ড ইয়ারে থাকতে পড়াশুনো বাদ দিয়ে ইংরেজি গানের ট্রুপ খোলে।	সুমন্ত্রর সাপের বিষ বিষয়ক গবেষণার ফর্মুলা চুরি করে বিক্রি করতে চায়। সুমন্ত্রর সহকারী নীলাম্বর ও কুকুর রজারকে হত্যা করে।	
ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য	তরুণ বসু ইতিহাসের অধ্যাপক। জাতীয় গ্রন্থাগারে ঝাও ঝিয়েনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।	ঝাও ঝিয়েনের কাছে থাকা অ্যাডমিরাল জংয়ের আঁকা মানচিত্র হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁকে হত্যা করেন।	গাড়ির টুলবক্সের স্প্যানার দিয়ে মাথার পিছনে আঘাত করে। তারপর তাঁর ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেন।
ছকটা সুডোকুর	সৌম্য নারায়ণ / টি পি শঙ্করণ পেঙ্গুইন রিসর্টস ইন্টারন্যাশনাল নামক ভুয়ো	ঐ কোম্পানি ট্যুরিস্টদের সঙ্গে যে চিঠি পাঠায় তাতে তাদের লোগোর গায়ে	

	কোম্পানির অপরাধ কর্মের সঙ্গে যুক্ত।	খুব ছোট করে সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য পাচার হয়। সিঙ্গাপুরে সেই সব চিঠি সংগ্রহ করে।	
আরাকিয়েলে-র হিরে	হাসমিক ভারদোন/ জেসমিন জোসেফ মেলিক আরাকিয়েলের স্ত্রী ইসাবেল আরাকিয়েলের ভাইঝি। সুগন্ধি মোমবাতি তৈরির ব্যাবসা করে।	সম্পত্তি পাওয়ার লোভে পিসিকে স্লো-পয়জন করতে থাকে। মোমবাতি তৈরির সময় প্যারাফিনের সঙ্গে পারদ মিশিয়ে স্লো-পয়জন তৈরি করত।	
গুপ্তধনের গুজব	সন্দীপন মীনধ্বজবাবুর পূর্বপুরুষের বাড়ি ‘নিনহো’ রক্ষণাবেক্ষনের কাজ করে। মালিক ফিরে এলে তাঁকে ভূতের ভয় দেখিয়ে	বাড়ির তলায় একটা পাতালপুরি আছে, সেখানে অস্ত্র সংগ্রহ করে রাখত।	

	বাড়ি থেকে তাড়ানোর ব্যাবস্থা করে।		
হাতে মাত্র তিনটি দিন	সুজয় মজুমদার রুস্তমজির প্রাইভেট সেক্রেটারি অশোক মজুমদারের ভাই।	রুস্তমজির মেয়ে রানিকে অপহরণ করে।	
কুড়িয়ে পাওয়া পেন ড্রইভ	রবার্তো জোয়ান্নি ইতালিয়ান টুরিস্ট। সখের ফটোগ্রাফির জন্য জোরালো ক্যামেরা ও তেপায়া স্ট্যান্ড নিয়ে ঘোরেন।	হিমাচল প্রদেশের নিকলাস বোয়ারিখ আর্ট গ্যালারি থেকে আসল ছবি চুরি করে ফ্রেমগুলোতে নকল ছবি ভরে দেন।	
মারকুইসস্ট্রি-টে মৃত্যু ফাঁদ	রণেন সামন্ত বাড়িতে আফ্রিকান জংলাগাছ স্টোফানথাস গাছ চাষ করেন। এর বীজ থেকে আওয়াবেন নামক শক্তিশালী বিষ তৈরি হয়।	তিনি ডেভিড ডিসুজার দিদির বর আব্রাহাম, দিদি ক্যাথলিন ও স্ত্রী র‍্যাচেলকে হত্যা করেন।	প্রথমে তাদের গায়ে যথাক্রমে ওয়াইন, ফলের রস, আইসক্রিম ফেলে দেন। তারপর মোছার জন্য আওয়াবেন লাগানো রুমাল

			এগিয়ে দেন। এভাবে তাদের শরীরে বিষ প্রবেশ করে।
টিকরপাড়ায় ঘড়িয়াল	ইন্দ্রজিৎ সেন বয়স্ক প্রফেসর সেজে ঘুরে বেড়ান। আন্তর্জাতিক পশু শিকার চক্রের সঙ্গে যুক্ত। সুবাহু তাঁর সাগরেদ ।	টিকরপাড়া ঘড়িয়াল প্রকল্পের দুটি ঘড়িয়ালকে মেরে তাদের চামড়া ও হাড়ের গুঁড়ো পাচার করার পরিকল্পনা করেন।	
দুঃস্বপ্ন বারবার	আহিরচাঁদ ও আকাশচাঁদ জগত শেঠের পরিবারের উত্তরপুরুষ।	মিলে আলোকচাঁদকে মুর্তি চুরির দায়ে জেলে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন, তবে তা বাস্তবায়িত হয়নি।	

স্যান্ডর সাহেবের পুঁথি	চন্দ্রকুমার স্যান্ডর কোরেশীর লেখা পুঁথি দেবলের কাঁচ থেকে হাতিয়ে নেবে বলে দুজন সহযোগী সহ দেবলের পিছু পিছু চলতে শুরু করে।	শেষ পর্যন্ত তারা পুঁথি হস্তগত করতে পারেনা। আসলে বাংলায় রচিত একমাত্র গেতংপা ফুকতালে রেখে আসার জন্য দেবল যাত্রা শুরু করেছিল।	

দেখা যাচ্ছে সাতটা কাহিনিতে হত্যার প্রসঙ্গ রয়েছে, 'আরাকিয়েলের হিরে'তে হত্যা করতে চাওয়ার প্রয়াস রয়েছে, তবে মিতিন তা ঘটার আগেই আটকে দিতে পেরেছে। 'তৃষ্ণা মারা গেছে' কাহিনিতে হত্যার দৃশ্য রয়েছে, তবে তা আসলে আত্মহত্যা। ছ'টা কাহিনিতে জাতীয় সম্পদ উদ্ধারের প্রসঙ্গ রয়েছে, এগুলো আসলে চুরি আটকে দেওয়া কিংবা চুরি করা জিনিস পুনরুদ্ধারের গল্প। মিতিনের কাহিনিতে অনেক জায়গাতেই রিভলভারের ব্যাবহার দেখা যায়। যেমন 'টিকর পাড়ায় ঘড়িয়াল'-এ দেখা যায় ---

> ইন্দ্রজিতের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। রিভলভারের নল মিতিনের দিকে ঘুরিয়ে বলল, "প্রথম গুলিটা তো তাহলে আপনার কপালেই নাচছে। ......"
>
> খচ করে একটা শব্দ হল সেফটি ক্যাচ তোলার। পরক্ষণেই অত্যাশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটাল মিতিন। বিদ্যুৎবেগে জিন্সের পকেট থেকে বের করেছে রিভলভার। ইন্দ্রজিতকে বিন্দুমাত্র প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়ে সরাসরি গুলি করেছে তার হাতে।[১২]

এমনকি অনেক সময় গুলি না চালালেও মিতিনকে রিভলভার তাক করে অপরাধীকে ভয় দেখাতে দেখা গেছে। তবে মিতিনের হাতে সবসময় রিভলভার থাকলেও হত্যার ক্ষেত্রে সুচিত্রা ভট্টাচার্য সব সময় অপরাধীর হাতে রিভলভার তুলে দেননি। 'তৃষ্ণা মারা গেছে'তে তৃষ্ণা আত্মহত্যার জন্য তার বন্ধুর বাবার লাইসেন্সড রিভলভার ব্যাবহার করেছে। কিন্তু

হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীরা রিভলভার ব্যাবহার করেনি। ‘মেঘের পরে মেঘ’-এ সায়ন পিনাকী বসুর মাথায় টেনিস র‍্যাকেট দিয়ে আঘাত করে, ‘ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য’তে অধ্যাপক তরুণ বসু গাড়ির স্প্যানার দিয়ে ঝাও ঝিয়েনকে আঘাত করেন । তারপর মৃত্যু সুনিশ্চিত করার জন্য তাঁর ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেন। ‘পালাবার পথ নেই’-এ তপনও অর্ককে গাড়ির তলায় পিসে মারে। এই তিনটে হত্যা ছাড়া বাকি হত্যার ক্ষেত্রে বিষ ব্যবহৃত হয়েছে। ‘আরাকিয়েলের হিরে’তে জেসমিন তার পিসিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। সে তার সুগন্ধী মোমবাতির মধ্যে মারকারি মিশিয়ে স্লো-পয়জন তৈরি করে। রুমকিও তার মাকে হত্যা করার জন্য স্লো-পয়জন হিসেবে আর্সেনিককে বেছে নেয়। জেসমিন যদিও হত্যা করার আগেই মিতিন রহস্য উদ্ঘটন করে ফেলে, তাই ইসবেল আরাকিয়েলের মৃত্যু ঘটে না। কিন্তু রুমকি শেষ পর্যন্ত তার মাকে হত্যা করে, অবশ্য তা স্লো-পয়জনের ফলে হয়না, ডিপ্রেশনের রিভার্স গ্রুপের দুটি ওষুধ খাইয়ে সে তার মাকে হত্যা করে। ‘মার্কুইস স্ট্রিটে মরণফাঁদ’ কাহিনিতে রণেন সামন্ত আফ্রিকান জংলাগাছ স্টোফানথাসের বিজ থেকে তৈরি আওয়াবেন বিষের সাহায্যে একের পর এক খুন করে চলেন। আর ‘মারণ বাতাস’-এ অপর্না দেবী বড়ছেলে সৌম্যরূপকে পঞ্চাশ সিসি সিরিঞ্জের সাহায্যে এয়ার এম্বলিজম করে হত্যা করেন। দেখা যাচ্ছে ‘উইমেন ওয়েপন’ বিষকে সুচিত্রা ভট্টাচার্য অপরাধের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রেখেছেন । এবং বিষগুলোকে শুধুমাত্র বিষ বলে দেগে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, সেগুলি সম্পর্কে বেশ বিশদে ব্যাখ্যাও করেছেন।

❖ পুলিশের ভূমিকা

পুলিশের সঙ্গে গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতার সম্পর্ক এককথায় বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ বলা চলে। পার্থ মাঝে মধ্যে পুলিশকে হেয় করতে চাইলেও মিতিনের মধ্যে তেমন প্রবণতা চোখে পড়ে না। পার্থ ও মিতিনের আলোচনার মধ্যেই তার ছবি ফুটে ওঠে ---

> --- পুলিশের কোনও তালজ্ঞান আছে ? ওরা তো সর্বদাই ভুল রাস্তায় দৌড়োয়।
>
> --- মোটেই না স্যার। পুলিশের তদন্তের একটা ধারা আছে। পদ্ধতিটা খুবই বাঁধাধরা, তেমন একটা ব্রেনও খাটাতে হয়না, কিন্তু তা দিয়েই শতকরা পঁচানব্বইটা বজ্জাতকে ওরা ধরে ফেলে। ...... আর পাঁচ পারসেন্টের জন্য রয়েছি আমি। আমরা। অর্থাৎ পেশাদার গোয়েন্দারা। যারা বুদ্ধির প্যাঁচে অলাদা ধরণের অপরাধীগুলোকে ঘায়েল করে।[১৩]

দেখা যাচ্ছে মিতিন তার পেশা ও পেশাগত যোগ্যতা নিয়ে বেশ গর্বিত। কিন্তু তার পাশাপাশি সে পুলিশের কাজের সাফল্যের কথাও তুলে ধরেছে। সেখানে নিজেকে খানিক ওপরে বসানোর প্রবণতা থাকলেও পুলিশকে হেয় কারার চেষ্টা নেই। মিতিনের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্কের কথা বলতে গেলে প্রথমেই যে চরিত্রের কথা উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন অনিশ্চয় মজুমদার।

গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রথম উপন্যাস 'পালাবার পথ নেই' থেকেই অনিশ্চয় উপস্থিত, এখানে তাঁর নাম অনিশ্চয় তালুকদার। তবে পরে সব কাহিনিতেই তিনি অনিশ্চয় মজুমদার নামেই হাজির হয়েছেন। 'সর্প রহস্য সুন্দরবনে' কাহিনিতে তিনি মিতিনদের বাড়িতে আসলে দেখা যায় সিঙ্গেল সোফায় তাঁর দেহ ভালো ভাবে আঁটছেনা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, নিখুঁত কামানো গাল, আর মুখে রয়েছে কাঁচাপাকা গোঁফ। এখানে তাঁর বয়স বাহান্ন বছর। তাঁর মুখ থেকে জানা যায় সম্প্রতি তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। এখন থেকে শুধু কলকাতা নয়, পুরো পশ্চিমবঙ্গের ভার রয়েছে তাঁর কাঁধে। আলিপুরের ভবানী ভবনে তাঁর অফিস। এই কাহিনিতে তিনি গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল। 'দুঃস্বপ্ন বারবার'-এ দেখা যায় তিনি ডেপুটি ডিরেক্টর অফ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। 'মারণ বাতাস' কাহিনিতেও তাঁকে এই পদেই দেখা যায়। এমন জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের ডাকনাম ভেল্টু। আচরণের দিক থেকেও দেখা যায় তিনি বেশ প্রাণোচ্ছল মানুষ। মিতিনের সঙ্গে কোনও কেসের ব্যাপারে কথা বলতে আসলে প্রথমে তিনি জানান আসলে ছুটির দিনে লুচি আর সাদা আলুর চচ্চড়ি খাওয়ার লোভে তিনি হাজির হয়েছেন। খুব বড় পদে আসীন থাকলেও তাঁর মধ্যে ইগো নেই। তাই 'মারণ বাতাস'-এ যখন তিনি মিতিনকে জানান যে তিনি নিজে গিয়ে তদন্ত করে নিশ্চিত হয়েছেন চিত্রলেখাই আসল হত্যাকারী , তখন মিতিন আবার তাদের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি আপত্তি করেন না। আসলে মিতিনের প্রতি তিনি বেশ স্নেহ পোষণ করেন। তাই যখনই মিতিনের পুলিশের দরকার পড়ে মিতিন নির্দ্বিধায় তাঁকে ফোন করে সাহায্য চায়। 'হাতে মাত্র তিনটে দিন'-এ তিনি সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও মিতিন টুপুরকে জানায় অনিশ্চয় মজুমদারের সঙ্গে কথা সেরে নিল। অপরাধ কর্মে ব্যবহৃত রুস্তমজির হণ্ডাসিটির মতো দেখতে আরেকটি গাড়ি প্রসঙ্গে মিতিন বলে ---- "লক করে অনিশ্চয়দাকে জানিয়ে দিচ্ছি, লোকাল থানা এসে নিয়ে যাবে"[১৪] ।

এক কথায় বললে অনিশ্চয় মজুমদার থাকার ফলে মিতিনের গোয়েন্দা জীবন অনেক সহজ হয়ে গেছে। বিভিন্ন ঘটনায় লোকাল থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রথমেই অনিশ্চয়

মজুমদারের পরিচিত বলার ফলে সবাই তাকে তোয়াজ করেছে। 'আরাকিয়েলের হিরে' কাহিনিতে মিতিন লোকাল থানায় গিয়ে ওসির সঙ্গে দেখা করলে প্রথমে তিনি খুব হম্বিতম্বি করেন। এমনকি টুপুর লেখাপড়া শিকেয় তুলে কেন সাগরেদগিরি করে বেড়াচ্ছে, তা নিয়ে তাকে বকাবকি করেন। তারপর অনিশ্চয় মজুমদারের নাম বলতেই তাঁর ব্যবহার একেবারেই পাল্টে যায়। তদন্তকারী অফিসার বিশ্বনাথ মই মিতিনকে কতটুকু তথ্য দেবে তা নিয়ে দোনামনায় থাকলে তিনি তাঁকে মনে করিয়ে দেন মিতিন আসলে অনিশ্চয়ের বন্ধু। ফলে মিতিন পুলিশি তদন্তের অগ্রগতির সবটাই জানতে পেরে যায়।

তবে সবসময়ই যে অনিশ্চয়ের কারণেই পুলিশ মহলের সাহায্য পেয়েছে তা বলা যায় না। 'তৃষ্ণা মারা গেছে'-র তদন্তকারী অফিসারব অজেয় কিংবা ভ্রমণ মূলক কাহিনিতে ভিন রাজ্যের পুলিশ তাকে তার কাজে সহযোগিতা করেছে। তবে এগুলোতে পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবে তার উপার্জনের প্রসঙ্গ নেই। যে সাতটি কাহিনিতে মিতিনের উপার্জনের কথা পাওয়া যায় তার মধ্যে দু'টি অনিশ্চয় মজুমদারের দেওয়া কেস। 'গুপ্তধনের গুজব'-এর কেসটা তিনি মিতিনকে দেন, কারণ বাড়ির মালিক মিডিয়া-পুলিশের হই-হট্টগোল চাইছেন না। 'মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ'-এর কেসটাও মিতিনকে দেন। কারণ, তিনি বলেন ডেভিড জেশুয়া বারবার ফোন করে তাঁর মাথা খারাপ করে দিচ্ছেন, তিনি বলছেন তাঁকে আর তাঁর স্ত্রীকে কেউ হত্যা করে ফেলবে। অন্যদিকে মিতিন যখন পেশাদারির পাশাপাশি সখের গোয়েন্দাগিরি করতে নেমে তাঁর সহযোগিতা চান, সেখানেও তিনি উপস্থিত থাকেন। 'দুঃস্বপ্ন বারবার'-এ কাহিনির শেষে শালিনী যখন মিতিনকে প্রণাম করে, তিনি মজা করে বলেন, ঐ কেসের পারিশ্রমিক এটা। এক কথায় বলতে গেলে পেশাদার গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জির গোয়েন্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে অনিশ্চয় মজুমদারের ভূমিকা কোনও ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

❖ মূল্যায়ন

মিতিন মাসি যে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় মেয়ে গোয়েন্দা একথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র কিশোর পাঠকদের কাছেই নয় প্রায় সব বয়সী পাঠকই মিতিনের কাহিনি পড়েন। কিছু পাঠকের কাছে তিনি খুব জনপ্রিয় আবার কিছু পাঠক বিরূপ সমালোচনাও করেন। তাঁদের মতে মিতিনের কাহিনি অনেক সময়ই গোয়েন্দা কাহিনির

বদলে পারিবারিক কাহিনি হয়ে উঠেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই মিতিনের কাহিনিতে পারিবারিক জীবনচিত্র যতটা উপস্থিত, অন্য গোয়েন্দা কাহিনিতে ততটা উপস্থিত নয়। তাকে ছেলেকে শাসন করতে দেখা যায়, রান্না করতে দেখা যায়, বাড়ির সব কাজে তদারকি করতে দেখা যায়। আসলে গোয়েন্দা কাহিনি বা বলা ভালো ক্রাইম কাহিনিতে মূলত অপরাধ জগতের চিত্রকে পাঠকের সামনে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এবং পাঠককে সেই আবহের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা কাহিনির লেখক গোয়েন্দাদের পারিবারিক জীবনের দিকে খুব বেশি নজর দেন না। এক্ষেত্রে ফেলুদা একেবারে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্যোমকেশের ক্ষেত্রে তার পারিবারিক জীবনের চিত্র থাকলেও মূল অপরাধ কাহিনির মাঝে সেই জীবনের কথা খুব বেশি বর্ণিত হতে দেখা যায় না। শুধুমাত্র এই দুজন গোয়েন্দার ক্ষেত্রেই নয়, বাংলার জনপ্রিয় প্রায় সব গোয়েন্দার কাহিনির দিকে লক্ষ করে দেখা যায় সেখানে গোয়েন্দার পারিবারের চরিত্রদের উল্লেখ থাকলেও পারিবারিক জীবনের চিত্র খুব বেশি নেই। লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য সেই জায়গাটাকেই তাঁর লেখার মধ্যে বেশি করে তুলে ধরলেন। তিনি দেখালেন মারামারি করে অপরাধীকে ধরিয়ে দেওয়ার পরই মিতিন তার পরিচারিকাকে ফোন করে বুমবুমের খবর নিচ্ছে। বেড়াতে গিয়ে সাজ্ঘাতিক অপরাধীর পিছু করার মাঝেও সে সবার জন্য বেশ কষিয়ে রান্না করছে। পাঠক এতদিন গোয়েন্দাদের গোয়েন্দাগিরির ক্ষমতা দেখে চমৎকৃত হত, কিন্তু তাদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কোনও ধারণা পেত না। লেখিকা পাঠকের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলেন গোয়েন্দার অন্দরমহলে বা বলা ভালো এক মেয়ে গোয়েন্দার অন্দরমহলে। এক গোয়েন্দা গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি কিভাবে স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করে, আত্মিয়দের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে কিভাবে জীবন উপভোগ করে, লেখিকা তা পাঠককে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার সুযোগ করে দিলেন।

নির্দেশিকা

১। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, জোনাথনের বাড়ির ভূত, আনন্দ, কলকাতা, জুলাই ২০১৩, পৃ. ২৪
২। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সারাগুায় শয়তান, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৮
৩। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, তিন মিতিন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১১৫
৪। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, জোনাথনের বাড়ির ভূত, আনন্দ, কলকাতা, জুলাই ২০১৩, পৃ. ১০৭
৫। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, জোনাথনের বাড়ির ভূত, আনন্দ, কলকাতা, জুলাই ২০১৩, পৃ. ২১
৬। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সর্পরহস্য সুন্দরবনে, আনন্দ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ১০৭
৭। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, হাতে মাত্র তিনটে দিন, আনন্দ, কলকাতা, জুলাই ২০১৩, পৃ. ৮১
৮। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'মেঘের পরে মেঘ', দে'জ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১৩-১৪
৯। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'দুঃস্বপ্ন বারবার', আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪২১, পৃ. ৯৪
১০। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সর্প রহস্য সুন্দরবনে, আনন্দ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১০৪-১০৫
১১। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'আরাকিয়েলের হিরে', আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪১৫, পৃ. ১৪২
১২। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'টিকর পাড়ার ঘড়িয়াল', অনন্দ, কলকাতা, ২০১৩ পৃ. ৩৬
১৩। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, মেঘের পরে মেঘ, দে'জ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১২
১৪। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, হাতে মাত্র তিনটে দিন, আনন্দ, কলকাতা, জুলাই ২০১৩, পৃ. ১১৩

অষ্টম অধ্যায়

অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাদের কথা

আগের অধ্যায়গুলিতে আলোচিত গোয়েন্দা ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু মেয়ে গোয়েন্দার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিছু কিছু উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যক্তিক সঙ্কট থেকে একটি মেয়েকে গোয়েন্দার ভূমিকায় নামতে হচ্ছে, গোয়েন্দাগিরি মোটেই তার পেশা নয়, কিন্তু পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে সে গোয়েন্দা হয়ে উঠছে। কিছু কিছু গল্পও রয়েছে যেখানে মেয়ে গোয়েন্দাদের দেখা মেলে। অনেক ক্ষেত্রেই এই মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে খুব বেশি কাহিনি রচিত হয়নি, হয়ত একটি বা দুটি কাহিনিতেই তাদের উপস্থিতি সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। বিভিন্ন লেখকদের এই ধরণের গোয়েন্দা চরিত্রকে এক জায়গায় এনে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হল।

❖ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

১৯১৬ সালের কলকাতার ভবানীপুরে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। কিন্তু তাঁর জীবনের পঁচিশ বছর রেঙ্গুনে কাটে। সেখানে তিনি রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাশ করে আইনজীবীর কাজ শুরু করেন। ১৯৪০ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'ইরাবতী' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি শিশু কিশোরদের জন্যও সাহিত্য রচনা করেন। পরবর্তী সময়ে শশধর প্রকাশনী থেকে তাঁর কিশোর সাহিত্য সমগ্রের চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে কৌতুক রসের কাহিনির পাশাপাশি কিছু গোয়েন্দা কাহিনিও খুঁজে পাওয়া যায়। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় গোয়েন্দা হিসেবে পারিজাত বক্সী চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছিলেন, সম্পর্কে সে ব্যোমকেশের ভাইপো। পারিজাতের পাশাপাশি তিনি মেয়ে গোয়েন্দার কাহিনিও রচনা করেছেন। হৈমন্তী ঘোষাল ও বৈশাখী ব্যানার্জি --- এই দুটি চরিত্রকে নিয়ে তিনি রহস্য কাহিনি রচনা করেন।

'অমানুষিক' গল্পে দেখা যায় হৈমন্তী ঘোষাল সখের গোয়েন্দা। তার সঙ্গী নিরুপম এই গল্পের কথক। গিরিডির অভ্র ব্যবসায়ী তেজেশ সরকার খুন হলে হৈমন্তী নিরুপমকে সঙ্গে করে গিরিডির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ঊনসত্তর বছরের তেজেশের পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে দেখা যায় পটাশিয়াম সায়ানাইডের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর চাকর রামকমল দুধে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে --- এই সন্দেহে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। হৈমন্তী অনুসন্ধান করে

বুঝতে পশু-পাখির ব্যবসায়ী রূপচাঁদ তার ট্রেনিং প্রাপ্ত বাঁদরকে কাজে লাগিয়ে তেজেশকে হত্যা করেছে। রূপচাঁদের নির্দেশে বাচ্চা বাঁদরটি ঘুলঘুলি দিয়ে নেমে এসে টেবিলে রাখা দুধের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়ে চলে যায়, সেই দুধ খেয়ে তেজেশ মারা যান। আসলে এর পিছনে অনেক বছর আগের এক ঘটনা দায়ি। অনেক বছর আগে তেজেশ ও রূপচাঁদ (তখন তার নাম ছিল সুবিনয়) গ্যংটকে ঘুরতে গিয়ে এক গুম্ফার মধ্যে কিছু স্বর্ণমুদ্রা পান। দুজনে সেই মুদ্রা সমান ভাগে ভাগ করে নেন। তারপর রাতের বেলা তেজেশ লোহা বাঁধানো বাঁশের লাঠি দিয়ে সুবিনয়ের মাথায় আঘাত করে তার বুকের মধ্যে লুকানো মুদ্রা নিয়ে পালিয়ে আসেন। গিরিডিতে এসে অভ্রের ব্যবসা শুরু করেন। বছর দুই আগে দুজনের সাক্ষাৎ হয়। তেজেশ তাকে চিনতে পারেন না, কিন্তু রূপচাঁদ তাঁকে চিনতে পারে। তারপর পরিকল্পনা করে সে তেজেশকে হত্যা করে।

কাহিনিটি একেবারেই একমুখী, সরল প্লট নিয়ে গঠিত। কাহিনির মধ্যে খুব অভিনব কোনও বিষয় না থাকলেও কাহিনিটি সুখপাঠ্য। যদিও এখানে নিরুপম চরিত্রটিকে হৈমন্তীর সহকারী হিসেবে সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। তবে তাকে মেয়ে গোয়েন্দার পুরুষ পার্শ্বচর চরিত্র বলা যেতে পারে। বাচ্চা বাঁদরটির হাতে অ্যানাসিনের বড়ি দিলে রাতে সে তেজেশের ঘরে এসে আবার গ্লাসের ঢাকা খুলে তার মধ্যে সেটি ফেলে দেয়, এটা দেখিয়ে হৈমন্তী পুলিশের কাছে খুনের আসল প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে। কিন্তু এই দৃশ্যটি বড়ই অযৌক্তিক মনে হয়। কারণ রূপচাঁদের বাঁদরকে হৈমন্তী কিভাবে নিজের আওতায় নিয়ে আসল, তা নিয়ে লেখক কাহিনির মধ্যে কোনও রকম ইঙ্গিত দেননি।

'অমানুষিক' গল্পে দেখা যায় লেখক নিরুপম চরিত্রটির বয়ানে বলছেন --- "এদেশে হৈমন্তীর আগে নারী গোয়েন্দা কেউ ছিল বলে জানি না, পরে আর কেউ হয়েছে কিনা বলতে পারব না।"[১]

কাহিনিটির প্রকাশকাল জানা যায় না। তবে এই কথা থেকে অনুমান করা যায় এটি কৃষ্ণার কাহিনিগুলি প্রকাশিত হওয়ার আগে রচিত।

হৈমন্তীর পাশাপাশি হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনিগুলির মধ্যে আরেকটি মেয়ে গোয়েন্দার সন্ধান মেলে। 'পাথরের চোখ' কাহিনিতে গোয়েন্দা বৈশালী ব্যানার্জি চরিত্রটিকে পাওয়া যায়। এই কাহিনিটি 'অমানুষিক'-এর মতো স্বল্পায়তনের গল্প নয়, ৫৬ পৃষ্ঠার নভলেট।

বৈশালী হৈমন্তীর মতো সখের গোয়েন্দা নয়। সে পেশাদার গোয়েন্দা আর সুজিত তার সহকারী। শিলাগড়ের ব্যবসায়ী ভুবন বাজপেয়ী বৈশালীর কাছে তাঁর রত্ন খচিত ধাতব ময়ূর নিয়ে হাজির হন। দেখান যে ময়ূরের একটি চোখের চুনি বদলে নকল পাথর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৈশালীর কাছ থেকে ফেরার সময় তিনি নিজের গাড়িতে খুন হন। এরপর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এসে বৈশালীর সঙ্গে দেখা করে তদন্ত করতে বলে। বৈশালী শিলাগড়ে গিয়ে অনুসন্ধান করে তারপর কলকাতায় ফিরে আসে। এরপর আকস্মাৎ শিলাগড়ে হানা দিয়ে ভুবনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী দীপালী দেবী ও তাঁর সহকারী মঙ শানকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়।

আসলে ঐ রত্নখচিত ময়ূরের পেটের মধ্যে ভুবন বাজপেয়ীর কালো টাকার হদিশ ছিল। দীপালী দেবী ময়ূরটা বরের অজান্তেই তাঁর রত্ন ব্যবসায়ী বাবাকে একবার দিয়েছিলেন। তিনি এই বিষয়টা জানানোর পর দীপালী দেবী ভুবনকে হত্যা করে তার দায় তাঁর ছেলে অতীন বাজপেয়ীর ঘাড়ে দায় চাপানোর পরিকল্পনা করেন। বৈশালীকে নিজে ডেকে এনে তাকে বারবার দিক ভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে বৈশালী বলে --- "বোধ হয় দীপালীদেবীর ধারণা, মেয়ে গোয়েন্দাদের যাহোক একটা কিছু বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।"[২]

বৈশাখীর বাবা শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় ইলেকট্রিক কোম্পানির ইঞ্জিনিয়র ছিলেন, তাঁর বন্ধু সত্যেন রায় লালাবাজারের ডেপুটি কমিশনার। ফলে গোয়েন্দাগিরি করার ক্ষেত্রে সে সহজেই পুলিশের সাহায্য পায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট থানার ও সির সঙ্গে কথোপকথনের ধরণ দেখে খটকা লাগে ---

> "অতীনবাবু ঠিকমত থানায় হাজিরা দিচ্ছেন তো ?
> ও সি হাসল। হ্যাঁ, একেবারে নিয়ম করে। এবার অ্যারেস্ট করি তাকে ?
> না, এখন নয়। যখন প্রয়োজন হবে বলব।"[৩]

গোয়েন্দাকে যতই সমীহ করুক, কোনও ওসি সন্দেহ ভাজনকে ধরার জন্য এভাবে প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবে না। আর প্রাইভেট ডিটেকটিভের মুখেও এমন উত্তর খুব বেমানান বলে মনে হয়। এটুকু বাদ দিলে বাকি কাহিনির বুনন বেশ ভালো। বৈশালী সব সময় নিজের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রাখে। খুনের পর ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট, ব্যালিস্টিক ডিপার্টমেন্ট, ভিসেরা রিপোর্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে যখন বৈশালী জানতে চায়, তখন বোঝা যায় লেখক তাকে পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবে বেশ নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

❖ ইন্দ্রনীল সান্যাল

ইন্দ্রানীল সান্যাল পেশায় চিকিৎসক। ১৯৬৬ সালের ১৯ জুলাই হাওড়ার বালিতে তাঁর জন্ম। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি বি এস পাশ করার পর পিজি হাসপাতাল থেকে প্যাথলজিতে এম ডি করেন। ২০০৪ সালে 'উনিশ কুড়ি' পত্রিকায় প্রথম বার তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়। ২০০৭ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রক্তবীজ' প্রকাশিত হয়। এই অধ্যায়ে তাঁর 'মেডিক্যাল থ্রিলার' নিয়ে আলোচনা করা হল। তাঁর বইয়ের মলাটে 'মেডিক্যাল থ্রিলার' শব্দের উল্লেখ রয়েছে, এবং লেখক নিজে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষ হওয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক খুঁটিনাটি তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে। তবে কাহিনিগুলি বিশ্লেষণ করলে এগুলিকে 'সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার' নামে চিহ্নিত করা বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ইংরেজি সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে এই শ্রেণির কাহিনির অভাব নেই। তবে ইন্দ্রনীল সান্যাল লেখা শুরু করার আগে বাংলা সাহিত্যে এই ধারার রচনা খুব বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তাই এই ক্ষেত্রে তাঁর পথ প্রদর্শক হিসেবে অন্য কোনও বাংলা সাহিত্যের লেখকের নাম উল্লেখ সম্ভব নয়। 'কর্কটক্রান্তি' কাহিনিতে দেখা যায়, মৃত্যুঞ্জয় দীপশিখাকে বলছেন --- "জীবনে কি উত্তেজনা কম পড়িয়াছে ? রবিন কুকের মেডিক্যাল থ্রিলার পড়।"[৪]

অর্থাৎ, বলা যায় তিনি এই লেখকের লেখা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর এই ধরণের লেখায় হাত দেন।

ইন্দ্রনীল সান্যালের বেশির ভাগ উপন্যাসেই গোয়েন্দার ভূমিকায় আলাদা আলাদা নারী চরিত্রের দেখা মেলে, গোয়েন্দার ভূমিকায় থাকা প্রত্যেকটি মেয়েই ডাক্তার। পাশাপাশি আলাদা আলাদা তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিও দেখা যায়। তবে 'পণ্যভূমি' উপন্যাসের সাংবাদিক চরিত্রগুলিকে 'স্নেহজাল' উপন্যাসে ফিরে আসতে দেখা যায়, যদিও কাহিনির অগ্রগতির ক্ষেত্রে এদের কোনও ভূমিকা নেই। আমাদের সমাজে মিডিয়ার ভূমিকা বোঝানোর জন্যই তাদের উপস্থিতি রয়েছে।

এই আলোচনায় তাঁর চারটি সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারের প্রসঙ্গ আনা হল : ১। কর্কটক্রান্তি ২। পণ্যভূমি ৩। স্নেহজাল ৪। ময়না তদন্ত। প্রথম তিনটি উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল হল উপন্যাসগুলি সিরিয়াল কিলিং নিয়ে রচিত। অর্থাৎ, অপরাধের ক্ষেত্রে কোনও বৈচিত্র্য নেই, অপরাধীদের অপরাধ ঘটানোর কৌশল ও তার পিছনে ক্রিয়াশীল মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য রয়েছে।

‘কর্কটক্রান্তি’ উপন্যাসটি ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে দেখা যায়, হত্যাকারী জাল নম্বর প্লেট লাগানো সাড়ে তিনশো শিশির বাইক চাপা দিয়ে প্রথমে দেহ ব্যবসায়ী কৃষ্ণা হালদারকে হত্যা করে। তারপর সাঁতারে রাজ্য-চ্যাম্পিয়ন ক্রিস্টোফার মণ্ডলকে লেকের জলে চুবিয়ে হত্যা করে। দীপশিখা মুখার্জি এই কাহিনিতে গোয়েন্দার ভূমিকা পালন করেছে। দীপশিখার বয়স ৩২ বছর। দীপশিখা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছিল ফরেনসিক মেডিসিনে। কাহিনিতে সে বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের অটোপসি সার্জেন্ট, ফরেনসিক মেডিসিনের একমাত্র মেডিক্যাল অফিসার। এই পরিচয়ের পাশাপাশি তার আরেকটি পরিচয় সে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত। ব্রেস্ট ক্যনাসারের দ্বিতীয় স্তরের চিকিৎসা চলছে। অপরেশন করে তার বাঁ দিকের স্তন বাদ দেওয়া হয়। গোটা উপন্যাস জুড়ে দীপশিখার অসুস্থতা ও চিকিৎসার বিবরণ রয়েছে, একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লেখক তা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। কৃষ্ণা ও ক্রিস্টোফারের পোস্ট মর্টেম করার সময় সে লে লক্ষ করে দুজনেরই গ্ল্যান্ড ফোলা। ডাক্তার বন্ধু সিদ্ধার্থকে দিয়ে অটোপ্সি করিয়ে জানতে পারে যে দুজনের লিম্ফোমা ছিল। অর্থাৎ, দুজনেই ক্যান্সার আক্রান্ত ছিল। এরপর ব্যাবসায়ী প্রদীপ প্যাটেল খুন হন, মেট্রোর লাইনে তাঁকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়। প্যাথলজি বিভাগে বন্ধু সিদ্ধার্থর সাহায্যে পুরনো নথি ঘেঁটে গত পাঁচ বছরের লিম্ফোমা রোগীদের যাবতীয় তথ্য জোগাড় করে। পাঁচ বছরে যে আড়াইশো লিম্ফোমা রোগীর চিকিৎসা শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে সতের জনের একবছরের মধ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য দীপশিখা কলকাতার বাকি মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে ফোন করে। শেষ তিনটে মৃত্যুর ক্ষেত্রে দীপশিখা লক্ষ করে তিনজনেই একটা নির্দিষ্ট ইনজেকশন নিত। এই ইনজেকশনটা বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের ফার্মাকোলজির বিভাগীয় প্রধান ডাক্তার সৌমিত্র সেনগুপ্তের ‘প্যানাসিয়া’ ড্রাগ ট্রায়ালের একটা পার্ট। যেহেতু লেখক নিজে একজন ডাক্তার এবং কাহিনিও মেডিক্যাল সিস্টেমের ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, তাই ইন্দ্রনীল সান্যালের কাহিনির মধ্যে মেডিক্যাল জগতের নিয়ম-কানুনের কথাও সবিস্তারে উঠে আসে ---

> ড্রাগ ডেভলপমেন্টের নির্দিষ্ট প্রোটকল আছে। প্রথমে ড্রাগ ডিসকভারি। তারপরে প্রি ক্লিনিক্যাল টেস্টিং। অর্থাৎ ল্যাবে পরীক্ষা। তারপর আসে পশুর ওপর পরীক্ষা। অ্যানিম্যাল ট্রায়াল। এই দু’টো মিলে ছ’বছর পর্যন্ত চলতে পারে। তারপর আসে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফার্স্ট ফেজ। এই ফেজে কুড়ি থেকে একশ জন পর্যন্ত হিউম্যান ভলেন্টিয়ার অংশ নিতে পারে। ...... কোনও ড্রাগ ট্রায়ালের ফেজ ওয়ান পাশ করলে শুরু হয়

> ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফেজ টু। এই ফেজে একশ থেকে পাঁচশ ভলেন্টিয়ার অংশ নেয়। এই ফেজ পেরতে পারলে শুরু হয় ফেজ থ্রি। এটা পেরিয়ে গেলে অ্যাপ্রুভালের জন্য আবেদন করতে হয়। অ্যাপ্রুভাল পেলে সেই ড্রাগ বাজারে আসে। তখনও ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফেজ ফোর চলে, দীর্ঘমেয়াদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জানার জন্য।[৫]

বিশল্যকরণী ফার্মার মালিক প্রিয়রঞ্জন বর্মা সৌমিত্র সেনগুপ্তের সন্তান বিতানকে দিয়ে সেই ফর্মুলা চুরি করান। ওই ওষুধটির ট্রায়ালে যারা সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি বিতানকে দিয়ে তাদের হত্যা করান। অন্যদিকে সৌমিত্রের পরবর্তী ওষুধে সেরে ওঠা নায়িকা ঝিলমকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার করে বাজারে ওই আগের ফর্মুলা ওষুধ হিসেবে নিয়ে আসতে চান।

এই কাহিনিতে দীপশিখার সহযোগী হিসেবে রয়েছে ময়দান থানার অফিস ইন-চার্জ বরুণ সরকার। তার বয়স ৪০, স্পোর্টসম্যানদের মতো চেহারা।

লেখক গোয়েন্দা চরিত্রটিকে যেমন নিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন, হত্যাকারী বিতান সেনগুপ্তর চরিত্রও তেমন নিখুঁত ভাবে চিত্রিত করেছেন ---

> ছ'ফিট লম্বা এক দানব। শ্যামলা গায়ের রং, মাথার ক্রু কাট। ক্লিন শেভন, এগিয়ে থাকা চোয়ালে ক্রূরতার ছোঁয়া, থুতনির মাঝখানে খাঁজ। রোমশ ভুরুর নীচে হিরের মতো ঝকঝকে চোখ। ট্র্যাকসুটের লোয়ার আর টি-শার্টের আড়ালে যে শরীর দেখা যাচ্ছে, সেটা জিমে বানানো। ...... আছে বক্সারের অ্যাগ্রেসিভনেস, আছে শয়তানের ক্রূরতা, আছে ঠাণ্ডা মাথার খুনির শীতলতা।[৬]

পাশাপাশি তার মধ্যে একটি মানবিক সত্তাও রয়েছে। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার পরও তার মধ্যে পাপবোধ কাজ করে। প্রতিটা হত্যার পর সে কাঁদতে থাকে। নিজেকে শাস্তি দিতে থাকে। আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়।

> আবার সে পাপ করেছে ! আবার ! ঈশ্বর কবে তাকে শাস্তি দেবেন, সেই আশায় বসে না থেকে নিজেকে শাস্তিদানের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়। পিঠে বেল্ট চালাতে থাকে শপাং! শপাং! শপাং! কাঁচা ঘায়ে আবার বেল্টের বাড়ি। ...... আজ সে যন্ত্রণায় নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চাইছে। ব্যাথার পূজার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে প্রায়শ্চিত্ত করছে।[৭]

আসলে সে মানসিক রোগাক্রান্ত একজন মানুষ। প্রিয়রঞ্জন তাকে রিমোট চালিত যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে গেছে। তাকে দানবিক করে তুললেও তার মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ মানবিকতাকে মুছে ফেলতে পারেনি । তাই শেষ পর্যন্ত সে নিজের বাবাকে হত্যা না করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

'সানন্দা পূজাবার্ষিকী ১৪২৯'-তে প্রকাশিত 'ময়না তদন্ত' উপন্যাসে আবার 'মড়াকাটা ডাক্তার' দীপশিখা মুখার্জিকে দেখা যায়। এখানে দেখা যায় দীপশিখার সাঁইত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। সে বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রফেসর হয়ে উঠেছে। দীপশিখার পাশাপাশি তার বর সৈকত, মেডিক্যাল কলেজের সহকর্মী মানস নাথ, রাজু ডোম চরিত্রগুলিও উপস্থিত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ইনস্পেক্টর বরুণ সরকারও এখানে উপস্থিত। 'কর্কটক্রান্তি' উপন্যাসে তার পোস্টিং ময়দান থানায় ছিল, বর্তমানে ভবানীপুর থানাতে বদলি হয়েছে। বরুণের বয়স এই কাহিনিতে পঁয়তাল্লিশ বছর।

বরুণই দীপশিখার কাছে এসে প্রিয়া দাশের মৃত্যুর বিষয়টাতে তাকে জড়িয়ে ফেলে। এমনকি মৃতদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন --- মাথায় ছুঁচ ফোটনোর বিষয়টা দীপশিখার নজরে না পড়লেও বরুণ তাকে সেটা ইশারায় দেখিয়ে দেয়। আর এখান থেকেই দীপশিখা বুঝতে পারে যে আসলে আপাতদৃষ্টিতে প্রিয়া দাশের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে মনে হলেও আসলে তাকে খুন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ভিসেরা রিপোর্ট আসার পর সে নিশ্চিত হয় যে ডাক্তার প্রিয়া দাশ আসলে খুন হয়েছেন। বরুণ দীপশিখাকে প্রিয়া দাশের শ্বশুরবাড়ি 'পুনশ্চ'তে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু দীপশিখা প্রথমে রাজি হয়না। সে জানায় --- "আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নই যে খুনের গন্ধ পেলে দৌড়ব। তাছাড়া ওখানে যাওয়াটা আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে না।"[৮]

আসলে পোস্টমর্টেম করা ডাক্তারের ক্ষেত্রে হত্যা নিয়ে বিশেষ মাথাব্যাথা না থাকাটাই স্বাভাবিক। 'কর্কটক্রান্তি' উপন্যাসে যেহেতু তার ব্যাক্তিগত জীবন জড়িয়ে পড়ছিল, তাই সে গোয়েন্দাগিরিতে নেমে পড়েছিল। লেখকের অন্যান্য উপন্যাসের গোয়েন্দারাও আসলে ব্যক্তিগত জীবনের জট ছাড়ানোর জন্যই গোয়েন্দাগিরি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দীপশিখার ব্যাক্তিগত জীবনের সমস্যা নয়, বরং ইনস্পেক্টর বরুণ সরকারের ব্যাক্তিগত জীবনের সমস্যার জন্য এই কাহিনিতে দীপশিখাকে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়। বরুণ পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যে থেকে রাজনৈতিক চাপের ফলে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে পারছিল না। প্রিয়া দাশের শ্বশুরবাড়ি খুব প্রভাবশালী একটি পরিবার। বংশপরম্পরায় তারা সাম্ভ্রান্ত ডাক্তার

এবং শাসক গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ। তাই প্রিয়া দাশের মৃত্যুকে হত্যা বলে চালিয়ে দিয়ে কেস ক্লোজ করে দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক চাপ আসতে থাকে। কিন্তু বরুণ একটু একটু করে দীপশিখাকে দিয়ে অনুসন্ধান করিয়ে নিতে থাকে। দীপশিখা প্রথমে তা না বুঝলেও শেষে পুরো বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারে।

লেখক অন্যান্য কাহিনির মতো এই কাহিনিতে সিরিয়াল কিলিংকে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু করে তোলেননি। তবে এই কাহিনিতেও খুনের একটি নির্দিষ্ট ছক দেখা যায়। কার্ল হাইম নাৎসি বাহিনির ডাক্তার ছিলেন। তিনি জার্মানি থেকে আর্জেন্টিনায় পালিয়ে যান, গা ঢাকা দেওয়ার জন্য সেখানকার একটি হাসপাতালে ভর্তি থাকেন। সেখানে নার্স লীলা দাশের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাঁর সঙ্গে বিয়ে করেন। তারপর পল দাশ নাম নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর নোটবুকে লিখে যান --- "আমাদের সন্তানকে শিক্ষা দেব যে মেডিক্যাল এথিক্স ভুলে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা উচিত। বিরোধী শক্তিকে নিকেশ করা উচিত। ইনফ্যাক্ট, আমি আমাদের সন্তানকে বোঝাব যে বড় হয়ে ডাক্তারি পড়তে হবে।"[৯]

তাঁর এই স্বপ্ন সফল হয়। তিনি যেমন নাৎসি বাহিনিতে থেকে 'টর্চার মেডিসিন'-এর চর্চা করেছিলেন, তাঁর পরবর্তী প্রজন্মও তেমন নিষ্ঠুর বিকৃত মস্তিষ্কের ডাক্তার হয়ে ওঠে। লীলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পলের বিকৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা জানতে পারার কারণে পল তাকে তাদের বাড়ি 'পুনশ্চ'-এর ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। পলের ছেলে ববি কলকাতায় উনশশো সত্তর থেকে উনিশশো বাহাত্তর পর্যন্ত নকশালদের ওপর টর্চার মেডিসিন নিয়ে চর্চা করে। তার স্ত্রী কবিতা এই কথা জেনে ফেললে ববি তাকে হত্যা করে। কবিতা ও ববির ছেলে নীল মেরিল্যান্ডের বেথেসডা মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করার পর আমেরিকার সেনাবাহিনীর ডাক্তার হিসেবে আবু ঘ্রাইবে চলে যায়। সেখানে সেও ২০০২ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত টর্চার মেডিসিনের নিয়ে গবেষণা করতে থাকে।

২০২১ সালে ইরাকের আবু ঘ্রাইব জেলের নৃশংসতার ভিডিও রেকর্ডিং প্রিয়ার হাতে পড়ে। তারপর প্রিয়া বুঝতে পারে যে সেও এই বাড়ির প্রথা মাফিক খুন হয়ে যাবে। তাই আগে থেকে সে সেই ভিডিও পেনড্রাইভে তুলে রেখে তা নিজের ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। বাড়িতে থাকা পুনশ্চ গ্রন্থের মধ্যে নিজের চিঠি লুকিয়ে রাখে। সিয়া কাপুরকে দিয়ে নিজের শাড়িতে নিজের শাশুড়ি ও তাঁর শাশুড়ির হত্যার কেস নম্বরগুলো ডিজিটাল প্রিন্ট করিয়ে রাখে। আলপথ রায়কে দিয়ে নিজের শরীরে সেই কেস নম্বর ট্যাটুও করিয়ে রাখে। পঁয়তাল্লিশ বছরের এই মনোরোগ চিকিৎসক প্রিয়া সিয়া, আলপথদের ব্যান্ডে গানও গাইত। একটা গানের কথার মধ্যে সে গোটা ঘটনার জট ছাড়ানোর ক্লু দিয়ে রাখে ---

খোকা আর তুলতুলি,

শোন ডাইনি বুড়ির বুলি,

খোল চোখের থেকে ঠুলি।

বুঝলি না তুলতুলি ?

লাগা আঁচলে রং-তুলি।

বুঝলি না তুই খোকা,

আঁক ত্যাঁদড় ট্যাটুগুলি।

শোন ডাইনিবুড়ির বুলি,

ঘাঁট ঠাকুরমায়ের ঝুলি,

পাবি কলম-চালকগুলি।

খোল চোখের থেকে ঠুলি।

পুনশ্চ দেখ খুলি।[১০]

পূর্ববর্তী যে হত্যাগুলো আত্মহত্যা নামে ধামা চাপা দেওয়া হয়েছিল সেগুলো যে আসলে হত্যা, তা জানা গেলেও পল মৃত, তাই তার প্রাপ্য শাস্তি সে পাবেনা। প্রিয়ার খাবারে বিষ মিশিয়েছিল তার চোদ্দ বছরের সন্তান আকাশ আর ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দিয়েছিল তার বর নীল। বরুণ জানায় নীলের কেসটা আর কলকাতা পুলিশের হাতে নেই। আবু ঘ্রাইবের প্রাক্তন সেনা চিকিৎসক কলকাতায় লুকিয়ে রয়েছে, এই বিষয়টা জানাজানি হতে বিষয়টার মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ঢুকে পড়েছে।

'ময়না তদন্ত' গোয়েন্দা কাহিনি হয়েও আসলে মানব সভ্যতার একটা অত্যন্ত বিকৃত দিককে তুলে ধরেছে। মানুষ যেখানে ঘৃণার জন্য মানবিকতাকে বিসর্জন দিতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে নকশাল আন্দোলন হয়ে ইরাকের মানুষদের ওপর আমেরিকান সৈন্যের অত্যাচারের চিত্রকে লেখক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ইন্দ্রনীল সান্যালের অন্যান্য কাহিনির মতো এই কাহিনিতেও বীভৎস রসের আধিক্য চোখে পড়ে। কিভাবে নাৎসি ডাক্তাররা ইহুদিদের ওপর; সারকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া কলকাতার ডাক্তাররা নকশালদের ওপর; আর আমারিকান সেনা চিকিৎসকরা ইরাকীদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে কাহিনির মধ্যে। কাহিনির মধ্যে প্রাপ্ত সব নোটবুক পড়ে ও ভিডিও দেখে দীপশিখার মনে হয়,

> মানুষ একে অপরকে কী ঘেন্না করে, তাই না ? এক ধর্ম অন্য এক ধর্মকে, এক জাত অন্য জাতকে, এক ভাষা অন্য ভাষাকে দমন করার জন্যে লড়াই করে যাচ্ছে। এত ঘৃণা আসে কোথা থেকে ? অত্যাচারের পদ্ধতি নিয়ে দিনের পর-দিন না-ভেবে যদি কত রকম ভাবে ভালোবাসা যায় এই নিয়ে মানুষ রিসার্চ করত, তাহলে কী ভালই না হত।[১১]

কাহিনির শেষে ইনস্পেক্টর বরুণ স্বীকার করেন তাঁর ও প্রিয়ার মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রিয়া জানত সে খুন হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে তাহলে বরুণ কেন প্রিয়ার খুন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। কাহিনির শুরুতেও দেখা যায়, প্রিয়া জানে সে খুন হবে এবং বাড়ির কেউই তাকে হত্যা করবে। তাহলে সে কেন ঐ বাড়িতেই রয়ে গেল ! প্রিয়া দাশ নিজে একজন ডাক্তার। সে চাইলে ঐ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারত। লেখক যদিও প্রথমেই এই বিষয়ে কৈফিয়ত দিয়েছেন, যে প্রিয়া আগে একটি দেশ ছেড়ে এখানে এসেছে, আবার সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে চায়না। কিন্তু তাঁর এই কৈফিয়ত খুব বেশি যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়না।

'পণ্যভূমি' উপন্যাসটিতে গোয়েন্দার ভূমিকায় গাইনকোলজি অবস্টেট্রিক্সে এমডি করা দিঠি চ্যাটার্জিকে দেখা যায়। দিঠি নিজের মদের আসক্তি কাটানোর জন্য মায়াগ্রাম নামের একটি আশ্রমে তিন মাসের জন্য ভর্তি হয়। সেখানে মন্দিরা ব্যানার্জি ছদ্মনামে থাকতে শুরু করে, পাশাপাশি তাকে যাতে কেউ চিনতে না পারে তার জন্য নিজের পোশাক পরিচ্ছদ, চুলের ধরণ সবকিছু বদলে ফেলে। মায়াগ্রামে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টটেটিভ প্রকাশ ঘোষাল ওরফে পেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। পরবর্তী সময়ে এই পেলেই তার সহকারী হয়ে ওঠে। নেশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর বাড়ি ফিরে এসে দিঠি জানতে পারে তার বর পথিক কয়েকদিন ধরে বেপাত্তা। দিঠি পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর নিজেই পথিককে খুঁজতে শুরু করে। তার খোঁজ থেকে সে নিজের অজান্তেই শিশুবিক্রি চক্রের অনুসন্ধানে জড়িয়ে যায়।

দিঠির বর পথিক একটি ক্লিনিকে বাচ্চা ডেলিভারি করতে গিয়েছিল। সেখানে সে বাচ্চা বিক্রি সংক্রান্ত বিষয় জেনে ফেলায় তাকে আটকে রাখা হয়। তারপর তাকে হত্যা করে মায়াগ্রামে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে দিয়ে তার ওপর বেদি বানিয়ে দেওয়া হয়।

এই গল্পের মূল অপরাধী মায়াগ্রামের গুরুজি নিজেও ডাক্তার ছিলেন। তিনি সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম বুঝতে পারার পরে তিনি বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করে নিঃসন্তান

দম্পতিদের মধ্যে বাচ্চা দত্তক নেওয়ার চাহিদার কথা জানতে পারেন। তারপর আস্তে আস্তে তিনি বাচ্চা বিক্রির চক্র তৈরি করে ফেলেন। বিদেশীদের কাছ থেকে চড়া দাম নিয়ে বাচ্চা দত্তক দেওয়ার ব্যাবসা শুরু করেন। অন্যদিকে মায়াগ্রাম মাদকমুক্তি সেন্টার চালাতে থাকেন, মূলত সেখান থেকেই বিদেশী দম্পতিদের হাতে বাচ্চা তুলে দেওয়া হত। এখানে গুরুজি সেজে তিনি পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি বজায় রাখতেন। আসলে তিনি ছোট থেকেই মানসিক ভাবে অসুস্থ। 'কর্কটক্রান্তি'র অপরাধী যেমন হত্যা করার পর নিজে কষ্ট পায়, নিজেকেও শারীরিক কষ্ট দিয়ে পাপ লাঘব করার চেষ্টা করে, এই কাহিনির গুরুজি একেবারেই তার উল্টো। তিনি হত্যা করে আনন্দ পান। আলোর বরকে, আলোকে, পথিককে হত্যা করার পর তিনি তৃপ্তি পান। জ্যন্ত কবর দেওয়ার পর মাটিতে কান পেতে গোঙানির শব্দ শুনলে তাঁর স্বর্গীয় অনুভূতি হয়।

এখানে পুলিশ ইনস্পেক্টর ঋতম হাজরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দিঠি ও তার সহকারী পেলে মিলে পুরো চক্রের সন্ধান পেলেও শেষ পর্যন্ত গুরুজি তাদেরকে জ্যান্ত কবর দেন। তখন ঋতম সেখানে উপস্থিত হয়ে গুরুজিকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি দুজনকে উদ্ধার করে তাদের প্রাণ বাঁচান।

'স্নেহজাল' উপন্যাসটি মূলত প্রতিশোধের কাহিনি। কাহিনিতে বীভৎস রসের অত্যাধিক ব্যাবহার লক্ষ করা যায়। প্রতিটি খুনের ধরণ খুবই বীভৎস। নিউট্রিশনিস্ট নম্রতা সাহার মুখে টেপ বেঁধে পেটের চামড়া কেটে সেখানে ফুটন্ত অলিভ অয়েল ঢেলে দেওয়া হয়, জিম ইন্সট্রাক্টর গোপালের পেটে ম্যাসাজ অয়েল, জাঙ্কফুড প্রস্তুতকারক মল্লিনাথের পেটে পটেটো চিপস ঢেলে দেওয়া হয়। আর বেরিয়াট্রিক সার্জেন তিলক ভট্টাচার্যের জন্য খুনি সার্জিকাল কটারি ব্যবহার করে।

রায়া একটা সময় চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী ছিলেন। একটি সিনেমার জন্য তাঁকে ওজন বাড়াতে হয়। প্রডিউসার মল্লিনাথ তাঁকে জাঙ্কফুড সরবরাহ করতে থাকে। কিন্তু একশ দশ কিলো ওজন হওয়ার পর সেই সিনেমা থেকে তিনি বাদ পড়েন। রায়া ওজন কমানোর জন্য প্রথমে নম্রতার কাছে যান। তারপর শুধু ডায়েট কন্ট্রোল করে হবেনা বলে জিমে যেতে শুরু করেন, সেখান জিম ইন্সট্রাক্টর গোপাল তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করতে চায়। রায়া তাতে সম্মত হয়না। গোপাল তাঁকে দিয়ে ভুলভাল এক্সারসাইজ করাতে থাকে এর ফল স্বরূপ তাঁর ডিস্ক প্রল্যাপ্স হয়, যে কারণে তিনি আর কখনও ব্যায়াম করতে পারবেন না। এরপর বেরিয়াক সার্জারি করার জন্য তিলক ভট্টাচার্জের কাছে যান। আড়াই

লাখ টাকার প্যাকেজ বলার পর সতের লাখ টাকার বিল হয়। তা মেটাতে গিয়ে রায়া প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি প্রতিশোধ নিতে শুরু করেন।

এখানে গোয়েন্দার ভূমিকায় ফরেনসিক সাইকায়াট্রিস্ট মোহর চ্যাটার্জিকে দেখতে পাওয়া যায়। পুলিশ অফিসার চিনার মিত্র এই সিরিয়াল কিলিংয়ের তদন্তে সাহায্য চেয়ে মোহরকে ডেকে পাঠায়। হত্যাকারীর মেন্টাল ম্যাপিং করার জন্য তাকে ডাকা হয়। মোহরের বাবা মনোচিকিৎসক আর মা মনোবিদ। তবে এঁরা তার জন্মদাতা বাবা মা নয়, এঁরা তাকে দত্তক নিয়েছিলেন। মোহর তার জন্মদাতা বাবা মায়ের খোঁজ করতে থাকে তবে সঠিক কোনও তথ্য পায়না। কিন্তু তার মা দিয়া ওরফে দয়াময়ী তার মেয়ের খোঁজ পায়, তার সঙ্গে সময় কাটায় কিন্তু তাকে বুঝতে দেয়না যে সে তার মা।

দিয়া যখন ছোট তখন তার বাবার বন্ধু তপন চৌধুরী ও নবীন রাঠি তাকে ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে। তার ফল স্বরূপ বারো বছর বয়সে দিয়া মোহরকে জন্ম দেয়। শহরে যখন এইসব খুনের ঘটনা চলছে তখন দিয়া এই দুজন অপরাধীকে হত্যা করে ও ববিটাইজেশন করে। দিয়া ভাবে শহরে যে সিরিয়াল কিলিংয়ের ঘটনা ঘটে চলেছে তার হত্যাকে তদন্তকারীরা ওই ঘটনার বাইরের বিষয় বলে বুঝতে পারবে না। কিন্তু কাহিনির শেষে দেখা যায় এই দুটো ঘটনার পার্থক্য মোহর বুঝতে পেরেছে ও সে আবার কলকাতায় ফিরে আসছে।

এখানে দুই হত্যাকারি নারীই প্রতিশোধের জন্য হত্যা করেছে। দিয়া হত্যা করলেও তা শুধুমাত্র প্রতিশোধের স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু রায়া হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মানসিক রোগীতে পর্যবসিত হয়েছে।

ইন্দ্রনীল সান্যালের কাহিনিগুলিতে গোয়েন্দার ভূমিকায় যে মহিলা ডাক্তার চরিত্র রয়েছে গোয়েন্দাগিরি তাদের কারোর নেশা নয়। মোহর নিজস্ব পেশার খাতিরে রহস্যের জালে জড়িয়ে যেতে থাকে। দিঠি বরকে খুঁজতে গিয়ে রহস্যের জালে জড়িয়ে যায়। আর দীপশিখা প্রথম কাহিনিতে নিজে খুন হয়ে যেতে পারে --- এই ভয় থেকে অনুসন্ধান শুরু করে। শুধুমাত্র 'ময়না তদন্ত' উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় বরুণ দীপশিখাকে অনুসন্ধানের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এখানে তার ব্যাক্তিগত জীবন কোনও ভাবে সংপৃক্ত নয়। সচরাচর আমরা মেয়ে গোয়েন্দাদের খুব স্বচ্ছ ভাবমূর্তি দেখতে অভ্যস্ত। লেখক ইন্দ্রনীল সান্যাল সেই ধারনায় চিড় ধরান। 'ময়না তদন্ত' উপন্যাসে দেখা যায়, দীপশিখা ড্রাগ আসক্ত হয়ে পড়েছিল, সেটা থেকে সে নিজেকে বের করে এনেছি। কিন্তু অত্যন্ত মানসিক চাপে পড়লে

সে আবার সেই ড্রাগের শরণাপন্ন হচ্ছে। ‘পণ্যভূমি’ উপন্যাসের গোয়েন্দা দিঠি মাদকাসক্ত ছিল, মদের নেশা ছাড়ার জন্য তাকে অ্যাসাইলামে থাকতে হয়। বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের মেয়ে গোয়েন্দাদের এর আগে দেখা যায়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়ে গোয়েন্দারা অত্যন্ত সুন্দরী, সর্বকর্ম নিপুণা, খুব স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নিয়ে হাজির হয়েছে, তাদের ব্যাক্তিগত জীবনে কোনও অন্ধকার দিক নেই। কিন্তু ইন্দ্রনীল সান্যাল তাঁর মেয়ে গোয়েন্দাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে পাঠকের সামনে এনে হাজির করেছেন।

❖ নন্দিনী নাগ

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে নন্দিনী নাগের জন্ম, বর্তমানে তিনি কলকাতার বাসিন্দা। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করার পর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত ভাবে তিনি একজন শিক্ষিকা। তাঁর প্রথম গ্রন্থ ‘অবিশ্বাসীর ঈশ্বর সন্ধান’-এর জন্য তিনি ২০১৭ সালে বাংলা আকাদেমি পুরস্কার পান। সাহিত্য জগতে আসার অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন। বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে লেখেন ‘অনন্ত সন্ধান জীবন অফুরান’। কাশ্মীরের ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে ‘ভিন্ন ভূস্বর্গ’ উপন্যাস লিখেছেন। এছাড়া ‘উড়ান’, ‘সোলমেট’ উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। শিশুদের জন্য কল্পবিজ্ঞান নির্ভর উপন্যাস ‘গোপীবল্লভপুরের গুপ্তরহস্য’ উপন্যাসও একটি ভিন্নধারার রচনা।

লেখিকা নন্দিনী নাগের নির্মিত গোয়েন্দা চরিত্রের নাম তিস্তা দত্ত । তাঁর প্রথম গোয়েন্দা কাহিনির বই ‘হত্যার পরিমিতি’ ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত তাঁর তিনটি গোয়েন্দা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। ‘হত্যার পরিমিতি’ গ্রন্থে দুটি কাহিনি রয়েছে – ‘ভালোবাসার পাসওয়ার্ড’ ও ‘হত্যার পরিমিতি’। ২০২১ সালে প্রকাশিত হয় ‘ডুয়ার্সে ডামাডোল’। এই তিনটি কাহিনিই গোয়েন্দা তিস্তার রহস্য উদ্ঘাটনের কাহিনি। তিস্তা একটি প্রকাশনা সংস্থায় চাকরি করে। প্রথম কাহিনিতে সে সাংবাদিক, তৃতীয় কাহিনিতে তাকে সহ-সম্পাদক পদে থাকতে দেখা যায়। তৃতীয় কাহিনিতে দেখা যায় তার বয়স বত্রিশ বছর। তার বর অর্ক ক্রিমিনাল ল’ইয়ার। এছাড়াও কাহিনিগুলোতে আরেকটি চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, সে হল রাজীব। রাজীব তিস্তার সহকর্মী ও নিকট বন্ধু। তিস্তার দুটি কাহিনিতে অর্ক ও রাজীবকে সহকারীর ভূমিকায় পাওয়া যায়। এর আগে বাংলা সাহিত্যে দীপকাকু ও ঝিনুকের মতো পুরুষ গোয়েন্দা ও মেয়ে সহকারীর ছবি পাওয়া গেছে।

মিতিন, গার্গীদের মতো মেয়ে গোয়েন্দাদের ক্ষেত্রে টুপুর, সোনালিচাঁপার মতো মেয়ে সহকারীদের পাওয়া গেছে। 'জোনাথনের বাড়ির ভূত' কাহিনিতে মিতিনের কথা মত পার্থ জোনাথনের বাড়িতে গিয়ে লাইকোপডিয়াম ছড়িয়ে আসলেও মিতিনের আসল অ্যাসিস্টট্যান্ট পার্থ নয় টুপুর। কিন্তু তিস্তার কাহিনিগুলোতে অর্ক ও রাজীবই তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে উঠেছে।

'ভালোবাসার পাসওয়ার্ড' কাহিনিটি পড়ে মনে হয় এটাই তিস্তার প্রথম গোয়েন্দাগিরি। সাংবাদিক হওয়ার সুবাদে লেখিকা মালবী বসুর সঙ্গে তার ব্যাক্তিগত পরিচয় ছিল। সেই মালবী বসুর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে যখন পুলিশ কেস ক্লোজ করে দিতে চায়, তখন তিস্তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনুসন্ধান শুরু করে। এক্ষেত্রে সে মালবী বসুর মেয়ে অর্ণবী তার পাশে এসে দাঁড়ায়। অর্ণবীর বন্ধু টুম্পা তিস্তার ভাইঝি, সেই কারণে অর্ণবী তাকে ভরসা করে। এই কাহিনিতে অর্ক বা রাজীবের সাহায্যের প্রয়োজন হয়না। এই কাহিনির ভিক্টিম ও অপরাধী দুজনেই মেয়ে। মালবী বসু খুব জনপ্রিয় লেখিকা, তার হত্যাকারী আইভি মেয়েটি মেয়েদের সাহায্যের জন্য তৈরি 'সাথী' নামের একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে। নিজের কাজের ব্যাপারে খুব মনোযোগী, কয়েকটি মেয়ের পাচার আটকেছে, কয়েকটি কমবয়সি মেয়ের বিয়ে আটকেছে। এই আইভিই আবার একজন লেখিকাকে স্প্রাইটের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ সিডেটিভ মিশিয়ে খুন করেছে। খুন করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঘরে এসি চলছে বলে তাঁর গায়ে কম্বলও টেনে দিয়ে এসেছে।

কাহিনিটিতে সোশ্যাল মিডিয়া একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। সংকেত চ্যাটার্জি নামের একটি ছেলে মালবী বসুর লেখার ভক্ত, মালবী বসুকে রোজ মেসেজ করত। সে অবসাদে ভুগছিল বলে মালবীও তার মেসেজের রিপ্লাই দিতেন। পুষ্পা সাহা নামের একটি একাউন্ট থেকে তাঁর কাছে মেসেজ আসে, সে দাবি করে সে সংকেতের প্রেমিকা, মালবী বসু যেন তার সঙ্গে কথোপকথন বন্ধ করে দেন। পুষ্পা নামের ফেক প্রোফাইল বানানো মেয়েটির আসল নাম আইভি। সে জানায়, সংকেত পূজা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে তাকে গর্ভবতী অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে তার জীবন নষ্ট করেছে। তারপর তার সঙ্গেও প্রেমের অভিনয় করে তার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। তারপরও সে ফেসবুকে বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করে। সংকেত তাকে তার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড দিয়েছিল, তাই সে দেখতে পায় সংকেত কার সঙ্গে মেসেজে কী কথা বলছে। সে যে মেয়েকেই ফাঁসানোর চেষ্টা করে আইভি তাকে সংকেতের ব্যাপারে সাবধান করে দেয়। মালবী বসুকেও তার সঙ্গে মেসেজে কথা বলতে বারবার বারণ করেছিল, কিন্তু তিনি

তাতে পাত্তা দেননি। তাই সে মালবী বসুকে হত্যা করেছে। যদিও মালবী বসুর সঙ্গে সংকেতের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠছিল না। কিন্তু আইভির বক্তব্য অনুযায়ী সে মালবী বসুর কাছে শেল্টার পাচ্ছিল। তাই সে তাঁকে হত্যা করেছে :

> "ম্যাডামের কাছে ও মানসিক ভাবে শেল্টার পাচ্ছিল, আমি ওকে ছেড়ে চলে আসায় যে কষ্ট পাচ্ছে সেই কষ্টে প্রলেপ পড়ছিল ম্যাডামের কথা শুনে। কিন্তু তা তো হতে দিতে পারি না আমি ! ওকে জ্বলতে হবে ! যেমন আমি জ্বলেছি, পূজা জ্বলেছে, সংকেতকেও জ্বলতে হবে। কোথাও আশ্রয় পেতে দেব না ওকে। ম্যাডামেকে অনেকবার বলেছিলাম সংকেতকে আনফ্রেন্ড করে দিতে। শুনলেন না আমার কথাটা তাই চলে যেতে হল।"[১২]

এখানে আইভির বক্তব্য থেকে বোঝা যায় সে মানসিক ভাবে অসুস্থ।

'হত্যার পরিমিতি'তে সাংবাদিক তন্ময়ের খুনের রহস্যভেদ করার চেষ্টা শুরু করে। আর তা করতে গিয়ে শুধু তন্ময় নয় তার সঙ্গে তার বন্ধু সৌরভের মৃত্যুর রহস্যও উদ্ঘাটিত হয়। পাশাপাশি বহুকাল আগের একটি খুন ও একটি আত্মহত্যার কারণ জানা যায়। তন্ময় একসময়ে তিস্তার সংবাদপত্রের প্রিন্টিং মিডিয়া হাউসে চাকরি করত, পরে একটা নিউজ চ্যানেলের রিপোর্টার হিসেবে যোগ দেয়। গাদিয়ারার একটি হোটেল থেকে তার মৃত দেহ উদ্ধারের হয়, প্রথমে জানা যায় হার্ট অ্যাটাকের কারণে মৃত্যু হয়েছে। ময়না তদন্তে তার শরীরে কোবরার বিষ পাওয়া যায়।

এই কাহিনির বুনন অত্যন্ত দৃঢ়সংবদ্ধ। হত্যাকারী মিমি চরিত্রটিকে লেখিকা খুব নিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন। কাহিনিতে ঘটে যাওয়া যাবতীয় মৃত্যুর পিছনে আসলে একটি রোগ দায়ি। রোগটির নাম 'কাইমেরিজম'। তিস্তা জানায় --- "কাইমেরিজম' বলতে বোঝায় মানুষের কোনও একটা অঙ্গের কোষগুলো যদি দুই বা তার বেশি জাইগোট থেকে আসে সেই অবস্থাটাকে।"[১৩]

মিমি তার অজ্ঞতার কারণে নিজেকে অভিশপ্ত বলে মনে করে। তিস্তা তাকে তার রোগের বিষয়ে জানায় ---

> "তোমার মায়ের গর্ভে দুটো ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়েছিল, যার একটা থেকে তুমি হয়েছ, আর একটা থেকে তোমার যমজ ভাই বা বোন হতে পারত। কিন্তু প্রকৃতির আজব খেয়ালে সেটা না হয়ে, সেই নিষিক্ত ডিম্বাণু তোমার শরীরে রয়ে গেছে। তাই তোমার শরীরে দুজন আলাদা

মানুষের জিন রয়ে গেছে, সেই জন্য তোমার চামড়াতে এই রঙের বিভাজন, দুই চোখের মণির রঙও আলাদা।[১৪]

মলয় ও রীমার সন্তান মিমি। রীমা একটি ব্যাঙ্কে চাকরি করত, মলয় কোর্টে মুহুরির চাকরি করত, তার বেশির ভাগ টাকা নেশায় উড়িয়ে দিত। বসের সঙ্গে রীমার সম্পর্ক আছে এই সন্দেহের কারণে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্য রীমাকে বারবার চাপ দিত। তারপর একদিন মিমির ডিএনএ রিপোর্ট পেয়ে দেখে সে তার সন্তান নয়। এই আক্রোশ থেকে রীমাকে হত্যা করে, তারপর নিজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। মিমি তখন খুবই ছোট। তারপর সে খ্রিস্টান হয়ে যায়, কৃষ্ণনগরের একটি মিশনারি স্কুল থেকে পড়াশুনো করে। এরপর আস্তে আস্তে দেহব্যাবসায় জড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নেতা রাজেশ পোদ্দার মিমির ক্লায়েন্ট ছিল। তাকে নিয়ে স্টোরি করার জন্য তন্ময় মিমিকে ফাঁদ হিসেবে ব্যাবহার করতে চায়। সে মিমিকে অনেকটা টাকার বিনিময়ে গাদিয়ারার হোটেলে নিয়ে আসে, সেখানে রাজেশ পোদ্দারকে ডেকে এনে বিভিন্ন ভিডিও তুলে সেগুলো তার চ্যানেলে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মিমিকে দেখে তন্ময় আন্দাজ করেছিল সে তার বন্ধু সৌভিকের প্রেমিকা। সে কথা তার কাছে জানতে চাইলে মিমি সাবধান হয়ে যায়। তন্ময়ের পানিয়ের মধ্যে মাদক মিশিয়ে দেয়। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেলে তার শরীরে সাপের বিষ ইঞ্জেক্ট করে।

তন্ময়কে খুন করাটাই মিমির প্রথম খুন নয়। আসলে সৌভিকের খুনের ঘটনা চাপা দেওয়ার জন্য মিমি তার বন্ধু তন্ময়কে হত্যা করে। বাবা মা মারা যাওয়ার পর মিমি খ্রিস্টান মিশনারিতে পড়াশুনো করে, সে ধর্মান্তরিত হয়। সে খ্রিস্টান হওয়ার জন্য প্রেমিক সৌভিকের বাড়ি থেকে প্রথমে আপত্তি ছিল। তারপর যখন সৌভিকের বাড়ি থেকে মেনে নেয়, দুজনে রাতে একটি বাগান বাড়িতে থাকতে যায়। সেখানে সৌভিক যখন মিমির আসল ত্বক দেখে তখন টাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। মিমি সেই অপমান সহ্য না করতে পেরে রান্নাঘর থেকে হামানদিস্তা এনে ওর মাথায় বারবার আঘাত করতে থাকে। তারপর যখন মিমির রাগ কমে তখন সৌভিক মারা গেছে। মিমি তার বন্ধু সুতপাকে ডাকে, দুজনে মিলে বাড়ির পিছনের কুয়োর মধ্যে মৃতদেহ ফেলে দেয়।

আসলে কাইমেরিজম নামক রোগের কারণে এই কাহিনিতে তিনটি হত্যা হয়। মলয় মিমির সঙ্গে তার ডিএনএ মেলেনি বলে মিমি আসলে অন্য পুরুষের সন্তান সন্দেহ করে স্ত্রী রীমাকে হত্যা করে। সৌভিক মিমির গায়ের রঙ দেখে মেনে নিতে না পারায় মিমি

সৌভিককে হত্যা করে। আর সৌভিকের হত্যা রহস্য যাতে ফাঁস না হয়ে যায় সেই কারণে মিমি তন্ময়কেও হত্যা করে।

রহস্য কাহিনিতে 'হানি ট্র্যাপ' একটি অতি ব্যবহৃত বিষয়। তবে এই কাহিনিতে তার ব্যবহার খানিকটা অন্য রকম। সচারাচর পুরুষ অপরাধীদের ধরার জন্য একটি মেয়েকে টোপ হিসেবে ব্যাবহার করা হয়। যেমন তন্ময় রাজেশ পোদ্দারের চরিত্র ফাঁস করে দেওয়ার জন্য মিমিকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু এখানে দেখা যায় তিস্তা তার বন্ধু রাজীবকে সুজাতার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে বিভিন্ন খবর আদায় করতে পাঠায়। আবার অর্ককে মিমির ক্লায়েন্ট সেজে অভিনয় করে তাকে নির্দিষ্ট ঘরে টেনে আনার নির্দেশ দেয়। এই দুই ক্ষেত্রেই একটি নারীর নির্দেশে দুই পুরুষকে টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

'ডুয়ার্সে ডামাডোল' কাহিনিতে তিস্তা ও তার বর অর্ক দুজনের পরিবার মিলে উত্তরবঙ্গে বেড়াতে যায়। সেখানে 'চিলাপাতা নেচার ক্যাম্প'-এর মালিক কার্তিক রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। কিছুদিন পর অফিসের রজত দা তিস্তাকে জানায় কার্তিক রায় খুন হয়েছেন। তিস্তা অনুসন্ধান করতে চিলাপাতায় যায়। এই খুনের অনুসন্ধান করতে গিয়ে কাঠের বেআইনি চোরা চালান দলের সন্ধান পায়। কার্তিক রায় একদিকে পুলিশের কাছে চোরা চালানের খবর পৌঁছে দিয়ে সরকারি সাহায্য পেতে থাকে, অন্যদিকে মাঝে মাঝে চোরা চালানকারিদের কাছে পুলিশের খবর পৌঁছে দিয়ে তাদের সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো রাখে। কার্তিক রায়কে হত্যা করার মোটিফ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিস্তা বুঝতে পারে অনেক মানুষই তাকে হত্যা করতে পারে। কার্তিক রায়ের হত্যার পদ্ধতির দিকে তাকালে দেখা যায় -- কার্তিক রায়ের ফেরার পথে একটি তার বেঁধে রাখা হয়েছিল, জামাকাপড় মেলার জন্য যে তার ব্যাবহার করা হয় তেমন তার রাস্তার এপার থেকে ওপারের বেঁধে দেওয়া হয়। কার্তিক রায় স্কুটিতে বসলে তার গলা যেমন জায়গায় থাকবে ঠিক তেমন উচ্চতায় তার বাঁধা হয়। কার্তিক রায় ঐ তারের কারণে স্কুটি থেকে পড়ে যান। ময়না তদন্তে হেড ইনজুরি, ইন্ট্রা সেরিব্রাল হেমারেজ হয়, সারভাইকাল ভার্টিকাল ফ্র্যাকচার, গলায় কাট মার্ক, মাল্টিপল সফট টিস্যু ইনজুরি আর সারভাইকাল ভার্টিব্রা প্রোল্যাপ্স পাওয়া গেছে । এই হত্যার ধরণটি ২০১৩ সালে মুক্তি পাওয়া 'প্রলয়' চলচ্চিত্র থেকে নেওয়া বলে মনে হয়। যদিও সেখানে তামার তারে লেগে ধড় ও মুণ্ড আলাদা হয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখা যায়, এখানে তারের ধরণে লেখিকা খানিকটা পরিবর্তন এনেছেন। কিন্তু বাকি খুনের পদ্ধতি প্রায় একই।

ব্যবসায়ী শ্যামসুন্দর আগরওয়াল কাঠের ব্যবসার পিছনে কাঠ ও বন্য পশুদের বিভিন্ন অঙ্গ চালানের কারবার চালাতেন। কার্তিক তাঁর মাল পাচার করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেয়, অন্যদিকে পুলিশকে খবর দিয়ে দেয়। এর ফলে শ্যামসুন্দরের এই কারবারের দালাল বিষ্ণু নার্জিনারী গণ্ডারের খড়্গ ও হাতির দাঁত সমেত ধরা পড়ে যায়। সেই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই সাত বছর পর বিষ্ণু জেল থেকে ফিরে এসে কার্তিককে হত্যা করে।

তৃতীয় কাহিনিতে গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি অ্যাডভেঞ্চারের চিত্রও ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি তিস্তা যে বুদ্ধির জোরে অপরাধীকে ঘায়েল করার পাশাপাশি শারীরিক ভাবেও অপরাধীর মোকাবিলা করতে সক্ষম সেকথাও লেখিকা জানিয়ে দিয়েছেন --- "...... তিস্তা নিজের হাতদুটো দিয়ে জাপটে ধরল মানুষটিকে আর তারপর সামান্য পিছন দিকে ঝুঁকে সর্বশক্তি দিয়ে ওই মানুষটাকে কোমর থেকে তুলে ধরে আছড়ে ফেলল মাটিতে। ... সেল্ফ ডিফেন্সের প্যাঁচে তাকে পেড়ে ফেলতে তিস্তার তাই খুব বেশি কষ্ট হয়নি।"[১৫]

এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত কাহিনিগুলোর দিকে তাকালে তিস্তাকে মেয়ে হিসেবে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য সমালোচনার মুখে পড়তে হয়নি। গার্গীর মতো সেও পেশাগত ভাবে সম্মানীয় পদে থাকার জন্য কেউ তাকে হেয় করতে পারেনি। তবে শখের গোয়েন্দাগিরি করার জন্য সামান্য কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে। ইনস্পেক্টর রজত মিত্র যখন মালবী বসুর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে কেস ক্লোজ করে দিতে চাইছেন, তখন তিস্তা এটাকে হত্যা বলায় তিনি উপহাস করেন --- "বলেন কী হে ? আমি এত বছর পুলিশের কাজ করে কিছু বুঝতে পারলাম না, আর আপনি দুদিন সাংবাদিকগিরি করে বুঝে গেলেন এটা মার্ডার ?"[১৬]

আবার এই কেস সল্ভ করে ফেলার পর রজত মিত্র তাকে গোয়েন্দা হওয়ার উপযোগী বলে মনে করেন। নিজেই বিভিন্ন কেসের খবর জানান। 'ডুয়ার্সে ডামাডোল'-এর কেসের বিষয়ে তিনিই তিস্তাকে জানান। মিতিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তিস্তার কোনও মিল না থাকলেও মিতিনের নির্মাণ কৌশলের খানিকটা প্রভাব তিস্তার কাহিনিগুলোর মধ্যে দেখা যায়। মিতিনের কাহিনির অনিশ্চয় মজুমদারের মতো এখানেও ইনস্পেক্টর রজত মিত্র তিস্তার পুলিশ বন্ধু হয়ে উঠেছে। পার্থ যেমন বউয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, অর্ককেও তেমনটা করতে দেখা যায় -- "বাহ ! তুমি তো দেখছি এক্কেবারে শার্লক হোমসের মহিলা সংস্করণ !"[১৭]

তবে তিস্তা গোয়েন্দাগিরি করতে ভালোবাসলেও তার মধ্যে অন্যান্য গোয়েন্দাদের মতো অদম্য জেদ দেখা যায়না। সে খুব সহজেই বলতে পারে ---“তেমন বুঝলে হাত তুলে দিয়ে ফিরে আসব। আমাকে তো আর কেউ মাথায় বন্দুক ধরে খুনের কিনারা করতে বলছে না ! আর আমার প্রফেশনও নয় যে কেস না সল্ভ করে ফিরে এলে মানসম্মান নিয়ে টানাটানি পড়বে, সুতরাং ভয় পেও না।”[১৮]

এখানেই অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাদের থেকে তিস্তা বেশ খানিকটা আলাদা হয়ে যায়।

❖ পারমিতা ঘোষ মজুমদার

লেখিকা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি নিয়ে স্নাতকোত্তর হন, বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় সরাকারের আধিকারিক। ‘আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪১৯’-এ (২০১৩) পারমিতা ঘোষ মজুমদারের ‘রাবংলা সম্ভব’ উপন্যাসে গোয়েন্দা রঞ্জাবতীকে খুঁজে পাওয়া যায়। সে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনো করার পর কিছুদিন সংবাদ পত্রে চাকরি করে। তারপর ‘ট্রুথ সিকার্স’ নামের এজেন্সি বানিয়ে গোয়েন্দাগিরি শুরু করে। তার সঙ্গী লাজবন্তী এখানে ব্যোমকেশ কাহিনির অজিতের মতোই তার গোয়েন্দাগিরির কাহিনি লেখে। তাদের অ্যাডভেঞ্চারের আরেক সদস্য হল লাজবন্তীর ছেলে পোগো ওরফে বীতশোক গঙ্গোপাধ্যায়, যে তাকে ‘গ্যাঞ্জাম’ বলে ডাকে। এই তিনজন সিকিমে ঘুরতে গিয়ে একটি রহস্যের জালে ঢুকে পড়ে। তাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে এক হোটেলে ওঠা মানুষদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে রাখতে বিভিন্ন সন্দেহজনক ঘটনা রঞ্জাবতীর চোখে পড়ে। একটি প্রাচীন বৌদ্ধপুঁথি, যা মিত্র পরিবারের হাতে ছিল অনেকদিন, তা পৃথিবীর সামনে আনার জন্য প্রাণগোপাল তার যমজ ভাই বৌদ্ধ ভিক্ষু বাল গোপালের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর পুরনো বন্ধু তিতাস রায় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পিছু নেন। এক সময়ে দুজনে আলাদা আলাদা জায়গায় গবেষণা করলেও তিতাস যখন একটি ওষুধ আবিষ্কারের দোরগোড়ায় তখন একটি আন্তর্জাতিক জার্নালে ঐ একই বিষয় নিয়ে প্রাণগোপালের একটি পেপার প্রকাশ পায়। ফলে তিতাসের গবেষণা অর্থহীন হয়ে যায়। এক সময়ে দুই বন্ধু বেড়াতে যায়, তিতাস একটি পাখির ছবি তোলার সময় প্রাণ গোপাল সেটা তাড়িয়ে দেয়। কিছুদিই পর ‘বার্ড এন্সাইক্লপেডিয়া’য় প্রাণগোপালের তোলা ঐ পাখির ছবি প্রকাশিত হয়। অনেক বছর পর তিতাস যখন জানতে পারে বৌদ্ধপুঁথিটি প্রাণগোপাল ভাই বালগোপালের হাত দিয়ে সবার সামনে নিয়ে আসতে চাইছে, তখন তিতাস কিয়োটোর রিসার্চ সেন্টারে যোগাযোগ করে জানায় পুঁথিটি সে-ই সেখানে দেবে। অতীতের বিদ্বেষ আর বর্তমানের

নামযশের এই লোভ থেকে তিতাস প্রাণগোপালকে হত্যা করে। কাহিনিতি সুখপাঠ্য, তবে কিছু কিছু জায়গায় টেকনোলজির ব্যবহার যেন কৃত্রিম ভাবে আরোপ করা হয়েছে বলে মনে হয়। 'আনন্দমালা পূজাবার্ষিকী ১৪২৩'-এ (২০১৭) দেখা যায় পারমিতা ঘোষ মজুমদারের লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তবে এখানে আর গোয়েন্দা রঞ্জাবতীর কাহিনি নেই। লেখিকা স্কুল পড়ুয়া পোগো চক্কতির ও তার বন্ধুদের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি লিখেছেন। রঞ্জাবতীকে নিয়ে তাঁর লেখা সম্ভবত আর প্রকাশিত হয়নি।

❖ শাশ্বতী সেনগুপ্ত

১৯৭৪ সালে বরানগরে শাশ্বতী সেনগুপ্তের জন্ম হয়। রাজকুমারী মেমোরিয়াল হাইস্কুলের গণ্ডি পার করে রবীন্দ্রভারতী থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। 'নেপাল রহস্য' উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের নানা তথ্য উঠে এসছে, বিশেষত বৌদ্ধপুঁথি নিয়ে লেখিকা অনেক তথ্য উপস্থাপন করেছেন। আসলে কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র মৈত্রী রায় 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেছে, তাই খুব সাবলীল ভাবে এই বিষটি কাহিনির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। উপন্যাসটি উত্তমপুরুষ কথনরীতিতে লিখিত। তবে কাহিনির মধ্যে মৈত্রী নামের উল্লেখ রয়েছে। মৈত্রী নেপাল নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে ঘুরে এসে ডক্টর বণিকের বাড়িতেই 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' এর দ্বিতীয় খণ্ড উদ্ধার করে। কাহিনিটিকে ঠিক গোয়েন্দা কাহিনি বলা যায়না, মূলত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। তবে কাহিনির অনুসন্ধানের মধ্যে বেশ গোয়েন্দাগিরির ভাব খুঁজে পাওয়া যায়। যে পুঁথির খোঁজে মৈত্রী নেপাল ভ্রমণ করে আসে, সেখানে বইটি না পেলেও কলকাতায় ফিরে এসে নিজের গাইডের বাড়িতে সে সেটি খুঁজে বের করে।

❖ মেয়ে গোয়েন্দাদের গল্প

২০১৬ সালে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'নিউ স্ক্রিপ্ট' প্রকাশনা থেকে 'মেয়েরা যখন গোয়েন্দা' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ১৭টি বাংলা গোয়েন্দা গল্প ও একটি অনুবাদ গল্প রয়েছে। যদিও এই আঠারটি গল্পের মধ্যে সবগুলোকে গোয়েন্দা কাহিনি বলা চলেনা। আবার গোয়েন্দা কাহিনি হলেও সেখানে উপস্থিত কোনও মেয়ে চরিত্র গোয়েন্দাগিরি করেনি এমন গল্পও এখানে সঙ্কলিত হয়েছে। সহ সম্পাদক গ্রন্থের প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছেন এটি কম বয়সীদের জন্য বানানো বলে এখানে পরিণত পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখা কিছু গল্পকে রাখা যায়নি। তাই বলা বাহুল্য এখানকার সব কাহিনিই মূলত শিশু ও কিশোর পাঠ্য।

এই সংকলন গ্রন্থে যে কাহিনিগুলি রয়েছে, সেগুলি হল ---

১। বিন্দিপিসির গোয়েন্দাগিরি	সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
২। ইন্দুমতীর সঙ্কট	সুকুমার সেন
৩। হীরের টুকরো	গজেন্দ্র মিত্র
৪। গল্পই কি অল্প	আশাপূর্ণা দেবী
৫। ডিটেকটিভ নন্দিনী সোম ও দানুমামা	অজিতকৃষ্ণ বসু
৬। সিমলার মামলা	নলিনী দাশ
৭। সেভেন পার্লস	মঞ্জিল সেন
৮। বাচ্চাটা এতো কাঁদছিল কেন	পবিত্র সরকার
৯। বিষহরির প্রসাদ	নবনীতা দেব সেন
১০। উত্তরাধিকারী	শিবানী চৌধুরী
১১। বুনোহাঁসের খোঁজে	হীরেন চট্টোপাধ্যায়
১২। গার্গীর এ বি সি ডি রহস্য	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩। মারণ বাতাস	সুচিত্রা ভট্টাচার্য
১৪। আর ডি এক্স রহস্য	স্বাতী ভট্টাচার্য

১৫। দিয়ালা যখন গোয়েন্দা	রাজেশ বসু
১৬। রেনেট মুলারের পোর্ট্রেট	হীমাদ্রীশেখর দাশগুপ্ত
১৭। গিফট হ্যম্পার	আশিস কর্মকার

এর মধ্যে নলিনী দাশ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কাহিনি নিয়ে যেহেতু আগেই আলোচনা হয়েছে তাই এখানে এঁদের তিনটি কাহিনি নিয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

- **পেশাদার গোয়েন্দার গল্প**

এই সঙ্কলনের মধ্যে তিনটি গল্পে পেশাদার গোয়েন্দার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় --- ১। আর ডি এক্স রহস্য ২। রেনেট মুলারের পোর্ট্রেট ৩। গিফট হ্যাম্পার ।

স্বাতী ভট্টাচার্যের 'আর. ডি. এক্স রহস্য' গল্পের গোয়েন্দার নাম মেধাবিনী সেন, সে পেশাদার গোয়েন্দা। বিশ্বরূপ দত্ত তাঁর বাড়ির চাকর ধনেশ্বর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় তার কাছে হাজির হয়। গোটা গল্পের বুনন বেশ ভালো। মেধা অনুসন্ধান করে জানতে পারে কোনও অপরাধী গ্যাং ভুল করে ধনেশ্বরের হাতে সত্তর হাজার টাকা আর আর ডি এক্সের প্যাকেট দিয়ে গেছে। এখানে মেধাবিনীর সহকারী হিসেবে পকেটমার ভেটকি কাজ করে। একসময়ে মেধা একটি খুনের দায় থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল। তাছাড়াও সে পুলিশ অফিসার রঞ্জন চক্রবর্তীর সাহায্য পায়। সে অপরাধীদের ডেরায় গিয়ে সেখান থেকে ধনেশ্বরকে মুক্ত করে। পাশাপাশি আর ডি এক্স চক্রও ধরা পড়ে। মেধাকে বিশ্বরূপ ধন্যবাদ দিলে মেধা জানায় এসবের প্রয়োজন নেই। সে তার পারিশ্রমিক পেলেই খুশি।

হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্তের 'রেনেট মুলারের পোর্ট্রেট' গল্পে গোয়েন্দার ভূমিকায় রয়েছে কিটি বা ক্যাটরিনা সেন, তার তদন্ত সংস্থার নাম 'ক্যাটরিনা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি'। তার সহকারী টিনা। রবার্ট প্লেচার তার পূর্ব পুরুষের অর্জিত একটি ছবি চুরি হয়ে যাওয়ার কারণে কিটির কাছে আসে। ছবিটি হিটলারের আঁকা রেনেট মুলারের পোর্ট্রেট, তাতে হিটলারের সই আছে। রবার্ট কিটিকে পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে যায়। এই গল্পের কাহিনির সঙ্গে মিল না থাকলেও 'শজারুর কাঁটা'র মতো এখানেও একটি আড্ডার সদস্যদের মধ্যে অনেক সন্দেহ ভাজনের মধ্যে থেকে অপরাধীকে খুঁজে বের করাটাই গোয়েন্দার কাজ। অমিতাভ সান্যাল ছবিটি চুরির চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ভুয়ো সিম থেকে

রবার্টকে মেসেজ করেন, ছবি চুরি করার জন্য তাকে আঘাত করেন। কিন্তু আসল ছবি চুরি করতে পারেননা। তার আগেই রবার্ট আসল ছবি শেঙ্কেলকে বিক্রি করে দিয়েছিল। যেহেতু বিদেশীদের কাছে এভাবে জিনিস বিক্রি করা যায়না, তাই রবার্টও অপরাধী সাব্যস্ত হয়। গল্পটি বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। এখানে সবাইকে জেরা করে অসঙ্গতি বের করার প্রসঙ্গটি বেশ মনোগ্রাহী।

আশিস কর্মকারের 'গিফট হ্যাম্পার' গল্পে দেখা যায় --- "অদিতি সেন শখের গোয়েন্দা।... বলা ভালো খেয়ালি গোয়েন্দা। ...তবে পুলিশের কাছ থেকে যখনই সাহায্য চাওয়া হয় তখন সে খেয়াল-টেয়াল মনপ্রাণ ঢেলে দেয়।[১৯]

সে দু বছর আগে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছে। ছাত্রী জীবনে অ্যাথলিট ছিল। জিন্স আর শার্ট পরে সব সময়। স্কুটি চালিয়ে অনুসন্ধানে বের হয়। এখানে পুলিশ ইনস্পেক্টর অদিতির কাছে সাহায্য চায়। কলকাতায় কয়েকটি ডাকাতি হয়েছে, কিন্তু পুলিশ কোনও কিছু করতে পারছে না। তাই অদিতি অনুসন্ধানে নামে। মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানির নাম করে বিভিন্ন উপহার পাঠানো হচ্ছে, আর সেই উপহারের বাক্স খুলে উপহার ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে সই করে দিতে বলা হচ্ছে। বাক্সগুলির মধ্যে ক্লোরোফর্ম মাখানো কাপড় থাকছে, সেটা খুলতেই বাড়ির মালিক অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। আর এই সুযোগে তাঁর বাড়ি লুট করছে দুষ্কৃতিরা। অদতি প্রথমে লুট হওয়া বাড়িগুলো ঘুরে বুঝতে পারে, যাদের বাড়িতে এমনটা হয়েছে তাঁরা আসলে একা থাকেন। অদিতি ফাঁদ পাতে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, একাকীত্ব থেকে মুক্তির জন্য ফোনোফ্রেন্ড চাই। তার কাছে বিভিন্ন ফোন আসতে থাকে। সে বয়স্ক মহিলার গলা করে কথা বলতে থাকে। তার কিছুদিন পর মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানির নাম করে উপহার পাঠানো হয়। সে বাক্স খোলার পরেও অজ্ঞান হয়না। কারণ, যোগাভ্যাসের মাধ্যমে সে অনেকক্ষণ শ্বাস না নিয়ে থাকতে পারে। পুলিশ অপরাধীকে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

- **<u>সখের গোয়েন্দাগিরির গল্প</u>**

সখের গোয়েন্দাগিরির দুটো গল্প রয়েছে এই সঙ্কলনে। রাজেশ বসুর 'দিয়ালা যখন গোয়েন্দা'তে দেখা যায় দিয়ালা দশম শ্রেণির ছাত্রী। মণিফাল্গুনী বাবু মারা যাওয়ার পর পরিবারের সঙ্গে সেখানে গিয়ে সে পুরো রহস্য সমাধান করে। মণিফাল্গুনী বাবুর কাছে একটি হিরে ছিল, তাঁর ছেলে ওম সেটি আত্মসাৎ করতে চাইছিল। সে তাঁর জীবনদায়ী

ওষুধ লুকিয়ে রেখেছিল, যে কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দিয়ালা মণিফাল্গুনী বাবুর রেখে যাওয়া সংকেত থেকে হিরে খুঁজে বের করে। শিশুপাঠ্য হলেও একে গোয়েন্দা কাহিনি বলা চলে। দিয়ালা ডি-কোডিং করে হিরে উদ্ধার করার পাশাপাশি মণিফাল্গুনী বাবুর মৃত্যুর পিছনের রহস্যও ফাঁস করে দিয়েছে।

হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের 'বুনোহাঁসের খোঁজে' গল্পে কোনও পেশাদার গোয়েন্দা নেই। এখানে গোয়েন্দার ভূমিকায় স্কুলের ছাত্রী বুয়াকে দেখা যায়, তার সঙ্গে রয়েছে তার বন্ধু উকি। তারা একটি নির্মায়মান বাড়ির মধ্যে থেকে রন্টু নামের এক অপহৃত বাচ্চাকে উদ্ধার করতে সাহায্য করে। সেখানে পড়ে থাকা সিম কার্ড নিয়ে এসে তার বাড়িতে খবর দেয়, তারপর পুলিশ এসে অপরাধীদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

'ডিটেকটিভ নন্দিনী সোম ও দানুমামা' গল্পের নামের মধ্যে 'ডিটেকটিভ' শব্দটি থাকলেও গল্পটিকে আসলে গোয়েন্দা কাহিনি বলা চলেনা। অজিতকৃষ্ণ বসু এই গল্পে বিভিন্ন চরিত্রের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে গোয়েন্দা নন্দিনী সোমের পরিচয় প্রকাশ করেছেন। নন্দিনী সোম 'মস্ত বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে'। এখানে নন্দিনীর বুদ্ধির পরিচয় দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তবে সে পেশাদার গোয়েন্দা নয়, 'অ্যামেচার ডিটেকটিভ'। "মেয়ের যেমন আশ্চর্য সুন্দর চেহারা, তেমনি গায়ের আর মনের জোর, তেমনি ধারালো বুদ্ধি আর জোরালো স্মৃতিশক্তি। সায়েন্স কলেজ থেকে অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি নিয়ে এম. এস-সি. পরীক্ষায় একেবারে প্রথম হয়েছে মানুষের মনের নানা রকম কাণ্ড নিয়ে।"[২০]

পুলিশ অফিসার করঞ্জাক্ষ চৌধুরী জানান, হারু দত্ত হত্যা মামলাতে তাঁরা তদন্ত করে বাণীতোষ ভাদুড়ীকে ধরেছিলেন। কিন্তু নন্দিনী তার সঙ্গে সাক্ষাতের পর বলে, বাণীতোষ ষড়যন্ত্রের শিকার। সে নিজের উদ্যোগে তদন্ত শুরু করে জানতে পারে, হারু ও বাণীতোষ দুজনে থিয়েটার করত। বাণীতোষ রগচটা ধরণের, সে রেগে গেলে হারুকে বলত, একদিন তাকে খুন করে দেবে। তবে সেটা তার মনের কথা ছিল না। কিন্তু এই হুমকির বিষয়টা মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছিল। তার সুযোগ নিয়ে ব্রজলাল ষড়যন্ত্র করে। এই দুজনের ওপরেই তার রাগ ছিল। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী পাড়ার লোককে এপ্রিল ফুল বানানোর জন্য বাণীতোষ ও হারু হারুর বাড়িতে চিৎকার করে ঝগড়ার অভিনয় করতে থাকে, তাতে পাড়ার লোক ছুটে আসে। তখন তারা জানায় যে তারা অভিনয় করছিল। পরের দিন হারু খুন হয়, জোরালো বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করা হয়। ব্রজলাল এই হত্যা করে, আর

খুনের দায়ে বাণীতোষ ফেঁসে যায়। যদিও নন্দিনীর তদন্তের পর ব্রজলাল দোষ স্বীকার করে।

- **<u>ব্যক্তিগত জীবনের রহস্য অনুসন্ধান</u>**

কয়েকটি গল্পে দেখা যায় নিজেদের ব্যাক্তিগত জীবনের সঙ্কটের মুখোমুখি হতে গিয়ে কয়েকটি মেয়ে চরিত্র গোয়েন্দার ভূমিকায় নেমে পড়েছে।

গজেন্দ্র কুমার মিত্রের 'হীরের টুকরো' কাহিনিতে রত্না্র যখন এগারো বছর বয়স তখন এক রবিবার সন্ধ্যেবেলা কারেন্ট চলে যাওয়ার পর বাবার সঙ্গে সেও বাড়ির বাইরে বের হয়। সেই সময়ে একজন লোক সাইকেলে যেতে যেতে রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে তার বাবা মাধবকে হত্যা করে। রত্না লোকটির হাতে দুটো ছোট ছোট হিরে বসানো আংটি দেখতে পেয়েছিল। মাধব মারা যাওয়ার পর কেশব মাধবের পরিবারের সব দায় দায়িত্ব সামলায়। সেই সময়ে রত্না এগারো বছর আর তার ভাইয়ের বয়স ছ'বছর। তাই কেশব মনোহারির দোকান ও কারখানা দুটোরই দায়িত্ব নেয়। বড় হওয়ার পর রত্না কলেজে চাকরি পায়। সে কলেজের সেমিনার উপলক্ষে দ্বারভাঙ্গা যাওয়ার পথে দেবেশ নামের এক ব্যাক্তির হাতে ঐ আংটি দেখতে পায়। তার সঙ্গে কথা বলে তার সঙ্গে উকিল নন্দবাবুর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে নানা মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর জানতে পারে --- কেশব শচীদুলালকে দিয়ে মাধবকে হত্যা করায়। আর এই হত্যার মূল্য হিসেবে শচীদুলাল কেশবের কাছ থেকে ছ'হাজার টাকা একটি রিভলভার আর কেশবের হাতের ঐ আংটি নিয়েছিল। কেশব ঐ আংটি কোনও বিলাতি সাহেবের কাছ থেকে কিনেছিল। শচীর সঙ্গে দর কষাকষি করার পর তাকে ঐ আংটি দিতে বাধ্য হয়। ভাই মাধবকে খুন করানোর পর কেশব তার পরিবারের পাশে এসে এমন ভাবে দাঁড়ায়, যাতে কেউ সন্দেহ না করতে পারে। রত্না ও তার ভাই ছোট থাকার কারণে মনোহারি দোকান ও কারখানা দুটোই সে পরিচালনা করতে থাকে। মাধবকে কেশব বলেছিল মনোহারি দোকানের মালিকানা মাধবের থাকুক, আর কারখানার মালিকানা সে নিজের কাছে রাখতে চায়। কিন্তু মাধব তাতে অস্বীকৃত হওয়ায় ফলে প্রথমে সে মামলা করে, তারপর তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

রত্না সবটা জানার পর আংটিটা নিয়ে তার জেঠু কেশবের কাছে যায়, সরাসরি কেশবকে সবকিছু মনে করায়। পাশাপাশি তার সঙ্গে আসা দেবেশকে পুলিশের লোক বলে

পরিচয় দেয়। কেশব ভয় পেয়ে আছড়ে পড়ে যায়। সম্ভবত ভয় পেয়ে তার পক্ষাঘাত বা স্ট্রোক হয় বলে অনুমান করা যায়।

রত্না এখানে গোয়েন্দা নয়। সে আলাদা ভাবে বাবার খুনি কে অনুসন্ধান করে বেড়ায়নি। কিন্তু খুনির হাতে থাকা আংটি দেখে তার ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে যেতেই সে অনুসন্ধানে নেমে পড়েছে। বহু হাত ঘুরে দেবেশের হাতে আসা আংটির প্রকৃত মালিকের খোঁজ বের করার মাধ্যমে সে তার বাবার হত্যা রহস্য উন্মোচন করতে পেরেছে।

সুকুমার সেনের 'ইন্দুমতীর সঙ্কট' কাহিনিতে কবি কালিদাস অপহৃত হন। তিনি স্ত্রী ইন্দুমতীকে একটি চিঠি পাঠান। সেই চিঠি পড়ে ইন্দুমতী বুঝতে পারেন কালিদাসকে কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। তিনি ধর্মকীর্তিকে বিষয়টা জানান তারপর নগরপাল অগ্নি ও বেতালকে নিয়ে গিয়ে কালিদাসকে উদ্ধার করেন। কালিদাসের পৈতৃক স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনা। বরং অপরাধীরা শাস্তি পায়। এখানে ইন্দুমতী মূলত চিঠি পড়ে ডি-কোডিং করেছে। বাকি কাজ নগরপাল করেছেন।

- **অপরাধ ঠেকানোর চেষ্টা**

অপরাধ সঙ্ঘটিত হওয়ার পর অনুসন্ধান করে তার পিছনে থাকা রহস্যকে সবার সামনে তুলে ধরাই গোয়েন্দার কাজ। কিন্তু এখানে কয়েকটি গল্প পাওয়া যায়, যেখানে অপরাধ সঙ্ঘটিত হওয়ার আগেই সেটাকে আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

আশাপূর্ণা দেবীর 'গল্পই কি অল্প' কাহিনিতে ঠিক ব্যক্তিক সঙ্কট নয়, পাশের ফ্ল্যাটের গোলমাল লক্ষ করে ডাক্তার লাহিড়ীর কাজের মেয়ে কাজল মণ্ডল পুলিশকে ফোন করে খবর দেয় ২৩ নম্বর ফ্ল্যাটে একটি খুন হতে চলেছে। অর্থাৎ, এখানে অপরাধ সঙ্ঘটিত হওয়ার পর অনুসন্ধান নয় বরং অপরাধ ঠেকানোর প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

মঞ্জিল সেনের 'সেভেন পার্লস'ও ঠিক গোয়েন্দাগিরির গল্প নয়, বরং অপরাধ ঠেকানোর গল্প। 'সেভেন পার্লস' আসলে সাতটি স্কুল পড়ুয়া তরুণীর দল। গার্গী তাদের পাণ্ডা, বাকিরা হল – ইলু, মিতু, জয়া, বুলু, হেনা আর পুলু। এরা সবাই হকি খেলে। একদিন পাড়ার এক মাদ্রাজি ভাড়াটেদের বাড়িতে দুপুরবেলা দুজন ছিনতাইবাজ ঢোকে। গৃহবধূ মাধুরীকে বেঁধে রেখে তার সবকিছু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তখন এই সাত বন্ধু মিলে

হকিস্টিক দিয়ে মারামারি করে তাদের মোকাবিলা করে এবং এদেরকে পুলিসের হাতে তুলে দেয়।

- **বুদ্ধি চর্চা**

সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বিন্দিপিসির গোয়েন্দাগিরি' কাহিনিটি খানিক অন্য ধারার কাহিনি। এখানে না আছে কোনও পেশাদার গোয়েন্দা না আছে কোনও ব্যাক্তিক সঙ্কট, এই গল্পটিকে বুদ্ধি চর্চার কাহিনি বলা যেতে পারে। বিন্দিপিসির বাড়িতে সব ভাইপো ভাইঝিরা বেড়াতে আসলে গল্প-গাছা চলতে থাকে। রাঘব একটি গল্প শোনায় আর বলে গল্প শেষে সে একটি প্রশ্ন করবে, সবাইকে তার উত্তর দিতে হবে। রাঘব বলে এক বছরের জন্য ইন্দোনেশিয়া সরকারের চাকরি নিয়েছিল। মায়মনুতে থাকার সময় সেখানে দুই বাঙালি – ভবতোষ রায় ও রামতনু সেন বেড়াতে যায়। ভবতোষ রায় ধনীব্যাক্তি সে নিজের টাকা খরচ করে রামতনুকে সঙ্গী করে বেড়াতে যায়। সমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়ে রামতনুর মৃত্যু হয়। জেলের বয়ান অনুযায়ী ভবতোষ রামতনুকে জলের মধ্যে চেপে ধরেছিল। ডাক্তার হিসেবে রামতনুর চিকিৎসা করেছিল রাঘব। অনেকদিন বাদে কলকাতার খবরের কাগজে ভবতোষের আত্মহত্যার খবর প্রকাশিত হয়। ভবতোষ গঙ্গায় ডুবে মারা যায়। গঙ্গার ঘাটে তার দামি জামা-জুতো পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল, রামতনুকে হত্যা করার অনুশোচনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে আত্মহত্যা করছে। বিন্দি পিসি জিজ্ঞাসা করে ভবতোষের দেহ পাওয়া গেছে কিনা। রাঘব জানায় পাওয়া যায়নি। পুলিশ তদন্তে জানা যায় মায়মনু থেকে ফিরে ভবতোষ একটি হোটেলে থাকত। আত্মীয় কেউ ছিল না। বন্ধুদেরও বর্জন করেছিল। ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকা তুলে তুলে সঞ্চয় প্রায় শেষ করে ফেলেছিল।

গল্প শোনানোর পর রাঘব জিজ্ঞেস করে ভবতোষ কেন রামতনুকে হত্যা করেছিল।

রেবা বলে --- রামতনু নিশ্চয়ই ভবতোষের পকেট থেকে টাকা চুরি করত।

রঞ্জনা বলে --- রামতনু ছিল পাকিস্তানের স্পাই, আর ভবতোষ দেশপ্রেমী ভারতীয়।

অজয়, প্রশান্ত, অভিজিৎ, সমীর সবাই নিজের মতো করে রামতনু হত্যার কারণ বলতে থাকে।

শেষে রাঘব বিন্দিপিসিকে তাঁর মত জিজ্ঞেস করে। বিন্দিপিসি বলে ভবতোষ রামতনুকে হত্যা করেনি, আসলে রামতনু ভবতোষকে হত্যা করেছে। ভবতোষ ধনী মানুষ তাকে হত্যা

করে নিজেকে ভবতোষ হিসেবে চালিয়ে দিতে পারলে রামতনুর লাভ। রাঘব জানায়, বিন্দিপিসিই ঠিক বলেছে। মায়মনুতে ভবতোষ মারা গেছিল, ভবতোষবেশী রামতনু আত্মহত্যার নাটক করে, তারপর পাকিস্তানের ফরিদপুরে গিয়ে বৈভবপূর্ণ জীবন কাটাচ্ছে। রাঘব কাজের সূত্রে ফরিদপুরে গিয়ে রামতনুর খোঁজ নিয়েছিল। তার সহপাঠী আজিম বলেছিল ইয়াকুব সেখ কলকাতায় গিয়ে খুব ধনী হয়ে ফিরেছে। রাঘব তাকে দেখে চিনতে পারে। সবাই বিন্দিপিসির এই প্রতিভা দেখে অবাক হলে বিন্দিপিসি জানায় --- "আমার রাধিকেপুর গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ কখন কী করছে --- খবর রাখি আমি। হাতে তো কাঁথা সেলাই ছাড়া কোনও কাজ নেই। তাই ওই খবরাখবর নিয়েই থাকি। সুহাস সারা বিকেলটা বাড়ি বাড়ি ঘোরে, আমায় খবর এনে দেওয়ার জন্য। ওর ঐটেই বড় কাজ। কাজেই লোকচরিত্র আমি খানিকটা জানি।"[২১]

- **শিশুপাঠ্য গল্প**

এই গ্রন্থের বাকি তিনটি গল্প একেবারের শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত। পবিত্র সরকারের 'বাচ্চাটা অতো কাঁদছিল কেন ?' কাহিনিটি কোনও গোয়েন্দা কাহিনি নয়। শিশুপাঠ্য কাহিনি। কাহিনির শেষে দেখা যায় রোমি অনেক পুরস্কার পাচ্ছে। কিন্তু এখানে রোমি আসলে কিছুই করেনি, সে একটি শিশুকে খুব কাঁদতে দেখে বলেছিল, দেখে মনে হচ্ছে যেন অন্যের বাচ্চা। সেই কথায় খটকা লাগতেই শিবায়ন কাকু ঐ দম্পতিকে আটক করে তাদের স্যুটকেস খুলতেই প্রচুর বিদেশী ঘড়ি, সোনার পাত, ক্যামেরা ধরা পড়ে। একটি কুখ্যাত স্মাগলিং গ্যাং ধরা পড়ে।

নবনীতা দেবসেনের 'বিষহরির প্রসাদ' শিশু পাঠ্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। এখানে একটি সাপের বিষ ও চামড়ার চালানকারী চক্র ধরা পড়ে। তার পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে ছোটমামুর। সারা, মহারাজ ও লক্ষীন্দ্র নারায়ণ তাঁর সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছিল। গল্পের শেষে দেখা যায় খবরের কাগজে তাদের সবার নাম বেরিয়েছে। তারা সরকারি তরফ থেকে পুরস্কার পাবে। এটিতে কোনও মেয়েকে আলাদা করে গোয়েন্দা বানানোর চেষ্টাও নেই। এই সঙ্কলনে এই কাহিনিটি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

শিবানী রায়চৌধুরীর 'উত্তরাধিকারী' গল্পে দেখা যায় পারু, মানে স্কুল পড়ুয়া পারমিতা দেব এই কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র। হঠাৎ করে তার বাবা অমিতকুমার দেব একটি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে একটি বাড়ির মালিকানা পান। কিন্তু ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিল

ক্ষীরমোহন। ক্ষীরমোহনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি বলেই অমিত বাবু মালিকানা পেয়েছেন। পারু বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় সন্ধান করে শেষ পর্যন্ত একটি পুরনো ছবি দেখে বুঝতে পারে ক্ষীরমোহন আসলে একটি বেড়াল ছিল। বলা বাহুল্য এটাও গোয়েন্দা কাহিনি নয়।

এই সংকলন গ্রন্থের নামের সঙ্গে সবগল্প সাযুজ্যপূর্ণ নয়। কিন্তু নামটি যেহেতু 'মেয়েরা যখন গোয়েন্দা' তাই গোটা বইটিকে আলোচনার আওতায় আনা হল।

উপরোক্ত কাহিনিগুলি থেকে যে মেয়ে গোয়েন্দাদের নাম পাওয়া গেল : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের -- ১। হৈমন্তী ঘোষাল ২। বৈশাখী ব্যানার্জি, ইন্দ্রনীল সান্যালের -- ৩। দীপশিখা মুখার্জি ৪। দিঠি চ্যাটার্জি ৫। মোহর চ্যাটার্জি, নন্দিনী নাগের -- ৬। তিস্তা দত্ত, ৭। স্বাতী ভট্টাচার্যের মেধাবিনী সেন ৮। হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্তের ক্যাটরিনা সেন ৯। আশিস কর্মকারের অদিতি সেন ১০। রাজেশ বসুর দিয়ালা ১১। হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের বুয়া ১২। অজিতকৃষ্ণ বসুর নন্দিনী সোম ১৩। গজেন্দ্র কুমার মিত্রের রত্না ১৪। সুকুমার সেনের ইন্দুমতী ১৫। আশাপূর্ণা দেবীর কাজল মণ্ডল ১৬। সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিন্দিপিসি আর ১৭। মঞ্জিল সেনের 'সেভেন পার্লস' দল। এই চরিত্রগুলোও বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দা। লক্ষ করলে দেখা যাবে এদের মধ্যে স্কুল পড়ুয়া থেকে পৌঢ়া, পরিচারিকা থেকে মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর সব ধরণের চরিত্র উপস্থিত। এক কথায় বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যের লেখকরা বয়স, সামাজিক অবস্থান, আর্থিক অবস্থানের দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণির মেয়েদেরকে গোয়েন্দা করে তুলেছেন। এদের মধ্যে অনেক গোয়েন্দা চরিত্র রয়েছে, যাদের নিয়ে আর নতুন গোয়েন্দা কাহিনি রচিত হওয়ার অবকাশ নেই। আবার দীপশিখা, তিস্তার মতো কিছু চরিত্র রয়েছে যারা পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারে।

নির্দেশিকা

১। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, 'অমানুষিক', কিশোর সাহিত্য সমগ্র ২, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২০৭

২। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, 'পাথরের চোখ', কিশোর সাহিত্য সমগ্র ২, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬৪

৩। তদেব, পৃ. ৫৭

৪। ইন্দ্রনীল সান্যাল, কর্কটক্রান্তি, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৭ পৃ. ৫০

৫। তদেব, পৃ. ৬০

৬। তদেব, পৃ. ৬১

৭। তদেব, পৃ. ১৫

৮। ইন্দ্রনীল সান্যাল, 'ময়না তদন্ত', সানন্দা পুজো ১৪২৯, পৃ. ২৪০

৯। তদেব, পৃ. ২৫৮

১০। তদেব, পৃ. ২৪৬

১১। তদেব, পৃ. ২৯৪

১২। নন্দিনী নাগ, 'ভালোবাসার পাসওয়ার্ড', হত্যার পরিমিতি, দে'জ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৬০

১৩। নন্দিনী নাগ, 'হত্যার পরিমিতি', হত্যার পরিমিতি, দে'জ, কলকাতা, ২০১৯ পৃ. ১১৬

১৪। তদেব, পৃ. ১১৪

১৫। নন্দিনী নাগ, ডুয়ার্সে ডামাডোল, দে'জ, কলকাতা, ২০২১ পৃ. ১০৫

১৬। নন্দিনী নাগ, হত্যার পরিমিতি, দে'জ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২৫

১৭। নন্দিনী নাগ, ডুয়ার্সে ডামাডোল, দে'জ, কলকাতা, ২০২১ পৃ. ১০

১৮। তদেব, পৃ. ৩৩

১৯। আশিস কর্মকার, 'গিফট হ্যাম্পার', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), মেয়েরা যখন গোয়েন্দা, নিউ স্ক্রিপ্ট, ২০১৬ পৃ. ৩২১

২০। অজিত কৃষ্ণ বসু, 'ডিটেকটিভ নন্দিনী সোম ও দানুমামা', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), মেয়েরা যখন গোয়েন্দা, নিউ স্ক্রিপ্ট, ২০১৬ পৃ. ৭৮

২১। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 'বিন্দিপিসীর গোয়েন্দাগিরি', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), মেয়েরা যখন গোয়েন্দা, নিউ স্ক্রিপ্ট, ২০১৬ পৃ. ১৩

উপসংহার

গোয়েন্দা সাহিত্য মূলত একটি পুরুষ অধিপত্যের জগত, সেখানে গোয়েন্দার স্ত্রী, পরামর্শদাতা বৌদি, এমনকি অপরাধ কর্মের পিছনে থাকা মানুষ হিসেবে নারীকে মানুষ খুব সহজে গ্রহণ করলেও মেয়েদেরকে গোয়েন্দার ভূমিকায় মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা আপত্তি লক্ষ করা যায়। বলা বাহুল্য সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন মাসির আগে অন্য কোনও মেয়ে গোয়েন্দা পাঠক সমাজের কাছে এতটা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। অথচ সুচিত্রা ভট্টাচার্য মিতিনকে নির্মাণ করার অনেক আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন সময়ে মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নির্মিত হয়েছে। কিছুদিনের চমকের পর আবার তারা হারিয়ে গেছে। পাঠকের স্মৃতিপটে স্থায়ী হয়ে উঠতে পারেনি। একুশ শতকেও 'মেয়ে গোয়েন্দা' বিষয়টি মূল ধারার বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। সূচনালগ্ন থেকে মেয়ে গোয়েন্দারা কিভাবে তৈরি হয়েছিল, আর তাদের স্বরূপই বা কেমন সেই নিয়ে এই গবেষণাসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে গোয়েন্দাগিরি তো একটি পেশা অথবা সখের কার্যপ্রণালী বিশেষ, সেখানে লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভাজন রেখা টানা কতটা যুক্তিযুক্ত। আলাদা করে মেয়ে গোয়েন্দা নিয়ে আলোচনা করার কারণ হল, 'গোয়েন্দা' শব্দটির সঙ্গে একটি পিতৃতান্ত্রিক পৌরুষের ধারণা সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। সেই কারণে গোয়েন্দাদের নাম মনে করতে গেলে অধিকাংশ পাঠকের মনেই শুধুমাত্র পুরুষ গোয়েন্দাদের ছবি ভেসে ওঠে। গোয়েন্দা সাম্রাজ্যে মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। পাশাপাশি একথাও সত্যি যে শুধুমাত্র লিঙ্গগত পরিচয় গোয়েন্দার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জীবনযাত্রা, গোয়েন্দাগিরির ধরণ, কাহিনিতে বর্ণিত সমস্যা সবকিছুর ওপরই প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। পুরুষ গোয়েন্দাদের যে কখনোই অপরাধীদের হাতে বন্দী থাকতে হয়নি এমনটা বলা যায়না। কিন্তু শিখা বা কৃষ্ণা যখন অপরাধীদের হাতে বন্দী হয়, তখন তা দীপকাকুর অপরাধীদের হাতে বন্দী থাকার থেকে বেশ অনেকটাই আলাদা হয়ে যায়। কৃষ্ণা বা শিখা অপরাধীদের লোলুপ দৃষ্টির শিকার হয়। আবার অপরাধী দলের পুরুষ চরিত্রদের লালসাকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদেরকে মুক্ত করতেও সক্ষম হয়। এক পুরুষ গোয়েন্দার ক্ষেত্রে অপরাধীদের সঙ্গে ছলনা বা প্রেমের অভিনয় করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু মেয়ে গোয়েন্দারা নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য এই পন্থা গ্রহণ করে। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও বেশ বড় ধরণের পার্থক্য চোখে পড়ে। বেশির ভাগ পুরুষ গোয়েন্দাই পেশাদার গোয়েন্দা। কিন্তু মেয়ে গোয়েন্দাদের ক্ষেত্রে মিতিনকে বাদ দিলে আর কাউকে

পুরোপুরি পেশাদার গোয়েন্দা বলা যায় না। পারমিতা ঘোষ মজুমদারের রঞ্জাবতী পেশাদার গোয়েন্দা, তবে তার খুব বেশি কাহিনি প্রকাশিত হয়নি। মেয়ে গোয়েন্দাদের ক্ষেত্রে মূলত সখের গয়েন্দাগির ছবি পাওয়া যায়। শিখা, কৃষ্ণা বা গণ্ডালুরা খুবই স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে। দময়ন্তী ও গার্গীর অন্য পেশাগত পরিচয় রয়েছে। অর্থপ্রাপ্তি নিয়ে তাদের একেবারেই মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, কিন্তু অর্জুন বা দীপকাকুকে গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি অর্থাগম নিয়েও মাথা ঘামাতে হয়। পেশাদার গোয়েন্দাদের তদন্তের ধরণ ও সখের গোয়েন্দাদের তদন্তের ধরণের মধ্যে বেশ খানিকটা পার্থক্য থেকে যায়। মেয়ে গোয়েন্দাদের অধিকাংশই সখের গোয়েন্দা হওয়ার দরুন সেই পার্থক্যও বিদ্যমান। আমাদের সমাজে এখনও পর্যন্ত একজন মেয়েকে তার চারিত্রিক শুদ্ধতার পরিচয় দিতে হয়। সেই কারণেই গার্গী যখন নিরপরাধ সায়নের পাশে দাঁড়ায় তাকে নিয়ে নানা রকম কেচ্ছা প্রকাশিত হতে থাকে, সেই রহস্যের পিছনে দৌড়ানোর কারণে তার ব্যাক্তিগত জীবন বিঘ্নিত হয়, তাকে দাদা-বউদির সংসার ছেড়ে বের হয়ে যেতে হয়। সে সায়নকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। পুরুষ গোয়েন্দাদের ক্ষেত্রে ব্যাক্তগত এমন সঙ্কটের ছবি বিরল। পুরুষ গোয়েন্দাদের স্ত্রীরা কখনো তাদের গোয়েন্দাগিরির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু গার্গী যখন খুনের তদন্ত করতে নেমে সিরিয়ালের বিভিন্ন অভিনেতার সঙ্গে মিশতে শুরু করে এমনকি অভিনয় করতে রাজি হয়ে যায়, তখন সায়নের সঙ্গে তার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মূলে স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রবণতা মেয়ে গোয়েন্দাদের জীবনেও প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের সমাজের প্রচলিত ধারনাতে আঘাত করার জন্য লেখকরা মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন ঠিকই, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষ নামের বদলে একটি নারীর নাম বসিয়ে দিয়েই তাঁরা মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্রগুলি নির্মাণ করেননি। তাই মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্রগুলি শুধুমাত্র পুরুষ গোয়েন্দার প্রতিস্পর্ধী চরিত্র হিসেবেই নির্মিত হয়নি। তারা সামগ্রিক ভাবে নিজেদের নারীসত্ত্বা নিয়ে কাহিনিতে হাজির হয়েছে। গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি বরের অগোছালো ঘর গুছিয়ে দেওয়া, রান্না করে সবার মন জয় করা, কাজের ফাঁকে সন্তানের খোঁজ নেওয়া ইত্যাদি কাজগুলো থেকে তারা অব্যহতি পায়নি। ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে। যেমন, স্বাতী ভট্টাচার্যের মেধাবিনী সেনের মধ্যে আলাদা করে মেয়ে গোয়েন্দার কোনও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়না। মেধাবিনীর বদলে কোনো পুরুষ নাম থাকলেও কাহিনির কোনও বাক্য বদলানোর প্রয়োজন পড়ত না। এই ধরণের কিছু গোয়েন্দা কাহিনি থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়ে গোয়েন্দারা সামগ্রিক ভাবে নিজেদের নারীসত্ত্বা সমেতই গোয়েন্দা কাহিনিতে হাজির হয়েছে।

আটটি অধ্যায়ে বিভাজিত এই গবেষণাসন্দর্ভের পাঁচটি অধ্যায়ে নির্দিষ্ট করে এক একটি মেয়ে গোয়েন্দাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গোয়েন্দা কৃষ্ণা ও শিখা, গোয়েন্দা গণ্ডালু, রহস্যানুসন্ধানী দময়ন্তী, গোয়েন্দা গার্গী, গোয়েন্দা মিতিন মাসি এই ছয় গোয়েন্দাকে নিয়ে এই গবেষণাসন্দর্ভে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের মধ্যে এরাই প্রতিনিধি স্থানীয়, তাই আলোচনার জন্য এদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে যে গল্প বা উপন্যাস লেখা হয়েছে সেগুলি ‘অন্যান্য মেয়ে গোয়েন্দাদের কথা’ শীর্ষক অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী যখন কৃষ্ণা ও শিখাকে নির্মাণ করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, আধুনিক বাঙালি মেয়েরা বিপদে পড়লে কিভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে তা জানানো। অর্থাৎ মেয়েদের মধ্যে সাহস সঞ্চারের জন্য তিনি তাঁর গোয়েন্দা চরিত্রগুলিকে নির্মাণ করেন। আর এই কারণে তাঁর গোয়েন্দাদেরকে বারবার বিপদে পড়তে দেখা যায়, আর তারপর নানা কৌশলে তারা সেই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করে। বেশির ভাগ কাহিনিতেই এই মুক্ত করার প্রসঙ্গই মূল কাহিনিকে ছাপিয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে। এরপর যখন নলিনী দাশ গোয়েন্দা গণ্ডালু সৃষ্টি করেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একেবারেই আলাদা। তিনি সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই শিশু-কিশোর পাঠ্য পত্রিকার পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি কালু, মালু, বুলু ও টুলুদের দলকে হাজির করেন। এনিড ব্লাইটনের ‘ফেমাস ফাইভ’কে অনুসরণ করলেও তিনি সম্পূর্ণ ভাবে তা অনুকরণ করলেন না। এখানে চার চরিত্রই কিশোরী, কোনও কিশোর চরিত্রকে তিনি তাঁর এই সিরিজে নিয়ে এলেন না। এর পিছনে তাঁর নারীবাদী চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে কিশোর পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়ার কারণে এখানে আলাদা করে নারীকেন্দ্রিক সমস্যার প্রসঙ্গকে তিনি তুলে ধরেননি। কৃষ্ণা ও শিখা যেমন একদিকে নারী হয়ে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য বিদ্রূপের শিকার হয়েছে আবার অন্যদিকে নারী হওয়ার করণে অপরাধীদের লালসার শিকার হয়েছে, গণ্ডালুদের ক্ষেত্রে এমনটা হতে দেখা যায় না। গণ্ডালু সিরিজকে মানুষ সেভাবে মনে রাখেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ের গোয়েন্দা কাহিনিতে কিশোর পাঠকদের জন্য রচিত এই গোয়েন্দা সিরিজের প্রভাব রয়ে গেছে। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজ তো বটেই, পাণ্ডব গোয়েন্দা, কাকাবাবু, মিতিন মাসি, দীপকাকু আরও অনেক কিশোর পাঠ্য গোয়েন্দা সিরিজ নির্মিত হতে শুরু করল। কিশোর সাহিত্যে ‘সন্দেশ’-এর হাত ধরে গোয়েন্দা কাহিনির যে ধারার সূত্রপাত হয়েছিল পরবর্তী সময়ে ‘আনন্দমেলা’য় তার চর্চা

অব্যহত থাকে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে কিশোর গোয়েন্দা সিরিজের সূত্রপাত হলেও বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পুরুষ গোয়েন্দাদের ক্ষেত্রে কিশোর সাহিত্যের চরিত্র হয়ে ওঠা যতটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল, মেয়ে গোয়েন্দাদের ক্ষেত্রে তেমনটা হল না। পরবর্তী কালের মেয়ে গোয়েন্দাদের মধ্যে মিতিন মাসি ও গার্গীর কিছু গল্প বাদ দিলে বেশির ভাগ গোয়েন্দা কাহিনিই প্রাপ্ত বয়স্ক পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখা। পারমিতা ঘোষ মজুমদারের মতো কিছু লেখিকা কিশোর পাঠ্য গোয়েন্দা উপন্যাস লেখার চেষ্টা করলেও আলাদা ভাবে কোনও গোয়েন্দা চরিত্রকে পাঠকের সামনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।

মনোজ সেন রহস্যানুসন্ধানী দময়ন্তীকে নিয়ে 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে শুরু করেন। বলাই বাহুল্য তা মোটেই কিশোর পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখা নয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এর আগে নির্মিত বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দারা কেউ বিবাহিত নয়। কৃষ্ণা বা শিখা তো বিয়ে না করার পণ নিয়েছে অন্যদিকে বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো বয়স গণ্ডালুদের হয়নি। দময়ন্তী বিবাহিত জীবন শুরু করার পর গোয়েন্দাগিরি শুরু করে। তার বর সমরেশের কথায় জানা যায় তাদের কলেজ জীবনের প্রেমের সম্পর্ক ক্রমে বিবাহিত জীবনে রূপান্তরিত হয়েছে। পেশায় সে ইতিহাসের অধ্যাপক, গোয়েন্দাগিরি করা তার নেশা। দময়ন্তীর কাহিনি পূর্ববর্তী গোয়েন্দা কাহিনির তুলনায় অনেক বেশি পরিণত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দময়ন্তীও হারিয়ে গিয়েছিল, জনপ্রিয়তা তাকে ফিরিয়ে এনেছে অন্য মাধ্যমে। সাতের দশক ও পরবর্তী সময়ের গোয়েন্দা কাহিনির ওপর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় দুই মেয়ে গোয়েন্দা গার্গী ও মিতিন বিবাহিত গোয়েন্দা। কিশোর পাঠকের জন্য রচিত কিছু গল্পে গার্গীর কিশোরী বয়সের ছবি পাওয়া গেলেও মিতিনের সব কাহিনিই তার বিবাহপরবর্তী জীবনের। তবে এক্ষেত্রে এই তিনজন বিবাহিত রমণীর মধ্যে বেশ খানিকটা পার্থক্য দেখা যায়। দময়ন্তী ও গার্গী পেশাদার গোয়েন্দা নয়। মনোজ সেন তাঁর লেখায় দময়ন্তীর পেশার উল্লেখ করলেও শুধুমাত্র তার গোয়েন্দাগিরির ছবিই তুলে ধরেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় গার্গীর গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি তার পেশাগত জীবনকেও বিস্তারিত ভাবে পাঠকের সামনে হাজির করেন। অন্যদিকে সুচিত্রা ভট্টাচার্য মিতিনকে পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবে নির্মাণ করেন, তার পেশাগত জীবনের পরিচয় দেওয়া মানেই তার গোয়েন্দাগিরির পরিচয় দেওয়া। লেখিকা মিতিনের পেশাগত জীবনের পাশাপাশি তার সাংসারিক জীবনকেও সবিস্তারে তুলে ধরেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা কাহিনিগুলিতে একদিকে নারীবাদী চেতনা অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিক ধারনাকে

মান্যতা দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একদিকে সে ক্যারাটের প্যাঁচে অপরাধীকে ঘায়েল করে, বেড়াতে গেলেও নিজের সঙ্গে রিভলভার নিতে ভোলে না, অন্যদিকে সে প্রকৃত সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, রন্ধন পটীয়সী, নিজের কাজের ফাঁকে বাড়িতে ফোন করে সন্তানের খবর নিতে ভুলে না যাওয়া আদর্শ মা। সম্ভবত লেখিকা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে থাকা একজন সাধারণ গৃহবধূও যে গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পারে, এই বার্তা দেওয়ার জন্য চরিত্রটিকে এভাবে নির্মাণ করেছেন।

নির্বাচিত এই গোয়েন্দাদের পাশাপাশি নবম অধ্যায়ে অন্যান্য কিছু মেয়ে গোয়েন্দাদের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা হল নন্দিনী নাগের গোয়েন্দা তিস্তা। তিস্তার সঙ্গে গার্গীর চরিত্রগত ঈষৎ মিল পাওয়া যায়। তিস্তা সাংবাদিক, গার্গীও বেশ কিছুদিন ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছিল। উভয়েই নিজের পেশাগত জীবন নিয়ে অত্যন্ত সচেতন ও সফল। তিস্তা তার পূর্ববর্তী মেয়ে গোয়েন্দাদের মতো বিবাহিত গোয়েন্দা তার কাহিনিগুলিও বেশ পরিণত। সূচনালগ্নের গোয়েন্দাদের মতো মেয়ে গোয়েন্দা বলে তাকে হেয় হতে হয়না। পাশাপাশি অফিসের বন্ধু ও বর অনেক সময়ই তাকে সাহায্য করতে থাকে। এক্ষেত্রে মিতিনের সঙ্গে পার্থর যে সহজ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তার ছাপ তিস্তার দাম্পত্য জীবনেও লক্ষ করা যায়।

সামগ্রিক ভাবে বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই একদম প্রথম পর্যায়ের মেয়ে গোয়েন্দা নির্মাণের পিছনে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবল প্রভাব রয়েছে। সাংসারিক জীবন আসলে পিতৃতান্ত্রিক ব্যাবস্থার একটি রূপ, সেই কারণে প্রথম পর্যায়ের গোয়েন্দারা কেউ বিবাহিত নয়। পাশ্চাত্য নারীবাদ ও ভারতীয় নারীবাদের যে মূলগত পার্থক্য তা হল, আধুনিক ভারতে পুরুষের হাত ধরেই নারীবাদের আগমন। রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীরা নারীর অধিকার নিয়ে প্রথম সরব হন। তাই ভারতীয় নারীবাদী ভাবনা সম্পূর্ণ রূপে পুরুষ নিরপেক্ষ নয়। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মধ্যে পাশ্চাত্য নারীবাদের প্রভাব পাওয়া গেলেও সাতের দশকের পরবর্তী সময়ের লেখকরা সেই পথে হাঁটেননি। তাঁরা 'রিপ্রোডাকটিভ স্লেভারি'-র তত্ত্বকে গুরুত্ব না দিয়ে বিবাহিত নারী গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ করেন। সেই পথ ধরে আস্তে আস্তে 'মাতৃত্বেই নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ' মানসিকতার প্রবেশ দেখা যায়। গোয়েন্দারা সংসার সন্তান সামলে গোয়েন্দাগিরি করেন। এমনটার পিছনে লেখকদের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার থেকেও সামাজিক পরিকাঠামোর প্রভাব অনেক বেশি বলে মনে হয়। পাঠক সবসময়ই এমন চরিত্রের সঙ্গে বেশি একাত্মবোধ করে যার সঙ্গে তার নিজের জীবনের কিংবা পরিচিত

মহলের মানুষের মিল রয়েছে। কৃষ্ণা বা শিখাকে তৎকালীন পাঠক সমাজ গ্রহণ করেছিল। তবে তারা ছিল কল্প রাজ্যের বাসিন্দা, সেই কারণে মানুষ এই চরিত্রের প্রতি মুগ্ধ হলেও একাত্মবোধ করতে পারেনি। সম্ভবত সেই কারণেই তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে মিতিনমাসিকে পাঠক অনেক বেশি করে মনে রেখেছে। কারণ, মিতিন মাসি একেবারেই ধরাছোঁয়ার বাইরের কোনও চরিত্র নয়। আমাদের পরিচিত গণ্ডির মধ্যের একজন হয়েও সে অসাধারণ, তাই পাঠক একদিকে যেমন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, অন্যদিকে তার সঙ্গে একাত্মবোধও করতে পেরেছে।

বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দা আগমনের সময় অন্যধারার সাহিত্যিক নির্মাণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ের লেখকদের কলমে তা বেশ অনেকটাই মূল ধারার সাহিত্যিক নির্মাণের আওতার মধ্যে চলে আসতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান লেখকরা শুধুমাত্র একটি মেয়েকে গোয়েন্দা হিসেবে উপস্থিত করে পাঠককে চমকে দেওয়ার বদলে রহস্য ও কাহিনিগত উৎকর্ষের দিকে অনেক বেশি নজর দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সাম্প্রতিক লেখক নন্দিনী নাগ তিস্তার কাহিনিগুলিতে তিস্তার লিঙ্গগত পরিচয়কে মাথায় রেখেও কাহিনির রহস্যের মধ্যে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করে চলেছেন। ইন্দ্রনীল সান্যাল নির্দিষ্ট কোনও মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নির্মাণ না করে তাঁর মেডিক্যাল থ্রিলারগুলোতে বিভিন্ন পেশার মেয়েদের পেশাগত ও ব্যাক্তিগত জীবনের পথে উপস্থিত রহস্যের জটিলতা সমাধানের ভার দিয়েছেন। ক্রমাগত মেয়ে গোয়েন্দাদের মধ্যে লিঙ্গগত পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে গোয়েন্দা হিসেবে নিজেদের সক্ষমতার স্বাক্ষর রাখার প্রবণতা চোখে পড়ছে। প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে ফল্গুনদীর মতো বহমান গোয়েন্দা সাহিত্যের এই ধারা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

একুশ শতকের নবীন পাঠকদের কাছে মিতিন মাসি ‘মেয়ে গোয়েন্দা’ হিসেবে আলাদা করে চিহ্নিত হলেও অন্যান্য গোয়েন্দাদের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার মতো চরিত্র নয়। শুধুমাত্র গ্রন্থ জগতেই নয় রুপোলী পর্দাতেও মেয়ে গোয়েন্দাদের আগমন লক্ষ করা যাচ্ছে। ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘শুভ মহরত’ চলচ্চিত্র কিংবা ‘তাহার নামটি রঞ্জনা’ টেলিছবি নির্মাণ গুণেই দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। টেলিভিশনে স্টার জলসা চ্যানেলে ‘চেক মেট’, ‘গোয়েন্দা গিন্নি’ জাতীয় ধারাবাহিকের প্রচার প্রমাণ করে দর্শক মহলে মেয়ে গোয়েন্দাদের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। বহুদিন আলোচনার আড়ালে থাকা মনোজ সেনের ‘রহস্যানুসন্ধানী দময়ন্তী’ সিরিজের কাহিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পরপরই ও টি টি প্ল্যাটফর্ম ‘হইচই’-এ তা নিয়ে ওয়েব সিরিজ নির্মিত হয়। মিতিন মাসির কাহিনি নিয়েও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এক কথায় রুপোলী পর্দার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রও ব্যোমকেশ, ফেলুদার কাহিনি নিয়ে

চর্বিত চর্বণের পাশাপাশি মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্র নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে। সুতরাং, বলা যায় দর্শকশ্রেণিও মেয়ে গোয়েন্দা বিষয়টিকে হেয় করার বদলে তার প্রতি কৌতূহল পোষণ করছে।

সবশেষে বলা যায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের কাছে মেয়ে গোয়েন্দা বিষয়টি আগের থেকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। তার পিছনে সামাজিক পালাবদল অবশ্যই মুখ্য কারণ। যে সময় প্রভাবতী দেবী গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে শুরু করেছিলেন, সেই সময়ে সমাজের অধিকাংশ মেয়েই শিক্ষার আলো পেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। সেখানে দাঁড়িয়ে এক মেয়ের গোয়েন্দাগিরি বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় নারী জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ের গাড়ি চালিয়ে অপরাধীর পিছু নেওয়া যতটা কাল্পনিক ছবি বলে মনে হত --- বর্তমান সময়ে ক্যারাটের প্যাঁচে একজন অপরাধীকে ঘায়েল করার ছবি ততটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়না। বিগত কয়েক বছর ধরে বর্তমান পাঠকদের জন্য পুরনো গোয়েন্দা কাহিনি নতুন করে প্রকাশিত হওয়ার জোয়ার এসেছে। এরমধ্যে পুরনো মেয়ে গোয়েন্দাদের কাহিনিগুলির সংকলন বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। কারণ, এই কাহিনিগুলি আগে এমন ভাবে সঙ্কলিত হয়নি। 'দেব সাহিত্য কুটীর' থেকে গোয়েন্দা কৃষ্ণা ও গোয়েন্দা শিখার গোয়েন্দা কাহিনি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি 'বুকফার্ম' থেকে গোয়েন্দা দময়ন্তীর কাহিনি নিয়ে দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সময়ের পাঠকদের কাছে এই পুরনো গোয়েন্দাদের কাহিনি নতুন করে ফিরে আসার পর তা পাঠকদের কাছে আদৃতও হয়েছে। কাহিনিগুলির রচনা কালের পাঠক মেয়ে গোয়েন্দাদেরকে যে অবাক দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিল, বর্তমান পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই বিস্ময় নেই। বরং সমালোচনা করে মান যাচাইয়ের প্রবণতা বেড়েছে। বলা বাহুল্য সব মেয়ে গোয়েন্দা কাহিনিই সেই মানদণ্ডে খুব উচ্চপর্যায়ে থাকবে না। কিন্তু একথাও সত্যি যে মেয়ে গোয়েন্দার কাহিনি বলেই তা নিম্নশ্রেণির গোয়েন্দা কাহিনি ভেবে নেওয়ার প্রবণতা অনেকটাই কমেছে। আগামী সময়ে মেয়ে গোয়েন্দার কাহিনিও অন্যান্য গোয়েন্দা কাহিনির সমপর্যায়ে পরিগণিত হবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.)। সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৬।

অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পা.)। সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি ২। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৭।

অরুণ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। সেরা গোয়েন্দা রহস্য। কলকাতা। পুনশ্চ। ১৯৯৫।

আগাথা ক্রিস্টি। রচনা সমগ্র ১। নচিকেতা ঘোষ (অনুবাদ)। কামিনী প্রকাশনালয়য়। কলকাতা। নববর্ষ ১৪০৫।

আগাথা ক্রিস্টি। রচনা সমগ্র ২। পৃথ্বীরাজ সেন (অনুবাদ)। কামিনী প্রকাশনালয়য়। কলকাতা। ভাদ্র ১৪০৫।

ইন্দ্রনীল সান্যাল। কর্কটক্রান্তি। ২য় মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৮।

ইন্দ্রনীল সান্যাল। পণ্যভূমি। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৮।

ইন্দ্রনীল সান্যাল। 'ময়না তদন্ত'। সানন্দা পুজো ১৪২৯।

ইন্দ্রনীল সান্যাল। স্নেহজাল। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৯।

চিত্রা দেব। শুধু আংটির জন্য। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৯১।

চিত্রা দেব। সিদ্ধিদাতার অন্তর্ধান। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৮৯।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ১। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১১।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ২। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১২।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ৩। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৩।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ৪। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৪।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ৫। ২য় সংস্করণ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৮।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ৬। ২য় সংস্করণ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০২০।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্গী সমগ্র ৭।কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৯।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। গোয়েন্দা গার্গী কিশোর সমগ্র। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৭।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। রায়মল্লিকবাড়ির জড়োয়া রহস্য। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৭।

দেবারতি মুখোপাধ্যায়। অঘোরে ঘুমিয়ে শিব। ৩য় সংস্করণ। কলকাতা। দীপ প্রকাশন। ২০২১।

দেবারতি মুখোপাধ্যায়। ঈশ্বর যখন বন্দী। ৪র্থ সংস্করণ। কলকাতা। দীপ প্রকাশন। ২০২১।

দেবারতি মুখোপাধ্যায়। গ্লানির্ভবতি ভারত। ৭ম প্রকাশ। কলকাতা। দীপ প্রকাশন। ২০২২।

দেবারতি মুখোপাধ্যায়। নরক সংকেত। ৮ম সংস্করণ। কলকাতা। দীপ প্রকাশন। ২০২২।

নন্দিনী নাগ। গোপীবল্লভপুরের গুপ্তরহস্য। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০২১।

নন্দিনী নাগ। ডুয়ার্সে ডামাডোল। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০২১।

নন্দিনী নাগ। হত্যার পরিমিতি। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৯।

নলিনী দাশ। গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র প্রথম খণ্ড। কলকাতা। নিউ স্ক্রিপ্ট। ২০০৯।

নলিনী দাশ। গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা। নিউ স্ক্রিপ্ট। ২০১২।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পা.)। মেয়েরা যখন গোয়েন্দা। কলকাতা। নিউস্ক্রিপ্ট। ২০১৬।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। অভিশপ্ত সম্পদ। কলকাতা। শরত সাহিত্য সদন। ১৯৪৫।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। গোয়েন্দা কৃষ্ণা। রণিতা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলকাতা। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড। ২০২০।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। গোয়েন্দা শিখা কুমারিকা সিরিজ। রণিতা চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলকাতা। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড। ২০২১।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। চির বঞ্চিতা। কলকাতা। শরত সাহিত্য সদন। ১৯৪৮।

প্রভাবতী দেবী। প্রভাবতী দেবীর গ্রন্থাবলী। কলকাতা। বসু সাহিত্য মন্দির। ১৯৫৭।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। মুক্তির আহ্বান। কলকাতা। ডি এম লাইব্রেরী।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। যুগের হাওয়া। কলকাতা। শরত সাহিত্য সদন। ১৯৪৮।

প্রণব সেন ও তপন কুমার দাস (সম্পা.)। সেরা গোয়েন্দা গল্প। কলকাতা। অশোক পুস্তকালয়য়। ২০০১।

প্রীতি চট্টোপাধ্যায়। রহস্যের দুই দিক। কলকাতা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। মাঘ। ১৪০৫।

বাণী বসু। অপারেশন অরিন্দম। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৮৯।

মনোজ সেন। দময়ন্তী সমগ্র ১। কলকাতা। বুক ফার্ম। ২০১৯।

মনোজ সেন। দময়ন্তী সমগ্র ২। কলকাতা। বুকফার্ম। ২০২০।

মহম্মদ জাফর ইকবাল। টুনটুনি ও ছোটাচ্চু। ৫ম মুদ্রণ। ঢাকা। পার্ল পাবলিকেশন। ২০১৪।

রাকিব হাসান। গোয়েন্দা কাহিনি মরু অভিযান। ঢাকা। দি রয়েল পাবলিশার্স। ২০১৪।

রাকিব হাসান। তিনকন্যা নীল নোটবুক। ঢাকা। অনন্যা। ২০১৭।

রাকিব হাসান। তিনকন্যা স্টার কুয়েস্ট ২। ঢাকা। অনন্যা। ২০১৭।

লীলা মজুমদার (সম্পা.)। নলিনী দাশ ও সত্যিজিৎ রায়। সরস রহস্য ১ম খণ্ড। কলকাতা। নিউ স্ক্রিপ্ট। ১৯৯২।

শাশ্বতী সেনগুপ্ত। নেপাল রহস্য। কলকাতা। প্রতিভাস। ২০১৭।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (সম্পা)। সেরা ১০১ গোয়েন্দা গল্প। কলকাতা। মাইতি বুক হাউস। ২০১৫।

শ্রী শ্রীরাম শাস্ত্রী (সম্পা.)। রহস্য-লহরী ১ম ভাগ। কলকাতা। বাণী পুস্তকালয়।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য ।'আরাকিয়েলের হিরে'। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪১৫।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। কুড়িয়ে পাওয়া পেনড্রাইভ। ২য় মুদ্রণ। কলকাতা। পত্রভারতী। ২০১৩।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। কেরালায় কিস্তিমাত। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ২০১২।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। গুপ্তধনের গুজব। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৩।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। 'ছকটা সুডোকুর'। আনন্দ পাবলিশার্স মেলা পূজাবার্ষিকী ১৪১৪। ২০০৭।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। জোনাথনের বাড়ির ভূত। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৩।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। 'ঝাও ঝিয়েন হত্যা রহস্য'। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪১০।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। 'টিকর পাড়ায় ঘড়িয়াল'। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪২০।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তিন মিতিন। ১ম প্রকাশ। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০০৮।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। 'দুঃস্বপ্ন বারবার'। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪২১।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। পালাবার পথ নেই। ৭ম মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৪।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। পাঁচ মিতিন। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০১৯।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য । 'মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ'। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪১৯।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সর্পরহস্য সুন্দরবনে। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১২।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সারান্ডায় শয়তান। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৩।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। স্যান্ডারসাহেবের পুঁথি। আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৪২২।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য। হাতে মাত্র তিনটে দিন। ২য় মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৩।

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়। গ্রেটডেন রহস্য। কলকাতা। মিত্র ও ঘোষ। ১৪০৫।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.)। রহস্য গল্প। কলকাতা। নারায়ণ পুস্তকালয়য়। ২০০৩।

সুমন্ত আসলম। শত্রুর কবলে পাঁচ গোয়েন্দা। ঢাকা। কাকলী প্রকাশন। ২০১৪।

সুশান্ত পাল (সম্পা.)। সেরা রহস্য। কলকাতা। দক্ষভারতী। ২০০০।

সুষমা সেন। ঈশ্বরের মৃত্যু। কলকাতা। দেব সাহিত্য কুটীর। অগ্রহায়ণ ১৩৬৭।

সুষমা সেন। এযুগের দুঃশাসন। কলকাতা। দেব সাহিত্য কুটীর। পৌষ ১৩৬৪।

সৈয়দ শামসুল হক। হাডসনের বন্দুক। ২য় সংস্করণ। ঢাকা। পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড। ২০১৪।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। কিশোর সাহিত্য সমগ্র ১ম খণ্ড। কলকাতা। শশধর প্রকাশনী। ২০১৪।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। কিশোর সাহিত্য সমগ্র ২য় খণ্ড। কলকাতা। শশধর প্রকাশনী। ২০১৩।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। কিশোর সাহিত্য সমগ্র ৩য় খণ্ড। ২য় সং। কলকাতা। শশধর প্রকাশনী। ২০১৮

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। কিশোর সাহিত্য সমগ্র ৪র্থ খণ্ড। কলকাতা। শশধর প্রকাশনী। ২০২০।

সহায়ক গ্রন্থ

প্রলয় বসু। গোয়েন্দা রহস্যের সন্ধানে। কলকাতা। খড়ি প্রকাশনী। ২০২০।

প্রসেনজিৎ দাসগুপ্ত। সাহিত্যের গোয়েন্দা। কলকাতা। পরশপাথর প্রকাশন। ২০১৩।

মল্লিকা সেনগুপ্ত। স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৪।

সুকুমার সেন। ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৮।

সহায়ক পত্রপত্রিকা

আন্তর্জাতিক পাঠশালা। অমিত রায় (সম্পা.)। গোয়েন্দার গল্প গল্পের গোয়েন্দা। কলকাতা। অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা। ২০১৮।

কোরক। তাপস ভৌমিক (সম্পা.)। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা। কলকাতা। প্রাক শারদ সংখ্যা। ২০১৩।

কৃত্তিবাস মাসিক। ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা। ২০১৮।

দেশ। সুমন সেনগুপ্ত (সম্পা.)। গোয়েন্দা কোথায়। ৮৫ বর্ষ ১০ সংখ্যা। ২০১৮।

বিভাব। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পা.)। শার্লক হোমসের শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা। কলকাতা। সাহিত্য সংসদ। ১৯৮৭।

সন্দেশ। সন্দীপ রায় (সম্পা.)। বর্ষ ৫৬। মে-জুলাই ২০১৬।